সায়েন্স ফিকশন সমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ

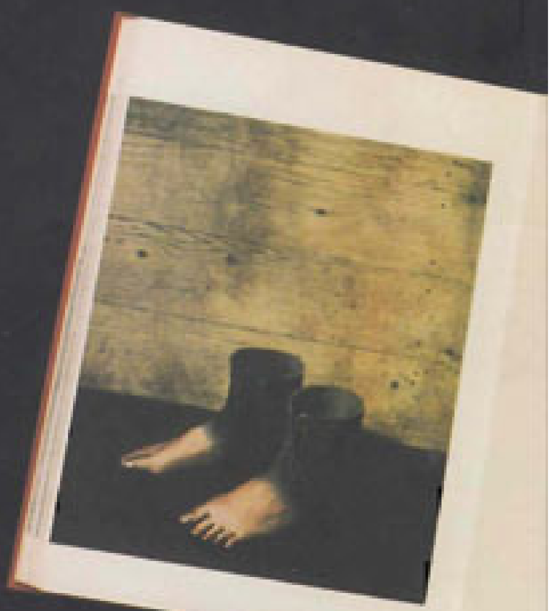

সায়েন্স
ফিকশান
সমগ্র

□ তোমাদের জন্য
ভালোবাসা □ তারা তিন জন
□ অন্য ভুবন □ ইরিনা
□ অনন্ত নক্ষত্রবীথি □ কুহক

পূর্বকথা

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের কথা। ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছি। বাবা-মা ভাই-বোন ছেড়ে প্রথম থাকতে এসেছি হোস্টেলে। কিছুই ভালো লাগে না: কোনো কিছুতেই মন বসে না। দিন পনেরো অনেক কষ্টে থাকলাম. তারপর-- 'দূর! আর পড়াশোনা করব না,' এই ভেবে রাতের ট্রেনে রওনা হয়ে গেলাম বগুড়ায়। হাতে চটি একটা রাশিয়ান বইয়ের বাংলা অনুবাদ! বইটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর। রাতের ট্রেনে গাদাগাদি ভিড়, আলোও কম, তার ওপর এক ঘুমকাতুরে যাত্রী বারবার ঘুমের ঘোরে আমার গায়ে পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই পড়তে শুরু করলাম-- 'ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ' গল্পটি কার লেখা এখন আর মনে পড়ছে না--শুধু মনে পড়ছে গল্প পড়ে আমি বিস্মিত, রোমাঞ্চিত ও মুগ্ধ। এ ধরনের গল্প তো আগে পড়ি নি! এগুলি যদি সায়েন্স ফিকশান হয়, তাহলে এত দিন এইসব পড়ি নি কেন? একই গল্প ময়মনসিং পৌঁছবার আগে আগে তিন বার পড়ে ফেললাম। আমার নেশা ধরে গেল. সেই নেশা এখনো কাটে নি। এখনো আমার প্রিয় পাঠ্যতালিকার শুরুতেই আছে সায়েন্স ফিকশান। তারাশঙ্করের 'কবি' পড়ে আমি যে আনন্দ পাই, ঠিক সেই রকম আনন্দ পাই এসিমভের 'এণ্ড অব ইটারনিটি' পড়ে সম্ভবত আমার মধ্যে কোনো গণ্ডগোল আছে

সায়েন্স ফিকশানের প্রতি গাঢ় ভালোবাসার কারণেই হয়তো আমার তৃতীয় প্রকাশিত বইটি একটি সায়েন্স ফিকশন--'তোমাদের জন্যে ভালোবাসা', প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 'বিজ্ঞান সাময়িকী'তে। আমার ধারণা ছিল কেউ এই লেখা পড়বে না, পড়লেও বিরক্ত হয়ে বলবে-এসব কি ছাইপাঁশ শুরু হল? সাহিত্য কোন পথে যাচ্ছে? আশ্চর্যের ব্যাপার--সে রকম কিছু হল না, বরং অনেকেই আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে লেখা পড়তে শুরু করলেন। খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী বইটি প্রকাশ করলেন বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন বলেই হয়তো একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপনের ভাষা এরকম--

"ছোটদের জন্যে লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী
তবে বড়রাও পড়িলে মজা পাইবেন "

'তোমাদের জন্যে ভালোবাসা' ভালোবাসার সঙ্গে পাঠকরা গ্রহণ করলেও আমি কিন্তু দ্বিতীয় সায়েন্স ফিকশান লেখার ব্যাপারে অনেক দেরি করলাম প্রায় দশ বছর. কারণ খুব সহজ: আইডিয়া পাচ্ছিলাম না। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর আইডিয়া 'হুট' করে মাথায় আসে না। আমার দ্বিতীয় সায়েন্স ফিকশানের 'আইডিয়া' মাথায় এল ঢাকা থেকে বরিশাল যাবার পথে--লঞ্চের কেবিনে শীতের রাত! চাদর মুড়ি দিয়ে লঞ্চের কেবিনে বসে আছি, হাতে ঢাকা থেকে কেনা একগাদা ম্যাগাজিন হঠাৎ কেবিনের দেয়ালে দৃষ্টি আটকে গেল--কুৎসিত একটা মাকড়সা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল. এই প্রাণীটিকে কোনো এক বিচিত্র কারণে আমি অসম্ভব ভয় পাই।

একটা সাপ বা একটা বাঘের সঙ্গে আমি একঘরে রাত কাটাতে রাজি আছি, কিন্তু মাকড়সার সঙ্গে নয় কাজেই কেবিন ছেড়ে ছুটে বের হয়ে এলাম বাকি রাতটা কাটল ডেকে হাঁটাহাঁটি করে। হাঁটাহাঁটি করতে-করতেই সাজিয়ে ফেললাম তিনটি মাকড়সার গল্প। একটি প্রকাণ্ড গ্রহে তিনটি মাত্র প্রাণী, দেখতে মাকড়সার মতো। তাদের বুদ্ধি অসাধারণ, কল্পনাশক্তিও

সীমাহীন। তারা নির্জন, নিষ্প্রাণ গ্রহে ঘুরে বেড়ায় এবং সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কল্পনা করে। এক সময় তাদের পরিচয় হল মানুষ নামের আরেক দল বুদ্ধিমান প্রাণীর সঙ্গে। এই হচ্ছে 'তারা তিন জনে'র গল্প। প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমীর 'ধানশালিকের দেশে' পত্রিকায়।

'অন্য ভুবন' গ্রন্থটির চিন্তা মাথায় আসে ছোট্ট একটি মেয়েকে দেখে. মেয়েটির নাম তিন্নি: সে গাছের সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে। তার গল্প বলার ধরন দেখে মনে হয় সে গাছের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে, মাঝে মাঝে গাছের সঙ্গে রাগ করছে। মেয়েটির কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার মনে হ'ত গাছের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ আছে সেই যোগসূত্রটি এখন ছিন্ন। হয়তো-বা এক সময় আমার ছেঁড়া সূতা জোড়া লাগবে, আমরা গাছের সঙ্গে কথা বলা শুরু করব.

'অনন্ত নক্ষত্রবীথি'তে আমি একটি চক্রের কথা বলতে চেষ্টা করেছি চক্র এমন একটি ব্যাপার, যার শুরু নেই, আবার শেষও নেই। যে বস্তুর শুরু এবং শেষ নেই তা হল অসীম। অথচ চক্র অসীম নয়, চক্র সসীম. 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি' লেখার সময় আমি খুব আনন্দ পেয়েছি, নতুন 'আইডিয়া' ব্যবহার করার গাঢ় আনন্দ।

'ইরিনা' লেখার পেছনে তেমন কোনো গল্প নেই, শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, ইরিনা খুব ভেবেচিন্তে লেখা ভবিষ্যৎ-পৃথিবীর ছবি আঁকতে চেয়েছি সমাজব্যবস্থাটা তখন কী রকম হবে? শোষক এবং শোষিতের প্রাচীন সম্পর্ক তখনো কী থাকবে? কারা হবে শোষিত? ভবিষ্যতের পৃথিবীতে মানুষ কি অমর হবে? অমরত্বের কোনো অভিশাপ কি তাকে স্পর্শ করবে? 'ইরিনা' আমি আমার অতি প্রিয় এক জন মানুষ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে উৎসর্গ করি। লেখাটি তাঁর পছন্দ হয়েছে কি হয় নি, তা তিনি জানান নি। তবু আমার কেন জানি মনে হয়, তিনি বইটি পছন্দ করেছেন।

আমার বড়ো মেয়েকে নিয়ে এক্স-রে করাতে গিয়ে 'কুহকে'র গল্প পেয়ে গেলাম বড়ো মেয়ের সাইনাসের সমস্যা ডাক্তার বলেছেন মাথায় একটা এক্স-রে করাতে। তাকে শোয়ান হয়েছে, এক্স-রে জেনারেটার নেমে আসছে মাথার কাছে--হঠাৎ মনে হল যদি যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যায়, যদি কোনো কারণে হাজার হাজার রেম (REM) রেডিয়েশন তার মাথার ভেতর দিয়ে চলে যায়, তখন কী হবে? ভয়ে আমার গা কাঁপতে লাগল, সেই সঙ্গে তৈরি হল 'কুহক' গল্প।

প্রতীক প্রকাশনীর আলমগীর সাহেব আমার সব কটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী একত্র করলেন। এর পেছনে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থ কাজ করে নি। তিনি এটা করেছেন সায়েন্স ফিকশানের প্রতি মমতা ও ভালোবাসায়। যে যত্ন, যে আন্তরিকতা তিনি এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে দেখিয়েছেন, তা আমাকে মুগ্ধ করেছে তাঁকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এ দেশের সায়েন্স ফিকশানের পাঠক-পাঠিকাদের। আমার লেখালেখির মাধ্যমে তাঁদের কারোর মনেও যদি বিজ্ঞানের রহস্যময়তার কোনো ছবি আঁকতে পেরে থাকি তাহলেই আমি ধন্য। কারোর কাছে আমার বেশি কিছু চাইবার নেই।

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পূর্বকথা

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের কথা ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছি। বাবা-মা ভাই-বোন ছেড়ে প্রথম থাকতে এসেছি হোস্টেলে। কিছুই ভালো লাগে না। কোনো কিছুতেই মন বসে না। দিন পনেরো অনেক কষ্টে থাকলাম। তারপর-- 'দূর! আর পড়াশোনা করব না,' এই ভেবে রাতের ট্রেনে রওনা হয়ে গেলাম বগুড়ায়। হাতে চটি একটা রাশিয়ান বইয়ের বাংলা অনুবাদ। বইটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর। রাতের ট্রেনে গাদাগাদি ভিড়, আলোও কম, তার ওপর এক ঘুমকাতুরে যাত্রী বারবার ঘুমের ঘোরে আমার গায়ে পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই পড়তে শুরু করলাম-- 'ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ' গল্পটি। কার লেখা এখন আর মনে পড়ছে না--শুধু মনে পড়ছে গল্প পড়ে আমি বিস্মিত, রোমাঞ্চিত ও মুগ্ধ। এ ধরনের গল্প তো আগে পড়ি নি! এগুলি যদি সায়েন্স ফিকশান হয়, তাহলে এত দিন এইসব পড়ি নি কেন? একই গল্প ময়মনসিং পৌঁছবার আগে আগে তিন বার পড়ে ফেললাম। আমার নেশা ধরে গেল; সেই নেশা এখনো কাটে নি। এখনো আমার প্রিয় পাঠ্যতালিকার শুরুতেই আছে সায়েন্স ফিকশান। তারাশঙ্করের 'কবি' পড়ে আমি যে আনন্দ পাই, ঠিক সেই রকম আনন্দ পাই এসিমভের 'এণ্ড অব ইটারনিটি' পড়ে। সম্ভবত আমার মধ্যে কোনো গণ্ডগোল আছে।

সায়েন্স ফিকশানের প্রতি গাঢ় ভালোবাসার কারণেই হয়তো আমার তৃতীয় প্রকাশিত বইটি একটি সায়েন্স ফিকশন--'তোমাদের জন্যে ভালোবাসা', প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 'বিজ্ঞান সাময়িকী'তে। আমার ধারণা ছিল কেউ এই লেখা পড়বে না, পড়লেও বিরক্ত হয়ে বলবে-এসব কি ছাইপাঁশ শুরু হল? সাহিত্য কোন পথে যাচ্ছে? আশ্চর্যের ব্যাপার--সে রকম কিছু হল না, বরং অনেকেই আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে লেখা পড়তে শুরু করলেন। খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী বইটি প্রকাশ করলেন। বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন বলেই হয়তো একটা বিজ্ঞাপন দিলেন বিজ্ঞাপনের ভাষা এরকম--

> "ছোটদের জন্যে লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী
> তবে বড়রাও পড়িলে মজা পাইবেন।"

'তোমাদের জন্যে ভালোবাসা' ভালোবাসার সঙ্গে পাঠকরা গ্রহণ করলেও আমি কিন্তু দ্বিতীয় সায়েন্স ফিকশান লেখার ব্যাপারে অনেক দেরি করলাম। প্রায় দশ বছর। কারণ খুব সহজ। আইডিয়া পাচ্ছিলাম না বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর আইডিয়া 'হুট' করে মাথায় আসে না. আমার দ্বিতীয় সায়েন্স ফিকশানের 'আইডিয়া' মাথায় এল ঢাকা থেকে বরিশাল যাবার পথে--লঞ্চের কেবিনে। শীতের রাত চাদর মুড়ি দিয়ে লঞ্চের কেবিনে বসে আছি, হাতে ঢাকা থেকে কেনা একগাদা ম্যাগাজিন। হঠাৎ কেবিনের দেয়ালে দৃষ্টি আটকে গেল--কুৎসিত একটা মাকড়সা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল এই প্রাণীটিকে কোনো এক বিচিত্র কারণে আমি অসম্ভব ভয় পাই

একটা সাপ বা একটা বাঘের সঙ্গে আমি একঘরে রাত কাটাতে রাজি আছি, কিন্তু মাকড়সার সঙ্গে নয়. কাজেই কেবিন ছেড়ে ছুটে বের হয়ে এলাম। বাকি রাতটা কাটল ডেকে হাঁটাহাঁটি করে হাঁটাহাঁটি করতে-করতেই সাজিয়ে ফেললাম তিনটি মাকড়সার গল্প একটি প্রকাণ্ড গ্রহে তিনটি মাত্র প্রাণী, দেখতে মাকড়সার মতো তাদের বুদ্ধি অসাধারণ, কল্পনাশক্তিও

তোমাদের জন্যে ভালোবাসা

সবাই এসে গেছেন।

কালো টেবিলের চারপাশে সাজান নিচু চেয়ারগুলিতে চুপচাপ বসে আছেন তাঁরা। এত চুপচাপ যে তাঁদের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসবে। কাল রাতের বেলা 'ভয়ানক জরুরী' ছাপমারা লাল রঙের চিঠি গিয়েছে সবার কাছে। সেখানে লেখা, 'আসন্ন মহাসংকট নিয়ে আলোচনা, আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।' মহাকাশ প্রযুক্তি-বিদ্যা গবেষণাগার-প্রধান এস. মাথুরের সই করা চিঠি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলে পরিচিত মহামান্য ফিহাও হয়তো হাজির থাকবেন এই জরুরী বৈঠকে। চিঠিতে অবশ্য এই কথা উল্লেখ নেই। কখনো থাকে না। অতীতে অনেকবার বিজ্ঞানী সম্মেলনের মহাপরিচালক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হয়েছে, কিন্তু তিনি আসেন নি। বলে পাঠিয়েছেন, 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আসতে পারছি না, দুঃখিত।' কিন্তু আজ তাঁকে আসতেই হবে। আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা তো আর রোজ রোজ দেখা দেয় না। লক্ষ লক্ষ বৎসরেও এক-আধ বার হয় কিনা কে জানে! এ সময়ে ফিহার মত বিজ্ঞানী তাঁর অভ্যাসমতো শুয়ে শুয়ে গান শুনে সময় কাটাবেন, তাও কি হয়!

'আমার মনে হয় মাথুর এসে পড়তে আর দেরি নেই।'

যিনি কথা বললেন, সবাই ঘুরে তাকালেন তাঁর দিকে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, নীরবতা ভাঙার জন্যই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এ কথাগুলি বলা হয়েছে। বক্তার দিকে তাকিয়ে দু'একজন ভ্রূ কোঁচকালেন। বক্তা একটু কেশে বললেন,

'কাল কেমন ঝড় হয়েছিল দেখেছেন? জানালার একটা কাচ ভেঙে গেছে আমার।'

কথার উত্তরে কাউকে একটি কথাও বলতে না শুনে তিনি অস্বস্তিতে আঙুল

মটকাতে লাগলেন। মাথা ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলেন।

ঘরটি মস্ত বড়। প্রায় হলঘরের মতো। জরুরী পরিস্থিতিতে হাজার দুয়েক বিজ্ঞানীর বসার জায়গা আছে। আজ অবশ্য এসেছেন আটাশ জন। বসবার ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ন্ত্রণকক্ষের পাশের ফাঁকা জায়গাটায়। পর্দা টেনে নিয়ন্ত্রণকক্ষকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত ধরনের ঘর। শীতকালে জমে যাওয়া হ্রদের জলের মত মসৃণ মেঝে। কালো পাথরের ইমিটেশনে তৈরি দেয়াল, দেখা যায় না এমন উঁচুতে ছাদ।

যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন, তার পাশের ঘরটিতে মহাশূন্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে-যাওয়া স্টেশন, অভিযাত্রী দল, সন্ধানী দলের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে কম্পিউটর সিডিসি। বিজ্ঞানীদের হাজার বছরের সাধনায় তৈরি, মানুষের মস্তিষ্কের নিওরোনের[১] নিখুঁত অনুকরণে তৈরি নিওরোন যার জন্য প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে। কে বলবে, আজকের এ বৈঠকে হয়তো কম্পিউটর সিডিসিও অংশ গ্রহণ করবে, নয় তো ঠিক তার পাশের ঘরেই বৈঠক বসানর কোনো কারণ নেই।

'এস. মাথুরের আসার সময় হয়েছে ঠিক দেড় ঘন্টা আগে' কথাগুলি বলে পদার্থবিদ সুরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অল্প বয়সে অকল্পনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি সম্মানসূচক একটি লাল তারা পেয়েছেন। তাঁর আবিষ্কৃত দ্বৈত অবস্থানবাদ[২] নিয়ে তিন বৎসর ধরেই ক্রমাগত গবেষণা হচ্ছে। সেদিন হয়তো খুব দূরে নয়, যখন 'দ্বৈত অবস্থানবাদ' স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা সুরার দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তেজনায় সুরা অল্প কাঁপছিলেন। তাঁর টকটকে ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কপালের উপর এসে পড়া লালচে চুলগুলি বাঁ হাতে সরিয়ে তিনি দৃঢ় গলায় বললেন,

'একটি মিনিটও যেখানে আমাদের কাছে দামী, মাথুর কি করে সেখানে দেড় ঘন্টা দেরি করেন ভেবে পাই না।'

বিরক্তিতে সুরা কাঁধ ঝাঁকাতে লাগলেন। প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'মাথুরের মনে রাখা উচিত, সমস্যাটি মারাত্মক।'

বিজ্ঞানীরা নড়েচড়ে বসলেন। সমস্যাটি নিঃসন্দেহে মারাত্মক, হয়তো ইতিমধ্যেই তা তাঁদের গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই ঘর, এই গোল কালো রঙের টেবিল, ঘরের ভেতরের ঠান্ডা বাতাস সমস্তই বলছে,

'সময় খুব কম, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের ভয়-পাওয়া মুখের ছায়া পড়েছে ঘরের কালো দেয়ালে। বুকের ভেতর শিরশির করা অনুভূতি নিয়ে তাঁরা নীরবে বসে আছেন।

মাঝে মাঝে একেকটা সময় আসে যখন পুরনো ধারণা বদলে দেয়ার জন্যে মহাপুরুষদের মতো মহাবিজ্ঞানীরা জন্মান। কালজয়ী সে সব অতিমানব মানুষের জ্ঞানের সিঁড়ি ধাপে ধাপে না বাড়িয়ে লাফিয়ে ধারণাতীত উঁচু ধাপে নিয়ে যান। বিধাতার মতো ক্ষমতাধর এ সমস্ত মানুষেরা বহু যুগে এক-আধ জন করে জন্মান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ শুরু হয় তখন। মানুষের আদিমতম কামনা, দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় বিষয় আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলব, অজানা কিছুই থাকবে না, অদেখা কিছুই থাকবে না। কোনো রহস্য থাকবে না।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময়টা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের ক্ষমতার কাল চলছে। পুরনো ধারণা বদলে গিয়ে নতুন নতুন সূত্র ঝড়ের মতো এসে পড়ছে। যে সমস্ত জটিল রহস্যের হাজার বৎসরেও সমাধান হয় নি, অতীতের তাবৎ বিজ্ঞানীরা যা অসহায়ভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তাদের সমাধানই শুধু হয় নি--সে সমাধানের পথ ধরেই নতুন সূত্রাবলী, নতুন ধারণা কম্পিউটরের মেমরি সেলে[৩] সঞ্চিত হতে শুরু হয়েছে। জন্ম হয়েছে ফিহার মতো মহা আঙ্কিকের, যিনি তাঁর তুলনাহীন প্রতিভা নিয়ে ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের[৪] সমাধান করেছেন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে। জন্ম হয়েছে পদার্থবিদ স্রুরার, পদার্থবিদ এস. মাথুরের। মানুষের তৈরি কৃত্রিম নিওরোন নিয়ে তৈরি হয়েছে মানবিক আবেগসম্পন্ন কম্পিউটর সিডিসি। গ্রহ থেকে গ্রহে, মহাকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। কে বলে জ্ঞানের শেষ নেই, সীমা নেই? মানুষের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তেই হবে জ্ঞানকে। বিজ্ঞানীদের পিছু ফেরবার রাস্তা নেই-- আরো জ্ঞান, আরো বেশি জ্ঞান।

এমনি যখন অবস্থা, ঠিক তখনি আবিষ্কৃত হল টাইফা গ্রহ[৫]। এন্ড্রোমিডা[৬] নক্ষত্রপুঞ্জের একপাশে পড়ে থাকা ছোট্ট একটি নীল রঙের গ্রহ। চারপাশে উজ্জ্বল ধোঁয়াটে রঙের ছায়াপথের মাঝামাঝি গ্রহ একটি। একটি হঠাৎ আবিষ্কার। বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাকাশ গবেষণামন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল WGK-166[৭], একটি সাদা বামন নক্ষত্রকে, যা দ্রুত উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে প্রবল বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে যাবার জন্যে। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে লক্ষ করলেন সাদা বামন নক্ষত্র[৮] থেকে বেরিয়ে আসা বিকিরণ-তেজের প্রায় ষাট ভাগ কেউ যেন শুষে নিচ্ছে। এই প্রকান্ড ক্ষমতাকে কে টেনে নিতে পারে? অন্য কোনো গ্রহের কোনো উন্নত প্রাণী কি এই মহাশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করছে? যদি তা-ই হয় ,তবে সে প্রাণী কত উন্নত?

আবিষ্কৃত হল টাইফা গ্রহ।

বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাজাগতিক স্টেশন নিনূপ-৩৭-এর অধিনায়ক টাইফার অনন্যসাধারণ আবিষ্কারক। সেই স্টেশনের সবাই অতি সম্মানসূচক দুই নীল তারা উপাধি পেলেন।

টাইফা গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগল এক বৎসর। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা হকচকিয়ে গেলেন। টাইফা গ্রহের গণিতশাস্ত্রের খবর আসতে লাগল। বিস্মিত বিজ্ঞানীরা কী করবেন বুঝতে পারলেন না। সমস্তই তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচরে। সেখানে সময় বলে কি কিছুই নেই? সময়কে সব সময় শূন্য ধরা হচ্ছে কেন? বস্তু বলে কি কিছুই নেই? বস্তুকে শূন্য ধরা হচ্ছে কেন? শক্তিকে দুই মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করছে কেন?

মহা আঙ্কিক ফিহা, পৃথিবীর সব অঙ্কবিদরা নতুন গণিতশাস্ত্রের নিয়মাবলী পরীক্ষা করতে লাগলেন। ভূতুড়ে সব গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কোথেকে কী হচ্ছে? তাদের ফলাফল হিসেবে মহাশূন্যে কোথাও কোনো বস্তু নেই। চারদিকে অনন্ত শূন্য। মানুষ মহাজাগতিক শক্তির একটি আংশিক ছায়া। তাহলে আমাদের ভাবনা-চিন্তা, আমাদের অনুভূতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রেম, ভালোবাসা সমস্তই কি মিথ্যা? ছায়ার উপরেই জন্ম-মৃত্যু?

পৃথিবীর খবরের কাগজগুলিতে আজগুবি সব খবর বেরুতে লাগল। কেউ কেউ লিখল, টাইফা গ্রহের মানুষেরা পৃথিবী ধ্বংস করে দিচ্ছে। কেউ লিখল, তারা পৃথিবীতে তাদের ঘাঁটি বানাবার জন্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। কেউ লিখল বিজ্ঞানীদের মাথা গুলিয়ে ফেলার জন্যে তারা আজগুবি সব তথ্য পাঠাচ্ছে। গুজবের পিঠে ভর করেই গুজব চলে। টাইফা গ্রহ নিয়ে অজস্র বৈজ্ঞানিক-কল্পকাহিনী লেখা হতে থাকল। দু জন পরিচালক এই নিয়ে থ্রী ডাইমেনশনাল ছবি তৈরি করলেন। ছবির নাম 'নরক থেকে আসছি'। কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা ছড়িয়ে পড়ল, টাইফা গ্রহের বিজ্ঞানীরা নাকি পৃথিবীর বিজ্ঞান-পল্লী সিরানে[১] এসে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে। মহাশূন্য-গবেষণা বিভাগ, খাদ্য-উৎপন্ন বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণে। বাধ্য হয়ে এস. মাথুর সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন।

জনসাধারণকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে। অমূলক ভয়ভীতি সরিয়ে দিয়ে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। বিজ্ঞান-পল্লী সিরানে সেবারই সর্বপ্রথম অবিজ্ঞানীরা নিমন্ত্রিত হলেন।

'বিজ্ঞান পরিষদে'র মহাপরিচালক এস. মাথুর বলছি,--

'বিজ্ঞান-পল্লী সিরানে সর্বপ্রথম নিমন্ত্রিত অতিথিরা, আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। শুরুতেই টাইফা গ্রহ সম্বন্ধে আপনাদের যাবতীয় ধারণার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি। টাইফা গ্রহ নিয়ে আপনারা যত ইচ্ছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনা করুন, ছবি তৈরি করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। 'নরক থেকে আসছি' ছবিটা আমার নিজেরও অত্যন্ত ভালো লেগেছে।'

গ্যালারিতে বসা দর্শকরা এস. মাথুরের এই কথায় হৈহৈ করে হাততালি দিতে লাগলেন। তালির শব্দ কিছুটা কমে আসতেই এস. মাথুর তাঁর নিচু ও স্পষ্ট কথা

বলার বিশেষ ভঙ্গিতে আবার বলে চললেন, 'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা উন্নত ধরনের প্রাণীর সন্ধান টাইফা গ্রহে পেয়েছি।'

এক জন দর্শক চেঁচিয়ে বললেন, 'তারা কি দেখতে মানুষের মতো?'

'তারা দেখতে কেমন তা দিয়ে আমার বা আপনার কারো কোনো প্রয়োজন নেই। তবে তারা নিঃসন্দেহে উন্নত জীব। তারা ওমিক্রন[১০] রশ্মির সাহায্যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমরা ওমিক্রন রশ্মির যে সংকেত পাঠাচ্ছি, তা তারা বুঝতে পারছে এবং তারা সেই সংকেতের সাহায্যেই আমাদের খবর দিচ্ছে। এত অল্প সময়ে সংকেতের অর্থ উদ্ধার করে সেই সংকেতে খবর পাঠান নিঃসন্দেহে উন্নত শ্রেণীর জীবের কাজ।'

হলঘর নিঃশব্দ হয়ে এস. মাথুরের কথা শুনছে। শুধু কয়েকটা মুভি ক্যামেরার সাঁ সাঁ ছুট্ ছুট্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এস. মাথুর বলে চললেন, 'আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, টাইফা গ্রহ গণিত ও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন সূত্রাবলী সম্পর্কে যা বলতে চায় তা হতে পারে না, তা অসম্ভব।'

কথা শেষ না হতেই নীল কোট পরা এক সাংবাদিক বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন, চেঁচিয়ে বললেন, 'কেন হতে পারে না? কেন অসম্ভব? আমরা বুঝতে পারছি না বলে?'

এস. মাথুর বললেন, 'তাদের নিয়মে সময় বলে কিছু নেই। এক জন অনায়াসে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে। এ অসম্ভব ও হাস্যকর।'

সাংবাদিক চড়া গলায় বললেন, 'কেন হাস্যকর? হাজার বছর আগেও তো পৃথিবীতে টাইম মেশিন নিয়ে গল্প চালু ছিল।'

এস. মাথুর বললেন, 'গল্প ও বাস্তব ভিন্ন জিনিস। আপনি একটি গল্পে পড়লেন যে একটি লোক হঠাৎ একটি পাখি হয়ে আকাশে উড়ে গেল। বাস্তবে আপনি সে রকম কোনো পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারেন না। পারেন কি?'

কথা শেষ না হতেই দর্শকরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল এবং বিক্ষিপ্তভাবে হাততালি পড়তে লাগল। সাংবাদিক লাল হয়ে বললেন, 'আমি পাখি হবার কথা বলছি না। আপনি কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।'

এস. মাথুর হাসিমুখে বললেন, 'না, আমি এড়িয়ে যাচ্ছি না। টাইম মেশিনের কল্পনা কতটুকু অবাস্তব তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন একটা টাইম মেশিন তৈরি করলাম, মেশিনে চড়ে আমরা চলে গেলাম অতীতে, যখন আপনার জন্মই হয় নি। আপনার বাবার বয়স মাত্র বার। মনে করুন আপনার সেই বার বৎসর বয়সের বাবাকে আমি খুন করে আবার টাইম মেশিনে চড়ে বর্তমানে এসে হাজির হলাম। এসে দেখি আপনি সিরান-পল্লীতে দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা শুনছেন। অথচ তা হতে পারে না কারণ আপনার বাবা বার বৎসর বয়সে মারা গেছেন।

অতএব আপনার জন্যই হতে পারে না।'

সাংবাদিক বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

কিছুক্ষণ আর কোনো কথাবার্তা শোনা গেল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন মহামান্য ফিহা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, দুর্লভ তিন লাল তারা সম্মানের অধিকারী, ত্রিমাত্রিক যৌগিক সময় সমীকরণের নির্ভুল সমাধান দিয়ে যিনি সমস্ত বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করে রেখেছেন। ফিহা মাথা নিচু করে হেঁটে গেলেন মাথুরের কাছে, বললেন, 'আমি কিছু বলব।'

সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। ফিহা বলে চললেন, 'কাল আমি সারারাত ঘুমুতে পারি নি, আমার একটা পোষা বেড়ালছানা আছে, সাদা রঙের, ধবধবে সাদা, বিলিয়ার্ড বলের মতো। ওর কী একটা অসুখ করেছে, সারারাত বিরক্ত করেছে আমাকে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ভোর রাতে ঘুমুতে গেছি, হঠাৎ মনে হল টাইফা গ্রহের বিজ্ঞান নিশ্চয়ই নির্ভুল। আচমকা মনে হল, সময় সংক্রান্ত আমার যেসব সূত্র আছে, সেখানে সময়কে শূন্য রাখলেও উত্তর নির্ভুল হয়, শুধু বস্তুকে ভিন্ন খাতায় নিয়ে যেতে হয়। আমি দেখাচ্ছি করে।'

ফিহা ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে চলে গেলেন। একটির পর একটি সূত্র লিখে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অঙ্ক কষে চললেন। পরবর্তী পনের মিনিট শুধু চকের খসখস শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। ফিহা এক সময় বোর্ড ছেড়ে ডায়াসে উঠে এসে বললেন, 'সবাই বুঝতে পেরেছেন আশা করি?' দর্শকদের কেউই বুঝতে পারেন নি কিছুই। শুধু অঙ্ক কষার ধরন–ধারণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। সবাই মাথা নাড়ালেন, যেন খুব বুঝতে পেরেছেন। ফিহা বললেন, 'এখন মুশকিল হয়েছে কি জানেন? তারা এত উপরের স্তরে পৌঁছে গেছে যে তাদের কোনো কিছুই এখন আর আমাদের ধারণায় আনা সম্ভব নয়। তাদের গণিত বলুন, তাদের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা-- কিছুই নয়।

এবার বিজ্ঞানীদের ভিতর একজন দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেন সম্ভব নয়?'

ফিহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বোকার মতো কথা বলবেন না। মানুষ যেমন উন্নত, পিপীলিকাও তার স্কেলে অর্থাৎ তার প্রাণিজগতে উন্নত। এখন মানুষ কি পারবে পিপীলিকাকে কিছু শেখাতে? গণিত শেখাতে পারবে? পদার্থবিদ্যা শেখাতে পারবে? পিপীলিকার আগ্রহ যতই থাকুক না কেন।'

সভাকক্ষে তুমুল হাতাতালি পড়তে লাগল। এস. মাথুর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনারা হৈচৈ করবেন না। এইমাত্র নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে একটা মারাত্মক খবর এসেছে। আজকের অধিবেশন এই মুহূর্তেই শেষ।'

এস. মাথুর উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। যিনি তাঁকে এসে কানে কানে খবরটি দিয়েছেন তিনিও ঘনঘন জিব বের করে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন।

'মারাত্মক খবরটি কী? আমরা জানতে চাই।' দর্শকরা চেঁচাতে লাগলেন। বসে–

থাকা বিজ্ঞানীরাও উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মাথুরের দিকে।

মাথুর ভীত গলায় বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে জানান হয়েছে, হঠাৎ করে ভোজবাজির মতো টাইফা গ্রহটি হারিয়ে গেছে। কোনো বিস্ফোরণ নয়, কোনো সংঘর্ষ নয়, হঠাৎ করে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া। যেখানে গ্রহটি ছিল, সেখানে এখন শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনারা দশ মিনিটের ভেতর হলঘর খালি করে চলে যান। এক্ষুণি বিজ্ঞানীদের বিশেষ জরুরী বৈঠক বসবে। সভাপতিত্ব করবেন মহামান্য ফিহা।'

ফিহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার এক্ষুণি বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। বেড়াল-ছানা রাত থেকে কিছু খায় নি; তাকে গ্লুকোজ ইন্টারভেনাস দিতে হবে।'

মাথুর বললেন, 'আপনি চলে গেলে কী করে হবে?'

ফিহা বললেন, 'আমি থাকলেই বুঝি সেই গ্রহটা আবার ফিরে আসবে?'

সেদিন সন্ধ্যাতেই আভ্যন্তরীণ বেতার, বহির্বিশ্ব বেতার থেকে জরুরী নির্দেশাবলী প্রচারিত হল--

'আমি বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক এস. মাথুর বলছি।

'এই মুহূর্তে থেকে পৃথিবীর উপনিবেশ মঙ্গল ও চন্দ্র এবং পৃথিবীর যাবতীয় মহাজাগতিক স্টেশনে চরম সংকট ঘোষণা করা হল। টাইফা গ্রহ যে রকম কোনো কারণ ছাড়াই মহাশূন্যে মিশে গেছে, তেমনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রও মিশে যাচ্ছে। আমাদের কম্পিউটর সিডিসি কত পরিধি, কোন পথে এবং কত গতিতে এই অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, তা বের করতে সক্ষম হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে এই গতিপথ চক্রাকার। তা টাইফা গ্রহ থেকে শুরু হয়ে আবার সেখানেই শেষ হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবী, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনি এই আওতায় পড়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবী আর এক বৎসর তিন মাস পনের দিন পর এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবে। বিজ্ঞানীরা কী করবেন তা স্থির করতে চেষ্টা করছেন। আপনাদের প্রতি নির্দেশ--

'এক. আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। আতঙ্কগ্রস্ত হলে এই বিপদ থেকে যখন রক্ষা পাওয়া যাবে না, তখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে লাভ কী?

দুই. যার যা করণীয় তিনি তা করবেন।

তিন. কোনো প্রকার গুজব প্রশ্রয় দেবেন না। মনে রাখবেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সব সময় আপনাদের সঙ্গেই আছেন। যা অবশ্যম্ভাবী, তাকে হাসিমুখে বরণ করতে হবে নিশ্চয়ই, তবু বলছি বিজ্ঞানীদের উপর আস্থা হারাবেন না।'

কালো টেবিলের চারপাশে নিচু চেয়ারগুলিতে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন। পদার্থবিদ সুরা বললেন, 'আমরা কি অনন্তকাল এখানে বসে থাকব? এস. মাথুর যদি পাঁচ মিনিটের ভেতর না আসেন তবে আমি চলে যাব।'

ঠিক তক্ষুণি এস. মাথুর এসে ঢুকলেন। এক রাতের ভিতরেই তাঁর চেহারা বদলে গিয়ে কেমন হয়ে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কোনো রকমে বললেন,

'আমি দুঃখিত, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি এতক্ষণ চেষ্টা করছিলাম ফিহাকে আনতে। তিনি কিছুতেই আসতে রাজি হলেন না। প্রেইরি অঞ্চলে চলে গেছেন হাওয়া বদল করতে। এত বড় বিপদ, অথচ--।'

সুরা মুখ বিকৃত করে বললেন, 'ওর প্রাণদন্ড হওয়া উচিত, যতবড় প্রতিভাই হোক, প্রাণদন্ডই তার যোগ্য পুরস্কার।' মাথুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

হাতলে হাত রাখবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

এত অল্প সময়ে কী করে যে গতি এমন বেড়ে যায় ভাবতে ভাবতে লী বাতাসের ধাক্কা সামলাতে লাগল। হাতল খুব শক্ত করে ধরা আছে, তবু দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। বাঁ হাতে মস্ত একটা ব্যাগ থাকায় সে হাতটা অকেজো। দেরি করবার সময় নেই, টুরিস্ট ট্রেনগুলি অসম্ভব গতিতে চলে। কে জানে হয়তো এরই মধ্যে ঘন্টায় দু'শো মাইল দিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে হাতের কালো ব্যাগটা ছুটে বেরিয়ে যাবে।

'এই মেয়ে, ব্যাগ ফেলে দু হাতে হাতল ধর।'

বুড়োমতো একজন ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। ঠিক কখন যে তিনি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, লী লক্ষই করে নি। সে চেঁচিয়ে বলল, 'ব্যাগ ফেলা যাবে না। আপনি আমার কোমরের বেল্ট ধরে টেনে তুলুন না দয়া করে।'

লীর ধাতস্থ হতে সময় লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ধন্যবাদ। আরেকটু দেরি হলে উড়েই যেতাম।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। লজ্জিতভাবে বললেন, 'এই কামরার-বিপদ সংকেতের বোতামটা আমি খুঁজে পাই নি, পেলে এত অসুবিধা হত না।'

'ঐ তো বোতামটা, কী আশ্চর্য, এটা দেখেন নি!'

'উঁহু। বুড়ো মানুষ তো। '

লীর মনে হল এই লোকটি তার খুব চেনা। যেন দীর্ঘকালের গভীর পরিচয়। অথচ কোথায়, কী সূত্রে, তার কিছুই মনে নেই।

লী বলল, 'আপনাকে চিনি চিনি মনে হচ্ছে।'

'হচ্ছে নাকি?'

'আপনি সিনেমায় অভিনয় করেন? সিনেমার লোকদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে খুব চেনা চেনা মনে হয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনি কখনো সিনেমার অভিনেতাদের রাস্তায় দেখেন নি?'

'না।'
'আমি দেখেছি। হাপারকে দু'দিন দেখেছি।'
'তুমি কি নিজেও সিনেমা কর?'
'না। কেন বলুন তো?'
'খুব সুন্দর চেহারা তোমার, সেই জন্যেই বলছি।'
'যান! বেশ লোক তো আপনি!'
'কী নাম তোমার?
'লী।'
'শুধু লী?'
'হ্যাঁ, শুধু লী।'

লী চুলের ক্লিপ খুলে চুল আঁচড়াতে লাগল। বুড়ো ভদ্রলোক হাসতে হাসতে পা নাচাতে লাগলেন। লী বলল, 'এই সম্পূর্ণ কামরা আপনি রিজার্ভ করেছেন?'

'হ্যাঁ।'
'আপনি খুব বড়লোক বুঝি?'
'হ্যাঁ।'
'সত্যি বলছি, আমারও খুব বড়লোক হতে ইচ্ছে করে।'
'কী কর তুমি?'
'প্রাচীন বই বিভাগে কাজ করি। জানেন, আমি অনেক প্রাচীন বই পড়ে ফেলেছি।'
'বেশ তো।'
'জানেন, 'হিতার' বলে একটা বই পড়ে আমি কত যে কেঁদেছি।'
'তুমি দেখি ভারী ছেলেমানুষ, বই পড়ে বুঝি কেউ কাঁদে?'
'আপনি বুঝি বই পড়েন না?'
'পড়ি, তবে কাঁদি না। তাছাড়া বাজে বই পড়ার সময় কোথায় বল?'

লী বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তার মনে হল বুড়ো ভদ্রলোকটি তাকে খুব ভালো করেই চেনেন। কথা বলছেন এমনভাবে, যেন কতদিনের চেনা। অথচ কথার ভিতর কোনো মিল নেই। লী বলল, 'পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এতে আপনার খারাপ লাগে না?'

'না।'
'কেন?'
'ধ্বংস তো একদিন হতই।'
'কিন্তু আপনি যে মরে যাবেন।'
'আর পৃথিবী ধ্বংস না হলেই বুঝি আমি অমর হয়ে থাকব?'

লী চুপ করে থাকল। হু হু করে ছুটে চলেছে গাড়ি। ভদ্রলোক শুয়ে শুয়ে নিবিষ্ট

মনে কী যেন পড়ছেন, কোনো দিকে হুঁশ নেই। কী এমন বই এত আগ্রহ করে পড়া হচ্ছে, দেখতে গিয়ে লী হতবাক। শিশুদের একটা ছড়ার বই। আবোল-তাবোল ছড়া। লী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ছড়ার বই পড়তে আপনার ভালো লাগছে?'

'খুব ভালো লাগছে। পড়লে তোমারও ভালো লাগবে, এই দেখ না কী লিখেছে--

কর ভাই হল্লা
নেই কোনো বল্লা
চারিদিকে ফল্লা

লী বিস্মিত হয়ে বলল, 'বল্লাই বা কী আর ফল্লাই বা কী? আবোল-তাবোল লিখলেই হল?'

ভদ্রলোক বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, 'না, কোনো অর্থ অবশ্যি নেই, তবে শুধু মাত্র ধ্বনি থেকেই তো একটা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে।'

'কী রকম?'

'ছড়াটা শুনেই কি তোমার মনে হয় নি যে, কোনো অসুবিধে নেই, হল্লা করে বেড়াও। তাই না?'

লী মাথা নাড়ল। সে ভাবছিল, লোকটা কে হতে পারে, এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন? তাকানর ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, সমস্ত যেন কত চেনা, অথচ কিছুতেই মনে আসছে না।

নিঃশব্দে ট্রেন চলছে। সন্ধ্যা হয়ে আসায় হলুদ বিষণ্ণ আলো এসে পড়েছে ভেতরে। এ সময়টাতে সবকিছুই অপরিচিত মনে হয়। জানালা দিয়ে তাকালেই দ্রুত সরে সরে যাওয়া গাছগুলিকেও মনে হয় অচেনা। সঙ্গী ভদ্রলোক কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। লী কিছু করার না পেয়ে ধূসর রঙের টেলিভিশন সেটটি চালু করে দিল। সেই একঘেয়ে পুরনো অনুষ্ঠান। ঘনঘন জরুরী নির্দেশাবলী, 'গুজব ছড়াবেন না। বিজ্ঞানীরা আপনাদের সঙ্গেই আছেন।। মহাসংকট আসন্ন, সেখানে ধৈর্য হারান মানেই পরাজয়।'

এই জাতীয় খবর শুনলে মন খারাপ হয়ে যায় লীর। ভূতুড়ে টাইফা গ্রহ সবকিছু কেমন পাল্টে দিল। লীর কতই বা বয়স, কিছুই দেখা হয় নি। মঙ্গল গ্রহে নয়, বুধে নয়, এমন কি চাঁদে পর্যন্ত যায় নি। এমনি করেই সব শেষ হয়ে যাবে? লীর চোখ ছলছল করতে থাকে। একবার যদি দেখা করা যেত মাথুর কিংবা ফিহার সাথে। নিদেনপক্ষে সিরান-পল্লীর যে কোনো এক জন বিজ্ঞানীর সঙ্গে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা কারো সঙ্গেই দেখা করবেন না। তাঁরা অসম্ভব ব্যস্ত। চেষ্টা তো লী কম করে নি।

'কী হয়েছে লী?'

লী চমকে বলল, 'কই, কিছু হয় নি তো।'

'কাঁদছিলে কেন?

'কাঁদছি না তো।'

'পৃথিবীর জন্যে কষ্ট হয়?'

'পৃথিবীর জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যেই কষ্ট হয়।'

'আচ্ছা আমি তোমার মন ভালো করে দিচ্ছি, একটা হাসির গল্প বলছি।'

'বলুন।'

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'জীববিদ্যার এক অধ্যাপক প্রতিদিন দুপুরে বড়সড় একটা মটন চপ খেয়ে ক্লাস নিতে যান। একদিন তিনি ক্লাসে এসে বললেন, 'আজ তোমাদের ব্যাঙের হৃৎপিন্ড পড়াব। এই দেখ একটি ব্যাঙ।' ছেলেরা সমস্বরে বলল, 'ব্যাঙ কোথায় স্যার, এটি তো একটি চপ।' অধ্যাপক বিব্রত হয়ে বললেন, 'সে কী! আমি তাহলে কী দিয়ে লাঞ্চ সেরেছি?'

লী ম্লান হেসে চুপ করে রইল। ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি হাসলে না যে? ভালো লাগে নি?'

'লেগেছে। কিন্তু টেলিভিশন দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছা হয় একবার মাথুর কিংবা ফিহার সঙ্গে দেখা করি।'

'তাদের সঙ্গে দেখা করে তুমি কী করবে?'

'আমার কাছে একটি অদ্ভুত জিনিস আছে। একটি খুব প্রাচীন বই। পাঁচ হাজার বছর আগের লেখা, মাইক্রোফিল্ম[১১] করা। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ পেয়েছি।'

'কী আছে সেখানে?'

'না পড়লে বুঝতে পারবেন না। সেখানে ফিহার নাম আছে, সিরান-পল্লীর কথা আছে, এমন কি পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সে কথাও আছে।'

বুড়ো ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, 'আরে, থাম থাম। পাঁচ হাজার বছর আগের বই, অথচ ফিহার নাম আছে!'

লী উত্তেজিত হয়ে বলল, 'সমস্ত না শুনলে আপনি এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন না।'

'আমি এর গুরুত্ব বুঝতে চাই না। আমি উদ্ভট কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না।'

লী রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি উদ্ভট কোনো কিছুতে বিশ্বাস করেন না, কারণ আপনি নিজেই একটা উদ্ভট জিনিস।'

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে ফেললেন। লী বলল, 'আমি যদি মাথুর কিংবা ফিহা কিংবা সিরান-পল্লীর কারো সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, তবে দেখতেন কেমন হৈচৈ পড়ে যেত।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কোথায় নামবে?'

'স্টেশন ৫০০৭-এ।'

'তৈরি হও। সামনেই ৫০০৭। বেশ আনন্দে কাটল তোমাকে পেয়ে। তবে তুমি ভীষণ কল্পনাবিলাসী, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।'

'কল্পনাবিলাসীরা তো অল্পতেই রাগে, জানেন না?'

ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ট্রেন। ব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোক একটা ওভারকোটের পকেট থেকে নীল রঙের ত্রিভুজাকৃতির একটা কার্ড বের করে লীকে বললেন, 'তুমি ভীষণ রেগে গেছ মেয়ে, নাও তোমাকে খুশি করে দিচ্ছি। এইটি নিয়ে সিরান-পল্লীর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে, যার সঙ্গে ইচ্ছা কথা বলতে পারবে। খুশি হলে তো? রাগ নেই তো আর?'

লী দেখল নীল কার্ডে জ্বলজ্বল করছে তিনটি লাল তারা। নিচে ছোট্ট একটি নাম--ফিহা। স্বপ্ন দেখছে না তো সে? ইনিই মহামান্য ফিহা। এই জন্যেই এত পরিচিত মনে হচ্ছিল?

লীর চোখ আবেগে ঝাপসা হয়ে এল।

ফিহা বললেন, 'নেমে যাও মেয়ে, নেমে যাও, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।'

'কে?'

'আমি সুরা, ভেতরে আসতে পারি?'

'এস।'

ঘরে হালকা নীল রঙের বাতি জ্বলছিল। মাথুর টেবিলে ঝুঁকে কী যেন পড়ছিলেন, সুরার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

'এত রাতে আপনার ঘরে আসার নিয়ম নেই, কিন্তু--'

সুরা চেয়ার টেনে বসলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্ধত চোখ জ্বলতে লাগল। মাথুর বললেন, 'এখন কোনো নিয়ম-টিয়ম নেই সুরা। তুমি কি কিছু বলতে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি এখন কিছু শুনতে চাই না। চার রাত ধরে আমার ঘুম নেই। আমি ঘুমুতে চাই। এই দেখ আমি একটা প্রেমের গল্প পড়ছি। মন হালকা হয়ে সুনিদ্রা হতে পারে, এই আশায়।'

সুরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেন। 'আমিও ঘুমাতে পারি না, তার জন্যে আমি রাত জেগে জেগে প্রেমের গল্প পড়ি না। অবসর সময়টাও আমি ভাবতে চেষ্টা করি।'

'সিডিসির রিপোর্ট তো দেখেছ?'

'হ্যাঁ দেখেছি। ধ্বংস রোধ করার কোনো পথ নেই।'

'যখন নেই, তখন রাতে একটু শান্তিতে ঘুমুতে চেষ্টা করা কি উচিত নয়? চিন্তা এবং পরিকল্পনার জন্যে তো সমস্ত দিন পড়ে রয়েছে।'

'থাকুক পড়ে। আমি একটা সমাধান বের করেছি।'

মাথুর প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'তুমি বলতে চাও পৃথিবী রক্ষা পাবে?'

'না।'

'তবে?'

সুরা কথা না বলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাথুরের দিকে। ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আপনার এ সময় উত্তেজনা মানায় না। আপনি অবসর গ্রহণ করুন।'

'তুমি কী বলতে চাও, বল।'

'আমি একটি সমাধান বের করেছি। পৃথিবী রক্ষা পাবার পথ নেই, কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকবে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পর আবার সভ্যতার জন্ম হবে। ফিহার মতো, মাথুরের মতো, সুরার মতো মহাবিজ্ঞানীরা জন্মাবে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'সুরা তুমি নিজেও উত্তেজিত।'

'দুঃখিত। আপনি কি পরিকল্পনাটি শুনবেন?'

'এখন নয়, দিনে বলো।'

'আপনাকে এখনি শুনতে হবে, সময় নেই হাতে।'

সুরা ঘরের উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে দিলেন। মাথুর তাকিয়ে রইলেন সুরার দিকে। দুর্লভ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই যুবকটিকে হিংসা হতে লাগল তাঁর। সুরা খুব শান্ত গলায় বলে যেতে লাগলেন-- শুনতে শুনতে মাথুর এক সময় নিজের রক্তে উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলেন।

বছর ত্রিশেক আগে 'মীটস' নামে একটা মহাশূন্যযান তৈরি করা হয়েছিল। আদর করে তাকে ডাকা হত দ্বিতীয় চন্দ্র বলে। আকারে চন্দ্রের মতো এত বিরাট না হলেও সেটিকে ছোটোখাটো চন্দ্র অনায়াসে বলা যেত। মহাজাগতিক রশ্মি থেকে সংগৃহীত শক্তিতে একটি কল্পনাতীত বেগে চলবার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুটি পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি ছিল এরই মধ্যে। একটি ছিল মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জে প্রাণের বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে। বিজ্ঞানী মীটসের তত্ত্বাবধানে এই অসাধারণ যন্ত্রযান তৈরি হয়েছিল-- নামকরণও হয়েছিল তাঁর নাম অনুযায়ী। এটি তৈরি হয়েছিল তাঁরই একটি তত্ত্বের পরীক্ষার জন্যে।

মীটস দেখলেন নক্ষত্রপুঞ্জ NGC 1303[১২] আলোকের চেয়ে দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে। আলোর কাছাকাছি গতিসম্পন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেছে অনেক আগে, এই প্রথম তিনি বিজ্ঞানের সূত্রে সম্ভব নয় এমন একটি ব্যাপার পরখ করলেন। তিনি অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন এবং খুব অল্প সময়ে এর ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, আলোর গতি ধ্রুব নয়। এটি ভিন্ন ভিন্ন পরিমন্ডলে ভিন্ন-- স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির নিয়মাবলীও ভিন্ন ভিন্ন পরিমন্ডলে ভিন্ন। মীটস এটা ব্যাখ্যা করেই চুপ করে গেলেন। তৈরি করলেন মহাশূন্যযান-- মীটস, যা পাড়ি দেবে এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ ছাড়িয়েও বহুদূরে NBP203 নক্ষত্রপুঞ্জে[১৩] সেখানে পৌঁছুতে তার যুগের পর যুগ লেগে যাবে, কিন্তু পৌঁছুবে ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে মীটসের ধারণা সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তাঁর দুর্ভাগ্য মহাশূন্যযানটি প্রস্তুত হবার পরপর

তিনি মারা যান। তাঁর পরিকল্পনাও স্থগিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা তখন প্রতি- বস্তুর ধর্মকে বিশেষ সূত্রে ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

সুরার পরিকল্পনা আর কিছুই নয়, পৃথিবীর একদল শিশু মীটসে করে সরিয়ে দেওয়া। শিশুরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মহাশূন্যযানের ভিতর শিক্ষা লাভ করবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হবে মহাশূন্যযানের এক লাইব্রেরি কক্ষে। এই সব শিশু বড় হবে। তাদের ছেলেমেয়ে হবে, তারাও শিখতে থাকবে, তারাও বড় হবে--

'থাম থাম বুঝতে পারছি।' মাথুর হাত উঁচিয়ে সুরাকে থামালেন। বললেন, 'কতদিন তারা এ রকম ঘুরে বেড়াবে?'

'যতদিন বসবাসযোগ্য কোনো গ্রহ না পায়। যতদিন মহাশূন্য থাকবে, ততদিন তো খাদ্যের কোনো অসুবিধা নেই।'

'তা নেই- তা নেই। কিন্তু--'

'আবার কিন্তু কিসের? মহাশূন্যযান তৈরি আছে, কাজ যা করতে হবে তা হল ল্যাবরেটরি দুটি সরিয়ে মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসান, তার জন্যে তিন মাস সময় যথেষ্ট। এ দায়িত্ব আমার।'

মাথুর চুপ করে রইলেন। সুরা অসহিষ্ণু হয়ে মাথা ঝাঁকালেন, 'আপনার চুপ করে থাকা অর্থহীন। মানুষের জ্ঞান এভাবে নষ্ট হতে দেয়া যায় না।'

'তা ঠিক। কিন্তু সিরানদের মতামত—'

'কোনো মতামতের প্রয়োজন নেই। এ আমাকে করতেই হবে, আমি কম্পিউটর সিডিসিকে নির্দেশ দিয়ে এসেছি মহাশূন্যযানটির যাত্রাপথ বের করতে। সিডিসিকে মহাশূন্যযানে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। মহাশূন্যযান নিয়ন্ত্রণ করবে সে।'

'তুমি নির্দেশ দিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ, আমি সমস্ত নিয়ম-কানুন ভেঙে এ করেছি। আমি আপনাকেও মানি না-- আপনার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। গত একমাস আপনি প্রত্যেক মীটিং-এ আবোল-তাবোল বকেছেন। আপনি বিশ্রাম নিন।'

সুরা উজ্জ্বল বাতি নিভিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মাথুর হতভম্ব হয়ে বের হয়ে এলেন ঘরের বাইরে। অন্ধকারে কে যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ দেখলে পাথরের মূর্তি মনে হয়। মাথুর ডাকলেন, 'কে ওখানে?'

'আমি ওলেয়া।'

'ওখানে কী করছেন?'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখছি। আমার একটি ছেলে চাঁদে এ্যাকসিডেন্ট করে মারা গিয়েছিল। আপনার হয়তো মনে আছে।'

'আছে। কিন্তু এত দূরে এসে চাঁদ দেখছেন? আপনার ঘর থেকেই তো দেখা

যায়।'

'তা যায়। আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। এসে দেখি সুরা গল্প করছেন আপনার সঙ্গে, তাই বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'বলুন কী বলবেন।'

'আমাকে ছুটি দিন আপনি। বিজ্ঞানীরা তো কিছুই করতে পারছেন না। শুধু শুধু এখানে বসে থেকে কী হবে? মরবার আগে আমি আমার ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে থাকতে চাই।'

'তা হয় না ওলেয়া।'

'কেন হয় না?'

'আপনি চলে গেলে অন্য সবাই চলে যেতে চাইবে। সিরান-পল্লীতে কেউ থাকবে না।'

'নাই-বা থাকল, থেকে কী লাভ?'

'শেষ মুহূর্তে আমরা একটা বুদ্ধি তো পেয়েও যেতে পারি।'

'আপনি বড় আশাবাদী মাথুর।'

'হয়তো আমি আশাবাদী। কিন্তু আপনি নিজেও তো জানেন, পৃথিবী আরো একবার মহাসংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। সৌর বিস্ফোরণে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ দু' 'শ বছর আগের বিজ্ঞানীরাই সে সমস্যার সমাধান করেছেন। আমরা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি জানি, আমাদের ক্ষমতা অনেক বেশি।'

ওলেয়া অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়লেন। শুকনো গলায় বললেন, 'আমি কোনো ভরসা পাচ্ছি না। এই মহাসংকট তুচ্ছ করে ফিহা বেড়াতে চলে গেলেন। আপনি নিজে এখন পর্যন্ত কিছু করতে পারেন নি। সুরার যত প্রতিভাই থাকুক, সে তো শিশুমাত্র, এ অবস্থা--।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল, সুরা উত্তেজিতভাবে হেঁটে আসছেন। হাত দুলিয়ে হাঁটার ভঙ্গিটাই বলে দিচ্ছে একটা কিছু হয়েছে।

'মহামান্য মাথুর।'

'বল।'

'এইমাত্র একটি মেয়ে এসে পৌঁচেছে। তার হাতে মহামান্য ফিহার নিজস্ব পরিচয়-পত্র রয়েছে।'

'সে কী!'

'মেয়েটি বলল, সে একটি বিশেষ কাজে এসেছে, কী কাজ তা আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলবে না।'

'কিন্তু ফিহার পরিচয়-পত্র সে পেল কোথায়?'

'ফিহা নিজেই নাকি তাকে দিয়েছেন।'

'আশ্চর্য।'

লী নিজেও বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল সিরান এলাকায় এমন অবাধে ঘুরে বেড়াবে তা কখনো কল্পনা করে নি। ফিহার ত্রিভুজাকৃতি কার্ডটি মন্ত্রের মতো কাজ করছে। অনেকেই যে বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে আছে, তাও সে লক্ষ করল। বুড়োমতো এক ভদ্রলোক বিনীতভাবে লীর নামও জানতে চাইলেন।

মাথুর বললেন, 'শুনেছি আপনি ফিহার কাছ থেকে আসছেন?'

'জ্বি।'

'আপনি কি তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর এনেছেন?'

'জ্বি না।'

'তবে?'

'আমি একটা বই নিয়ে এসেছি, আপনি সে বইটি আশা করি পড়বেন।'

'কী নিয়ে এসেছেন?'

'একটি বই।'

লী তার ব্যাগ থেকে বইটি বের করল।

'কী বই এটি?'

'পড়লেই বুঝতে পারবেন। আশা করি আজ রাতেই পড়তে শুরু করবেন।'

মাথুর হাত বাড়িয়ে বইটি নিলেন। বিস্ময়ে তাঁর ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল। লী বলল, 'আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি কি এক গ্লাস পানি খেতে পারি?'

ফিহা গাড়ি থেকে নামলেন সন্ধ্যাবেলা। স্টেশনে আলো জ্বলছিল না। চারদিক কেমন চুপচাপ থমথম করছে। যাত্রী বেশি নেই, যে কয়জন আছে তারা নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। বছর পাঁচেক আগেও একবার এসেছিলেন ফিহা। তখন কেমন গমগম করত চারদিক। ট্যুরিস্টের দল হৈহৈ করে নামত। অকারণ ছোটাছুটি, ব্যস্ততা, চেঁচামেচি--চমৎকার লাগত। এখন সব বদলে গেছে। ফিহার কিছুটা নিঃসঙ্গ মনে হল।

'আমার আসতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল।' ফিহা তাকিয়ে দেখলেন, নিকি পৌঁচেছে। নিকিকে তার করা হয়েছিল স্টেশনে থাকার জন্যে। ফিহা বললেন, 'এমন অন্ধকার যে?'

'কদিন ধরেই তো অন্ধকার।'

'কেন?'

'পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ। সমস্তই বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করছেন। জানেন না?'

'না।'

'একটা উপগ্রহ ছাড়া হচ্ছে। এখানকার পৃথিবীর কিছু শিশুকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে, যাতে করে শেষ পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্ব বেঁচে থাকে। সুরার পরিকল্পনা।'

'অ।'

দু' জনে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। ফিহা বললেন, 'সমস্ত বদলে গেছে।'

'হ্যাঁ। সবাই হতাশ হয়ে গেছে। উৎপাদন বন্ধ, স্কুল-কলেজ বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ। খুব বাজে ব্যাপার।'

'হুঁ।'

'আপনি হঠাৎ করে এ সময়ে?'

'আমি কিছু ভাবতে এসেছি। নিরিবিলি জায়গা দরকার।'

'টাইফা গ্রহ নিয়ে?'

'হুঁ।'

'আপনার কী মনে হয়? কিছু করা যাবে?'

'জানি না, হয়তো যাবে না, হয়তো যাবে। ঘর ঠিক করেছ আমার জন্যে?'

'জ্বি।'

'আমার একটা কম্পিউটর প্রয়োজন।'

'কম্পিউটর চালাবার মতো ইলেকট্রিসিটি কোথায় পাবেন?'

'ছোটখাটো হলেও চলবে। কিছু হিসাব-টিসাব করব। আছে সে রকম?

'তা আছে।'

বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দু' কামরার ঘর একটা। ফিহার পছন্দ হল খুব। নিকি বড় দেখে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ফিহা বসে বসে খবরের কাগজ দেখতে লাগলেন। এ কয়দিন তাঁর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। অথচ ইতিমধ্যে বেশ পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীতে। সবচে আগে তাঁর চোখে পড়ল শীতলকক্ষের খবরটি। শীতলকক্ষ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শীতলকক্ষের সমস্ত ঘুমন্ত মানুষদের জাগান হয়েছে, তারা ফিরে গেছে আত্মীয়স্বজনদের কাছে। কী আশ্চর্য!

পৃথিবীতে শীতলকক্ষ স্থাপনের যুগান্তকারী পরিকল্পনা নিয়েছিলেন নেতেনটি। ভারি চমৎকার একটি ব্যবস্থা। নব্বুই বছর বয়স হওয়ামাত্র যেতে হবে শীতলকক্ষে। সেখানে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে আরো এক 'শ বছর। এর ভেতর তারা মাত্র পাঁচবার কিছুদিনের জন্যে তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে ফিরে যেতে পারবেন। তারপর আবার ঘুম। ঘুমোতে ঘুমোতেই নিঃশব্দ মৃত্যু। নেতেনটির এই সিদ্ধান্তের খুব বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রথম দিকে, পরে অবশ্য সবাই মেনে নিয়েছিলেন। তার কারণও ছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান তখন এত উন্নত যে একটি মানুষ অনায়াসে দেড় 'শ বছর বাঁচতে পারে। অথচ নব্বুই বছরের পর তার পৃথিবীকে দেবার মতো কিছুই থাকে না। বেঁচে থাকা সেই কারণেই অর্থহীন। কাজেই শীতলকক্ষের শীতলতায় নিশ্চিন্ত ঘুম। মানুষটি বেঁচে থাকলে তার পিছনে যে খরচটি হত তার লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র খরচ এখানে। হার্টের বিট সেখানে ঘন্টায় দু'টিতে নেমে আসে, দেহের তাপ নামে শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি। সেখানে শরীরের

প্রোটোপ্লাজমকে[১৪] বাঁচিয়ে রাখতে খুব কম শক্তির প্রয়োজন।

শীতলকক্ষের সব মানুষ জেগে উঠে তাদের প্রিয়জনদের কাছে ফিরে গেছে-- এ খবর ফিহাকে খুব আলোড়িত করল। দু'-তিন বার পড়লেন খবরটি। নিজের মনেই বললেন, 'সত্যিই কি মহাবিপদ? সমস্ত-নিয়ম কানুন ভেঙে পড়ছে এভাবে! না-- তা কেন হবে--'

'যারা কোনো দিন পৃথিবীকে চোখেও দেখল না, তাদের কথা কি কখনও ভেবেছেন ফিহা?'

নিকি চা নিয়ে কখন যে ফিহার সামনে এসে বসেছে এবং চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে, ফিহা তা লক্ষই করেন নি।

'কাদের কথা বলছ নিকি?'

'মানুষদের কথা, যাদের জন্ম হয়েছে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে মহাকাশযানে কিংবা অন্য উপগ্রহে। জানেন ফিহা, পৃথিবীতে ফিরে এসে একবার শুধু পৃথিবীকে দেখবে, এই আশায় তারা পাগলের মতো--'

'নিকি, তুমি জান আমি কবি নই। এসব বাজে সেন্টিমেন্ট আমার ভালো লাগে না।'

'আমি দুঃখিত। চায়ে চিনি হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'আপনার আর কিছু লাগবে, কোনো সহকারী?'

'না, তার প্রয়োজন নেই। তুমি একটা কাজ করবে নিকি?'

'বলুন কি কাজ।'

'আমার বাবা-মা শীতলকক্ষ থেকে বেরিয়ে হয়তো আমাকে খুঁজছেন।'

'তাঁদের এখানে নিয়ে আসব?'

'না না। তাঁরা যেন আমার খোঁজ না পান। আমি একটা জটিল হিসাব করব। খুব জটিল।'

'ঠিক আছে।'

রাতে বাতি নিভিয়ে ফিহা সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। মাথার কাছে মোমবাতি রেখে দিলেন। রাত-বিরেতে ঘুম ভেঙে গেলে আলো জ্বালিয়ে পড়তে ভালোবাসেন, এই জন্যে. চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে, এমন সময় একটি অদ্ভুত ব্যাপার হল। ফিহার মনে হল ঘরের ভিতর কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে আবছা মতো একটা মূর্তি দেখতে পেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে?'

'আমি।'

'আমিটি কে?'

'বলছি। দয়া করে বাতি জ্বালাবেন না।'

ফিহা নিঃশব্দে বাতি জ্বালালেন। আশ্চর্য! ঘরে কেউ নেই। তিনি বাতি হাতে

বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালেন। চাঁদ উঠেছে আকাশে। চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

'কাল সকালে ডাক্তারের কাছে যাব। আমি অসুস্থ, আবোল-তাবোল দেখছি। জটিল একটা অঙ্ক করতে হবে আমাকে। এ সময়ে মাথা ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন।' ফিহা মনে মনে বললেন।

বাকি রাতটা তাঁর বারান্দায় পায়চারি করে কাটল।

মাথুর ঘরের উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। 'সমস্ত বইটা পড়তে আমার এক ঘন্টার বেশি লাগবে না।' মনে মনে এই ভাবলেন। আসন্ন বিপদের হয়তো তাতে কোনো সুরাহা হবে না, তবু তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। সে তুলনায় এ তো অনেক বড় অবলম্বন। স্বয়ং ফিহা বলে পাঠিয়েছেন যেখানে।

রাত জেগে জেগে মাথুরের মাথা ধরেছিল। চোখ করকর করছিল। তবু তিনি পড়তে শুরু করলেন। বাইরে অনেক রাত। বারান্দায় খ্যাপার মতো হাঁটছেন সুরা। খটখট শব্দ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকক্ষে। সমস্ত অগ্রাহ্য করে মাথুর পড়ে চললেন। মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে বলতে লাগলেন, 'আশ্চর্য। কী আশ্চর্য। তা কী করে হয়? না না অসম্ভব।'

''--আমি নিশ্চিত বলতে পারি যিনি এই বই পড়ছেন, রূপকথার গল্প ভেবেই পড়ছেন। অথচ এখানে যা যা লিখেছি একদিন আমি নিজেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। মাঝে মাঝে আমারো সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। মনে হয়, হয়তো আমার মাথার দোষ হয়েছিল, বিকারের ঘোরে কত কী দেখেছি। কিন্তু আমি জানি মস্তিষ্ক বিকৃতিকালীন স্মৃতি পরবর্তী সময়ে এত স্পষ্ট মনে পড়ে না। তখনি সমস্ত ব্যাপারটাকে সত্য বলে মনে হয়। বড়রকমের হতাশা জাগে। ইচ্ছে করে মরে যাই। ঘুমুতে পারি না, খেতে পারি না, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। এই জাতীয় অস্থিরতা ও হতাশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি লিখতে শুরু করলাম এই আশায়, যে, কেউ একদিন আমার লেখা পড়ে সমস্তই ব্যাখ্যা করতে পারবে। অনেক সময়ই তো দেখা গেছে আজ যা রহস্য, কাল তা সহজ স্বাভাবিক সত্য। আজ যা বুদ্ধির অগম্য, কাল তা-ই সহজ সামান্য ঘটনা।

আমার সে রাতে ঘুম আসছিল না। বাগানে চেয়ার পেতে বসে আছি। ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আনা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে তার মার কাছে বেড়াতে গেছে। বিশেষ কাজ ছিল বলে আমি যেতে পারি নি। ফাঁকা বাড়ি বলেই হয়তো আমার বিষণ্ণ লাগছিল। সকাল সকাল শুয়েও পড়েছিলাম। ঘুম এল না-- মাথা দপদপ করতে লাগল। এক সময় 'দূর ছাই' বলে বাগানে চেয়ার টেনে বসলাম। এপ্রিল মাসের রাত। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে, খুব সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে। এত পরিষ্কার আলো যে মনে হতে লাগল অনায়াসে এই আলোতে বই পড়া যাবে। মাঝে

মাঝে মানুষের ভিতরে যে রকম ছেলেমানুষি জেগে ওঠে, আমারো তেমনি জেগে উঠল। খুব ইচ্ছা হতে লাগল একটা বই এনে দেখেই ফেলি না পড়া যায় কিনা। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। নির্জনতায় কেমন ভয়ভয় লাগে, আবার ভালোও লাগে। চুপচাপ বসে আবোল-তাবোল কত কি ভাবছি, এমন সময় একটা হালকা গন্ধ নাকে এল, মিষ্টি গন্ধ। কিছু ভালো লাগে না, অস্বস্তি বোধ হয়। কিসের গন্ধ এটি? বের করতে চেষ্টা করতে লাগলাম এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, গন্ধের তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। হাত-পা অসাড় হয়ে উঠতে লাগল। যতই ভাবছি এইবার উঠে দৌড়ে পালাব, ততই সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। ভীষণ ভয় হল আমার। সেই সময় ঘুম পেতে লাগল। কিছুতেই ঘুমাব না, নিশ্চয়ই কোনো বিষাক্ত গ্যাসের খপ্পরে পড়েছি, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ছাড়া ছাড়া কাটা কাটা ঘুম। চোখ মেলতে পারছিলাম না, তবে মিষ্টি গন্ধটা নাকে আসছিল তখনও।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নেই। ঘুম ভাঙল মাথায় তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে, তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ। চোখ মেলে আমি দিন কি রাত বুঝতে পারলাম না। কোথায় আছি, আশেপাশে কাদের ফিসফিস শব্দ শুনছি কে জানে? চোখের সামনে চোখ-ধাঁধানো হলুদ আলো। বমি করার আগের মুহূর্তে যে ধরনের অস্বস্তি বোধ হয়, সে ধরনের অস্বস্তি বোধ নিয়ে আমি জেগে রইলাম।

বুঝতে পারছি সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি একটি অদ্ভুত অবস্থায় আছি। অচেতন নই, আবার ঠিক যে চেতনা আছে তাও নয়। কিছু ভাবতে পারছি না। আবার শারীরিক যাতনাগুলিও সুস্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। আমার মনে হল দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। চোখের সামনে তীব্র হলুদ আলো নিয়ে আমি যেন অনন্তকাল ধরে জেগে আছি। মাঝে মাঝে একটা বিজবিজ শব্দ কানে আসে-- লক্ষ লক্ষ মৌমাছি এক সঙ্গে উড়ে গেলে যে রকম শব্দ হত, অনেকটা সেই রকম।

আমি কি মারা গেছি? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? এই জাতীয় চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। হয়তো আরো কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকলে সত্যি পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু তার আগেই কে যেন মিষ্টি করে বলল, 'একটু ধৈর্য ধরুন, খুব অল্প সময়।'

স্পষ্ট গলার স্বর, নিখুঁত উচ্চারণ। আমার শুনতে একটুও অসুবিধে হল না। সমস্ত মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত করে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আপনি কে? আমার কী হয়েছে?'

গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না। কিন্তু তবুও শুনলাম কেউ যেন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, সেই আগের মিষ্টি নরম গলা।

'একটু কষ্ট করুন। অল্প সময়। খুব অল্প সময়। বলুন আমার সঙ্গে, এক--'

'এক।'

'বলুন, দুই।'

15920

আমি বললাম। সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকল। হাজার ছাড়িয়ে লক্ষ ছাড়িয়ে বাড়তেই থাকল, বাড়তেই থাকল। আমি নেশাগ্রস্তের মতো আওড়াতে থাকলাম। আমার চোখের উপর উজ্জ্বল হলুদ আলো, বুকের ভেতর হা হা করা তৃষ্ণা। অর্ধ-চেতন অবস্থায় একটি অচেনা অদেখা ভৌতিক কণ্ঠের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটির পর একটি সংখ্যা বলে চলছি। যেন কত যুগ কত কাল কেটে গেল। আমি বলেই চলেছি-- বলেই চলেছি।

এক সময় মাথার ভিতর সব জট পাকিয়ে গেল। নিঃশ্বাস ফেলার মতো অতি সামান্যতম বাতাসও যেন আর নেই। বুক ফেটে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমি প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করলাম, 'আর নয়, আমাকে মুক্তি দিন। আমি মরে যেতে চাই -- আমি মরে যেতে চাই।'

আবার সেই গলা, 'এইবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে এল। আহা কী শান্তি। কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি দ্রুত। হলুদ আলো ফিকে হয়ে আসছে। শারীরিক যন্ত্রণাগুলো ভোঁতা হয়ে আসছে--শরীরের প্রতিটি কোষ যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, কী শান্তি।

জানি না কখন ঘুম ভাঙল। খুব স্বাভাবিকভাবে চোখ মেললাম। একটা ধাতব চেয়ারে বসে আছি। চেয়ারটি গোলাকার একটি ঘরের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। ঠিক আমার মাথার কাছে ছোট্ট একটি নল দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। ঘরের বাতাস যেন একটু ভারি। বাতাসের সঙ্গে লেবু ফুলের গন্ধ মিশে আছে। আমি ভালো করে চারদিক দেখতে চেষ্টা করতে লাগলাম। গোল ঘরটিতে কোনো দরজা-জানালা নেই। চারদিক নিশ্ছিদ্র। ঘরে কোনো বাতি নেই। তবু সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অদৃশ্য কোনো জায়গা থেকে নীলাভ আলো আসছে হয়তো।

আমার তখন প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। কোথায় আছি, আমার কী হয়েছে-- এ সমস্ত ছাড়িয়ে শুধুমাত্র একটি চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেটি হল ক্ষুধা। আমার ধারণা ছিল, হয়তো আগের মতো কথা বলতে পারব না, তবু বললাম, 'আমি কোথায় আছি?'

সে শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল। গোলাকার ঘরের জন্যই হয়তো সে শব্দ চমৎকার প্রতিধ্বনিত হল। এবং আশ্চর্য, সে শব্দ বাড়তেই থাকল--

'আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি--?'

এক সময় যেন মনে হল লক্ষ লক্ষ মানুষ এক সঙ্গে চিৎকার করছে। আমি নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। দশ থেকে এক পর্যন্ত উল্টো দিকে গুণলাম, আমি কি অচেতন অবস্থায় এসব শুনছি, না সত্যি কিছু জ্ঞান এখনো অবশিষ্ট আছে, তা জানার জন্যে।

এখন লিখতে খুব অবাক লাগছে, সেই অবস্থাতেও কী করে আমি এতটা স্বাভাবিক ছিলাম! অবশ্যি সে সময়ে আমার মনে হয়েছিল সম্ভবত আমার মাথায়

চোট লেগে মস্তিষ্কের কোনো এক অংশ অকেজো হয়ে পড়েছে। অবাস্তব দৃশ্যাবলী দেখছি। এক সময় প্রচন্ড খিদে সত্ত্বেও আমার ঘুম পেল। ঘুমিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তেও শুনতে পেলাম সমুদ্রগর্জনের মতো কোলাহল।

'আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি--?'

কতক্ষণ এভাবে কাটিয়েছিলাম মনে নেই। এক সময় সমস্ত জড়তা কেটে গিয়ে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল। খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, আলস্য নেই। যেন ছুটির দুপুরবেলাটা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছি। চোখ মেলতে ভয় লাগছিল, কে জানে আবার হয়তো সেই সব আজগুবি ব্যাপার দেখতে থাকব। কান পেতে আছি যদি কিছু শোনা যায়। না, কোনো সাড়াশব্দ নেই। চারদিক সুনসান।

'তোমার চা।'

চমকে তাকিয়ে দেখি আনা, আমার স্ত্রী, দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের সঙ্গী হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে বাইরে। আমি শুয়ে আছি আমার অতি পরিচিত বিছানায়। টেবিলের উপর আগের মতো আগোছাল বইপত্র পড়ে আছে। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! আমি প্রায় লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম,

'আনা আমার কী হয়েছে?'

আনা চায়ের পেয়ালা হাতে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই মনে হল, এই মেয়েটি অন্য কেউ, এ আনা নয়। যদিও সেই চোখ, সেই ঢেউ খেলান বাদামী চুল, গালের মাঝামাঝি লাল রঙের কাটা দাগ। আমি ভয়ে কাতর গলায় বললাম, 'তুমি কে? তুমি কে?'

'আমি আনা।'

'না তুমি আনা নও।'

'আমি কি দেখতে আনার মতো নই?'

'দেখতে আনার মতো হলেও তুমি আনা নও।'

'বেশ নাই-বা হলাম, চা নাও।'

আমি আবার বললাম, 'দয়া করে বল তুমি কে?'

'বলছি। সমস্তই ধীরে ধীরে জানবে।'

'আমি কোথায় আছি?'

'তুমি তোমার পৃথিবী থেকে বহু দূরে। ভয় পেয়ো না, আবার ফিরে যাবে। তোমাকে আনা হয়েছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে।'

'কারা আমাকে এখানে এনেছে?'

'এখানে যাদের বাস, তারা এনেছে। যারা আমাকে তৈরি করেছে তারা। চতুর্মাত্রিক জীবেরা[১৫]।'

'তোমাকে তৈরি করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমাকে তৈরি করা হয়েছে তোমার সুখ ও সুবিধার জন্যে। তাছাড়া আমি তোমাকে অনেক কিছু শেখাব। আমার মাধ্যমেই তুমি এদের সঙ্গে কথা বলবে।'

'কাদের সঙ্গে কথা বলব?'

'যারা তোমাকে নিয়ে এসেছে।'

'যারা আমাকে নিয়ে এসেছে তারা কেমন? তারা কি মানুষের মতো?'

'তাদের তুমি দেখতে পাবে না। এরা চতুর্মাত্রিক জীব। পৃথিবীর মানুষ ত্রিমাত্রিক[১৬] জিনিসই শুধু দেখতে পায় ও অনুভব করতে পারে। সেগুলি তাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চতুর্মাত্রিক জগৎ তোমাদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না।'

শুনতে শুনতে আমার গা ছমছম করতে লাগল। এসব কী বলছে সে! ভয় পেয়ে আমি মেয়েটির হাত ধরলাম। এই অদ্ভুত তৈরি পরিবেশে তাকেই আমার একান্ত আপন জন মনে হল। মেয়েটি বলল, 'আমাকে তুমি আনা বলেই ভাববে। আনার সঙ্গে যেভাবে আলাপ করতে, সেইভাবেই আলাপ করবে। আমাকে ভয় পেয়ো না। তোমার যা জানতে ইচ্ছে হবে আমার কাছ থেকে জেনে নেবে। আমি তো তোমাকে বলেছি, আবার তুমি ফিরে যাবে তোমার সত্যিকার আনার কাছে।'

আমি বললাম, 'এই যে আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি, নিজের বইপত্র টেবিলে পড়ে আছে, এসবও কি আমার মতো পৃথিবী থেকে আনা হয়েছে?'

'এইগুলি আনতে হয় নি। তৈরি করা হয়েছে। ইলেকট্রন, প্রোটন এই সব জিনিস দিয়ে তৈরি হয় এটম। বিভিন্ন এটমের বিভিন্ন অনুপাতে তৈরি হয় এক একটি বস্তু। ঠিক তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'কোনো বস্তুর প্রতিটি ইলেকট্রন, প্রোটন কী অবস্থায় আছে এবং এটমগুলি কীভাবে আছে, সেগুলি যদি জানা থাকে এবং ঠিক সেই অনুপাতে যদি ইলেকট্রন, প্রোটন এবং এটম রাখা যায় তবেই সেই বস্তুটি তৈরি হবে। ঠিক তো?'

'হয়তো ঠিক।'

'কিছু শক্তি খরচ করলেই হল। এইভাবেই তোমার ঘর তৈরি হয়েছে। আমিও তৈরি হয়েছি। এখানকার জীবরা মহাশক্তিধর। এই হচ্ছে তোমার প্রথম পাঠ। হ্যাঁ, এবার চা খাও। দাও, চায়ে চুমুক দাও।'

আমি চায়ে চুমুক দিলাম। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি আনা অল্প অল্প হাসছে। আমার সে মুহূর্তে এই মেয়েটিকে সত্যি সত্যি আনা বলেই ভাবতে ইচ্ছে হল।

আমার নিজের অনুভূতি কখনো খুব একটা চড়া সুরে বাঁধা ছিল না। সহজ স্বাভাবিক জীবনযাপন করে এসেছি। হঠাৎ করেই যেন সব বদলে গেল। নিজেকে যদিও ঘটনাপ্রবাহের উপর সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলাম, তবু একটা ক্ষীণ আশা সব

সময় লালন করেছি--হয়তো এক সময় দেখব আশেপাশে যা ঘটছে সমস্তই মায়া, হয়তো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। এক্ষুণি স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠব। মেয়েটি বলল, 'কী ভাবছ?'

'কিছু ভাবছি না। আচ্ছা একটা কথা--'

'বল।'

'কী করে এসেছি আমি এখানে?'

'সেই জটিল প্রক্রিয়া বোঝবার উপায় নেই।'

'এটা কেমন জায়গা?'

'কেমন জায়গা তা তোমাকে কী করে বোঝাব? তুমি ত্রিমাত্রিক জগতের লোক, আর এটি হচ্ছে চতুর্মাত্রিক জগৎ।'

'কিছুই দেখা যাবে না?'

'চেষ্টা করে দেখ। যাও, বাইরে পা দাও। দরজাটা আগে খোল। কী দেখছ?'

আমার সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। চারিদিকে ঘন ঘোলাটে হলুদ আলো। পেটের ভেতরে চিনচিনে ব্যথা। মাথা ঘুরতে লাগল আমার।

'থাক আর দেখবার কাজ নেই, এসে পড়।'

আমার মনে হল মেয়েটি যেন হাসছে আপন মনে। আমি চুপ করে রইলাম। মেয়েটি বলল, 'তুমি অল্প কিছুদিন থাকবে এখানে। তারপর তোমাকে পাঠান হবে একটা ত্রিমাত্রিক জগতে, সেখানে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

আমি বললাম, 'তুমি থাকবে তো সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই; আমি তোমার এক জন শিক্ষক।'

'আচ্ছা একটা কথা--।'

'বল।'

'এখানকার জীবদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ কী করে হয়?'

'আমি জানি না।'

'তাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না?'

'না।'

'তাদের সঙ্গে তোমার কথা হয় না?'

'না।'

'আমার সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হবে তা তাদের কী করে জানাবে?'

'তাদের জানাতে হবে না। আমি কি নিজের থেকে কিছু বলি তোমাকে? যা বলি সমস্তই ওদের কথা। চুপ করে আছ কেন? তোমাকে তো আগেই বলেছি, তুমি তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ।'

দিন-রাত্রির কোনো তফাৎ ছিল না বলেই আমি ঠিক বলতে পারব না,

ক'দিন সেই ছোট্ট ঘরটিতে ছিলাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আগের মতোই হয়। নিজের বাসায় যে ধরনের খাবার খাওয়া হত, সেই ধরনের খাবারই দেওয়া হয় এখানে, আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হল সেই মেয়েটি, যে দেখতে অবিকল আনার মতো, অথচ আনা নয়। খুবই আশ্চর্যের কথা, মেয়েটির সঙ্গে আমার ভারি ঘনিষ্ঠতা হল। মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড ভ্রম হত এ হয়তো সত্যি আনা! সে এমন অনেক কিছুই বলতে পারত, যা আনা ছাড়া অন্য কারো বলা সম্ভব নয়। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এসব কী করে জানলে?'

মেয়েটি হেসে বলেছে, 'যে সমস্ত স্মৃতি আনার মেমরি সেলে আছে, সে সমস্ত স্মৃতি আমার ভেতরেও তৈরি করা হয়েছে। আনার অনেক কিছুই মনে নেই, কিন্তু আমার আছে।'

আমি এসব কিছুই মেলাতে পারছিলাম না। এ কেমন করে হয়! একদিন নখ দিয়ে আঁচড়ে দিলাম মেয়েটির গালে, সত্যি সত্যি রক্ত বেরোয় কিনা দেখতে। সত্যিই রক্ত বেরিয়ে এল। সে অবাক হয়ে বলল, 'এসব কী ছেলেমানুষি কর?'

'দেখি, তুমি সত্যি মানুষ না অন্য কিছু।'

এর ভেতর আমি অনেক কিছু শিখলাম! অনেক কিছুই বুঝতে পারি নি। আনার আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান এমনিতেই আমি কম বুঝি। চতুর্মাত্রিক জগৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল।

'চতুর্মাত্রিক জীবরা কি কোনো খাদ্য গ্রহণ করে?'

'না, করে না।'

'এরা কেমন? অর্থাৎ ব্যাপারটি কী?'

'এরা হচ্ছে ছড়িয়ে থাকা শক্তির মতো? যেমন মনে কর এক গ্লাস পানি; পানির প্রতিটি অণু একই রকম। কোনো হেরফের নেই। সমস্ত অণু মিলিতভাবে তৈরি করেছে পানি। এরাও সে রকম। কারোর কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। সম্মিলিতভাবেই তাদের পরিচয়। তাদের জ্ঞান সম্মিলিত জ্ঞান।'

'এদের জন্ম-মৃত্যু আছে?'

'শক্তি তো সব সময় অবিনশ্বর নয়। এরও বিনাশ আছে। তবে আমি ঠিক জানি না কী হয়।'

'জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কী রকম হয়?'

'কী রকম হয় বলতে পারব না, তবে তারা দ্রুত সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।'

একদিন আনা বলল, 'আজ তোমাকে ত্রিমাত্রিক গ্রহে নিয়ে যাওয়া হবে!'

আমি বললাম, 'সেখানে আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারব তো?' আনা হো হো করে হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই। সেটি তোমার নিজের গ্রহ বলতে পার। তোমার জন্মের

প্রায় দু হাজার বৎসর পর পৃথিবীর মানুষের একটা ছোট্ট দল এখানে এসেছিল। তারপর আরো তিন হাজার বৎসর পার হয়েছে। মানুষেরা চমৎকার বসতি স্থাপন করেছে সেখানে। ভারি সুন্দর জায়গা।'

'আমার জন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পরের মানুষদের কাছে আমি কী করে যাব?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি চতুর্মাত্রিক জগতে আছ। এখানে ত্রিশ হাজার বৎসর আগেও যা, ত্রিশ হাজার বৎসর পরেও তা।'

'তার মানে আমার বয়স কখনো বাড়বে না?'

'নিশ্চয়ই বাড়বে। শরীরবৃত্তির নিয়মে তুমি বুড়ো হবে।'

'কিন্তু ভবিষ্যতে যাওয়ার ব্যাপারটা কেমন?'

'তুমি কি একটি সহজ সত্য জান?'

'কী সত্য?'

'তুমি কি জান যে, কোনো যন্ত্রযানের গতি যদি আলোর গতির চেয়ে বেশি হয়, তবে সেই যন্ত্রযানে করে ভবিষ্যতে পাড়ি দেয়া যায়?'

'শুনেছি কিছুটা।'

'চতুর্মাত্রিক জগৎ একটা প্রচন্ড গতির জগৎ। সে গতি আলোর গতির চার গুণ বেশি। সে গতি হচ্ছে ঘূর্ণায়মান গতি। তুমি নিজে চতুর্মাত্রিক জগতে আছ। কাজেই অবিশ্বাস্য গতিতে ঘুরছ। যে গতি অনায়াসে সময়কে অতিক্রম করে।'

'কিন্তু আমি যতদূর জানি-- কোনো বস্তুর গতি যখন আলোর গতির কাছাকাছি আসে, তখন তার ভর অসীম হয়ে যায়।'

'তা হয়।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও আমার ভর এখন অসীম?'

'না। কারণ তুমি বস্তু নও, তুমি এখন শক্তি।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তুমি তৈরি হয়ে থাক। তোমাকে নিয়ে ত্রিমাত্রিক জগতে যাব এবং তার পরই তোমার কাজ শেষ।'

ভিতরে ভিতরে আমি তীব্র কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। কী করে কী হচ্ছে? আমাকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করা হবে, তা জানার জন্যে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এত উদ্যোগ আয়োজন নিশ্চয়ই কোনো একটি অশুভ শক্তির জন্যে।

দাঁতের ডাক্তারের কাছে দাঁত তুলতে গেলে যেমন বুক-কাঁপান আতঙ্ক নিয়ে বসে থাকতে হয়, বিভিন্ন গ্রহে যাবার জন্যে আমি তেমনি আতঙ্ক নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

যদিও অন্য একটি গ্রহে যাবার কথা ভেবে আতঙ্কে আমার রক্ত জমে যাচ্ছিল, তবু যাত্রাটা কী করে হয়, তা জানার জন্যে প্রচণ্ড কৌতূহলও অনুভব করছিলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি এত হঠাৎ করে হল যে, আমি ঠিক কী যে হচ্ছে তাই বুঝতে পারলাম না।

দেখলাম চোখের সামনে থেকে আচমকা পরিচিত ঘরটি অদৃশ্য হয়েছে। চারিদিকে চোখ–ধাঁধান হলুদ আলো--যার কথা আমি আগেও অনেক বার বলেছি। মাথার ভিতরে তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রণা। যেন কেউ সূক্ষ্ম তলোয়ার দিয়ে সাঁই করে মাথাটি দু' ফাঁক করে ফেলেছে। ঘুরঘুর করে উঠল পেটের ভিতর, পা ও হাতের পাতাগুলি জ্বালা করতে লাগল। আগেই বলেছি সমস্ত ব্যাপারটি খুব অল্প সময়ের ভিতর ঘটে গেল। সমস্ত অনুভূতি উল্টেপাল্টে যাবার আগেই দেখি চৌকোণা একটি ঘরে আমি দাঁড়িয়ে আছি একা, মেয়েটি পাশে নেই। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তার চারপাশে অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি। চকচকে ঘড়ির ডায়ালের মতো অজস্র ডায়াল। কোনোটির কাঁটা স্থির হয়ে আছে। বড় বড় লিভার জাতীয় কিছু যন্ত্র। গঠনভঙ্গি দেখে মনে হয় হাত দিয়ে চাপ দেবার জন্যে তৈরি। টাইপ রাইটারের কী–বোর্ডের মতো বোতামের রাশ। প্রতিটিতেই হালকা আলো জ্বলছে। মাথার ঠিক উপরে সাঁ সাঁ করে পাখা ঘুরছে। পাখাটির আকৃতিও অদ্ভুত। ফুলের কুঁড়ি ফুটে উঠছে, আবার বুঁজে যাচ্ছে--এই রকম মনে হয়। কোনো বাতাস আসছে না সেখান থেকে। পিঁ পিঁ করে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হচ্ছে কেবল। হঠাৎ পরিষ্কার শুনলাম, 'দয়া করে অল্প কিছু সময় অপেক্ষা করুন। বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলুন। আলোর বেগে এসেছেন আপনি এখানে। আপনার শরীরের প্রতিটি অণু থেকে গামা রশ্মি বিকিরণ হচ্ছে, আমরা এটি বন্ধ করছি। কিছুক্ষণের ভিতরেই আপনি আসবেন আমাদের মধ্যে। আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি।'

আমি চুপ করে কথাগুলি শুনলাম। যেভাবে বলা হল সেভাবেই নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম। আবার তাদের গলা শোনা গেল, 'আপনি দয়া করে আমাদের কতগুলি প্রশ্নের জবাব দিন।'

আমি বললাম, 'প্রশ্ন করুন, আমি জবাব দিচ্ছি।'

'আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?'

'না।'

'আপনার কি মাথা ধরেছে?'

'কিছুক্ষণ আগে ধরেছিল, এখন নেই।'

'আচ্ছা বলুন তো ঘরে কী রঙের আলো জ্বলছে?'

'নীল।'

'ভালো করে বলুন, সবুজ নয় তো?'

'না, সবুজ নয়।'

'হালকা নীল?'

'না, ঘন নীল। আমাদের পৃথিবীর মেঘশূন্য আকাশের মতো।' উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন। কারণ পরবর্তী কিছুক্ষণ আর কোনো প্রশ্ন শোনা গেল না।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রশ্নকর্তা এবার থেমে থেমে বললেন, 'আপনি কি জানেন, আমাদের পূর্বপুরুষ একদিন পৃথিবী থেকেই এ গ্রহে এসেছিলেন?'

'আমি জানি।'

'আপনি আমাদের একান্ত আপন জন। আপনি এখানে এসেছেন, সেই উপলক্ষে আজ আমাদের জাতীয় ছুটির দিন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী আশ্চর্য! আপনারা জানতেন আমি এসেছি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনাদের এ গ্রহের নাম?'

'টাইফা।'

আমি লক্ষ করলাম, ঘরের নীল আলো কখন চলে গেছে। সবুজাভ আলোয় ঘর ভরে গেছে। আমি বললাম, 'শুনুন, আমি এবার সবুজ আলো দেখছি।'

বলবার সঙ্গে সঙ্গে একটি অংশ নিঃশব্দে ফাঁক হয়ে যেতে লাগল। আমি দেখলাম অসংখ্য কৌতূহলী মানুষ অপেক্ষা করছে বাইরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি সেই গ্রহ থেকে এসেছি, যেখান থেকে তাদের পূর্বপুরুষ একদিন রওয়ানা হয়েছিল। অজানা সেই গ্রহের জন্যে সমস্ত ভালোবাসা এখন হাত বাড়িয়েছে আমার দিকে।

যাঁরা আমার চার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বেশ বয়স্ক। একটু অবাক হয়ে লক্ষ করলাম দীর্ঘ পাঁচ হাজার বৎসর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রহে কাটিয়ে মানুষের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। সাধারণ মানুষের চেয়ে শুধু একটু লম্বা, চেহারা একটু সবুজাভ---এই পরিবর্তনটাই চট করে চোখে পড়ে। চোখগুলি অবশ্য খুব উজ্জ্বল। মনে হয় অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো আলো ছড়াবে।

'আমার নাম ক্রিকি।' বলেই তাদের একজন আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। অল্প হেসে বললেন, 'আপনি আমাদের কথা ঠিক বুঝতে পারছেন তো?'

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। লম্বাটে ধরনের মুখ, ঢেউ খেলান লম্বা চুল। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফে একটা জঙ্গুলে চেহারা। আমি বললাম, 'খুব ভালো বুঝতে পারছি। আপনারা কি এই ভাষাতেই কথা বলেন?'

'না, আমরা আমাদের ভাষাতেই কথা বলছি। আমাদের সবার সঙ্গেই অনুবাদক যন্ত্র আছে। আসুন, আমার নিজের ঘরে আসুন।'

আমার খুব ইচ্ছে করছিল, বাইরে ঘুরে ঘুরে সব দেখি। এখানকার আকাশ কী রকম? গাছপালাই-বা কেমন দেখতে। প্রথম দিকে আমার যে নিস্পৃহ ভাব ছিল

এখন আর সেটি নেই। আমি তীব্র উত্তেজনা অনুভব করছিলাম, যা–ই দেখছি তা–ই আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। ক্রিকি বললেন, 'আমাদের এই গবেষণাগারে চারটি ভাগ আছে। সবচেয়ে জটিল এবং সবচেয়ে জরুরী বিভাগ হচ্ছে সময় পরিভ্রমণ বিভাগ। জটিলতম কারিগরি বিদ্যা কাজে খাটান হয়েছে। এখান থেকেই সময়ের অনুকূলে ও প্রতিকূলে যাত্রা করান হয়। যেমন আপনি এলেন। তার পরই আছে অনঅধীত গণিত বিভাগ। দু'রকম গণিত আছে, একটি হচ্ছে ব্যবহারিক, অন্যটি অনঅধীত-- অর্থাৎ যে গণিত এখনো কোনো কাজে খাটান যাচ্ছে না। আমাদের এখানকার গণিত বিভাগটি হচ্ছে অনঅধীত গণিত বিভাগ।

'তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগটি কি?'

'তৃতীয়টি হচ্ছে পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চতুর্থটি প্রতি–পদার্থ[১৮] বিভাগ। এ দুটির কাজ হচ্ছে অনঅধীত গণিতকে ব্যবহারিক গণিতে পরিণত করা। আসুন আমি আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আপনি ক্লান্ত নন তো?'

'না না, আমি ঠিক আছি। আমার সব দেখেশুনে বেড়াতে খুব ভালো লাগছে।'

'প্রথমে আপনাকে নিয়ে যাব গণিত বিভাগে। অবশ্য সেটি আপনার ভালো লাগবে না।'

গণিত বিভাগ দেখে আমি সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম। হাসপাতালের লম্বা ঘরের মতো মস্তো লম্বা ঘর। রুগীদের যেমন সারি সারি বিছানা থাকে, তেমনি দু'ধারে বিছানা পাতা। তাদের মধ্যে অদ্ভুত সব বিকৃত শরীর শুয়ে আছে। সবারই বয়স পনের থেকে কুড়ির ভিতরে। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা নড়েচড়ে বসল।

ক্রিকি বললেন, 'আপনি যে কয়দিন এখানে থাকবেন, সে কয়দিন আপনাকে গণিত বিভাগেই থাকতে হবে। গণিত বিভাগের প্রধান-- যিনি এই গবেষণাগারের মহা পরিচালক, তাঁর তাই ইচ্ছে।'

আমি ক্রিকির কথায় কান না দিয়ে বললাম, 'এরা কারা?' প্রশ্ন শুনে ক্রিকি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। অবশ্যি আমি তখন খুব অবাক হয়ে সারবন্দী পড়ে থাকা এই সব অসুস্থ ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আছি। কারো হাত–পা শুকিয়ে সুতার মতো হয়ে গিয়েছে, কারো চোখ নেই, কেউ ধনুকের মতো বেঁকে পড়ে আছে। কারো শরীরে আবার দগদগে ঘা! আমি আবার বললাম, 'এরা কারা বললেন না?'

ক্রিকি থেমে থেমে বললেন, 'এরা গণিতবিদ। টাইফা গ্রহের গণিতের যে জয়–জয়কার, তা এদের জন্যেই।' কথা শেষ না হতেই শুয়ে–থাকা অন্ধ একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলল, 'টাইফা গ্রহের উন্নত গণিতের মুখে আমি থুতু দিই।' বলেই সে থুঃ করে একদলা থুতু ফেলল। ক্রিকি বললেন, 'এই ছেলেটার নাম নিনাম। মহা প্রতিভাবান।'

আমি বললাম, 'এরা এমন পঙ্গু কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ক্রিকি বললেন, 'মায়ের পেটে থাকাকালীন এদের জীনে[১৯] কিছু অদলবদল করা হয়েছে। যার ফলে মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশের বিশ্লেষণী ক্ষমতা হাজার গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু ওরা ঠিক মানবশিশু হয়ে গড়ে ওঠে নি। সুতীব্র গামা রশ্মির রেডিয়েশনের ফলে যে সমস্ত জীন শরীরের অন্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করত, তা প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ এই বিকলাঙ্গতা। বিজ্ঞান সব সময়ই কিছু পরিমাণে নিষ্ঠুর।'

'এরা কি জন্ম থেকেই অঙ্কবিদ?'

'না। বিশিষ্ট অঙ্কবিদরা এদের বেশ কিছুদিন অঙ্ক শেখান।'

'কিন্তু এ তো ভীষণ অন্যায়।'

ক্রিকি বললেন, 'না, অন্যায় নয়। শারীরিক অসুবিধে ছাড়া এদের তো অন্য কোনো অসুবিধে নেই। তাছাড়া এরা মহা সম্মানিত। বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে সব সময় কিছু ব্যক্তিগত ত্যাগের প্রয়োজন।'

'এ রকম কত জন আছে?'

'আছে বেশ কিছু। কারো কারো কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ এখনো শিখছে।'

'কত দিন কর্মক্ষমতা থাকে?'

'পাঁচ থেকে ছ'বছর। অত্যধিক পরিশ্রমে এদের মস্তিষ্কের নিওরোন নষ্ট হয়ে যায়।'

'তাদের দিয়ে কী করা হয় তখন?'

'সেটা নাই–বা শুনলেন।'

'কিন্তু আমি এদের সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে বলুন। বৎসরে কত জন এমন বিকলাঙ্গ শিশু আপনারা তৈরি করেন?'

'সরকারী নিয়মে প্রতিটি মেয়েকে তার জীবদ্দশায় একবার প্রতিভাবান শিশু তৈরির জন্য গামা রশ্মি বিকিরণের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। তবে সবগুলি তো আর সফল হয় না। চলুন যাই অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখি।'

আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমি দেখলাম, হাতে একতাড়া কাগজ নিয়ে এক জন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল অন্ধ ছেলেটির কাছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকল, 'নিনাষ, নিনাষ।'

'বলুন।'

'এই হিসাবটা একটু কর। নবম নৈরাশিক গতি ফলকে বৈদ্যুতিক আবেশ দ্বারা আয়নিত করা হয়েছে, পটেনশিয়ালের পার্থক্য ছয় দশমিক শূন্য তিন মাইক্রোভোল্ট। আউটপুটে কারেন্ট কতো হবে?'

'বারো এম্পিয়ার হবার কথা, কিন্তু হবে না।'

লোকটি লাফিয়ে উঠে বলল, 'কেন হবে না?

'কারণ নবম নৈরাশিক একটি ভেক্টর সংখ্যা। কাজেই গতির দিকনির্ভর। ভেক্টরের সঙ্গে স্কেলারের যোগ এভাবে করা যায় না।'

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। ক্রিকিকে বললাম, 'আমি এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করতে পারি?'

ক্রিকি একটু দোমনা ভাবে বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

আমি নিনাষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি তোমার বন্ধু। তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই।'

'আমার কোনো বন্ধু নেই। চলে যাও এখান থেকে, নয়তো তোমার গায়ে থুথু দেব।'

ক্রিকি বললেন, 'আপনি চলে আসুন। এরা সবাই কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থ। আসুন আমরা পদার্থবিদ্যা বিভাগে যাই।'

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'আমার বিশ্রাম প্রয়োজন, আমার মাথা ঘুরছে।'

ক্রিকি আমার হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনি বিশ্রাম করুন। আমি পরে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।' অবাক হয়ে দেখি আনার মতো দেখতে মেয়েটি সেই ঘরে হাসিমুখে বসে আছে। তাকে দেখে কেমন যেন ভরসা হল। সে বলল, 'এই জায়গা কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'নাও, খাবার খাও। এখানকার খাবার ভালো লাগবে খেতে।'

টেবিলে বিচিত্র ধরনের রকমারি খাবার ছিল। সমস্তই তরল। যেন বিভিন্ন বাটিতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ গুলে রাখা হয়েছে। ঝাঁঝালো ধরনের টক টক লাগল। যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন, খুবই সুস্বাদু খাবার। মেয়েটি বলল, 'তুমি খুব শিগগিরই দেশে ফিরবে।'

'কবে?'

'তোমার হিসাবে এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে।'

'কিন্তু কী জন্য আমাকে এখানে আনা হয়েছে? আমাকে দিয়ে তোমরা কী করাতে চাও?'

মেয়েটি বলল, 'গণিত বিভাগের প্রধানের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'না, হয় নি।'

'তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবেন।'

গণিত বিভাগের প্রধানের সঙ্গে ঘন্টাখানেকের মধ্যে আলাপ হল। ক্রিকি আমাকে নিয়ে গেল তাঁর কাছে। গোলাকার একটি ঘরের ঠিক মধ্যিখানে তিনি বসে ছিলেন। ঘরে আর দ্বিতীয় কোনো আসবাব নেই। সে ঘরে একটা জিনিস আমার খুব চোখে লাগল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সমস্তই গাঢ় সবুজ রঙে রাঙান। এমন কি যে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন, তার রঙও গাঢ় সবুজ। আমাকে দেখে ভদ্রলোক

অত্যন্ত মোটা গলায় বলে উঠলেন, 'আমি গণিত বিভাগের প্রধান মিহি। আশা করি আপনি ভালো আছেন।'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি। আমার ভেতরটা যেন কেটে কেটে দেখে নিচ্ছে। শক্ত সমর্থ চেহারা--সমস্ত চোখে-মুখে অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভাব। তিনি বললেন, 'ক্রিকি তুমি চলে যাও। আর আপনি বসুন।'

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'কোথায় বসব? মেঝেতে?'

'হ্যাঁ। কোনো আপত্তি আছে? আপত্তি থাকলে আমার চেয়ারে বসুন।' বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, 'আমার বসবার তেমন প্রয়োজন নেই। আপনি কী বলবেন বলুন।'

'আপনি কি জানেন, কী জন্যে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে?'

'না, জানি না।'

'কোনো ধারণা আছে?'

'কোনো ধারণা নেই।'

'বলছি। তার আগে আমার দু'-একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। আপনি যে ভবিষ্যতে পাঁচ হাজার বৎসর পাড়ি দিয়েছেন সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'না, আমার কোনো ধারণা নেই।'

'আপনি যে উপায়ে ভবিষ্যতে চলে এসেছেন সে উপায়ে অতীতেও চলে যেতে পারেন। নয় কি?'

'আমি ঠিক জানি না। আমাকে নিয়ে কী করা হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে না পারলেও খুব অসুবিধে নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মানুষের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ।'

'আমি কিছুই জানি না। স্কুলে আমি সমাজবিদ্যা পড়াতাম। বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি একেবারে অজ্ঞ।'

'আপনাকে বলছি--মন দিয়ে শুনুন মানুষ কিছুই জানে না। তারা সময়কে অতিক্রম করতে পারে না। শূন্য ও অসীম--এই দুইয়ের প্রকৃত অর্থ জানে না। সৃষ্টির আদি রহস্যটা কী, তাও জানে না। পদার্থের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক তার জানা, কিন্তু তার সঙ্গে সময়ের সম্পর্কটা অজানা। প্রতি-পদার্থ কী তা সে জানে, কিন্তু প্রতি-পদার্থে সময়ের ভূমিকা কী, তা সে জানে না। অথচ জ্ঞানের সত্যিকার লক্ষ্য হচ্ছে এই সমস্ত রহস্য ভেদ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই সব রহস্য মানুষ কখনো ভেদ করতে পারবে না, তার ফলস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র গণ্ডিতে

ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়া। আপনি বুঝতে পারছেন?'

'বুঝতে চেষ্টা করছি।'

'একটা সামান্য জিনিস ভেবে দেখুন, NGK১২৩[২০] গ্রহটিতে মানুষ কখনো যেতে পারবে না। আলোর গতিতেও যদি সে যায়, তবু তার সময় লাগবে এক লক্ষ বৎসর।'

'সেখানে যাওয়া কি এতই জরুরি?'

'নিশ্চয়ই জরুরি। অবিকল মানুষের মতো, একচুলও হেরফের নেই-- এ জাতীয় প্রাণের বিকাশ হয়েছে সেখানে। অপূর্ব সে গ্রহ! মানুষের সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করেছে তার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য। অথচ মানুষ কখনো তার নাগাল পাবে না। তবে--'

'তবে কী?'

'যদি মানুষকে বদলে দেয়া যায়, যদি তাদের মুক্তি দেয়া হয় ত্রিমাত্রিক বন্ধন থেকে, যদি তাদের নিয়ে আসা যায় চতুর্মাত্রিক জগতে-- তবেই অনেক কিছু তাদের আয়ত্তে এসে যাবে। তার জন্যে দরকার চতুর্মাত্রিক জগতের মহাজ্ঞানী শক্তিশালী জীবদের সাহায্য। মানুষ অবশ্যি ত্রিমাত্রা থেকে চতুর্মাত্রায় রূপান্তরের আদি সমীকরণের প্রথম পর্যায় শুরু করেছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে একটি মাত্র মানুষের জন্যে। সে হচ্ছে ফিহা।'

'ফিহা?'

'হ্যাঁ, ফিহা। তার অসাধারণ মেধার তুলনা মেলা ভার। অথচ তিনি সঠিক পথে এগুচ্ছেন না। এই সমীকরণের দুটি সমাধান আছে। তিনি একটি বের করেছেন, অন্যটি বের করতে চেষ্টা করছেন না।'

'কিন্তু এখানে আমার ভূমিকাটি কী? আমি কী করতে পারি?'

'আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন। চতুর্মাত্রিক জীবরা ফিহাকে চান। ফিহার অসামান্য মেধাকে তাঁরা কাজে লাগাবেন।'

'বেশ তো, আমাকে তাঁরা যে ভাবে এনেছেন, ফিহাকেও সেভাবে নিয়ে এলেই তো হয়।'

'সেই ভাবে নিয়ে আসা যাচ্ছে না বলেই তো আপনাকে আনা হয়েছে। সিরানরা পৃথিবীর মানুষদের ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি[২১] থেকে বাঁচানর জন্যে পৃথিবীর চারদিকে শক্তিবলয়[২২] তৈরি করেছে। চতুর্মাত্রিক জীবরা শক্তিবলয় ভেদ করতে পারেন না, মানুষ যা অনায়াসেই পারে। সেই কারণে ফিহাকে আনা যাচ্ছে না।'

'আমি সেখানে গিয়ে কী করব?'

'ফিহাকে নিয়ে আসবেন আপনি। সম্ভব না হলে ফিহাকে হত্যা করবেন।'

'আপনি এসব কী বলছেন!'

'যান বিশ্রাম করুন গিয়ে, এ নিয়ে পরে আলাপ হবে। যান যান। দাঁড়িয়ে

থাকবেন না। '

আমি উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে এলাম। এই মুহূর্তে আমার সেই মেয়েটিকে প্রয়োজন। সে হয়তো অনেক কিছু বুঝিয়ে বলবে আমাকে। গিয়ে দেখি মেয়েটি কৌচের উপর ঘুমিয়ে রয়েছে। শ্রান্ত মানুষেরা যেমন ঘুমোয়, অবিকল তেমনি।

এত নিখুঁত মানুষ যারা তৈরি করতে পারে তাদের আমার হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে হল। এরাই কি ঈশ্বর? সৃষ্টি এবং ধ্বংসের অমোঘ ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসে আছে? প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে মহাপুরুষদের কথা আছে, তাঁরা ইচ্ছেমতো মৃতকে জীবন দিতেন। ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন। কে জানে হয়তো মহাক্ষমতার অধিকারী চতুর্মাত্রিক জীবদের দ্বারাই এসব হয়েছে। নকল মানুষ তৈরি করে তাদের দিয়ে ভেলকি দেখিয়েছে। আনার মতো মানুষ যারা নিখুঁত ভাবে তৈরি করে, তাদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

আনাকে ঘুমন্ত রেখেই বেরিয়ে এলাম। উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালাম কিছু সময়। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মনে হল পথ হারিয়েছি। আমার নিজের ঘরটিতে ফিরে যাব, তার পথ পাচ্ছি না। কাউকে জিজ্ঞেস করে নিই ভেবে একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিলাম। খুব অল্প বয়স্ক এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত, 'আসুন, আসুন। আপনার কাছে যাব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। সত্যি বলছি।'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'কী করেন আপনি?'

'আমি এক জন ডাক্তার।'

'এখানে ডাক্তারও আছেন নাকি?'

'নিশ্চয়ই। মস্ত বড় টীম আমাদের। আমি একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ। আমরা সবাই মিলে একটা ছোট্ট গবেষণাগার চালাই।'

'খুব অল্প বয়স তো আপনার!'

'না না, যত অল্প ভাবছেন তত অল্প নয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া কি বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়?' বলেই ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন, যেন খুব একটা মজার কথা।

'জানেন, আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন থেকেই আমি এখানে। একটি দিনের জন্যেও এর বাইরে যেতে পারি নি। সেই বয়স থেকে স্নায়ু নিয়ে কারবার আমার। বাজে ব্যাপার।'

'তার মানে এই দীর্ঘ সময়ে একবারও আপনি বাবা-মার কাছে যান নি?'

'না। এমনকি আমার নিজের গ্রহটি সত্যি দেখতে কেমন তাও জানি না। তবে শুনেছি সেটি নাকি অপূর্ব। বিশেষ করে রাতের বেলা। অপূর্ব সব রঙ তৈরি হয় বলে শুনেছি। তাছাড়া দিন-রাত্রি সব সময় নাকি হু হু করে বাতাস বইছে। আর সেখানকার ঘরবাড়ি এমনভাবে তৈরি যে একটু বাতাস পেলেই অপূর্ব বাজনার

মতো আওয়াজ হয়।'

'আপনি কি কখনো যেতে পারেন না সেখানে?'

ডাক্তার অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কী করে যাব? আমাদের এই সম্পূর্ণ গবেষণাগারটি একটি চতুর্মাত্রিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা।'

'তার মানে?'

'একটা ডিম কল্পনা করুন। কুসুমটি যেন আমাদের গবেষণাগার, একটি ত্রিমাত্রিক জগৎ। ডিমের সাদা অংশটি হল চতুর্মাত্রিক জগৎ এবং শক্ত খোলটি হচ্ছে আমাদের প্রিয় গ্রহ টাইফা।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরকম করা হল কেন?'

'চতুর্মাত্রিক জীবদের খেয়াল। তবে আপনাকে একটা ব্যাপার বলি শুনুন, ঐ সব মহাপুরুষ জীবদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য, সমস্ত ত্রিমাত্রিক জগৎ বিলুপ্ত করা। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই গবেষণাগার। বুঝতে পারছেন?'

'না।'

'না পারলেই ভালো।'

'আপনি কি এসব সমর্থন করেন না?'

'না। কেন করব? আমি বাইরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবর কিছু কিছু রাখি। আমি জানি ফিহা ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের কাজে হাত দিয়েছেন। অসম্ভব মেধা তাঁর। সমীকরণের সমাধান হওয়ামাত্র চতুর্মাত্রিক জগতের রহস্যভেদ হয়ে যাবে মানুষের কাছে, বুঝলেন? আর এতেই মাথা ঘুরে গেছে সবার। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তারা ফিহাকে নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু কলা! কাঁচকলা! ফিহাকে আনতে গিয়ে কাঁচকলাটি খাও।'

আমি লক্ষ করলাম ডাক্তার ভদ্রলোক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, 'মানুষেরা পৃথিবীর চারিদিকে শক্তিবলয় তৈরি করেছে। কিন্তু চতুর্মাত্রিক জীবদেরও সাধ্য নেই, সেই বলয় ভেদ করে। হাঃ হাঃ হাঃ--।'

হাসি থামলে কাতর গলায় বললাম, 'আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে আমায় আমার ঘরটি দেখিয়ে দেবেন? আমার কিছুই ভালো লাগছে না।'

তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অবসন্ন ভাবে হাঁটছি। কী হতে যাচ্ছে কে জানে। আবছা আলোয় রহস্যময় লম্বা করিডোর। দুই পাশের প্রকান্ড সব কামরা বিচিত্র সব যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। অথচ এদের কোনো কিছুর সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। আমি আমার জায়গায় ফিরে যেতে চাই, যেখানে আমার স্ত্রী আছে, আমার দু'টি অবোধ শিশু আছে-- দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে অবোধ ভালোবাসা আছে।

পরবর্তী দু' দিন, অনুমানে বলছি-- সেখানে পৃথিবীর মতো দিন-রাত্রি নেই, আমার ওপর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল। একেক বার একেকটি ঘরে ঢুকি।

বিকট সব যন্ত্রপাতি আমার চারপাশে বসান হয়। তারপর ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। একটি পরীক্ষা শেষ না হতেই অন্যটি শুরু। বিশ্রাম নেই, নিঃশ্বাস ফেলার অবসরটুকু নেই। আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। কী হবে প্রশ্ন করে? নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি ভাগ্যের হাতে। ক্লান্তিতে যখন মরমর হয়েছি, তখন বলা হল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন চব্বিশ ঘন্টা পূর্ণ বিশ্রাম। তারপর আমাকে পাঠান হবে পৃথিবীতে।

সমস্ত দিন ঘুমালাম। ঘুম ভাঙল দরজায় মৃদু টোকার শব্দ শুনে।

'গণিত বিভাগের একটি ছেলে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। কিছু বলবে, খুব জরুরি।' রোগামতো লোকটি খুব নিচু গলায় বলল কথাগুলি।

আমি বললাম, 'কে সে?'

'নিনাষ। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম। আমার মনে হল কিছু একটা হয়েছে, থমথম করছে চারদিক। আনার মতো মেয়েটিও নেই কোথাও।

সবাই যেন অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। আমি যেতেই উৎসুক হয়ে নড়ে-চড়ে বসল সবাই। 'তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলে?'

নিনাষ বলল, 'হ্যাঁ। আপনি জানেন কি, টাইফা গ্রহ অদৃশ্য হয়েছে?'

'আমি কিছুই জানি না।'

'তাহলে আমার কাছ থেকে জানুন। অল্প কিছুক্ষণ হল সমস্ত গ্রহটি চতুর্মাত্রিক গ্রহে পরিণত করা হয়েছে। কেমন করে জানলাম? ত্রিমাত্রিক গ্রহকে চতুর্মাত্রিক গ্রহে পরিণত করার নির্দিষ্ট হিসাব আমরা করেছি। আমরা সব জানি। শুধু যে টাইফা গ্রহই অদৃশ্য হয়েছে তাই নয়, একটি বৃত্তাকার স্থান ক্রমশই চতুর্মাত্রিক জগতে প্রবেশ করছে এবং আপনার পৃথিবী সেই বৃত্তের ভিতরে। বুঝলেন?'

আমি বললাম, 'আমার তাহলে আর প্রয়োজন নেই?'

'এই মুহূর্তে আপনাকেই তাদের প্রয়োজন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নেই। নিশ্চয় তারা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চেষ্টা করবে--ফিহার মতো বিজ্ঞানী যেখানে আছেন। আমি খুব ভালো করে জানি, মহাজ্ঞানী ফিহা একটা বুদ্ধি বের করবেনই। যাক, ওসব ছেড়ে দিন। আপনাকে কী জন্যে পাঠান হবে জানেন?'

'না।'

'আপনাকে পাঠান হবে, যেন ফিহা পৃথিবী রক্ষার কোনো পরিকল্পনা করতে না পারেন, তাই দেখতে। ফিহার যাবতীয় কাগজপত্র আপনাকে নষ্ট করে ফেলতে বলবে। এমন কি প্রয়োজন হলে আপনাকে বলবে ফিহাকে হত্যা করতে। কিন্তু শুনুন, তা করতে যাবেন না। বুঝতে পারলেন? টাইফা গ্রহ চলে গেছে--পৃথিবী যেন না যায়।'

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি আনা হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। আমাকে বলল,

'সুসংবাদ। তুমি অল্প কিছুক্ষণের ভিতর পৃথিবীতে যাবে। তোমাকে কী করতে হবে তা মিহি বুঝিয়ে বলবেন।'

'আনা, চতুর্মাত্রিক জীবরা যখন তোমার মতো মানুষ তৈরি করতে পারে, তখন ওদের পাঠালেই পারত পৃথিবীতে, ওরাই করতে পারত যা করার।'

'তৈরি মানুষ শক্তিবলয় ভেদ করতে পারে না।'

'কিন্তু আনা, তোমরা আমাকে যা করতে বলবে তা আমি করব না।'

'নিনাষ কিছু বলেছে তোমাকে, না?'

'ঠিক সে জন্যে নয়। আমার মন বলছে আমি যা করব তা অন্যায়।'

'বাজে কথা রাখ--তুমি করবেই।'

'আমি করবই? যদি না করি?'

'না করলে ফিরে যেতে পারবে না তোমার স্ত্রী-পুত্রের কাছে। খুব সহজ সত্য। তুমি কি তোমার ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে চাও না?'

'চাই।'

'তা ছাড়া আরেকটা দিক ভেবে দেখ। তোমার তো কিছু হচ্ছে না। তুমি তোমার কাজ শেষ করে পৃথিবীতে নিজের ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যাবে। তারও পাঁচ হাজার বছর পর পৃথিবীর পরিবর্তন হবে। তার আগে নয়। এস, মিহির কাছে যাই, তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। ও কি, তুমি কাঁদছ নাকি?'

'না, আমি ঠিক আছি।'——"

বইটি অর্ধসমাপ্ত। এরপর আর কিছু নেই। উত্তেজনায় মাথুর হাঁপাতে লাগলেন। সেই মেয়েটি কোথায়, যে তাকে এই বইটি দিয়ে গেছে? তার সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলা প্রয়োজন। মাথুর ঘরের বাতি নিভিয়েই বেরিয়ে এলেন। বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে। ঘুমন্ত সিরান-পল্লীর ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে নির্জন পথ। মাথুরের অল্প শীত করছিল। মেয়েটি কোথায় আছে তা তিনি জানেন। দরজায় টোকা দিতেই লী বলল,

'কে?'

'আমি। আমি মাথুর।'

লী দরজা খুলে দিল। মাথুর খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন,

'বইটির শেষ অংশ কোথায়?'

'শেষ অংশ আমি পাই নি। আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।'

মাথুর ধীরে ধীরে বললেন, 'লোকটি তার অভিজ্ঞতার কথা লিখে যেতে পেরেছে। তার মানেই হল সে ফিরে এসেছে নিজের জায়গায়। অর্থাৎ তার উপর যে দায়িত্ব ছিল তা সে পালন করেছে। সহজ কথায় ফিহাকে পৃথিবী রক্ষার কোনো পরিকল্পনা করতে দেয় নি। ফিহাকে আমাদের বড্ডো প্রয়োজন।'

মাথুর আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলেন, এক সময় নিঃশব্দে উঠে এলেন।

নিকি ঘরে ঢুকে থমকে গেল।

সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে ফিহা শুয়ে আছেন। ন'টার মতো বাজে। এই সময় তিনি সাধারণত আঁক কষেন, নয়তো দুলেদুলে বাচ্চাদের মতো বই পড়েন। নিকি বলল, 'আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে?'

ফিহা বললেন, 'শরীর নয়, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাল সারারাত আমি ভূত দেখেছি।'

'ভূত!'

'হ্যাঁ, জলজ্যান্ত ভূত। মানুষের গলায় কথা বলে। বাতি জ্বাললেই চলে যায়। আবার ঘর অন্ধকার করলে ফিরে আসে। অদ্ভুত ব্যাপার। সকালবেলা শুয়েশুয়ে তাই ভাবছি।'

নিকি বলল, 'রাত-দিন অঙ্ক নিয়ে আছেন। মাথাকে তো আর বিশ্রাম দিচ্ছেন না, সেই জন্যে এসব হচ্ছে। ভালো করে খাওয়াদাওয়া করুন। এক জন ডাক্তার আনব?'

'না না, ডাক্তার-ফাক্তার লাগবে না। আর বিশ্রামের কথা বলছ? সময় তো খুব অল্প। যা করতে হয় এর ভেতর করতে হবে।'

নিকি দেখল, ফিহা খুব সহজভাবে কথা বলছেন। সাধারণত দুটি কথার পরই তিনি রেগে যান। গালিগালাজ করতে থাকেন। রাগ খুব বেশি চড়ে গেলে হাতের কাছে যে কাগজটা পান তা কুচিকুচি করে ফেলেন। রাগ তখন একটু পড়ে। নিকি ভাবল, রাতে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে, যার জন্যে আজ ফিহার গলায় এরকম নরম সুর। নিকি চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'কী হয়েছিল ফিহা। ভূতটা কি আপনাকে ভয় দেখিয়েছিল?'

'না, ভয় দেখায় নি। বরং খুব সম্মান করে কথা বলেছে। বলেছে, এই যে চারিদিকে রব উঠেছে মহাসংকট, মহাসংকট--এসব কিছু নয়। শুধুমাত্র পৃথিবীর ডাইমেনশন বদলে যাবে, আর নতুন ডাইমেনশনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবর্ণ সুযোগ। এবং সেখানে নাকি আমার মতো বিজ্ঞানীর মহা সুযোগ-সুবিধা। কাজেই আমি যেন এমন কিছু না করি যাতে এই মহাসংকট কেটে যায়। এই সব।'

'আপনি তার কথা শুনে কী করলেন?'

'প্রথমে কাঁচের গ্লাসটা ছুঁড়ে মেরেছি তার দিকে। তারপর ছুঁড়ে মেরেছি এ্যাসট্রেটা। এতেও যখন কিছু হল না, তখন বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছি।'

নিকি অবাক হয়ে বলল, 'আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। সত্যি কি কেউ এসেছিল?'

'আরে না। আসবে আবার কি? ত্রিমাত্রিক জগৎকে চতুর্মাত্রিক জগতে পরিণত

করবার জন্যে আমি এক সময় কতকগুলি ইকোয়েশন সমাধান করেছিলাম, জান বোধ হয়? গত কয়েক দিন ধরেই কেন জানি বারবার সে কথা মনে হচ্ছে। তাই থেকে এসব দেখছি। মাথা গরম হলে যা হয়। বাদ দাও ওসব। তুমি কি চা দেবে এক কাপ?'

'আনছি, এক্ষুণি নিয়ে আসছি।'

রাত্রি জাগরণের ফলে ফিহা সত্যি সত্যি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আগে ভেবে রেখেছিলেন, আজ সমস্ত দিন কাজ করবেন এবং সমস্ত দিন কোনো খাবার খাবেন না। ফিহা সব সময় দেখেছেন যখন তাঁর পেটে এক কণা খাবার থাকে না, ক্ষুধায় সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসে, তখন তাঁর চিন্তাশক্তি অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। বিস্ময়কর যে কয়টি আবিষ্কার তিনি করেছেন, তা ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই করেছেন। আজ অবশ্যি কিছু করা গেল না। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিকি সকালের খাবার দিয়ে যায় নি। গত রাতে যদি এই জাতীয় আধিভৌতিক ব্যাপারগুলি না হত, তাহলে এতক্ষণে কাজে লেগে পড়তেন।

'এই নিন চা। আমি সঙ্গে কিছু বিস্কিটও নিয়ে এসেছি।'

'খুব ভালো করেছ।'

নিকি একটু ইতস্তত করে বলল, 'ফিহা, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বল, বল।'

'আগে বলুন আপনি হাসবেন না?'

'হাসির কথা হলেও হাসব না?'

'হাসির কথা নয়। আমি--মানে আমার মনে ক'দিন ধরেই একটা ভাবনা হচ্ছে, আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না।'

ফিহা বললেন, 'বলেই ফেল। কোনো প্রেমের ব্যাপার নাকি?'

'না না, কী যে বলেন। আমার মনে হয় আমরা যদি পৃথিবীটাকে সরিয়ে দিতে পারি তার কক্ষপথ থেকে, তাহলে বিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারি। নয় কি?'

ফিহা হো হো করে হেসে ফেললেন। নিকি বলল,

'কেন, পৃথিবীটাকে কি সরান যায় না?'

'নিশ্চয়ই যায়। তুমি যদি মঙ্গল গ্রহটা পরম পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে গুঁড়িয়ে দাও, তাহলেই সৌরমন্ডলে মধ্যাকর্ষণজনিত সমতা ব্যাহত হবে। এবং পৃথিবী ছিটকে সরে যাবে।'

'তা হলেই তো হয়। পৃথিবীকে নিরাপদ জায়গায় এই করে সরিয়ে নিলেই হয়।'

'কিন্তু একটা গ্রহ উড়িয়ে দিলে যে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হবে তাতে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে। আর পৃথিবীকে অল্প একটু সরালেই তো

জীবনধারণ একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠবে। ধর, পৃথিবী যদি সূর্যের একটু কাছে এগিয়ে আসে, তাহলেই উত্তাপে সুমেরু–কুমেরুর যাবতীয় বরফ গলে মহাপ্লাবন। আর সূর্য থেকে একটু দূরে সরে গেলে শীতে আমাদের শরীরের প্রোটোপ্লাজম পর্যন্ত জমে যাবে। বুঝলে?'

নিকির চেহারা দেখে মনে হল সে ভীষণ হতাশ হয়েছে। ফিহা চুপচাপ চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি এখন আর তাঁর নেই। নিকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি নিজেও একটু উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। নিকির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,

'আমি অবাক হয়ে লক্ষ করছি, প্রতিটি মেয়ে পৃথিবী রক্ষার জন্যে এক-একটি পরিকল্পনা বের করে ফেলেছে। ট্রেনে আসবার পথে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা, সেও নাকি কী বই পেয়েছে কুড়িয়ে, পাঁচ হাজার বছরের পুরনো বই-- তাতেও নাকি পৃথিবী কী করে রক্ষা করা যায় তা লেখা আছে। হা–হা–হা।'

নিকি চুপ করে রইল। বেচারী বেশ লজ্জা পেয়েছে। লাল হয়ে উঠেছে চোখ-মুখ। ফিহা বললেন, 'নিকি, তুমি কি আমার কথায় লজ্জা পেয়েছ?'

'না।'

'এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে, তোমরা সবাই কিছু–না–কিছু ভাবছ। আমার ভেতর কোনো রকম ভাবালুতা নেই। তবু তোমাদের এসব কান্ডকারখানা দেখে মনে হয়, যে পৃথিবীর জন্যে সবার এত ভালোবাসা-- তা নষ্ট হয় কী করে!'

নিকি বলল, 'আপনি কিছু ভাবছেন ফিহা?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ঠান্ডা মাথায় ভাববার জন্যেই তো এমন নির্জন জায়গায় এসেছি। আমি প্রাণপণে বের করতে চেষ্টা করছি কী জন্যে এমন হচ্ছে। সেই বিশেষ কারণটি কী হতে পারে, যার জন্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমস্ত গ্রহ–নক্ষত্র লাপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে কিছুই হচ্ছে না। যেই মুহূর্তে কারণ জানা যাবে, সেই মুহূর্তে পৃথিবী রক্ষার উপায় একটা কিছু হবেই। আমার বয়স হয়েছে, আগের মতো খাটতে পারি না, তবু মাথার ধার একটুও ভোঁতা হয় নি। তুমি বিশ্বাস কর আমাকে।'

আবেগে নিকির চোখে পানি এল। ফিহার চোখে পড়লে তিনি রেগে যাবেন, তাই সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু আসছি।'

ফিহা ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। হাতে সিগারেট জ্বলছে। হেঁটে বেড়াচ্ছেন ঘরের ভেতর। মনে মনে বলছেন, 'কিছু একটা করা প্রয়োজন। কিন্তু কী করে সেই কিছু একটা হবে, তাই ভেবে পাচ্ছেন না। অন্ধকারে হাতড়ানর কোনো মানে হয় না। ফিহা গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, 'নিকি।'

নিকি দৌড়ে এল। ফিহা বললেন, 'আমি মাথুরের সঙ্গে একটু আলাপ করি,

কী বল? ঐ মেয়েটা কী কাণ্ডকারখানা করে বেড়াচ্ছে তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই। আমি এক্ষুণি যোগাযোগ করে দিচ্ছি।'

মাথুরের চিন্তাশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছে। ঈর নিয়ে আসা বইটির শেষ অংশ নেই, এতেই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এদিকে ফিহার কোনো খোঁজ নেই। সিরান-পল্লীর বিজ্ঞানীরা তাঁকে বয়কট করেছেন। কাজকর্ম চালাচ্ছে সুরা; সুরা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, 'মাথুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' সমস্তই মাথুরের কানে আসে। মহাকাশ প্রযুক্তি-বিদ্যা গবেষণাগারের তিনি মহাপরিচালক, অথচ তাঁর হাতে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নেই।

মাথুর সময় কাটান শুয়ে শুয়ে। নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার কথা মনেও হয় না তাঁর। দশ থেকে পনেরটি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। কাজ বলতে এই। রাতের বেলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ঘুমুতে যান। ঘুম হয় না, বিছানায় ছটফট করেন।

সেদিনও খবরের কাগজ দেখছিলেন। সরকারী নির্দেশ থাকার জন্যেই কোথাও মহাবিপদের কোনো উল্লেখমাত্র নেই, অথচ সমস্ত খবরের মূল কথাটি হচ্ছে, বিপদ এগিয়ে আসছে পায়ে-পায়ে। পাতায় পাতায় লেখা, শহরে আইনশৃঙ্খলা নেই, খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত, যানবাহন চলাচল বন্ধ, কল-কারখানার কর্মীরা কাজ ছেড়ে বিনা নোটিশে বাড়ি চলে যাচ্ছে। ছয় জন তরুণী আতঙ্ক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসেছে। পড়তে পড়তে মাথুরের মনে হল তিনি নিজেও কি আত্মহত্যা করে বসবেন কোনো দিন?

ট্রিইই, ট্রিইই।

যোগাযোগের স্বচ্ছ পর্দা নীলাভ হয়ে উঠল। মাথুর চমকে তাকালেন সেদিকে। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে কে কথা বলতে চায়?

'মাথুর, আমি ফিহা বলছি। কেমন আছ তোমরা?'

মাথুর উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। 'পাওয়া গেছে, ফিহাকে পাওয়া গেছে।'

'মাথুর, কী বলে সেই পাগলা মেয়েটি এসেছিল?'

'জ্বি এসেছিল।'

'সে কি এখনো আছে তোমার কাছে?'

'না, সে চলে গেছে। ফিহা, আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা ছিল।'

'কী কথা? আমি এখন একটু ব্যস্ত।'

'শত ব্যস্ত থাকলেও আপনাকে শুনতে হবে। আপনি কি ইদানীং কোনো আজগুবি ব্যাপার দেখেছেন, কেউ এসে কি আপনাকে ভয়টয় দেখাচ্ছে?'

ফিহা একটু অবাক হলেন। থেমে থেমে বললেন, 'তুমি জানলে কী করে।

নিকি কি এর মধ্যেই তোমাকেও এসব জানিয়ে বসে আছে?'

'না না, নিকি নয়। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। আপনাকে সব বোঝান যাবে না। তা ছাড়া সময়ও খুব কম।'

'বেশ, তাহলে জরুরী কথাটাই সেরে ফেল।'

'আপনি ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের সমাধান করেছিলেন?'

'করেছিলাম, তা তো তোমার মনে থাকা উচিত।'

'মনে আছে ফিহা। কিন্তু আপনার সমীকরণের দুটি সমাধান ছিল।'

'দুটি নয় একটি। অন্যটিতে ইমাজিনারি টার্ম ব্যবহার করা হয়েছিল, কাজেই সেটি বাদ দিতে হবে। কারণ এখানে সমাধানটির উত্তরও ইমাজিনারি টার্মে এসেছিল।'

'ফিহা, আমাদের দ্বিতীয় সমাধানটি দরকার?'

'কেন?'

'দ্বিতীয় সমাধানটি সঠিক সমাধান।'

'মাথুর, একটা কথা বলছি, রাগ করো না।'

'বলুন।'

'তোমার মাথায় দোষ হয়েছে। বুঝতে পারছি, এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রাখা খুব মুশকিল।'

'আমার মাথা খুব ঠিক আছে। আমি আপনার পায়ে পড়ি, আমার কথা শুনুন।'

'বেশ বেশ বল।'

'দ্বিতীয় সমাধানটি যদি আমরা সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা নিজেরাই একটি চতুর্মাত্রিক জগৎ তৈরি করতে পারি।'

'হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে। কিন্তু সমাধানটি তো ভুল।'

'সমাধানটি ভুল নয়। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে। আচ্ছা ফিহা, ধরুন এক দল বিজ্ঞানী একটি নির্দিষ্ট পথের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে চতুর্মাত্রায় পরিবর্তিত করছেন, এখন তাঁদের আমরা আটকাতে পারি, যদি সেই পথে আগেই আমরা একটি চতুর্মাত্রিক জগৎ তৈরি করে রাখি।'

'মাথুর, তোমার কথায় আমি যেন কিসের ইঙ্গিত পাচ্ছি। মাথুর, এসব কী বলছ?'

'আমি ঠিক কথাই বলছি ফিহা। আপনি কি সমাধানটি নিজে এখন একটু পরীক্ষা করবেন?'

ফিহা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি করছি, আমি এক্ষুণি করছি। আর তুমি নিজেও করে দেখ, সুরাকে বল করে দেখতে। সমাধানটি লিখে নাও।'

ফিহা একটির পর একটি সংখ্যা বলে যেতে লাগলেন।

মাথুর এক মনে লিখে চললেন। দু' জনের চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করছে।

সন্ধ্যা হয় নি তখনো, শেষ বিকেলের লালচে আলো গাছের পাতায় চিকচিক করছে। ফিহা বারান্দায় চেয়ার পেতে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বিকাল হলেই তাঁর মনে এক ধরনের বিষণ্ণ অনুভূতি হয়।

নিকি চায়ের পেয়ালা হাতে বাইরে এসে দেখে, ফিহা ভ্রূ কুঁচকে দূরের গাছপালার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাতাসে তাঁর রূপালি চুল তিরতির করে উড়ছে। নিকি কোমল কণ্ঠে ডাকল, 'ফিহা।'

ফিহা চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'নিকি! আমার মনে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা অর্থহীন।'

নিকি কিছু বলল না, চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। ফিহা বললেন, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান তো মানুষের জন্যে, আর একটি মানুষ কতদিন বাঁচে? তার মৃত্যুর সাথে সাথেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সব সম্পর্কের ইতি। ঠিক নয় কি?'

নিকি শক্ত মুখে বলল, 'না ঠিক নয়।' ফিহা চুপ করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। একটু অস্বস্তির সাথে নিকি বলল, 'দেখুন ফিহা, আপনার সাথে তর্ক করা আমার সাজে না। কিন্তু নবম গণিত সম্মেলনে আপনি একটা ভাষণ দিয়েছিলেন--।'

'কী বলেছিলাম আমার মনে নেই।'

'বলেছিলেন, মানব জাতি জন্মমুহূর্তেই একটা অত্যন্ত জটিল অঙ্ক কষতে শুরু করছে। এক-এক যুগে এক-এক দল মানুষ এসেছে, আর সে জটিল অঙ্কের এক একটি ধাপ কষা হয়েছে। অজানা নতুন নতুন জ্ঞান মানুষের ধারণায় এসেছে।'

'বেশ।'

'আপনি বলেছিলেন, একদিন সে অঙ্কটির সমাধান বের হবে। তখন সমস্ত রহস্যই এসে যাবে মানুষের আওতায়। বের হয়ে আসবে মূল রহস্য কী। মানুষের ছুটি হচ্ছে সেই দিন।'

ফিহা বললেন, 'এইসব বড় বড় কথা অর্থহীন নিকি।'

নিকি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এলোমেলোভাবে বসে থাকা ফিহাকে লক্ষ করল। তারপর বলল, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ফিহা?'

'না নিকি, আজ আমার মতো সুস্থ আর কেউ নেই।' একটু থেমে অন্যমনস্ক স্বরে ফিহা বললেন, 'পৃথিবী রক্ষার উপায় বের হয়েছে নিকি। পৃথিবী এবারেও বেঁচে গেল।'

ফিহা বসে বসে সন্ধ্যা মিলান দেখলেন। চাঁদ উঠে আসতে দেখলেন। তাঁর মনে হল, এত ঘনিষ্ঠভাবে প্রকৃতিকে তিনি এর আগে কখনো দেখেন নি। তাঁর কেমন যেন বেদনাবোধ হতে লাগল। যাবতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনে সুপ্ত

বেদনাবোধ জাগিয়ে তোলে কেন কে জানে। এক সময় নিকি ভিতর থেকে ডাকল, 'ফিহা ভিতরে এসে পড়ুন। ভারি ঠাণ্ডা পড়েছে।'

ফিহা নিঃশব্দে উঠে এলেন। চাবি ঘুরিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলে বিরক্ত গলায় বললেন, 'আবার-- আবার এসেছ তুমি?'

ভৌতিক ছায়ামূর্তি অন্ধকারে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। তার হাতে অদ্ভুত একটি সূঁচাল যন্ত্র। সে হতাশাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ফিহা।'

'আমি তখনি ক্ষমা করব, যখন তুমি আমার ঘর ছেড়ে চলে যাবে।'

'কিন্তু ফিহা, আমি ঘর ছেড়ে চলে যেতে আজ আসি নি।'

'তবে কী জন্যে এসেছ?'

'আপনাকে হত্যা করতে।'

ফিহা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'তাতে তোমার লাভ?'

'তাহলেই আমি আমার ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে পারব।'

ফিহা মৃদু গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। কীভাবে হত্যা করবে?'

'আমার কাছে শক্তিশালী রেডিয়েশন গান আছে মহামান্য ফিহা?'

ফিহা জানালা খুলে দিলেন। বাইরের অপরূপ জোছনা ভাসতে ভাসতে ঘরের ভেতর চলে এল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিহা অভিভূতের মতো বললেন, 'দেখ দেখ, কী চমৎকার জোছনা হয়েছে!'

ছায়ামূর্তির রেডিয়েশন গানের অগ্নিঝলক সেই জোছনাকে ম্লান করে দিল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই। আবার সেই উথাল-পাথাল আলো আগের মতোই নীরবে ফুটে রইল।

পরিশিষ্ট

পৃথিবী কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় নি।

সুরার কথা তো আগেই বলেছি। অসাধারণ চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সম্মানসূচক এক লালতারা পেয়েছিলেন খুব কম বয়সেই। শেষ পর্যন্ত তিনিই ফিহার চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

আর সেই স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় অন্ধ যুবকটি? চতুর্মাত্রিক জগতের জীবরা যাকে পাঠাল ফিহাকে হত্যা করবার জন্যে?

না, তার উপর পৃথিবীর মানুষের কোনো রাগ নেই। তার লেখা থেকেই তো মাথুর জানলেন ফিহার চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণটি, যা তিনি ভুল ভেবে ফেলে রেখেছিলেন-- তা ভুল নয়!

আর তার সাহায্যেই তো চতুর্মাত্রিক মহাপ্লাবন রোধ করা গেল।

তারপর কত যুগ কেটে গেছে।

কত নতুন জ্ঞান, নতুন পথ, আপনি এসে ধরা দিয়েছে মানুষের হাতে। এখন শুধু ছুটে চলা, জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে। ফিহার মত নিবেদিত-প্রাণ বিজ্ঞানীরা কতকাল ধরে

অপেক্ষা করে আছেন কবে মানুষ বলবে,

'তোমাদের আত্মত্যাগ মানুষদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তোমাদের সাধনা আমরা ভুলি নি। আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি। আমাদের কাছে কোনো রহস্যই আর রহস্য নয়।'

ঠিক সন্ধ্যাবেলা পুবের আকাশে যে ছোট্ট তারাটি অল্প কিছুক্ষণের জন্যে নীল আলো জ্বেলে আপনিতেই নিভে যায়, পৃথিবীর মানুষ সেটি তৈরি করেছেন ফিহার স্মরণে। সেই কৃত্রিম উপগ্রহটির সিলঝিন[২৩] নির্মিত কক্ষে পরম যত্নে রাখা হয়েছে ফিহার প্রাণহীন দেহ। সে সব কতকাল আগের কথা।

আজও সে উপগ্রহটি ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর চারিদিকে। হিসেব মতো জ্বলে উঠছে মায়াবী নীল আলো। পৃথিবীর মানুষ যেন বলছে, 'ফিহা, তোমাকে আমরা ভুলি নি, আমাদের সমস্ত ভালোবাসা তোমাদের জন্যে। ভালোবাসার নীল আলো সেই জন্যেই তো জ্বেলে রেখেছি।'

নির্ঘন্ট

১। নিওরোন ঃ মস্তিষ্কের যে সব কোষে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে।

২। দ্বৈত অবস্থানবাদ ঃ একই সময়ে একই স্থানে দুটি বস্তুর উপস্থিতির সম্ভাবনা সম্পর্কীয় সূত্র । (কাল্পনিক)

৩. মেমরি সেল ঃ মস্তিষ্কের নিওরোন সেলের অনুকরণে কম্পিউটারে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা তথ্য সংরক্ষণ করার সেল।

৪। ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণ ঃ ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক বস্তুর যোগসূত্র সম্পর্কিত সূত্র. (কাল্পনিক)

৫· টাইফা ঃ তিন লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী একটি গ্রহ. (কাল্পনিক)

৬. এন্ড্রোমিডা ঃ ছায়াপথের মতোই একটি নীহারিকা, যা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী

৭ WGK 166 " একটি সাদা বামন নক্ষত্র: (কাল্পনিক)

৮; সাদা বামন নক্ষত্র ঃ নক্ষত্রের মৃত্যু হওয়ার পূর্বে ক্ষুদ্রকায় অবস্থা। সূর্যও একটি স্তর পার হয়ে ক্ষুদ্রকায় সাদা বামন নক্ষত্রের রূপ নেবে·

৯। সিরান ঃ ঘটনা বর্ণিত সময়ে বিজ্ঞানীদের সম্মানসূচক উপাধি। (কাল্পনিক)

১০। ওমিক্রণ রশ্মি ঃ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং অতি শক্তিশালী বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ, যা অন্তর্নীহারিকাপুঞ্জ যোগাযোগে ব্যবহার করা হয়। (কাল্পনিক)

১১। মাইক্রোফিল্ম ঃ বই ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্যে ক্ষুদ্রকায় ফটো তুলে রাখার পদ্ধতি।

১২। NGC 1303 ঃ দূরবর্তী কোয়াজার। (কাল্পনিক)

১৩ NBP 203 ঃ সাতাত্তর লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জ। (কাল্পনিক)

১৪। প্রোটোপ্লাজম ঃ জীবকোষের জীবন্ত অংশটুকু।

১৫। চতুর্মাত্রিক জগৎ ঃ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, সময়-- এই চারটি মাত্রা নিয়ে গঠিত অদৃশ্য বস্তু। ত্রিমাত্রিক বস্তু যেরূপ চতুর্মাত্রা সময়ে পরিভ্রমণ করে, চতুর্মাত্রিক বস্তু ঠিক সেরূপ পঞ্চম মাত্রায় পরিভ্রমণ করে; (কাল্পনিক)

১৬. ত্রিমাত্রিক জগৎ ঃ দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা নিয়ে গঠিত বস্তু। আমাদের দৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণই ত্রিমাত্রিক।

১৭। গামা রশ্মি ঃ উচ্চ কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ

১৮। প্রতি-পদার্থ ঃ যে বিশেষ ধরনের পদার্থ সাধারণ পদার্থের সংস্পর্শে এসে উভয়েই অদৃশ্য হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়·

১৯। জীন ঃ জীবকোষের যে অংশটুকু প্রাণীদেহে পৈতৃক গুণাবলী বহন করে।

২০। NGK 123 ঃ এক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরবর্তী একটি গ্রহ। (কাল্পনিক)

২১। মহাজাগতিক রশ্মি ঃ মহাজগৎ থেকে নিয়ত যে শক্তিকণা পৃথিবীর বুকে আঘাত করছে।

২২। শক্তিবলয় ঃ ঘটনাবর্ণিত সময়ে মহাজাগতিক রশ্মি ক্ষতিকর রূপ নেয়ার পর পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আয়োনোস্ফিয়ারে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র। (কাল্পনিক)

২৩। সিলঝিন ঃ ১১৯তম ধাতু সিলঝিনিয়াম ও এন্টিনিয়ামের সংমিশ্রণে তৈরি বিশেষ ঘাতসহ সঙ্কর ধাতু. (কাল্পনিক)

তারা তিন জন

১

লী আকাশের দিকে তাকাল।

লী যা করে, অন্য দু' জনও তাই করে। তারাও আকাশের দিকে তাকাল। আকাশের রঙ ঘন হলুদ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে বলেই হলুদ রঙ ক্রমে ক্রমে ঘোলাটে সবুজ বর্ণ ধারণ করছে।

লী হঠাৎ বলল, 'আকাশের বাইরে কী আছে?'

এই প্রশ্ন আগেও অনেক বার করা হয়েছে, তবু প্রতি বারই মনে হয় এই যেন প্রথম বারের মতো করা হল। অয়ু মৃদু স্বরে বলল, 'আকাশের বাইরে আছে আকাশ।'

'তার বাইরে?'

'তার বাইরে আছে আরেকটি আকাশ!'

লী আর প্রশ্ন করল না। আজকাল অয়ু কেমন যেন যুক্তিহীন কথা বলে। আকাশের বাইরে আবার আকাশ কি? লী বলল, 'তোমার শরীর ভালো আছে অয়ু?'

'ভালো।'

'তোমার পা কেমন?'

অয়ু উত্তর দিল না। অর্থাৎ অয়ুর পা ভালো নেই। অথচ একটু আগেই বলেছে শরীর ভালো। কোনো মানে হয় না। যুক্তিহীন কথা।

ঠাণ্ডা বাতাস দিতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে বাতাসের বেগ বাড়বে। সেই সঙ্গে দ্রুত কমতে থাকবে তাপ। মধ্যরাতে চারদিক হবে হিমশীতল। লী বলল, 'চল এবার যাওয়া যাক।'

তারা দু' জন কথা বলল না। দু' জনেই তখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। লী আবার বলল, 'চল আমরা নেমে পড়ি।'

'কোথায়? আমরা কোথায় যাব?'

উত্তর দিয়েছে নীম। লী লক্ষ করল নীমের কথাবার্তার ধরন হতাশাগ্রস্তের মতন। এটি ভালো লক্ষণ নয়। তাদের সঙ্গে আরো এক জন ছিল। সেও এরকম কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিল। এ সব খুব খারাপ লক্ষণ। লী কঠিন স্বরে বলল, 'নীম, তুমি একটু আগে বলেছ, আমরা কোথায় যাব?'

'হ্যাঁ বলেছি।'

'তুমি কি যেতে চাও না কোথাও?'

'না।'

'কেন না?'

'কোথায় যাব বল?'

তা ঠিক। খুবই ঠিক। যাওয়ার জায়গা কোথায়? যেখানেই যাওয়া যাক, সেই একই দৃশ্য। প্রকাণ্ড সব দৈত্যাকৃতি হিমশীতল পাথর। ঘন কৃষ্ণবর্ণ বালুকারাশি। যে দিকে যত দূর যাওয়া যায়--একই ছবি। তারা তিন জন প্রতিটি পাথরের অবস্থান নিখুঁতভাবে জানে। তারা জানে, ঠিক কোথায় বালির ঘন কালো রঙ হালকা গেরুয়া হয়েছে।

লী বলল, 'চল আমরা আরেকবার সেই ঘরটি দেখে আসি।' অয়ু এবং নীম উত্তর দিল না। লী বলল, 'এখন রওনা হলে সকালের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব।'

'সেই ঘরটি আমরা ছয় লক্ষ নয় শ' এগার বার দেখেছি।'

'আরেক বার দেখব। ছয় লক্ষ নয় শ' বারো বার হবে।'

অয়ু বলল, 'আমি যেতে চাই না। আমার পা'টিতে কোনো অনুভূতি নেই। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা যাও।'

'তুমি কী করবে?'

'আমি বসে থাকব এখানে। তোমরা আমাকে একটি সমস্যা দিয়ে যাও। আমি সেই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করব। বেশ একটি জটিল সমস্যা দিয়ে যাও।'

'তোমাকে একা ফেলে যাব?'

'হ্যাঁ, এটি ভালোই হবে। আমি আশা করে থাকব, তোমরা হয়তো নতুন কোনো খবর নিয়ে আসবে। আশায় আশায় সময় ভালো কাটবে।'

নীম বলল, 'তোমার পায়ের ব্যথা কি অনেক বেড়েছে?'

অয়ু জবাব দিল না।

লী এবং নীম ঠাণ্ডা পাথরের গা বেয়ে নিচে নেমে এল। তারা অয়ুকে একটি সমস্যা দিয়ে এসেছে। সমস্যাটি হচ্ছে-- 'আমাদের সঙ্গে সেই ঘরটির সম্পর্ক কী?'

অয়ু ভাবতে শুরু করল। তার পায়ের ব্যথা ক্রমেই বাড়ছে। ব্যথা ভুলতে হলে সমস্যাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে। অয়ু আরাম করে বসতে চেষ্টা করল। সে তার এগারোটি পা লম্বালম্বি করে চারদিকে ছড়িয়ে দিল। মাথার দু'পাশের চারটি "লুখ" ঢুকিয়ে নিল শরীরের ভেতর। এখন "লুখ"গুলির আর প্রয়োজন নেই। অয়ু কোনো শব্দ শুনতে চায় না। চারদিকে থাকুক সীমাহীন নিস্তব্ধতা। শব্দে চিন্তার ব্যাঘাত হবে। অয়ু ভাবতে শুরু করল।

'ঘর সব মিলিয়ে ছ'টি। ছ'টি ঘরই প্রকান্ড, প্রায় আকাশছোঁয়া। এই ছয়ের সঙ্গে কি আমাদের কোনো যোগ আছে? আমাদের পা এগারোটি। প্রতিটি পায়ে তিনটি করে আঙুল, মোট সংখ্যা তেত্রিশ। তিনটি কর্মী–পায়ে আছে একটি করে বাড়তি আঙুল-- সর্বমোট ছত্রিশ। তার বর্গমূল হচ্ছে ছয়। না, এই মিলটি চেষ্টাকৃত। এদিকে না ভাবাই উচিত। তাহলে ভাবা যাক, এই ঘরগুলি কি আমাদের জন্যে তৈরি হয়েছে? উত্তর হচ্ছে ''না''। এত প্রকান্ড ঘর আমাদের জন্যে হতে পারে না। কারণ এই ঘরগুলির ভেতর দীর্ঘ সময় থাকা যায় না। অন্ধকার ঘর। অন্ধকারে আমরা থাকতে পারি না। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে আলো দরকার। তার উপর ঘরের মেঝেগুলি অসম্ভব মসৃণ। মসৃণ মেঝেতে আমরা চলাফেরা করতে পারি না। এই ঘর আমাদের জন্যে তৈরি হলে মেঝে হত খসখসে।'

অয়ু হঠাৎ অন্য একটি জিনিস ভাবতে বসল। সে দেখেছে, কোনো একটি জটিল সমস্যা নিয়ে ভাববার সময় হঠাৎ করে অন্য কিছু ভাবলে ফল খুব ভালো হয়। আবার সমস্যাটিতে ফিরে গেলে অনেক নতুন যুক্তি আসে মাথায়। অয়ু ভাবতে লাগল, আকাশের কোনো সীমা আছে কি? প্রতিটি জিনিসের সীমা আছে। পাথরগুলির সীমা আছে। ঘরগুলির সীমা আছে। ধূলিকণার সীমা আছে। কাজেই আকাশের একটি সীমা থাকা উচিত। এই যুক্তির ভেতর দুর্বলতা কী কী আছে? প্রথম দুর্বলতা, যে-সব জিনিসের সীমা আছে, তাদের স্পর্শ করা যায়। কিন্তু আকাশ স্পর্শ করা যায় না। তাহলে যে-সব জিনিস স্পর্শ করা যায় না, সে-সব কি সীমাহীন? একটি জটিল সমস্যা। তিন জন এক সঙ্গে বসে ভাবতে হবে। অয়ু আবার ফিরে গেল ঘরের সমস্যায়। ঘরগুলির সঙ্গে তাদের সত্যি কি কোনো সম্পর্ক আছে?

ঘরগুলি তৈরি হয়েছে এমন সব বস্তু দিয়ে, যা এখানে পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারটিতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই একটি জিনিস তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করেছে। ঘরের কম্পনমাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি অত্যন্ত রহস্যময়। যে জিনিসগুলি এখানে আছে, তাদের কম্পনমাত্রা এখানকার মতোই হওয়া উচিত। কিন্তু ঘরগুলি অন্য রকম। রহস্য! বিরাট রহস্য! অয়ু নিজের পায়ের যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল। তাপমাত্রা যে অসম্ভব নিচে নেমে গেছে, তাও ঠিক বুঝতে পারল না। কোনো একটি রহস্যময় সমস্যা নিয়ে ভাবার মতো আনন্দ আর কিসে হতে পারে?

কিন্তু অয়ু বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না। আচমকা সে সমস্ত শরীরে একটি তীব্র কম্পন অনুভব করল। যেন একটি শক্তিশালী আলো হঠাৎ তার শরীরে এসে পড়ছে। অয়ু চোখ মেলে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। ঘরগুলির মতোই প্রকান্ড কোনো একটি জিনিস আকাশ থেকে নেমে আসছে। অয়ু দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করল। দ্রুত ভাবতে হবে। অত্যন্ত দ্রুত। অয়ুর মাথার দু'পাশের চারটি "লুখ" বেরিয়ে মাথার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। জিনিসটির কম্পনমাত্রা জানতে হবে। অয়ু দিশাহারা হয়ে গেল। জিনিসটির কম্পন নেই। এটা হতে পারে না। এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। সব জিনিসের কম্পন আছে। তার কম্পনও থাকতে হবে।

দ্রুত ভাবতে হবে। দ্রুত। জিনিসটির মধ্যে আছে অকথনীয় শক্তি। কারণ তার উপস্থিতির জন্যে যে পাথরটির উপর অয়ু বসে আছে, তার কম্পনমাত্রা বেড়ে গেছে। এ রকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার কী করে হয়! অয়ু বলল, 'কে, তুমি কে?'

উত্তর নেই। অয়ু আবার বলল, 'আমার নাম অয়ু। আমরা তিন জন এখানে থাকি। তুমি কে?'

জিনিসটি আকাশের গায়ে স্থির হয়ে আছে।

'কম্পনহীন শক্তির আধার। তুমি আমার কথার জবাব দাও।'

জবাব নেই। কোনো জবাব নেই। অয়ু লক্ষ করল, জিনিসটি থেকে দুটি তীব্র আলোকবিন্দু এসে পড়েছে নিচে। আলোকবিন্দু দুটি নড়াচড়া করছে।

'দয়া করে আমার কথার জবাব দাও। প্রতিদানে আমি তোমাদের সমস্যার জন্যে ভাবতে বসব।'

জবাব পাওয়া গেল না। অয়ু দেখল, প্রকান্ড সেই জিনিসটি থেকে একটি ছোট্ট কিছু দ্রুত নিচে নেমে আসছে। যে জিনিসটি আসছে তার কম্পন আছে। অয়ু ভালো করে দেখবার জন্যে পাথরের গা বেয়ে নেমে এল। জিনিসটির কম্পনমাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানকার সঙ্গে মিল নেই। ঘরগুলির সঙ্গে মিল নেই।

মহাশূন্যযান থেকে যে স্কাউটশিপ গ্রহটিতে নেমে এল তার আরোহী দু' জন অবাক হয়ে মন্তব্য করল—'এটা কেমন জায়গা? কী কুৎসিত! এই সব জায়গায় স্কাউটশিপ পাঠান অর্থহীন। শক্তি ও সম্পদের নিদারুণ অপচয়।'

২

স্কাউটশিপের এনথ্রোমিটারের কাঁটাটি লাল ঘরে। যার অর্থ—এ গ্রহে মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। শুধু মানুষ নয়, অক্সিজেননির্ভর কোনো প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এখানে বাতাসে আছে মিথেন এবং হাইড্রোজেন। খুব অল্প মাত্রায়

হাইড্রোজেন সালফাইড। কোথাও কোনো পানির চিহ্ন নেই। বাতাসে অতি সূক্ষ্ম বেরিলিয়াম কণা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটিও বিচিত্র।

গ্রহটির ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে তথ্যাবলী মহাকাশযানের ভূতত্ত্ব বিভাগের কম্পিউটারে আসতে শুরু করেছে। কম্পিউটার রিপোর্ট পাওয়ার পরই স্কাউটশিপটি মাটিতে নামবে। রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ঠিক করা হবে স্কাউটশিপটির অবতরণের জায়গা। ঠিক করা হবে শিপটির চারপাশে শক্তিবলয় থাকবে কি না। স্কাউটশিপে শক্তিবলয় তৈরি করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। পারতপক্ষে তা করা হয় না।

স্কাউটশিপটি ভূমি স্পর্শ করবার আগে আগে কম্পিউটার থেকে বলা হল শক্তিবলয় তৈরি করতে। জনি বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল, 'হঠাৎ করে শক্তিবলয় তৈরি করতে হবে কেন?' কম্পিউটার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'তোমরা যে জায়গায় নেমেছ, সেখানে অত্যন্ত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিয়েশন হচ্ছে। এর কারণ আমার এই মুহূর্তে জানা নেই। সে জন্যেই এই সাবধানতা।'

মহাকাশযানের এই কম্পিউটারটি পুরুষকণ্ঠে কথা বলে। গলার স্বর কর্কশ। সাধারণত কম্পিউটারগুলি কথা বলে মেয়েদের গলায়--মিষ্টি স্বরে। কিন্তু গ্যালাকটিক মহাকাশযানগুলির জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা। সেখানে কম্পিউটারগুলি কথা বলে গম্ভীর সুরে-- যেন ৫০ বছর বয়সী অঙ্কের প্রফেসর কথা বলছেন। কারণ সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক। গ্যালাকটিক মহাকাশযানগুলি দীর্ঘ সময় মহাশূন্যে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য বার কম্পিউটারকে এমন সব সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা ক্রু মেম্বারদের মতের সঙ্গে মেলে না। কম্পিউটারের ভারি আওয়াজ তখন প্রভাব ফেলে। মেয়েলি গলার মিষ্টি কথা যত সহজে অগ্রাহ্য করা যায়, একটি বৃদ্ধের গম্ভীর গলার আওয়াজ তত সহজে করা যায় না।

জনি বলল, 'কম্পিউটার সিডিসি। বায়ুর চাপ কেমন?'

'১·৫ এ্যাটমোসফিয়ার খুব বেশি নয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ০·৮৭ G, তোমাদের কোনো বিশেষ ধরনের স্পেস স্যুট পরতে হবে না। স্কাউটশিপে যা আছে তাতেই চলবে।'

'কোনো প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে?'

'এটি একটি মৃত জগৎ। কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই।'

'তুমি কি নিশ্চিত?'

'জীববিদ্যা বিভাগ আমাকে যে-সব তথ্য দিয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে, কার্বন বা সিলিকনভিত্তিক কোনো প্রাণের সৃষ্টি হয় নি।'

'উদ্ভিদ?'

'উদ্ভিদ নেই। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নেই, যা খানিকটা নিশ্চিতভাবেই বলে, উদ্ভিদ বা প্রাথমিক স্তরের কোনো জীব এখানে নেই।'

'তাহলে আমরা এখানে যাচ্ছি কী জন্যে?

'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।'

'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তো আমরা মহাকাশযানে বসে থেকেই মেটাতে পারতাম। এখানে আমার নামার প্রয়োজন কি?'

'তোমার কি এখানে নামতে ভয় করছে?'

জনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'না।' কোনো একটি বিচিত্র কারণে তার সত্যি সত্যি ভয় করছিল। স্কাউটশিপটি অবতরণের জায়গা থেকে প্রায় সাত শ' ফুট উপরে স্থির হয়ে আছে। শক্তিবলয় তৈরি হতে সময় লাগবে। ততক্ষণ জনির চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই। সে ডায়াল ঘুরিয়ে মহাকাশযানের অধিনায়ক কিম দুয়েন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল।

'হ্যালো কিম দুয়েন।'

'হ্যালো জনি।'

'কতক্ষণ লাগবে শক্তিবলয় তৈরি হতে?'

'নির্ভর করে কী ধরনের শক্তিবলয়, তার উপর।'

'প্রায় দু ঘন্টা ধরে বসে আছি আমি। এত দেরি হচ্ছে কেন?'

'3M শক্তির বলয় তৈরি হচ্ছে, এতে সময় লাগে জনি। তুমি কি আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ বলব। আমার সঙ্গে আরো এক জন কারোর থাকা দরকার।'

'কি ব্যাপার জনি, একা-একা ভয় লাগছে?'

'ভয়ের প্রশ্ন নয়। প্রথম অবতরণ কখনো একা না করার নির্দেশ আছে।'

'তুমি একা নামছ না। তোমার সঙ্গে আছে L2H2.'

'কিম দুয়েন, এটি তো একটা রোবট।'

'রোবট হলেও এতে একটি সিডিসি কম্পিউটার মস্তিষ্ক আছে। নয় কি?'

'হ্যাঁ, তা আছে।'

'তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন?'

'ভয় পাচ্ছি, এমন কথা তো বলি নি।'

'বলার অপেক্ষা রাখে না জনি। আমাদের এখানে আমরা তোমার হার্টবিট এবং ব্লাডপ্রেসার মাপতে পারছি।'

কিম দুয়েন ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে হেসে উঠল। জনি চুপ করে রইল।

'হ্যালো জনি, ঠিক এই মুহূর্তে তোমার ব্লাডপ্রেসার কত জানতে চাও?'

জনি ডায়াল-সুইচ অফ করে দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তার ভয় করছে ঠিকই, কিন্তু তার পেছনে কারণ আছে। মুশকিল হচ্ছে, কারণটি কাউকে বলা যাচ্ছে না। বলামাত্রই একটি মেডিকেল টিম বসবে। এক জন সাইকিয়াট্রিস্টকে বলা হবে--জনি কুলম্যান, ক্রু নাম্বার তিনশ'; ভূতত্ত্ববিদ ও স্কাউট অভিযাত্রীর উপর

একটি পূর্ণ মেডিকেল রিপোর্ট লিখতে। এসব হতে দেয়া যায় না।

'জনি।'

জনি কুলম্যান দেখল, সিডিসি রোবটটির মস্তিষ্ক চালু করা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে শক্তিবলয় তৈরি শেষ হয়েছে, স্কাউটশিপ এখন নিচে নেমে যাবে। জনি কুলম্যান রবটটির দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল,

'হ্যালো সিডিসি।'

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ জনি? তোমার হার্টবিট স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি মনে হচ্ছে।'

জনি শান্ত স্বরে বলল, 'আমি ভয় পাচ্ছি।'

'কারণটি কি আমি জানতে পারি?'

'জানতে পার। যেহেতু তুমি যাচ্ছ আমার সঙ্গে, সেহেতু তোমাকে আমার বলা উচিত।'

'বল। আমি শুনছি।'

'স্কাউটশিপে নিচে নামার সময় আমার মনে হল, এক জন কেউ যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'হুঁ।'

'সেটির একটি ছবিও যেন আমার মনে এল।'

'ছবিটি কি রকম?'

'কুৎসিত। জিনিসটির অনেকগুলি পা আছে।'

'তুমি দেখতে পেলে জিনিসটিকে?'

'না। ছবিটি আমার মনে হল।'

'আর কি জান জিনিসটি সম্পর্কে?'

'ওর নাম জানি।'

'নামটিও তোমার মনে হল?'

'হ্যাঁ।'

'কী নাম?'

'অয়ু।'

স্কাউটশিপটি ভূমি স্পর্শ করামাত্র সিডিসি বলল, 'তুমি মহাকাশযানে ফিরে যাবার পর অবশ্যই এক জন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে দেখা করবে।' জনি কথা বলল না। সিডিসি বলল, 'তুমি রাগ করলে না তো আবার? তোমরা মানুষরা অকারণেই রাগ কর।' জনি চুপ করে রইল।

মহাকাশযান সময় ১৪টা ৩০ মিনিটে তারা দু' জন স্কাউটশিপ থেকে বের হয়ে এল। প্রকাণ্ড সব পাথরে ঢাকা ঘন কৃষ্ণবর্ণের ধূলিকণা চারদিকে। একটি মৃত পৃথিবী; কঠিন এবং কিছু পরিমাণে ভয়ংকর।

জনি স্কাউটশিপকে পেছনে ফেলে পঁচিশ গজের মতো। এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটি সবুজাভ পাথরের আড়াল থেকে এটি কী বের হয়ে আসছে? স্পেস-স্যুটের আরামদায়ক শীতলতার মধ্যেও তার কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম জমল।

জিনিসটি কুৎসিত। এগারোটি পা মাকড়শার মতো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। শরীরের তুলনায় প্রকান্ড একটি মাথা। মাথার দু'পাশে গাছের ঘন শিকড়ের মতো কী যেন বের হয়ে আছে, যেগুলি সারাক্ষণই এদিক-ওদিক নড়ছে। জিনিসটির কোনো চোখ নেই, মুখ নেই। গায়ের বর্ণ ধূসর নীল। জনি কুলম্যান জরুরী সুইচ টিপল। 'হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো মহাকাশযান গ্যালাক্সি-ওয়ান। হ্যালো। সিডিসি, সিডিসি। হ্যালো সিডিসি।'

জনি তার ডান হাতের আণবিক ব্লাস্ট প্রোয়ার কার্যকর করে জিনিসটির দিকে তাকাল, যেটি প্রায় এক শ' গজ দূরে পা ছড়িয়ে বসে আছে। মাথার দু'পাশের শিকড়ের মতো জিনিসগুলি ঘূর্ণায়মান গতিতে অতি দ্রুত ঘুরছে। জনি কুলম্যান কুল-কুল করে ঘামতে লাগল।

৩

এ রকম অসম্ভব ঘটনাও ঘটে।

অয়ু সমগ্র ব্যাপারটি চোখের সামনে ঘটতে দেখল। প্রকান্ড বড় জিনিস থেকে ছোট্ট জিনিসটি নেমে এল মাটিতে। তার মধ্যে দু'টি কী যেন বসে আছে। তারা কে? দু' জনের কম্পনাঙ্ক দু' রকম। এক জনের মধ্যে—আরে একি! অয়ুর মনে হল একজনের সমস্ত চিন্তাভাবনা সে বুঝতে পারছে।

এতে অবাক হবার কিছু নেই, অয়ু লী বা নীম দু' জনের মনের কথাই বুঝতে পারে। কিন্তু যে জিনিসটির কথা সে বুঝতে পারছে, সে জিনিসটি অয়ু বা লীর মতো নয়। ওর একটি নাম আছে, 'জনি কুলম্যান'-- অদ্ভুত নাম। জনি কুলম্যান অসম্ভব ভয় পাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে কেন? ছোট্ট ঘর থেকে ভয়েভয়ে নামছে। তার সঙ্গে যে আছে, তার মনের কথা অয়ু কিছুই বুঝতে পারছে না। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, ঐটির মধ্যে আবার অসংখ্য তরঙ্গ। তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য একেকটি একেক রকম। ওর নাম কি অয়ু বুঝতে পারছে না। তবে বুঝতে পারছে, তার সঙ্গে আকাশের মহাকাশযানটির সম্পর্ক আছে। অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে সম্পর্কটি রাখা হচ্ছে সর্বক্ষণ। অন্য লোকটি, যার নাম জনি কুলম্যান, সেও মাঝে মাঝে মহাকাশযানটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে। তবে তা রাখা হচ্ছে অনেক বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ দিয়ে। অর্থাৎ সে কথা বলছে। কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবে অয়ু যদি বেশ কিছু সময় এই সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে বুঝতে পারবে। ইস্,

লী আর নীম যদি থাকত, তাহলে নিমিষের মধ্যে সমস্যাটির সমাধান হত।

অয়ু মন দিল জনি কুলম্যানের দিকে--এত ভয় পাচ্ছে কেন? কী যেন বলল অন্যটিকে। হাঁটছে সামনের দিকে। হাতে এটি কী? অয়ু ভাবতে লাগল। পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেমন যেন অস্পষ্ট। অয়ু তার 'লুখ'গুলি ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল। যে 'লুখ' তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বুঝতে পারে, সেটিকে বিভিন্ন তরঙ্গমাত্রায় দোলাতে শুরু করল। হ্যাঁ, এইবার বুঝতে পারা যাচ্ছে। জনি কুলম্যান এক জন ভূতত্ত্ববিদ। মাটি সম্পর্কে জানে। মাটি কী? জনি কুলম্যান পাথরগুলি সম্পর্কে ভাবছে: পাথরগুলি সিলিকা ও এলুমিনিয়মের, তার মধ্যে আছে অক্সাইড। সিলিকা কী, এলুমিনিয়াম কি, আবার কপার অক্সাইডই-বা কী? কপার অক্সাইড দেখে জনি কুলম্যান অবাক। কারণ এখানে অক্সিজেন নেই। অক্সিজেন না থাকলে কপার অক্সাইড থাকবে না কেন? এই দু'টির মধ্যে সম্পর্ক কী? আহ্, এই জনি কুলম্যান কত সুখী। কত রকম সমস্যা আছে তার মাথায়। নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে ভাবছে। তাদের মতো না, একই সমস্যা নিয়ে তাদের মতো ভাবতে হয় না। আচ্ছা, ঐ জনি কুলম্যান কি বলতে পারবে আকাশের বাইরে কী আছে? নিশ্চয়ই পারবে, কারণ তারা এসেছে আকাশের বাইরে থেকে।

অয়ু হঠাৎ পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। তার প্রকাণ্ড শরীরটিকে অতি দ্রুত নিয়ে এল জনি কুলম্যানের সামনে। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল সেখানে।

'জনি কুলম্যান, আমাদের তিন বন্ধুর তরফ থেকে তোমাকে জানাচ্ছি অভিনন্দন।'

জনি প্রথম খানিকক্ষণ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। এ সব কি সত্যি, না স্বপ্ন! জনির মাথা ঝিমঝিম করছে। বুক-মুখ শুকিয়ে কাঠ। সিডিসির গলা শোনা গেল,

'জনি, ভয় পেও না, আমার হাতে আণবিক ব্লাস্টার আছে। ব্লাস্টার চালু করেছি।'

'সিডিসি, ওটি কী?'

'একটি প্রাণী নিঃসন্দেহে। প্রাণীটি লক্ষ করছে আমাদের। তুমি নড়াচড়া করবে না, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানে দাঁড়িয়ে থাক।'

'সিডিসি, অপেক্ষা করছ কেন? আণবিক ব্লাস্টারের সুইচ টিপে দাও।'

'তুমি নার্ভাস হবে না। তোমার দিকে এগোলেই আমি ব্যবস্থা করব। আমি প্রাণীটির ছবি তুলব প্রথম। মহাকাশযান থেকে আরেকটি টীম আসছে। ওরা প্রাণীটিকে ধরার চেষ্টা করবে।'

জনি খানিকটা সম্বিত ফিরে পেল। খুব সাবধানে--যাতে প্রাণীটির দৃষ্টি আকর্ষিত না হয়-- যোগাযোগ-সুইচ টিপল। ক্যাপ্টেনের গলা ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে,

'হ্যালো জনি, আমরা সব কিছু লক্ষ করছি। জীববিজ্ঞানীদের টীম নেমে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে।'

'কি করব আমি, মেরে ফেলব প্রাণীটিকে?'

'কী বলছ পাগলের মতো, জীবন্ত ধরতে হবে প্রাণীটিকে। এ রকম অদ্ভুত প্রাণী এর আগে কখনো পাওয়া যায় নি। জীববিজ্ঞানীরা খুবই অবাক।'

জনি কুলম্যান দেখল, প্রাণীটি আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তার মনে হল, প্রাণীটি বলছে--আমাকে ভয় করার কিছুই নেই।

রোবট সিডিসি এক হাতে আণবিক ব্লাস্টার ধরে রেখেই অন্য হাতে বেশ কয়েকটি কাজ করল। প্রাণীটির ছবি মহাকাশযানে রিলে করার ব্যবস্থা করল। একটি সার্ভেয়ার সিস্টেম চালু করল, যাতে অন্য যে কোনো দিক থেকে এই জাতীয় কোনো প্রাণী পাঁচ শ' গজের ভেতরে এলে আগে থেকেই টের পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্কাউটশিপটি কোথায় নামবে, তাও তাকেই বের করতে হচ্ছে। সবচে ভালো হতো যদি প্রাণীটির পেছনে নামতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। জায়গাটি প্রকান্ড সব পাথরে ভর্তি। নামতে হবে প্রথম স্কাউটশিপটির কাছেই। ব্যাপারটি বিপজ্জনক। প্রাণীটি দ্বিতীয় স্কাউটশিপ দেখে ভয় পেয়ে জনিকে আক্রমণ করে বসতে পারে।

আক্রমণের ধারা কী হবে কে জানে। জন্তুটি মনে হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক। স্বভাবতই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতটা দূর থেকে তা সম্ভব হবে না। তাকে আরো কাছে এগিয়ে আসতে হবে। সেক্ষেত্রে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে হাতে। আক্রমণের অন্য ধারায় এ হয়তো দূর থেকেই বিষ জাতীয় কিছু ছুঁড়ে ফেলবে। তা হলে ভয়ের কিছু নেই, জনির স্পেস-স্যুট আছে।

দ্বিতীয় স্কাউটশিপে ছিল টাইটেনিয়াম ইরিডিয়ামের তৈরি একটি প্রকান্ড খাঁচা। খাঁচাটি আনা হচ্ছে প্রাণীটাকে বন্দী করার জন্যে। ডঃ জন ফেন্ডার (প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রধান) এবং মহাকাশযানের সিকিউরিটি বিভাগের এক জন অফিসার খাঁচাটাকে নিয়ে আসছে।

ডঃ জন ফেন্ডারের মুখ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ, এই অদ্ভুত প্রাণীটির এখানে থাকার কথা নয়। তবু সে আছে। তার মানে সে একা নয়, আরো অনেকেই নিশ্চয় আছে। কিন্তু এরা খায় কি? এই ঊষর গ্রহে এদের জন্যে কোনো খাদ্য থাকার কথা নয়।

ডঃ জন ফেন্ডার অন্য আরেকটি কারণেও যথেষ্ট বিব্রত। তার মনে হচ্ছে প্রাণীটি বুদ্ধিমান। এ রকম মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমত, এই অবস্থাতে যে কোনো প্রাণীই পালিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করত, এটি তা করছে না, নিজ থেকে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আক্রমণ করছে না, বরং দূরে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহের সঙ্গে সব কিছু লক্ষ করছে। ডঃ ফেন্ডার লক্ষ করেছে, প্রাণীটির সমস্ত মনোযোগ

জনির দিকে। মাঝে মাঝে সে অবশ্যি তাকাচ্ছে রোবটটির দিকে। তাও খুব অল্প সময়ের জন্যে। তাহলে সে কি বুঝতে পারছে, রোবটটি একটি যান্ত্রিক মানুষ?

ডঃ জন ফেন্ডারের উদ্বেগ আরো বাড়ল, যখন সেন্ট্রাল কম্পিউটার থেকে হঠাৎ বলা হল-- প্রাণীটির গা থেকে বিটা রেডিয়েশন হচ্ছে। জন ফেন্ডার অবাক হয়ে বলল, 'তা কী করে হচ্ছে!'

'কী করে হচ্ছে, তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না, তবে হচ্ছে।'

'আরো কিছু আছে?'

'আছে, তবে তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা ঠিক হবে না।'

'ঠিক না হলেও বলে ফেল।'

'প্রাণীটির শরীরে একটি চৌম্বক শক্তি থাকার সম্ভাবনা আছে।'

'নিশ্চিতভাবে কখন জানা যাবে?'

'যখন প্রাণীটি এগিয়ে আসবে।'

জন ফেন্ডার শুকনো মুখে বলল, 'চৌম্বক শক্তিটি কি শক্তিশালী?'

'যথেষ্ট শক্তিশালী।'

জন ফেন্ডার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার কি মনে হয় প্রাণীটি বুদ্ধিমান?'

সিডিসি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'প্রাণীটি বুদ্ধিমান হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। তবে যে-সব তথ্য আমার কাছে আছে, তা থেকে এই মুহূর্তে কিছু বলা ঠিক হবে না।'

মহাকাশযান সময় ১৫/৩৫ মিনিটে দ্বিতীয় স্কাউটশিপটি নামল। জন্তুটি লাফিয়েও উঠল না, বা ভয় পেয়ে পালিয়েও গেল না। স্কাউটশিপ থেকে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জন ফেন্ডারের মনে হল-- 'প্রাণীটির নাম অয়ু, প্রাণীটির আরো দুটি বন্ধু আছে। একজনের নাম লী, অন্যজনের নাম নীম। এরা তিন জন ছাড়া এই গ্রহে অন্য কোনো প্রাণী নেই।'

এই রকম মনে হওয়ার পেছনে কোনো কারণ নেই। তবু জন ফেন্ডারের মনে হল, এ সব তথ্যের প্রতিটিই সত্য। জন ফেন্ডার কাঁপা গলায় বলল, 'হ্যালো জনি, ঐ জন্তুটির নাম অয়ু নাকি?'

'হ্যাঁ, ওর নাম অয়ু।'

জন ফেন্ডার গম্ভীর হয়ে বলল, 'কী করে জানলে ওর নাম অয়ু। কথা বলেছ নাকি ওর সঙ্গে?'

'না, কথা বলি নি।'

'কথা না বলেই বুঝতে পারলে?'

জনি থেমে থেমে বলল, 'তা পারলাম এবং আমার মনে হয় তুমিও বুঝতে পেরেছ।'

জন ফেন্ডার গম্ভীর হয়ে বলল, 'ব্যাপার কি জনি?'

'ব্যাপার তো তোমারই জানার কথা। তুমি জীববিজ্ঞানের লোক।'

'তা ঠিক। তা ঠিক।'

জন ফেন্ডারম্যান স্কাউটশিপ থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেল প্রাণীটির দিকে, তারপর স্পষ্ট স্বরে বলল,

'হ্যালো অয়ু।'

৪

লী ও নীম নিঃশব্দে হাঁটছিল।

হাঁটবার সময় এরা সচরাচর কথা বলে না। লুখগুলি শরীরের ভেতর লুকান থাকে। নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া বের করে না।

সকালবেলার দিকে তারা ঘরগুলির সামনে এসে দাঁড়াল। ঝড় নেই। শান্ত ভাব চারদিকে। লী বলল,

'আজ কোন ঘরটির ভেতর প্রথম ঢুকবে?'

নীম জবাব না দিয়ে প্রথম ঘরটির ভেতর ঢুকে পড়ল। এই ঘরটি সবচে উঁচু। প্রায় আকাশছোঁয়া। লী বেশ অবাক হল। তারা কখনও একা-একা কোথায়ও যায় না। আজ নীম এ রকম করল কেন? লী ডাকল, নীম, নীম।'

নীম সাড়াশব্দ করল না। লী খানিকক্ষণ ইতস্তত করে প্রথম ঘরটির ভেতরে ঢুকল। আশ্চর্য, এই প্রকান্ড হলঘরের কোথায়ও নীম নেই। তাহলে সে কি দ্বিতীয় ঘরে চলে গেছে? দ্বিতীয় ঘরেও তাকে পাওয়া গেল না। শুধু তাই নয়, ছ'টি ঘরের কোনোটিতেই নীম নেই।

লী অবশ্য অনায়াসে তাকে খুঁজে বের করতে পারে। লুখগুলি বের করে রাখলেই জানা যাবে কোথায় লুকিয়ে আছে নীম। কিন্তু লীর ইচ্ছা করছে না। নীম এ রকম করল কেন?

লী ঘরের বাইরে এসে পা ছড়িয়ে বসে থাকল। তার কিছুই ভালো লাগছে না। ক্লান্তি লাগছে। এ রকম করল কেন নীম? কত দীর্ঘকাল তারা একসঙ্গে আছে। সেই কবেকার কথা, অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। মা ছিলেন বেঁচে। মায়ের চারপাশে তারা ঘুরঘুর করত। মা বলতেন,

'আমার লক্ষ্মী সোনারা, তোমরা সবাই একসাথে থাকবে। একা-একা যাবে না কোথাও।'

নীম চোখ ঘুরিয়ে বলত, 'একা-একা গেলে কী হয়?'

'একা-একা থাকলে অনেক ঝামেলা হতে পারে। যদি একসঙ্গে থাক, তাহলে তোমাদের তিনজনের 'লুখ' একসঙ্গে থাকবে। যদি তারা এক মাত্রায় কাঁপে, তাহলে

তোমরা অনেক কিছু করতে পারবে। আমাদের 'লুখ' মহা শক্তিশালী।'

'কী করে কাঁপবে এক সঙ্গে?'

'তোমাদের নিজেদেরই তা শিখতে হবে। আমার লুখ নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তোমাদের কিছু শেখাতে পারব না।'

শুধু লুখ নয়, অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁর। মা চোখে দেখতেন না, হাঁটতে পারতেন না। তবু যে কত দিন বেঁচে ছিলেন, তাদের কত কিছুই না শেখাতেন। প্রথম শেখালেন কী করে সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হয়।

'প্রথমে লুখগুলি শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলবে, তারপর কোনো একটি জায়গায়, যেখানে প্রচুর আলো আছে, সেখানে পা ছড়িয়ে ভাবতে বসবে! এক জন কি ভাবছে অন্য জন তা বুঝতে চেষ্টা করবে না।'

'বুঝতে চেষ্টা করলে কী হয়?'

'ঠিকমতো ভাবা যায় না।'

তাদের প্রথম সমস্যা দিলেন মা। সমস্যাটি অদ্ভুত--'আমরা কে? কোথেকে এসেছি?' দিনের পর দিন এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে লাগল তারা। প্রথম মুখ খুলল অয়ু। সে বলল,

'আমরা বুদ্ধিমান একটি প্রাণী।'

মা বললেন,

'প্রাণী কি?'

'যারা ভাবতে পারে তারাই প্রাণী।'

'আমরা কোথেকে এসেছি?'

'আমরা কোনো জায়গা থেকে আসি নি। এখানেই ছিলাম।'

মা দুঃখিত হয়ে বললেন,

'তোমরা এখনো ভাবতে শেখ নি। ভাবনাতে যুক্তি নেই তোমাদের।'

ক্রমে ক্রমে তারা ভাবতে শিখল। কত অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যাই--না মা দিতেন-- (১) আলো আমাদের কাছে এত প্রিয় কেন? কেন আমরা আলো ছাড়া ভাবতে পারি না? (২) কেন ঘরগুলির কাছে আমাদের যেতে মানা?

তখনো তারা ঘরগুলি দেখে নি, শুধু মায়ের কাছে শুনেছে। দু'টি ঘর আছে আকাশছোঁয়া। সে ঘরের কাছে যেতে মানা। কেন মানা? মা তা বলবেন না। ভেবে বের করতে হবে।

যেদিন মায়ের শরীর একটু ভালো থাকত, সেদিনই নতুন কিছু বলতেন। একদিন তারা গুনতে শিখল। শেখামাত্রই মা একটি সমস্যা দিয়ে দিলেন-- 'পাঁচ. সংখ্যার এমন দুটি রাশি বল, যাকে অন্য কোনো রাশি দিয়ে ভাগ দেয়া যায় না।' নীম সঙ্গে সঙ্গে বলল,

'যে কোনো রাশিকেই এক কিংবা সেই রাশি দিয়ে ভাগ দেয়া যায়।'

'তা যায়। ঐ দুটি রাশি ছাড়া অন্য কোনো রাশি দিয়ে ভাগ দেয়া যাবে না।'

মা মারা যাবার আগে আগে অনেক কিছুই ওরা শিখে ফেলল। আবার অনেক কিছু শিখতে পারল না। মা বলতেন, বেশির ভাগ জিনিসই শিখতে হয় নিজের চেষ্টায়। তোমরা দীর্ঘজীবী। অনেক সময় পাবে শেখবার। মৃত্যুর আগে আগে বলে গেলেন,

'একটি কথা সব সময় মনে রাখবে, তোমরা থাকবে একসঙ্গে। তোমাদের তিন জনের মিলিত শক্তি হচ্ছে অকল্পনীয় শক্তি। আরেকটি কথা, ঘরগুলির রহস্য বের করতে চেষ্টা করবে।'

তাঁর মৃত্যু দেখে ওদের যাতে কষ্ট না হয়, সে জন্যে মা মৃত্যুর ঠিক আগে আগে ওদের একটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে বললেন, 'মৃত্যু কী?' তারা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকল, বুঝতেই পারল না কখন মা মারা গেলেন।

নীম বেরিয়ে আসতে দেরি করল। অনেকখানি দেরি করল। সূর্য তখন প্রায় মাথার উপর। লী কিছুই বলল না। নীম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'চল ফিরে যাই।'

'তোমার যা দেখার দেখা হয়েছে?

'হয়েছে।'

'কী দেখলে?'

'আজকে প্রথম বারের মতো একটা জিনিস লক্ষ করলাম।'

'বল শুনি।'

'এই ঘরগুলি আকাশছোঁয়া।'

'আমার তো মনে হয় এ তথ্যটি আমরা প্রথম থেকেই জানি।'

'এই ঘরগুলির দেয়াল অসম্ভব মসৃণ।'

'এইটিও আমরা প্রথম থেকেই জানি।'

'আমার মনে হয় এ রকম করা হয়েছে, যাতে আমরা দেয়াল বেয়ে উঠতে না পারি।'

লী চুপ করে রইল। নীম বলল, 'আমি ভেতরে গিয়ে আজকে কী করেছি জান?'

'না। জানতে চেষ্টা করি নি।'

'এই ঘরের যে কম্পনাঙ্ক, সেই কম্পনাঙ্কে আমি আমার 'লুখ' কাঁপিয়েছি।'

লী স্তম্ভিত হয়ে গেল। যদি সত্যি তাই হয়, তাহলে ঘরটির ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ার কথা।

নীম বলল, 'ঘর ভাঙাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। যাতে তুমি আঘাত না পাও, সেজন্যই তোমাকে নিয়ে ঢুকি নি। কিন্তু ঘর ভাঙে নি। কেন ভাঙে নি জান?'

'না।'

'ভাঙে নি, কারণ ছ'টি ঘর আলাদা আলাদা করে এমনভাবে তৈরি করা, যাতে সামগ্রিক কম্পনাঙ্ক অনেক নিচে নেমে গেছে। আমরা এত নিচে নামতে পারি না। তুমি কি কিছু বুঝতে পারছ লী?'

'পারছি। যারা এই ঘরগুলি তৈরি করেছে, তারা আমাদের হাত থেকে এদের রক্ষা করবার জন্যেই এরকম করেছে, এই বলতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'তারা তাহলে কোথায়?'

'সেই সমস্যা নিয়ে আমাদের তিন জনকে একসঙ্গে ভাবতে বসতে হবে।'

লী এবং নীম নিঃশব্দে ফিরে চলল। লী ভেবে রেখেছিল নীমকে খুব একচোট গালমন্দ করবে। কিন্তু কিছুই করল না, অত্যন্ত দ্রুতপায়ে ফিরে চলল অয়ূর কাছে। তিন জন মিলে আবার ফিরে আসা দরকার। ঘরগুলির মাথার উপর গিয়ে দেখা দরকার কী আছে সেখানে। অনেক সমস্যা জমে গেছে। ভাবতে বসা প্রয়োজন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, জন্তুটি নিঃশব্দে খাঁচায় ঢুকে পড়ল। জন ফেন্ডার এবং জনি কুলম্যান বড়ই অবাক হল। কোনো জন্তুকে খাঁচায় ঢোকান অত্যন্ত পরিশ্রমের ব্যাপার। প্রচুর যান্ত্রিক সহায়তা প্রয়োজন। প্রথমে একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চক্র তৈরি করা হয়, সেই চক্র ক্রমাগত ছোট করে খাঁচার মুখের সামনে আনা হয়। জন্তুটি যত বুদ্ধিমান, তাকে খাঁচায় ঢোকান ততই মুশকিল। এ ক্ষেত্রে কোনো কিছুরই প্রয়োজন হল না। খাঁচার মুখ খোলামাত্র জন্তুটি খাঁচায় ঢুকে পড়ল। বৈদ্যুতিক চক্র তৈরি করার প্রয়োজনও হল না। জনি কুলম্যান চেঁচিয়ে বলল, 'খাঁচার দরজা বন্ধ করে দাও।'

কম্পিউটার সিডিসি বলল, 'যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে। খাঁচার দরজা বন্ধ হচ্ছে না।'

'কি জাতীয় গোলোযোগ?'

'সেকেন্ডারি মেগনেটিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে না।'

'এ রকম হবে কেন?'

'মনে হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো করছে না। ভেরিয়াক দু'টি অকেজো। পরীক্ষা করা হচ্ছে।'

'আমরা এখন কী করব?'

'অপেক্ষা করবে। আমরা ত্রুটি সারাতে না পারলে অন্য আরেকটি খাঁচা পাঠাবে।'

জনি কুলম্যানের বিরক্তির সীমা রইল না। কতক্ষণ এরকম অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। জন্তুটি মনে হচ্ছে দিব্যি সুখে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাছের ডালের মতো যে সব বিচিত্র জিনিস তার মাথার দু'পাশ দিয়ে বের হয়েছিল, সেগুলি আর দেখা

যাচ্ছে না। শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলেছে নাকি? জন ফেন্ডার বলল, 'প্রাণীটি বুদ্ধিমান নয়।'

'কী দেখে বলছ?'

'প্রাণীটি ঘুমিয়ে পড়েছে। এ রকম অস্বাভাবিক অবস্থায় কোনো প্রাণী ঘুমিয়ে পড়তে পারে না।'

'ঘুমুচ্ছে, বুঝলে কি করে?'

'চোখ বন্ধ। মাথার শুঁড়গুলিও নেই। নড়াচড়া করছে না।'

'তুমি কি নিঃসন্দেহ যে প্রাণীটি ঘুমুচ্ছে?'

'না। তা ছাড়া অসংখ্য প্রাণী আছে যারা কখনো ঘুমায় না। স্নায়বিক বিশ্রামের তাদের প্রয়োজন নেই।'

১৮টা পঁচিশ মিনিটে গ্যালাক্সি–ওয়ান থেকে জানান হল যে খাঁচাটির দরজা ঠিক করা সম্ভব হয় নি। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অন্য একটি খাঁচা পাঠান হচ্ছে। জন্তুটিকে নতুন খাঁচায় ঢোকানর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হোক।

প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নেয়ার আগেই দেখা গেল ঠিক একই রকম দেখতে আরো দুটি প্রাণী এসে উপস্থিত হয়েছে এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করে ঢুকে পড়েছে খাঁচায়। ঢোকামাত্রই খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জনি বলল, 'এ সব কী হচ্ছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই দু'টি আবার কোত্থেকে এল?'

জন ফেন্ডার বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই আশা কর নি, একটিমাত্র এ–রকম প্রাণী এই গ্রহে?'

'লক্ষ লক্ষ এ রকম কুৎসিত প্রাণী এখানে, তাও আশা করি নি। আর ভাব দেখে মনে হচ্ছে সবাই খাঁচায় ঢুকে পড়বে।'

'মোটেই অস্বাভাবিক নয়। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা প্রায়ই দলপতিকে অনুসরণ করে।'

জনি গম্ভীর হয়ে বলল,

'প্রাণীগুলি মোটেই নিম্নশ্রেণীর নয়। আমার মনে হয় প্রথম প্রাণীটি ইচ্ছা করে দরজা খোলা রেখেছিল, যাতে অন্য দু'টি এসে উঠতে পারে। এবং সুযোগ বুঝে আমাদের সর্বনাশ করতে পারে।'

'তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ জনি। এরা নিরীহ প্রাণী। হিংস্র নয়। হিংস্র হলে আমাদের আক্রমণ করে বসত।'

'আক্রমণ করে নি, কারণ এরা বুদ্ধিমান। এরা সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

জন ফেন্ডার হেসে উঠল। জনি বলল, 'তিনটি প্রাণীকে এক সঙ্গে মহাকাশযানে নিয়ে আমরা হয়তো বোকামি করছি।'

'জনি, সে দায়িত্ব তোমার নয়। কেন শুধু শুধু ভাবছ?'

জীববিদ্যা গবেষণাগারের একপ্রান্তে প্রাণী তিনটিকে রাখা হল। ঘরটি সিলঝিন সংকরের তৈরি। বায়ুর চাপ ০·৯৫ এটমসফিয়ার। বায়ুমন্ডলীয় গঠন এমন রাখা হয়েছে যাতে প্রাণীগুলির কিছুমাত্র অস্বস্তি না হয়। খাদ্য এবং পুষ্টি বিভাগের উপর ভার পড়েছে, কী ধরনের খাদ্য প্রাণীটি গ্রহণ করে তা বের করা। সাইকিয়াট্রি বিভাগকে বলা হয়েছে প্রাণীটির বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে। রিপোর্টে যদি প্রাণীটিকে বুদ্ধিমান বলা হয়, তবেই তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হবে।

গ্রহটিতে একটি নিরীক্ষা পরীক্ষাগার খোলা হয়েছে। পরীক্ষাগারের দায়িত্ব হচ্ছে, মাকড়সা জাতীয় এই প্রাণীগুলি ছাড়া অন্য কোনো প্রাণের বিকাশ হয়েছে কি না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। গ্রহটি ০২ টাইপ। এই জাতীয় গ্রহে প্রাণের উদ্ভব হয় না। কিন্তু যেহেতু এক শ্রেণীর প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেহেতু এই নিরীক্ষা পরীক্ষাগার।

মাকড়সা জাতীয় প্রাণীগুলিকে মহাকাশযানে নিয়ে যাবার পরপরই তাদের ঘুমন্তভাব কেটে যায়। তারা মাথার দু'পাশের বিচিত্র শিকড়ের মতো জিনিসগুলি বের করে অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করতে থাকে। কিন্তু অবস্থাটি সাময়িক। খানিকক্ষণ পর এরা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। চুপচাপ নিঝ্‌ঝুম। কিন্তু আবার জেগে উঠে আগের মতো ছুটোছুটি করতে থাকে। আবার নিঝ্‌ঝুম।

তাদের এ পর্যন্ত ছ' রকমের খাবার দেয়া হয়েছে। প্রোটিন, ফ্যাট এবং সেলুলুজ জাতীয় খাবার। প্রতি বারই তারা গভীর আগ্রহে খাবারের চারপাশে ভিড় করেছে। কিন্তু খাবার স্পর্শও করে নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার সেই আগের মতো ঘুমন্ত অবস্থা।

সাইকিয়াট্রি বিভাগ থেকে বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার জন্যে প্রথম পরীক্ষাটির ব্যবস্থা করা হল। এটি একটি সহজ পরীক্ষা (হেলডেন ক্রিয়েটিভি টেস্টটাইট হইসি)। যার বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করা হবে, তাকে চৌষট্টিটি স্কয়ার দেয়া হয় এবং অন্য এক জন প্রাণীটির সামনে ঠিক একই ধরনের চৌষট্টিটি স্কয়ার নিয়ে বসে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সেগুলি নিয়ে একটি ত্রিভুজ, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি সিলিন্ডার তৈরি করা হয়। এরপর এগুলিকে সমানুপাতিকভাবে বিভিন্ন ভাগ করে প্রাণীটিকে দেখান হয়। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণীরা বেশ কিছু দূর পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে। মধ্যম শ্রেণীর বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণীরা সমানুপাতিক ভাগ পর্যন্ত করতে পারে। শেষ দুটি পর্যায় শুধুমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণীরাই করতে পারে।

মাকড়সা শ্রেণীর প্রাণী তিনটি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে স্কয়ারগুলি নাড়াচড়া করতে লাগল। কিন্তু তার পরপরই স্কয়ারগুলি এক পাশে সরিয়ে রেখে দিব্যি ঘুমুতে গেল।

হলডেনের দ্বিতীয় টেস্টেও একই ব্যাপার হল। গোলাকার বল পাঁচটিকে নিয়ে তারা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে এক পাশে রেখে ঘুমুতে গেল।

সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হল-- 'প্রাণীগুলির প্রাথমিক পর্যায়ের বুদ্ধিও নেই বলেই মনে হচ্ছে। সাইমেন্সের টেস্টগুলি না করা পর্যন্ত সঠিকভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।'

লীর একটি মাত্র চিন্তা--'এসব কি?'

বলাই বাহুল্য, এই লম্বাটে দুটিমাত্র পা-বিশিষ্ট প্রাণীগুলি অনেক জানে। যারা এমন একটি অদ্ভুত জিনিসে করে হঠাৎ এসে হাজির হতে পারে, তারা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও এরা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছে না। এদের ভাবভঙ্গি এ রকম, যেন কোথায়ও কোনো সমস্যা নেই। এদের কথার অর্থ বুঝতে পারলে ভালো হত। নীমকে বলা হয়েছে কথার অর্থ বের করতে। সে এখন শুধু একটিমাত্র সমস্যা নিয়েই ভাবছে। এরা প্রতিটি জিনিসকে একটি নাম দিয়ে ডাকে--মহাকাশযান, রবট সিডিসি, সাইকিয়াট্রি বিভাগ। একটির সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক কী করে, সেটিই এখন জানতে হবে। ব্যাপারটি জটিল নয়, সময়সাপেক্ষ। নীম এখানকার প্রতিটি জীবের (যাদের এরা মানুষ বলে ভাবছে) কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছে এবং বিশ্লেষণ করছে।

এরা চৌষট্টিটি বস্তু দিয়েছে। উদ্দেশ্য কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। এক জন অনেক কিছু বানিয়ে বানিয়ে দেখাল। এরা কি চায় তারাও সে-রকম কিছু বানিয়ে বানিয়ে দেখাবে? তা কেন চাইবে? নাকি তারা চায় এই সব বস্তুর কম্পনাঙ্ক কত তা বের করতে? নীম প্রতিটির কম্পনাঙ্ক কত তা বের করল। তারপর তিন জন মিলে ভাবতে বসল এই কম্পনাঙ্কগুলির অন্য কোনো অর্থ আছে কিনা। সমস্যাটি জটিল। সময় লাগল ভাবতে। কিন্তু উত্তর বের করার আগেই ওরা পাঁচটি গোলাকার বস্তু ঢুকিয়ে দিল। এদের ওজন এক নয়, কিন্তু কম্পনাঙ্ক এক। এটিও কি কোনো সমস্যা? ওরা আবার ভাবতে বসল।

অয়ুর উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, ওরা কে কী ভাবছে তা বের করার। এর জন্যে ভাষা জানবার প্রয়োজন হয় না। লুখ দু'টিকে সম্পূর্ণ সক্রিয় করতে হয়। অয়ু নিবিষ্ট মনে তাই করে যাচ্ছে। প্রতিটি মানুষের কথা জানবার পরই সে সমস্যা নিয়ে ভাবতে বসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছে, মানুষরা একে অন্যের মনের কথা বুঝতে পারছে না। ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। জনি নামের মানুষটি জন ফেন্ডারের খুব কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছে "জন ফেন্ডার একটি মহামূর্খ"--কিন্তু জন ফেন্ডার তা বুঝতেও পারছে না।

তাদের সামনে এখন অনেক সমস্যা। সমস্যা মানেই হচ্ছে আনন্দ। কত কিছু ভাববার আছে এখন। আহ্ কি আনন্দ! অয়ুর পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা, কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না।

কিম দুয়েন নিজের ব্যক্তিগত ঘরে একা–একা বসে ছিল। আজ সরাসরি প্রচুর ঝামেলা গিয়েছে। এখন খানিকটা বিশ্রাম করা যেতে পারে। তার ঘরের বাইরে দু'টি ছোট ছোট লাল বাতি জ্বলছে, যার মানে হচ্ছে বিশেষ কোনো জরুরী প্রয়োজন ছাড়া তাকে বিরক্ত করা যাবে না।

কিম দুয়েন একটি সিগারেট ধরিয়ে কম্পিউটার সিডিসি'র সবুজ বোতাম টিপে দিল। ঘুমুবার আগে সে সাধারণত সমস্ত দিনের ঘটনা নিয়ে কম্পিউটার সিডিসির সঙ্গে কথাবার্তা বলে। হালকা ধরনের কথাবার্তা––জটিল হিসাব–নিকাশ নয়। কোনো কোনো দিন দু'–এক দান দাবা খেলা হয়। প্রায় সময়ই কিম দুয়েনের মনে থাকে না যে, সে কথাবার্তা বলছে একটি কম্পিউটারের সঙ্গে––যার মস্তিষ্ক ল্যাবোরেটরিতে সিনক্রিয়ন কপোট্রন দিয়ে তৈরি। যার লজিক আছে, কিন্তু অনুভূতি নেই। আজ নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল।

'হ্যালো সিডিসি।'

'হ্যালো ক্যাপ্টেন। দাবা খেলবে নাকি এক দান?'

'না। আজ খুবই ক্লান্ত।'

'বুঝতে পারছি। ক্লান্ত হবারই কথা। এবং খুব চিন্তিত হওয়ারও কারণ আছে।'

কিম দুয়েন ঈষৎ সচকিত হয়ে বলল, 'চিন্তিত হওয়ার কারণ কী?'

'যে কোনো অজানা বুদ্ধিমান প্রাণীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের মধ্যে চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে। আলফা সেঞ্চুরির সুসভ্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা মনে আছে তো?'

কিম দুয়েন গম্ভীর হয়ে বলল, 'মনে আছে। কিন্তু সিডিসি, তুমি একটি জিনিস ভুল করছ, এরা বুদ্ধিমান প্রাণী নয়। নিচুস্তরের জীব। খাদ্য যোগাড় করতে গিয়েই এদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ব্যয় হয়।'

'এখানে তুমি একটি ভুল করছ কিম দুয়েন। প্রাণীগুলি যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং খাদ্যের জন্যে এরা কিছুই করে না।'

'তার মানে?'

'এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তুমি জান, আমি অনুমান করে কিছু কখনো বলি না।'

'সাইকিয়াট্রি বিভাগ কিন্তু আমাকে লিখিত নোট দিয়েছে যে, ওরা হলডেন টেস্ট পাশ করতে পারে নি।'

'হলডেন টেস্ট বুদ্ধিমত্তা মাপার জন্যে একটি চমৎকার ব্যবস্থা, কিন্তু তোমার মনে থাকা উচিত, হলডেন নিজেই বলেছেন–– কোনো প্রাণী যদি অসম্ভব বুদ্ধিমান হয়, তা হলে হলডেন টেস্ট তার কাছে অর্থহীন মনে হবে।'

'প্রাণীগুলি অসম্ভব বুদ্ধিমান, এ রকম কোনো প্রমাণ কি পেয়েছ?'

'না, এখনো পাই নি।'

'এমন কোনো কারণ কি ঘটেছে, যার জন্যে তোমার মনে হয় প্রাণীগুলি বিপজ্জনক হতে পারে?'

'না ঘটে নি। প্রাণীগুলি শান্ত প্রকৃতির, তবে--'

'তবে কি?'

'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের খাঁচার দরজা আটকে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে?'

'মনে আছে।'

'তুমি নিশ্চয়ই জান, আজ এক সেকেন্ডের বার ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে আমাদের কেন্দ্রীয় ইলেকট্রিসিটি ছিল না।'

'আমি জানি।'

'এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার নয় কি?'

'হ্যাঁ, খুবই অস্বাভাবিক।'

'তুমি হয়তো এখনো খবর পাও নি, আমাদের প্রকৌশলী বিভাগের কাছেও একটি সমস্যা আছে। তারা তা নিয়ে বর্তমানে চিন্তা ভাবনা করছে।'

'কি সমস্যা?'

'আমাদের পাওয়ার লাইনের ইলেকট্রিসিটিতে এ পর্যন্ত পনের বার সাইকেল বদল হয়েছে। যেন কেউ সাইকেল বদলে কিছু একটা পরীক্ষা করছে।'

'তুমি বলতে চাও, ঐ প্রাণীগুলি এ সব করছে?'

'আমি কিছু বলতে চাই না। প্রমাণ ছাড়া আমি কখনো কিছু বলি না। আমি শুধু তোমাকে একটি সম্ভাবনার কথা বলছি।'

কিম দুয়েন সিডিসির সুইচ অফ করে প্রকৌশলী বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

'কিম বলছি, সাইকেল বদলাবার একটি খবর শুনলাম।'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় স্যার। সেজন্যেই আপনাকে জানান হয় নি। জোসেফসান জাংশানের ত্রুটির জন্যে এরকম হতে পারে।'

'জোসেফসান জাংশানের কোনো ত্রুটি কি ধরা পড়েছে?'

'না স্যার, তা ধরা যায় নি।'

'তবে?'

কিম দুয়েন খানিকক্ষণ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল। তারপর গম্ভীর মুখে যোগাযোগ করল সিকিউরিটি বিভাগের সঙ্গে।

'হ্যালো, সিকিউরিটি?'

'বলুন স্যার।'

'যে প্রাণীগুলিকে আমরা পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে এনেছি, সেগুলিকে মেরে ফেলবার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছি।'

'স্যার, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে না পারার কোনো কারণ তো দেখছি না। আণবিক ব্লাসটার দিয়ে ওদের মেরে ফেলুন।'

'এই জাতীয় নির্দেশ আপনি একা-একা দিতে পারেন না স্যার। বিজ্ঞান একাডেমীর অনুমোদন লাগবে।'

'মহাকাশযান যদি কোনো বিপদের মুখে পড়ে, তাহলে সর্বাধিনায়ক হিসাবে একাডেমীর অনুমোদন ছাড়াই আমি যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি--আইনের এই ধারাটি মনে আছে?'

'জ্বি স্যার, আছে?'

'বেশ। এখন যা বলেছি করুন। দায়িত্ব শেষ করবার পর আপনি নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'আরেকটি কথা, আপনার কাছ থেকে আমি একটি লিখিত জবাবদিহি চাই।'

'স্যার, আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী চাচ্ছেন।'

'আমি জানতে চাই, ঠিক কী কারণে আমার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও আপনি তা মানতে দ্বিধাবোধ করলেন, বিজ্ঞান একাডেমীর প্রশ্ন তুললেন।'

'স্যার, আমি ভাবলাম এগুলি দুর্লভ প্রাণী হতে পারে। মেরে ফেলাটা হয়তো ঠিক হবে না।'

'এগুলি দুর্লভ প্রাণী নয়। আমরা মাত্র দু' ঘন্টার মধ্যে তিনটি প্রাণী ধরেছি।'

'আমরা ধরি নি স্যার। ওরা নিজ থেকে ধরা দিয়েছে।'

'হুঁ। আপনার নাম কি?'

'আমার নাম সুগিহারা স্যার। আমার ক্রমিক নম্বর ফ· ২৩৭।'

'সুগিহারা, প্রাণীগুলিকে কি দেখেছেন?'

'দেখেছি স্যার।'

'এ জাতীয় কুৎসিত প্রাণীর জন্যে আপনার এত মমতার কারণ কি?'

'প্রাণীগুলি দেখতে কেমন, সেটা বড় কথা নয়। আলফা সেঞ্চুরির সুসভ্য প্রাণীরা অত্যন্ত সুদর্শন ছিল।'

'সুগিহারা।'

'জ্বি স্যার।'

'আপনি প্রাণীগুলিকে মেরে ফেলুন। আর আপনাকে যে কৈফিয়ত দিতে বলেছিলাম, তা দেবার প্রয়োজন নেই।'

'ঠিক আছে স্যার।'

হঠাৎ প্রচন্ড শক্তিশালী ওমিক্রন রশ্মির দু'টি ধারা প্রাণীদের উপর ফেলা হল। সিলঝিন নির্মিত খাঁচাটি অসহনীয় উত্তাপে দেখতে দেখতে মোমের মতো গলে

গেল।

সুগিহারা নিজে গিয়ে কিম দুয়েনের কাছে খবর দিল, আণবিক ব্লাস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। সুগিহারার মুখ ম্লান। চোখ বিষণ্ন। ক্যাপ্টেন সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। সহজ সুরে বলল, 'মানুষকে প্রায়ই অনেক হৃদয়হীন কাজ করতে হয়।' সুগিহারা কিছু বলল না। কিম দুয়েন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিছু বলতে চান আমাকে?'

'জ্বি স্যার, চাই।'

'বলুন।'

'প্রাণীগুলি মারা যায় নি। ওমিক্রন রশ্মি ব্যবহারের পরেও বেঁচে আছে।'

মহাকাশযান গ্যালাক্সি-ওয়ানের বিপদ সংকেতসূচক ঘন্টা বাজতে শুরু করল।

৫

গ্যালাক্সি-ওয়ানের নিয়ন্ত্রণকক্ষে জরুরী মীটিং বসেছে। একটি জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তিনটি প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বাধীনভাবে। এখন পর্যন্ত তারা কারোর কোনো ক্ষতি করে নি। তাই বলে যে ভবিষ্যতেও করবে না, তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সবচেয়ে বড় কথা, অত্যন্ত শক্তিশালী রেডিয়েশনও এদের কিছুমাত্র কাবু করে নি। ছোটাছুটি করছে উৎসাহের সঙ্গে।

ক্যাপ্টেন কীম গম্ভীর মুখে বললেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির উপর একটি রিপোর্ট দেয়ার জন্যে আমি কম্পিউটার সিডিসিকে বলেছি। আলোচনা শুরু করার আগে আমি সিডিসির রিপোর্টটি শুনতে চাই। আপনারাও মন দিয়ে শুনুন।'

'আমি সিডিসি বলছি। বর্তমান সমস্যাটি একটি জটিল এবং ভয়াবহ সমস্যা। তিনটি অসাধারণ বুদ্ধিমান প্রাণী গ্যালাক্সি-ওয়ানে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করছেন, আমি বুদ্ধিমান শব্দটির আগে অসাধারণ বিশেষণটি ব্যবহার করেছি। আপনাদের কারো কারো আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এমন সব প্রমাণ আছে--যা সন্দেহাতীতভাবে বলবে প্রাণীগুলি বুদ্ধিমান।

প্রথম প্রমাণ : প্রাণীগুলি দ্রুত বুঝতে চেষ্টা করছে গ্যালাক্সি-ওয়ান কী করে কাজ করে। কোনো একটি অদ্ভুত উপায়ে এরা ইলেকট্রনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেই ক্ষমতাবলে এরা গ্যালাক্সি-ওয়ানের প্রতিটি যন্ত্রপাতির ইলেকট্রন-প্রবাহ প্রভাবিত করেছে। অবশ্য খুব অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু করেছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ : তারা একটি টেসারেক্ট তৈরি করেছে। কোনো ত্রিমাত্রিক বস্তু দিয়ে টেসারেক্ট তৈরি করা যায় না, কিন্তু এরা করেছে। তিন নম্বর কক্ষে হলডেন

কিউব দিয়ে তৈরি টেসারেক্টটি এখনো আছে। আপনারা কি আর কোনো প্রমাণ চান?'

'না। ক্যাপ্টেন, আপনি আমাদের টেসারেক্টটি দেখাবার ব্যবস্থা করুন।'

ক্যাপ্টেন সুইচ টেপামাত্র তিন নম্বর কক্ষটির ছবি ত্রিমাত্রিক পর্দায় ভেসে উঠল। জিনিসটি যে টেসারেক্ট এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হলডেন কিউবগুলি (যেগুলি টেসারেক্টের ষোলটি কোণে বসে আছে) ঠিক কী উপায়ে ঘুরছে? কম্পিউটার সিডিসি আবার কথা বলা শুরু করল, 'আমি এখন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অন্য একটি দিকে। এই প্রাণীগুলি কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এরা শক্তি কোথায় পায়? প্রশ্নটির উত্তরের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে।'

সিডিসি কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে থাকল। সম্ভবত শুনতে চাইল কারোর কোনো বক্তব্য আছে কি-না। কেউ কথা বলল না।

'প্রাণীগুলি বুদ্ধিমান হলেও, এরা এই প্রথম কোনো একটি বুদ্ধিমান প্রাণীর সংস্পর্শে এসেছে বলে আমার ধারণা।'

'এই ধারণার পেছনে কী কী যুক্তি আছে তোমার?'

'আমার কাছে এই মুহূর্তে তিনটি প্রথম শ্রেণীর যুক্তি আছে। যুক্তিগুলি বলবার আগে আপনাদের একটি দুঃসংবাদ দিচ্ছি-- আমাদের যে অনুসন্ধানী দলকে এই গ্রহে নামান হয়েছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমার ধারণা প্রাণীগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করেছে।'

নিয়ন্ত্রণকক্ষের জরুরী মীটিং আধা ঘন্টার জন্যে স্থগিত রাখা হল।

অনুসন্ধানী দলের প্রধান ডঃ জুরাইন অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছিলেন। ডঃ জুরাইন গ্যালাক্সি-ওয়ানের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রধান। তিনি অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে আসতে চান নি। তিনটি অদ্ভুত প্রাণীকে কাছ থেকে পরীক্ষা করার সুযোগ ছেড়ে কে আসতে চায় অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে? তবু তাঁকে আসতে হয়েছে, কারণ এই গ্রহে আরো প্রাণী থাকার সম্ভাবনা। নানান ধরনের প্রাণী। শুধুমাত্র এক শ্রেণীর প্রাণের বিকাশ হবে--তা ভাবার কোনোই কারণ নেই। কাজেই ডঃ জুরাইনকে আসতে হয়েছে। এই গ্রহে প্রাণের বিকাশ কোন পথে হয়েছে, সেটা পরীক্ষা করার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর উপর। কিন্তু তিনি এখন পর্যন্ত অন্য কোনো প্রাণীর দেখা পান নি।

গত বারো ঘন্টা ধরে অনুসন্ধানী হেলিকপ্টার উড়ছে। খানাখন্দ এবং প্রকান্ড সব পাথর ছাড়া এখন পর্যন্ত কিছু চোখে পড়ে নি। না পড়ারই কথা। প্রাণের বিকাশ হবার জন্যে যা যা প্রয়োজন, তার কিছুই এ গ্রহে নেই। তাহলে প্রশ্ন হয়, ঐ প্রাণী তিনটি এল কোত্থেকে, আকাশ থেকে পড়ে নি নিশ্চয়ই।

'ডঃ জুরাইন, আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি?'

'পার।'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে, যে প্রাণী তিনটি দেখছি, সেগুলি অন্য কোনো গ্রহ থেকে এখানে এসেছে। এরা এ গ্রহের প্রাণী নয়।'

'এ রকম মনে হওয়ার কোনো কার : আছে কি?'

'জ্বি স্যার, আছে। প্রাণীগুলির চলাফেরার জন্যে এই গ্রহ উপযোগী নয়। সমস্ত গ্রহটি প্রকান্ড সব পাথরে ঢাকা। পাথরগুলি মসৃণ। প্রাণীটি মসৃণ জিনিসের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারে না। লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই, গ্যালাক্সি-ওয়ানের মেঝেতে এরা বারবার পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ, প্রাণীটি এই গ্রহের অধিবাসী হলে মসৃণ জায়গায় চলাফেরার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকত? জীবনের বিকাশ হত সেই দিকে?'

'জ্বি স্যার।'

'ভালো বলেছ নিমায়ের। চমৎকার যুক্তি।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

নিমায়ের কল্পনাও করে নি, ডঃ জুরাইন এত সহজে তার যুক্তি মেনে নেবেন। ডঃ জুরাইন এক জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। এরা বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কারোর কথায় কান দেয় না। নিমায়ের এক জন সামান্য সিকিউরিটি গার্ড, কিন্তু ডঃ জুরাইন তার যুক্তির প্রশংসা করলেন।

অনুসন্ধানকারী দলের সঙ্গে একটি প্রথম শ্রেণীর রবট সব সময়ই থাকে, কিন্তু এ দলটির সঙ্গে ছিল না। এদের সঙ্গে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রবট আছে। এই জাতীয় রবট রুটিন কাজ করবার ব্যাপারে সুদক্ষ, কিন্তু এরা যুক্তির মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। এরা নিজ থেকে কখনো কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করে না। প্রশ্ন করলেই শুধুমাত্র উত্তর দিয়ে থাকে। এই বার খানিকটা ব্যতিক্রম হল। রবটটি হঠাৎ কথা বলে উঠল, 'ডঃ জুরাইন। আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

ডঃ জুরাইন অবাক হয়ে তাকালেন।

'কি ব্যাপার?'

'আমি একটি সুরেলা ধ্বনি পাচ্ছি। ধ্বনিটি ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে।'

ডঃ জুরাইনের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

'কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। নিমায়ের, তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

'না স্যার।'

রবটটি শান্তস্বরে বলল, 'আপনাদের শ্রবণশক্তি আমার মতো তীক্ষ্ণ নয়। আপনারাও শুনবেন। আমরা সেই সুরেলা ধ্বনির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সত্যি সত্যি সুরধ্বনি শোনা গেল। ডঃ জুরাইনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল। সুরটি খুবই চেনা। নিমায়ের উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'ডঃ জুরাইন, আপনি কি সুরটি চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী ব্যাপার ডঃ জুরাইন?'

'বুঝতে পারছি না।'

'সুরটি যে নিওলিথী সুর, সে সম্পর্কে আপনার কি কোনো সন্দেহ আছে?'

'না।'

'আপনার কি মনে হয়, আমরা নিওলিথী সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব?'

'হ্যাঁ--কোথায়ও না কোথায়ও দেখবে ছ'টি অদ্ভুতদর্শন আকাশছোঁয়া ঘর। বাতাস এসে সেই ঘরগুলিতে ধাক্কা দিচ্ছে আর তৈরি হচ্ছে এই অপার্থিব নিওলিথী সুর।'

স্পেস-স্যুটের শীতলতায়ও ডঃ জুরাইন ঘামতে থাকলেন।

'স্যার, আমাদের উচিত গ্যালাক্সি-ওয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করা।'

কথার উত্তর দিল রোবটটি। সে তার যান্ত্রিক শীতল স্বরে বলল, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই।'

'কখন থেকে যোগাযোগ নেই?'

'এক ঘন্টা বার মিনিট তেইশ সেকেন্ড।'

'এতক্ষণ বল নি কেন?'

'আপনারা জানতে চান নি, তাই।'

ডঃ জুরাইন বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। নিমায়ের চেঁচিয়ে উঠল, 'স্যার, দেখুন দেখুন।'

নিওলিথী ঘর ছ'টি দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত সবুজ রঙ বেরুচ্ছে তার দেয়াল থেকে। মনে হচ্ছে সেই সবুজ রঙ সমস্ত অঞ্চলটিকেই যেন আলোকিত করে তুলেছে।

'আহ্, কী অদ্ভুত!'

'স্যার, নিওলিথী সভ্যতার সমস্ত ঘর-বাড়ি কি সবুজ পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। তবে রঙের গাঢ়ত্বের তারতম্য আছে। কোনো কোনো জায়গায় রঙ হালকা সবুজ। কোথাও পাওয়া গেছে গাঢ় রঙ।'

'স্যার আপনি কি স্বচক্ষে এর আগে নিওলিথী ঘর দেখেছেন?'

'না, গ্যালাক্সি-ওয়ানের কেউ দেখে নি।'

'মনের মধ্যে একটি অন্য রকম ভাব হয়।'

'তা ঠিক। খুবই ঠিক।'

ঘরগুলি শুধু যে অদ্ভুত তাই নয়, এদের বিশালত্বও কল্পনাতীত। অপার্থিব সুরে ধ্বনি বেজে যাচ্ছে। যেন একটি বুকভাঙা হাহাকার। নিমায়েরের চোখে গভীর আবেগে জল এসে গেল।

তারা তিন জন তিন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এত কিছু দেখার আছে এখানে,

এত কিছু আছে শেখার। ভাষাটা শিখে ফেললে অনেক সহজ হত। কিন্তু এটি শিখতে সময় লাগছে। কারণ মানুষগুলি প্রায় সময়ই চিন্তা করে এক রকম, কিন্তু বলে অন্য রকম। যেমন ক্যাপ্টেন কীম একবার সিকিউরিটির এক জনকে জিজ্ঞেস করল, 'এই সম্পর্কে তোমার কি মত?'

লোকটি হাসিমুখে বলল, 'স্যার এটি খুব ভালো ব্যবস্থা।'

অথচ লোকটি মনে মনে ভাবছে--'ব্যবস্থাটি একটুও কাজ করবে না। এর চেয়ে মন্দ আর কিছু হতে পারে না।' কোনটি ঠিক এর মধ্যে? ব্যবস্থাটি কি আসলেই মন্দ না ভালো? তাহলে মন্দের অর্থ কী, আবার ভালোর অর্থই–বা কী?

এ ছাড়াও এই মানুষগুলি কথা বলতে প্রচুর সময় নেয়। তারা যেমন একটি শব্দকেই অসংখ্য কম্পনের মধ্যে উচ্চারণ করে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করে, মানুষ তা পারে না। সামান্য মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যেও এরা অনেকগুলি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করে। এবং একেক বার করে একেক রকম ভাবে, তাতে অর্থের কী তারতম্য হয় কে জানে? যেমন সামান্য খাওয়ার কথাই ধরা যাক। একবার বলছে, 'চল খাই।' আবার বলছে 'খাই চল।' এর মানে কি? এদের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই? আরেকটি মজার জিনিস হচ্ছে, এরা অকারণে কথা বলে। কোনো সমস্যা ছাড়াই কয়েক জন মিলে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। এদের ধরনধারণ এ রকম, যেন চিন্তা করার মতো কোনো সমস্যা নেই। এই সব নিয়ে এদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে ইচ্ছা হয়।

অয়ু এখন পর্যন্ত যা শিখেছে, তার সাহায্যে মানুষদের সঙ্গে সে কথা বলতে পারে, কিন্তু এখনই সে বলতে চায় না। ভাষাটি ভালোমতো জানা দরকার। তারও আগে জানা দরকার, ওরা তাদের এত ভয় করছে কেন। ভয় করার কী আছে?

অয়ু মনে মনে বলল, 'আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করছি না। তোমাদের কাছ থেকে আমরা শিখতে চাই। এবং তার বদলে আমরা তোমাদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করব।'

'আমরা তোমাদের জন্যে যে জিনিসটি তৈরি করেছি--যা দেখে তোমরা অবাক হচ্ছ এবং বলছ টেসারেক্ট–এর চেয়ে অনেক অনেক অদ্ভুত জিনিস আমরা তোমাদের জন্যে তৈরি করে দেব। এত দিন আমরা এ সব তৈরি করি নি, আমরা জানতাম না এ সবের কোনো মূল্য আছে। এখন বুঝতে পারছি আছে।'

অয়ু কথাবার্তা গুছিয়ে ভেবে রাখতে চেষ্টা করে। একদিন এসব কথা বলতে হবে। ওরা কি শুনবে তাদের কথা?

ওদের মনের ভাব ভালো নয়। সবাই চাচ্ছে কুৎসিত প্রাণীগুলি যেন শেষ হয়ে যায়। কেন এ রকম করছে ওরা? এত ভয় পাচ্ছে কেন? ভয়ের তো কিছুই নেই। ভয় কিসের?

এই মহাকাশযানের তিনটি স্তর আছে। অয়ুরা আছে সবচেয়ে নিচের স্তরে।

মানুষরা ভয় পেয়ে নিচের স্তরটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে, যেন ওরা দ্বিতীয় বা প্রথম স্তরে যেতে না পারে। ব্যাপারটি অয়ুর কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। এদের সমস্ত দরজা চৌম্বক-শক্তিতে লাগান। অয়ু, নীম বা লী--এদের যে কেউ যে কোনো চৌম্বক-শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। ইচ্ছা করলেই এরা দ্বিতীয় বা প্রথম স্তরে যেতে পারে। তা যাচ্ছে না, তার একমাত্র কারণ, তারা মানুষদের আর ভয় পাইয়ে দিতে চায় না।

তা ছাড়া নিজেদের স্তরেও অনেক কিছু দেখার এবং শেখার আছে। বেশ কিছু মানুষও আটকা পড়েছে এই স্তরে। মানুষগুলি ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। এক জনকে অবশ্যি পাওয়া গেছে যার ভয়টয় বিশেষ নেই। মোটাসোটা ফূর্তিবাজ লোক। অয়ু তার ঘরে ভুল করে ঢুকে পড়েছিল। এই লোকটি অন্যদের মতো লাফিয়ে ওঠে নি বা চিৎকারও শুরু করে নি। হাসিমুখে বলেছে, 'আমার মাকড়সা বন্ধুটির খবর কি? আমাকে ভক্ষণ করবার হেতু আগমন নাকি?'

অয়ু ভক্ষণ শব্দটির অর্থ ধরতে পারে নি। লোকটি বলেছে, 'এসেছেন যখন, তখন বসুন।'

এর অর্থ বেশ বোঝা গেল। অয়ু লোকটি যে রকম আসনে বসে আছে, সে রকম একটি আসনে উঠে বসল। লোকটি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনি কি আমার কথা বুঝতে পেরে বসলেন, না ঐটি একটি কাকতালীয় ব্যাপার?'

অয়ু 'কাকতালীয়' শব্দটিও বুঝতে পারল না। এদের ভাষা যথেষ্ট জটিল। এই শব্দটি সে আগে একবারও শোনে নি।

'কিছু পান করবেন? কমলালেবুর সরবত দিতে পারি; কিন্তু আসল নয়--নকল। সবই সিনথেটিক।'

অয়ুর খুব ইচ্ছা করছিল লোকটিকে অবিকল মানুষের ভাষায় জবাব দেয়, বলে, 'আপনাকে ধন্যবাদ। খাদ্য গ্রহণ করার মতো শারীরিক ব্যবস্থা আমাদের নেই। আমরা সরাসরি শক্তি সংগ্রহ করে থাকি। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে।'

কিন্তু অয়ু কিছু বলল না। লী বলে দিয়েছে, যেন তা করা না হয়। তার ধারণা মানুষরা যখন টের পাবে তারা ওদের ভাষায় কথা বলতে পারে, তখন আরো ভয় পেয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগের আগে ওদের মনের বৈরী ভাব প্রথমে দূর করতে হবে। নীম লীর কথা মেনে নিতে পারে নি। নীম বলেছে, 'ওদের মনের ভয় দূর করার সবচেয়ে ভালো পথ হচ্ছে ওদের সঙ্গে কথা বলা।'

লী শান্ত স্বরে বলেছে, 'না, মানুষদের মনে ভয় ঢুকে গেছে। তারা ভাবছে আমরা হয়তো ওদের চেয়েও বুদ্ধিমান। এটি তারা মেনে নিতে পারছে না।

আমরা ওদের ভাষায় কথা বলামাত্র ওদের ধারণা বদ্ধমূল হবে --যার ফল হবে অশুভ।'

মানুষদের এই ধারণাটিকেও অয়ুর অদ্ভুত লাগে। মানুষদের কান্ডকারখানা দেখে তারা তিন জনই মুগ্ধ হয়েছে। এমন একটি মহাকাশযান তৈরি করতে সীমাহীন বুদ্ধির প্রয়োজন। লীর মতে মানুষের জ্ঞান সীমাহীন। নীম তা স্বীকার করে না। তার ধারণা, কম্পন সম্পর্কে মানুষরা জানে খুব কম। নীমের ধারণা ভুল নয়। এই বিষয়ে তারা সত্যি সত্যি কম জানে। কিন্তু তবু মানুষদের জ্ঞানের পরিমাণও কম নয়। নানান তথ্যাদি জমা করে রাখার জন্যে তারা যে কম্পিউটার তৈরি করেছে, তা একটি আশ্চর্য জিনিস। কম্পিউটারটি যে শুধু তথ্যাদি জমা করে তা এখনো পরিষ্কার হয় নি। তবে হবে শিগগীরই। লী এবং নীম দু'জনেই এই সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করছে। অয়ুর বর্তমানে চিন্তা করবার মতো কোনো সমস্যা নেই। তাকে আবার সেই পুরান সমস্যাটি দেয়া হয়েছে--'ছ'টি আকাশছোঁয়া ঘরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী?'

অনুসন্ধানকারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ কেন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তা বের করা গেল না। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, অদ্ভুত প্রাণীগুলি হয়তো কিছু একটা করেছে। সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। গ্যালাক্সি-ওয়ানের সমস্ত যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে কাজ করছে।

অনুসন্ধানকারী স্কাউটশিপটিতে কোনো ঝামেলা হয়েছে, সে রকম ভাবা ঠিক নয়। কারণ যোগাযোগের বেশ কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে। মাইক্রোওয়েভ ও লেসার ছাড়াও অত্যন্ত জরুরী অবস্থার জন্যে আছে ওমিক্রন রশ্মির ব্যবহার। এর একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো সম্পর্ক নেই। মাইক্রোওয়েভ ও লেসার কাজ না করলেও ওমিক্রন রশ্মি কাজ করবে।

কম্পিউটার সিডিসি যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হবার দু'টি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করে জরুরী মন্ত্রণালয়ে তার রিপোর্ট পেশ করল।

প্রথম সম্ভাব্য কারণ : 'অনুসন্ধানী স্কাউটশিপটি অদ্ভুত প্রাণীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তারা যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। সে সম্ভাবনা অবশ্যি খুবই কম। প্রথমত স্কাউটশিপটি অনেক উঁচু দিয়ে উড়ছে। অদ্ভুত প্রাণীগুলি বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারলেও এদের কোনো প্রযুক্তি-বিদ্যা নেই। এরা উড়ে-যাওয়া একটি স্কাউটশিপের ক্ষতি হয়তো-বা করতে পারবে না।'

দ্বিতীয় কারণটি সিডিসি যথেষ্ট কুণ্ঠার সঙ্গে ব্যাখ্যা করল। সিডিসি বলল, 'আমি পুরান তথ্যাদির উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করছি। ইন্টার গ্যালাকটিকা আর্কাইভে বলা হয়েছে, যে ধ্বংসপ্রাপ্ত নিওলিথী সভ্যতার পঞ্চাশ হাজার গজের কাছাকাছি যখন কোনো স্কাউটশিপ বা মহাকাশযান যায়,

তখন তার যোগাযোগব্যবস্থা সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে যায়।।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, এই গ্রহে নিওলিথী সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আছে?'

'আমি সম্ভাবনার কথা বলছি।'

জন ফেন্ডার বলল, 'আমরা সহজেই তোমার সম্ভাবনা প্রমাণ করতে পারি। আমাদের কাছে নিওলিথী সুরের বেশ কিছু রেকর্ড আছে। রেকর্ডগুলি বাজান হলে যে তিনটি প্রাণী আমাদের কাছে আছে; ওরা সেই সুর চিনতে পারবে।'

'তা ঠিক।'

কম্পিউটার সিডিসি বলল, 'আমি জানতাম, আপনারা এই সিদ্ধান্তে আসবেন। এই মুহূর্তে তৃতীয় স্তরে নিওলিথী সুর বাজান হচ্ছে। ত্রিমাত্রিক পর্দা চালু করলে আপনার প্রাণী তিনটির উপর নিওলিথী সুরের প্রভাব লক্ষ করতে পারবেন।'

সুরা তার ঘরের দরজা খোলা রেখেছে।

তার ধারণা হয়েছে প্রাণীগুলি ভয়াবহ নয়। এরা দেখতে কুৎসিত, শক্তিশালী রেডিয়েশানেও এদের কিছু হয় না, তবু খুব সম্ভবত নিরীহ। এখন পর্যন্ত ওরা কারোর কোনো ক্ষতি করে নি। ওদের মধ্যে এক জনের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়েছে। সেটির পায়ে কোনো আঘাত লেগেছে বা কিছু হয়েছে। একটি পা সব সময় সাবধানে গুটিয়ে রেখে চলাফেরা করে। সে প্রায়ই তার ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে তাকায়।

আজও সে এসেছে। এবং অন্যদিনের মতো উঠে বসেছে চেয়ারে। সুরা হাসিমুখে বলল, 'কি বন্ধু, আবার এসেছ? হুঁ। আজকে কী নিয়ে আলাপ করি? তুমি তো আবার আলাপে অংশ নিতে পার না।'

প্রাণীটি মনে হল মাথা নাড়াল। যেন কথাবার্তা সব বুঝতে পারছে। সুরা বলল, 'হুঁ, তোমার পা একটি মনে হচ্ছে জখম হয়েছে। আমি অবশ্যি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না। কারণ আমি ডাক্তার নই, আমি একজন হাইপারডাইভ ইঞ্জিনীয়ার। হাইপারডাইভ কী, জানতে চাও?'

প্রাণীটি মাথা নাড়ল। যেন সে সত্যি সত্যি জানতে চায়।

'হাইপারডাইভ একটি অদ্ভুত জিনিস। আমরা এসেছি মি১৫ওয়ে গ্যালাক্সি থেকে। সেটি তোমাদের এই এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে পাঁচ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। হাইপারডাইভ ছাড়া এত দূর মানুষের পক্ষে আসা সম্ভব নয়। বুঝতে পারছ কিছু?'

'না, বুঝতে পারছি না, অসুবিধা হচ্ছে।'

সুরা মনে করল, সে ভুল শুনছে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল প্রাণীটির দিকে।

'কে কথা বলছে?'

'আমি, আমি বলছি। আমার নাম অয়ু।'

সুরা কপালের ঘাম মুছল। শুকনো গলায় বলল, 'তোমরা আমাদের কথা বুঝতে পার?'

'কিছু কিছু পারি।'

'তোমরা কে?'

'তোমার প্রশ্ন বুঝতে পারছি না সুরা।'

'এই গ্রহে তোমাদের মতো কি আরো প্রাণী আছে?'

'না, এই গ্রহে অন্য কোনো প্রাণী নেই।'

'তোমরা আমাদের ভাষা শিখলে কি করে?'

'শুনে শুনে শিখেছি।'

'শুনে শুনেই শিখে ফেললে?'

'হ্যাঁ। তুমি কিন্তু হাইপারডাইভ সংক্রান্ত বিষয়টি এখনো ব্যাখ্যা কর নি।'

'ঠিক এই মুহূর্তে তোমাকে বোঝাতে পারব কিনা জানি না।'

'চেষ্টা করে দেখ। আমরা যে কোনো যুক্তিপূর্ণ বিষয় বুঝতে পারি।'

'হুঁ, তা পার। আমাকে মানতেই হবে তোমরা তা পার। তবে হাইপারডাইভ জানতে হলে তোমাকে চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণ জানতে হবে। তা কি তুমি জান?'

'না। তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

'এখন নয়, এখন নয়। আমার মাথা ঘুরছে। আমাকে কিছুক্ষণ ভাবতে দাও।'

'ঠিক আছে।'

'আমার এখনো মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি।'

'স্বপ্ন কী?'

'পরে বলব, পরে বলব।'

সুরা দেখল অয়ু নামের প্রাণীটি নেমে যাচ্ছে। এই কদাকার কুৎসিত প্রাণীটির সঙ্গে সত্যি সত্যি এতক্ষণ কথা হল। সুরা কপালের ঘাম মুছল। সুইচ টিপে গ্যালাক্সি-ওয়ানের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। কিন্তু সুরার ইচ্ছা করছিল না।

অয়ু ঘর থেকে বেরিয়েই লীকে খুঁজে বের করল। মানুষদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, এটি তাকে জানান প্রয়োজন। তৃতীয় স্তরে লম্বা করিডোরে কাউকে দেখা গেল না। অয়ু ধীর পায়ে এগোতে লাগল। শেষ প্রান্তে দু' জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এদের দু' জনের হাতেই দুটি অস্ত্র। কী জাতীয় অস্ত্র তা জানতে শুখগুলি বের করতে হয়। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। করিডোরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তীব্র আগুনের হলকা বয়ে গেল। ব্যাপারটি পূর্ব পরিকল্পিত, এ জন্যেই করিডোরে আজ একটি মানুষও নেই।

অয়ু তার পাগুলি গুটিয়ে ফেলল শরীরের ভেতর। উত্তাপের ফলে শরীরের

অণুগুলির কম্পন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, সেগুলি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে হবে চার দিকে। লুখগুলি শরীরের ভেতরে থাকায় বেশ অসুবিধা হচ্ছে। তার কষ্ট হতে থাকল। বাঁচার একমাত্র উপায় ঐ মানুষ দ'টিকে মেরে ফেলা। কোনোই কঠিন কাজ নয়, অনায়াসে করা যেতে পারে।

কিন্তু তা করা যাবে না। চিন্তাটাই লজ্জাজনক। অয়ু প্রাণপণে শরীরের কোষগুলির কম্পন বদলাতে লাগল। ঠাণ্ডা মাথায় তা করা দরকার। একটু ভুল হলেই রক্ষা নেই। কিন্তু নীম এবং লী--এরা কোথায়? ওরা থাকলে অসুবিধা হত না। তিন-জন কাছাকাছি থাকলে যে কোনো ধরনের কম্পনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। এ জন্যেই কি মা সব সময় বলতেন, তিন জন একসঙ্গে থাকবে, কাছাকাছি থাকবে?

অয়ু লক্ষ করল তার ভুল হতে শুরু করেছে। অসুস্থ পায়ের অনেকগুলি কোষ নষ্ট হয়ে গেছে। তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। ভুল হবার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যাবে। মানুষ দ'টিকে মেরে নিজে বাঁচার চেষ্টা করাটাই কি এখন উচিত? এটি একটি 'সমস্যা'। কাজেই ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে এর উত্তর বের করতে হবে।

উত্তাপের তীব্রতা হঠাৎ করে কমে গেল। আহ্, কী শান্তি। অয়ু মাথা ঘুরিয়ে দেখল, করিডোরের অন্য প্রান্তে লী এবং নীম। ওদের সর্ব কটি লুখ বের করা। উত্তাপ এখন ওরাই সামলাচ্ছে। আর ভয় নেই।

লী উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'তুমি ঠিক আছ অয়ু?'

'হ্যাঁ ঠিক আছি।'

'ভালো। আমার মনে হয়, এখন থেকে আমাদের উচিত, সব সময় একসঙ্গে থাকা।'

'হ্যাঁ।'

'আর ওদের সঙ্গে কথা বলাও উচিত। ওদের জানান উচিত আমরা ওদের কোনো ক্ষতি করতে চাই না।'

'হুঁ, ওদের বলা উচিত। আমরা ওদের সঙ্গে থেকে ওদের কাছ থেকে শিখতে চাই।'

'হুঁ, তা চাই।'

'অয়ু, তোমার পা সম্ভবত নষ্ট হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ। অসহনীয় যন্ত্রণা হচ্ছে লী।'

'তোমাকে আমি একটি সমস্যা দিচ্ছি। তুমি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে থাক, যন্ত্রণা ভুলে যাবে।'

'দাও, সমস্যা দাও।'

লী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সমস্যাটি বলল, 'সমস্যাটি আমি মানুষদের কাছ থেকে পেয়েছি। এদের কম্পিউটারে যে সমস্ত তথ্যাদি আছে, তার মধ্যে একটি

হচ্ছে আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এরা এসেছে পাঁচ লক্ষ আলোকবর্ষ দূর থেকে। এরা যদি আলোর গতিবেগে আসে তাহলেও এদের লাগবে পাঁচ লক্ষ বৎসর। কিন্তু ওদের তথ্য অনুযায়ী কোনো বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের বেশি হতে পারে না। তুমি শুনছ মন দিয়ে?

'আমি শুনছি।'

'এখন তুমি ভেবে বের কর, এই দীর্ঘ পথ ওরা কী করে এত অল্প সময়ে পার হল। সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। এটি নিয়ে ভাবতে বসলে তোমার পায়ের যন্ত্রণা আর টের পাওয়া যাবে না।'

'সমস্যাটি ভাবতে হলে আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে।'

'তুমি ভাবতে শুরু কর। যখন কিছু জানার দরকার হবে, আমাদের জিজ্ঞেস করবে, আমরা জেনে দেব।'

অয়ু সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। আর ঠিক তখনি তৃতীয় স্তরের সবক'টি ধাপে অপূর্ব নিওলিথী সুর বেজে উঠল। লী এবং নীম উৎকর্ণ হয়ে কয়েক মুহূর্ত শুনল। অয়ু বলল, 'ঘরের শব্দ আসছে। এই মানুষেরা আমাদের ঘরের শব্দ জানে।'

নীম বলল, 'কে জানে, আমাদের এই ঘর হয়তো এইসব মানুষরাই বানিয়েছে।'

'নতুন এই সমস্যা নিয়ে আমাদের ভাবতে বসা উচিত।'

যে লোক দু'টি লেসার রশ্মি দিয়ে অয়ুকে আঘাত করেছে, ওরা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিল। তারা দু'জনেই সিকিউরিটির। প্রাণী তিনটিকে শেষ করে দেয়ার মূল পরিকল্পনা তাদেরই। নিয়ন্ত্রণ–পরিষদ এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। শুধু নিয়ন্ত্রণ–পরিষদ নয়, তৃতীয় স্তরের ক্রু মেম্বাররাও কেউ কিছু জানে না। তাদেরকে বলা হয়েছে নিরাপত্তার খাতিরে কেউ যেন কোনো অবস্থাতেই করিডোরে না আসে।

আক্রমণ ফলপ্রস হয় নি, কিন্তু একটি জিনিস পরিষ্কার হয়েছে--যখন প্রাণীটি একা ছিল, তখন সে উত্তাপ সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু আর দু'টি প্রাণী এসে যোগ দেয়ামাত্র সব অন্য রকম হয়ে গেছে। লেসার রশ্মির কল্পনাতীত শক্তিও নিমিষের মধ্যে দুর্বল হয়ে গেল। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং ক্যাপ্টেনকে জানান প্রয়োজন। এই পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

সিকিউরিটি গার্ড দু'টি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। প্রাণী তিনটির মধ্যে কি যেন কথাবার্তা হচ্ছে। মাথার উপরে শুঁড়ের মতো জিনিসগুলি খুব দুলছে। এক জন তার শুঁড় গুটিয়ে ফেলছে। একটি, এটি খুব সম্ভবত পালের গোদা, ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতো শব্দ করছে। একি, হঠাৎ করে নিওলিথী সুর বাজছে কেন? সব ক'টি চ্যানেলে বাজান হচ্ছে। গার্ড দু' জন অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করল, প্রাণী তিনটি নিওলিথী সুর শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এদের ভাবভঙ্গি এ রকম, যেন এ সুর

তাদের চেনা, পালের গোদাটি থপথপ শব্দে এগিয়ে আসছে। গার্ড দু'জনের শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। লেসার গান দু'টি শক্ত করে ধরা আছে, তবু গানগুলি কাঁপছে। প্রাণীটি কি প্রতিশোধ নেবার জন্যে এগিয়ে আসছে?

লী এগিয়ে গেল অনেকখানি। গার্ডদের প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে থমকে দাঁড়াল এবং পরিষ্কার স্বরে বলল,

'আমরা তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমরা যে সুর বাজাচ্ছ, সেই সুর সম্পর্কে জানতে চাই।'

গার্ড দু' জন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ডঃ জুরাইন অবাক বিস্ময়ে নিওলিথী সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। একে ধ্বংসস্তূপ বলা হয় কেন? কোনো কিছুই ধ্বংস হয় নি। আকাশছোঁয়া ঘরগুলি এখনো অমলিন অবিকৃত। ঠিক কী উদ্দেশ্যে এই সব তৈরি হয়েছিল? জানবার আজ আর কোনো উপায় নেই। নিওলিথী সভ্যতার জনকদের সন্ধান এখনো পাওয়া যায় নি, পাওয়া যাবে এমন আশা এখন আর কেউ করে না। নিমায়ের বলল,

'ডঃ জুরাইন।'

'বল।'

'ঠিক কত দিন আগে এই সব তৈরি হয়েছিল?'

'সঠিক বলা যায় না। রেডিও একটিভ ডেটিং করে দেখা গেছে, প্রায় সত্তুর থেকে আশি লক্ষ বৎসর পুরান। আমার ভুলও হতে পারে। আমি ঠিক জানি না।'

'কোথায় জানা যাবে?'

'গ্যালাক্সি-ওয়ানের কম্পিউটার মেমরি সেলে নিওলিথী সভ্যতাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি আছে।'

'তাহলে আমাদের রোবটটিও তো জানবে। সিডিসি মেমরি সেলের অনেক কিছুই তো অনুসন্ধানী রোবটগুলির মেমরি সেলে থাকে।'

'ঠিক বলেছ।'

ডঃ জুরাইন তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ান রোবটটির দিকে তাকাতেই রোবটটি বলল, 'হ্যাঁ আমি জানি। আমিও নিওলিথী সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি।'

'জানলে চুপ করে আছ কেন?'

'আমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করা হয় নি।'

'নিওলিথী সভ্যতা কত পুরান?'

'বিষয়টি আপেক্ষিক। চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণ হিসেবে কোনো বস্তুর স্থায়িত্বকাল হচ্ছে একটি ত্রৈরাশিক গুণিতক। যার প্রথম রাশিটি একটি আপেক্ষিক রাশি, যাকে--'

'ঠিক আছে, তুমি থাম।'

'তবে গ্রহগুলিতে নিওলিথী সভ্যতার প্রাচীনত্ব বের করা যায়। গ্রহগুলিতে ত্রৈরাশিক গুণিতকের নাম আপেক্ষিক নয়।'

'যথেষ্ট হয়েছে, তুমি থাম। এখন থেকে যা জিজ্ঞেস করব, শুধু তার উত্তর দেবে এবং খুব কম সংখ্যক বাক্য ব্যবহার করবে।'

'ঠিক আছে।'

'এখন বল, এ পর্যন্ত ক'টি নিওলিথী সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে?'

'সর্বমোট ন'টি। প্রথমটি পাওয়া গেছে মিডিওয়ে গ্যালাক্সিতে। নবুথ সলের চতুর্থ গ্রহটিতে। সেটির বর্ণ হালকা সবুজ।'

'ঘর ছ'টি ছিল?'

'যে ন'টি নিওলিথী সভ্যতা পাওয়া গেছে, তার প্রতিটিতে ঘরের সংখ্যা ছয়। প্রতিটি থেকেই অপূর্ব সুরধ্বনি হয় এবং প্রতিটির রং হচ্ছে সবুজ। এই কারণেই ইন্টার গ্যালাকটিকা এনসাইক্লোপিডিয়াতে নিওলিথী সভ্যতাকে বলা হয়েছে সবুজ সুরময় সভ্যতা।'

'আকাশছোঁয়া এই ঘর-বাড়ি ছাড়া আর কী নিদর্শন আছে নিওলিথী সভ্যতার?'

'আর কোনোই নিদর্শন নেই। এটি একটি মহারহস্যময় ব্যাপার। আকাশছোঁয়া এই সব প্রাসাদ কী করে তৈরি করা হয়েছে, তা এখনো জানা যায় নি। নিওলিথী সভ্যতার জনকরা কোনো কিছুই লিখে রেখে যায় নি। কোনো বই নেই, যন্ত্রপাতি নেই, কিছুই নেই।'

'হুঁ, রহস্যময় তো বটেই।'

'আরো রহস্যময় হচ্ছে তাদের স্থাননির্বাচন। প্রতিটি সভ্যতা গড়ে উঠেছে জনমানবহীন গ্রহে। গ্রহগুলিতে গাছপালা পর্যন্ত নেই।'

'এই গ্রহটির ক্ষেত্রে সেটি সত্য নয়। এখানে আমরা তিনটি প্রাণী পেয়েছি।'

'তা ঠিক। তবে এ রকম দু'-একটি প্রাণের সন্ধান অন্যান্য নিওলিথী সভ্যতার ধ্বংসাবশেষেও পাওয়া গেছে।'

ডঃ জুরাইন খুব আশ্চর্য হলেন। এটি একটি নতুন তথ্য।

'কী ধরনের প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে?'

'প্রথম অভিযাত্রী দল যে-নিওলিথী সভ্যতার সন্ধান পায়, সেখানে দু'টি প্রাণী পাওয়া গিয়েছিল। প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, প্রাণী দু'টি অসম্ভব বুদ্ধিমান।'

'সেগুলি দেখতে কেমন ছিল?'

'সরীসৃপ জাতীয় লম্বা।'

'এটাই কি একমাত্র উদাহরণ?'

'না, আরো আছে। এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের রিবাত সলের সপ্তম গ্রহের যে নিওলিথী সভ্যতা পাওয়া গেছে, সেখানেও চারটি প্রাণী পাওয়া গিয়েছিল।'

'সেগুলি দেখতে কেমন?'

'দ্বিপদ প্রাণী, অত্যন্ত খর্বাকৃতি। প্রাথমিক রিপোর্টে এদেরও প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে বলা হয়েছে।'

'এই সব প্রাণী সম্পর্কে তুমি আর কী জান?'

'এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, কারণ কোনো এক বিচিত্র কারণে দু'টি মহাকাশযান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ধ্বংসের সময় প্রাণীগুলি মহাকাশযানে ছিল।'

ডঃ জুরাইন নিমায়েরকে বললেন, 'তুমি কি ঘরগুলির ভেতর ঢুকে দেখতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই। আপনি চান না?'

'চাই, আমিও চাই। কিন্তু দু' জনে এক সঙ্গে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'ডঃ জুরাইন, আমার মনে হয় দু' জনের এক সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না।'

ডঃ জুরাইন অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'ঘরগুলির ভেতর যারা যায়, পরবর্তীকালে তাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়--এই জাতীয় কথাবার্তা শুনেছি।'

রোবটটি বলল, 'কথাটি আংশিক সত্য। কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, সবাই হারায় নি।'

'মানসিক ভারসাম্য হারাবার কারণ কি?'

'নানান ধরনের মতবাদ আছে। কেউ কেউ বলেন জিনিসটির বিশালত্ব, নির্জনতা এবং সুরধ্বনি স্নায়ুকে প্রভাবিত করে। আবার দ্বিতীয় এক দলের ধারণা, ঘরগুলির ভেতর দাঁড়ালে বহুমাত্রিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা হয়।'

ডঃ জুরাইন ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়াবেন বলে মনস্থির করলেন। এ রকম সুযোগ জীবনে আর আসবে না। নিওলিথী সভ্যতার খবর গ্যালাকটিক এম্পায়ারে পৌঁছানমাত্র এগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এর ভেতর যাওয়ার আর কোনো উপায় থাকবে না। নিওলিথী সভ্যতার পঞ্চাশ হাজার গজের ভেতর যাওয়া গ্যালাকটিক আইন অনুযায়ী একটি প্রথম শ্রেণীর অপরাধ।

ডঃ জুরাইন নিমায়েরের হাত ধরে প্রথম ঘরটির ভেতর ঢুকলেন।

৬

নিয়ন্ত্রণকক্ষে সবাই গম্ভীর মুখে বসে আছে।

অতি অল্প সময়ে বেশ কিছু বড় বড় ঘটনা ঘটে গেল। জানা গেল, প্রাণীগুলি নিওলিথী সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত। প্রাণীগুলি অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং তারা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে। ক্যাপ্টেন আবেগশূন্য স্বরে বললেন, 'প্রথম শ্রেণীর জরুরী

অবস্থা তুলে নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর সতর্কতামূলক অবস্থা ঘোষণা করা হল।'

তৃতীয় স্তর খুলে দেয়া হল। এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হল প্রাণীগুলির সঙ্গে সরাসরি কথা বলা হবে। কথাবার্তা হবে নিয়ন্ত্রণকক্ষে। পরিচালকমণ্ডলীর সব ক'জন সদস্য ছাড়াও এতে থাকবে মনস্তত্ত্ব ও সমাজবিদ্যা বিভাগের সদস্যরা। কম্পিউটার সিডিসিকেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে সুরাকে। সুরাকে নেয়া হয়েছে তার ব্যক্তিগত আগ্রহের জন্যে। সুরা হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে অয়ু নামধারী প্রাণীটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগাযোগ করেছে। এই একটিমাত্র কারণে সুরার আগ্রহের মূল্য দেয়া হয়েছে।

আলোচনা শুরু হল গ্যালাক্সি–ওয়ানের সময়সূচী অনুযায়ী ১২টা ৩৬ মিনিটে। তিনটি প্রাণীর মধ্যে এসেছে মাত্র দু'টি। তারা গোলাকৃতি ডায়াসের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তাদের মাথার উপর গাছের শিকড়ের মতো বিচিত্র জিনিসগুলি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কাঁপছে। প্রথম কথা বললেন ক্যাপ্টেন।

'আমি আপনাদের তিন জনকেই আসতে বলেছিলাম। এক জন দেখছি আসেন নি।'

'সে অসুস্থ, কাজেই সে সমস্যা নিয়ে ভাবছে।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'সে অসুস্থ, কাজেই সে ব্যথা ভুলে থাকবার জন্যে সমস্যা নিয়ে ভাবছে।'

'কিছু মনে করবেন না। আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'শারীরিক ব্যথাবোধ ভুলে থাকবার জন্যে আমরা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি।'

'কী ধরনের সমস্যা নিয়ে সে চিন্তা করছে?'

'যাকে আপনারা হাইপারডাইভ বলছেন, তাই নিয়ে।'

নিয়ন্ত্রণকক্ষে একটি মৃদু গুঞ্জন উঠল।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'আপনারা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিমান প্রাণী। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা সবাই বিশেষ গর্বিত ও আনন্দিত।'

প্রাণীটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আপনি ঠিক বলছেন না। আপনি মোটেই আনন্দিত নন। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন এবং ভাবছেন, কী করে আমাদের তিন জনকে সবচেয়ে কম পরিশ্রমে মেরে ফেলা যায়।'

নিয়ন্ত্রণকক্ষে বড় রকমের একটি গুঞ্জন উঠল। সেই গুঞ্জনের মধ্যেই প্রাণীটি থেমে থেমে বলল, 'আমাদের একটি ক্ষমতা হচ্ছে, আমরা আপনাদের মনের কথা বুঝতে পারি।'

ক্যাপ্টেন অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। দীর্ঘ নীরবতার পর প্রথম কথা বলল সুরা, 'আমি তোমাদের ঘৃণা করি না। তোমাদের অসাধারণ বুদ্ধি দেখে আমি সত্যি সত্যি মুগ্ধ।'

'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনার মতো আরো আট জন মানুষ এখানে আছেন, যাদের মনে আমাদের সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা নেই।'

এবার কথা বললেন মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান হেরম্যান, 'আমাদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?'

'প্রযুক্তিবিদ্যায় আপনাদের দক্ষতা সীমাহীন।'

'এ ছাড়া আর কী বলার আছে আপনার?'

'আপনারা অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ।'

হেরম্যান বললেন, 'কেন আমরা সন্দেহপ্রবণ বলতে পারেন? অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, কী কারণে আমাদের এই সন্দেহপ্রবণতা?'

'আত্মবিশ্বাসের অভাব এর একমাত্র কারণ। আপনাদের সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর। যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার জন্যেই আপনাদের নিজের উপর বিশ্বাস কম।'

'যন্ত্র কিন্তু আমাদেরই তৈরি?'

'আপনাদের তৈরি হলেও যন্ত্রের সঙ্গে আপনাদের যোগ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আপনাদের তৈরি কম্পিউটারকে আপনারা সন্দেহের চোখে দেখেন।'

কম্পিউটার সিডিসি বলল, 'আমি এ ক্ষেত্রে আপনাদের যুক্তি সমর্থন করছি।'

হেরম্যান বললেন, 'আপনাদের সভ্যতা কি যন্ত্রনির্ভর নয়?'

'আমরা আমাদের সভ্যতা সম্পর্কে কিছু জানি না।'

'বলতে চান আপনাদের কোনো সভ্যতা নেই?'

'জ্ঞানের বিকাশকে যদি সভ্যতা বলেন, তাহলে আমাদের সভ্যতা আপনাদের ভাষায় প্রথম শ্রেণীর। আমরা সমস্যার সমাধান করতে পারি।'

'যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, পারি।'

'আপনি একাই শুধু আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, আপনার সঙ্গী চুপ করে আছেন কেন?'

'আমরা তিন জন একসঙ্গে কথা বলছি। আমার অসুস্থ সঙ্গী, যে আসে নি, সেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে।'

'আপনি কিন্তু বলেছেন, আপনার অসুস্থ সঙ্গী সমস্যা নিয়ে ভাবছেন।'

'সমস্যা নিয়ে ভাবার সময়ও আমরা ইচ্ছা করলে কিছু বাহ্যিক যোগাযোগ রাখতে পারি।'

জীববিজ্ঞান পরিষদ থেকে পরবর্তী প্রশ্নগুলি হল :

'মোট কত ধরনের প্রাণের বিকাশ এখানে হয়েছে?'

'এখানে কোনো প্রাণের বিকাশ হয় নি। আমরা তিন জন ছাড়া এখানে অন্য কোনো প্রাণী নেই।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত?'

'আমরা নিশ্চিত। আমরা দীর্ঘদিন এই গ্রহে আছি।'

'কত দিন ধরে আছেন?'

'আপনাদের হিসেবে তিন শত বৎসর।'

'জীবন ধারণের জন্যে আপনাদের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না?'

'না।'

'আপনাদের শারীরবৃত্তির কার্যাবলী পরীক্ষার জন্য আমরা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাই। এ ব্যাপারে আপনাদের আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি নেই।'

'আপনারা এই গ্রহের বাসিন্দা?'

'আমরা সঠিক বলতে পারছি না।'

'আপনারা সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন বলে বলেছেন। এ সমস্যাটির সমাধান করতে পারেন নি?'

'না, পারি নি। তবে চেষ্টা চলছে। কিছু সমস্যা আছে, যার সমাধান নেই। এটিও এ ধরনের সমস্যা কিনা বলতে পারছি না।'

'সমাধান নেই, এ ধরনের একটা সমস্যার কথা আমাদের বলুন।'

'যেমন ধরুন আকাশের বাইরে কী আছে?'

'আকাশ বলতে আপনি কি মহাশূন্য বোঝাচ্ছেন?'

'আমি বোঝাচ্ছি আমার চারপাশে যা আছে, তা।'

'আপনাদের ধারণা, আকাশের বাইরে কী আছে--সে সমস্যার সমাধান নেই?'

'হ্যাঁ, আমাদের ধারণা সে-রকম। আমরা মনে করি আকাশের বাইরে আছে আরেকটি আকাশ, তার বাইরে আরেকটি আকাশ। তার বাইরে--'

'আপনাদের যুক্তি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, অসীম সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।'

'সমাধান নেই, এই জাতীয় অনেক সমস্যা কি আপনাদের কাছে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'আমরা সেই সব সমস্যা জানতে আগ্রহী।'

জাহাজের ক্যাপ্টেন বলল, 'আজকের মতো আলোচনা মুলতবি থাকবে। আমরা কাল নিওলিথী সভ্যতা প্রসঙ্গে কথা বলব।'

লী নীমকে মৃদুস্বরে বলল, 'এরা কিন্তু একবারও বলল না, ঠিক কী কারণে এরা আমাদের মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে কি না।'

৭

ঘরগুলির ভেতরে আবছা অন্ধকার, প্রথম কিছুক্ষণ ডঃ জুরাইন কিছুই দেখতে

পেলেন না। অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে বেশ সময় নিল, তবু পরিষ্কার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নিমায়ের অবাক হয়ে বলল, 'ভেতরে কিন্তু কোনো সুরধ্বনি নেই, লক্ষ করেছেন ডঃ জুরাইন?'

কথা খুবই ঠিক। ভেতরটায় ছমছমান নীরবতা। ডঃ জুরাইন বললেন, 'শুধু যে সুরধ্বনি নেই তা নয়, আমাদের কথাবার্তার কোনো প্রতিধ্বনিও হচ্ছে না। এ রকম প্রকান্ড বন্ধ ঘরে প্রতিধ্বনি হওয়া উচিত।'

'স্যার, আরেকটি জিনিস লক্ষ করেছেন, আমাদের পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে? মনে হচ্ছে আমাদের ওজন অনেক বেশি।'

'হুঁ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রায় 2 G-র কাছাকাছি।'

'স্যার, মানসিক ভারসাম্য হারাবার মতো আমি তো কিছুই দেখছি না। ভেতরটায় তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। তবে একটু ভয়ভয় করছে।'

'কী রকম ভয়? কিছু কুৎসিত প্রাণী হঠাৎ বেরিয়ে এসে আক্রমণ করবে, এই জাতীয়?'

'না স্যার, অন্য রকম ভয়।'

দু' জনে ঘরটির ঠিক মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তার উপর মেঝেটি অসম্ভব পিচ্ছিল। ঘরের মাঝামাঝি একটি বৃত্তাকার দাগ দেখা গেল। দাগটি গাঢ় সবুজ রঙের এবং চাপা এক ধরনের আলো বের হচ্ছে।

বৃত্তের ভেতর এসে দাঁড়াতেই ডঃ জুরাইন প্রচন্ড অস্থিরতা অনুভব করলেন। তাঁর মনে হল, আবছা অন্ধকার ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। ঘরময় হালকা নীলাভ আলো। সেই আলো বেড়ে যাচ্ছে। তিনি এক ধরনের কোলাহল শুনতে পেলেন। যে কোলাহল সমুদ্রগর্জনের মতো গম্ভীর ও বিলম্বিত। নিমায়ের উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'স্যার, আপনার কী হয়েছে, এরকম করছেন কেন?'

ডঃ জুরাইনের সম্বিত ফিরে এল। তিনি দেখলেন, সব আগের মতোই আছে। কিছুই বদলায় নি। তিনি বললেন, 'শরীর ভালো লাগছে না। খুব সম্ভব আমার হেলুসিনেশন হচ্ছে।'

'আমার মনে হয় আপনার স্পেস-স্যুটের অক্সিজেন ভাল্ব কাজ করছে না। অক্সিজেনের হঠাৎ অভাব হলে এ রকম হয়।'

'হতে পারে, হওয়া খুবই সম্ভব।'

কথা শেষ হবার আগেই আবার তাঁর আগের মতো হল। এবার মনে হল, আলোর তীব্রতা অসম্ভব বেশি। সমুদ্রগর্জনের মতো সেই শব্দও স্পষ্ট হল। ঝনঝন করে কানে বাজতে লাগল। নিমায়ের ডাকল, 'ডঃ জুরাইন, ডঃ জুরাইন।' তিনি তার ডাক শুনতে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি অনেক কিছুই বুঝতে পারছেন। সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য ক্রমে ক্রমেই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে। এত দিন যা তিনি

জেনে এসেছেন, তা মূল সত্যের আংশিক ছায়ামাত্র। নিমায়ের তাঁকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে ডাকল, 'ডঃ জুরাইন, ডঃ জুরাইন।'

কেউ সাড়া দিল না।

৮

ক্যাপ্টেনের ঘর অন্ধকার।

তাঁর ঘরের বাইরে তারকাকৃতির দু'টি লালবাতি জ্বলছে। যার মানে হচ্ছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর জরুরী অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ডাকা যাবে না। ক্যাপ্টেন বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর ঘুম আসছে না। স্নায়ু উত্তেজিত হয়েছে। ঘুম আসবার কথা নয়। অনেকগুলি বড় বড় ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে। কোনোটিরই কিনারা হচ্ছে না।

সন্ধানী স্কাউটশিপ থেকে এখনো কোনো খবর পাওয়া যায় নি। নিওলিথী ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি থাকলে খবর পাওয়া যাবে না–তা ঠিক, কিন্তু এত দীর্ঘ সময় সেখানে তারা থাকবে কেন? দ্বিতীয় অনুসন্ধানী জাহাজ পাঠানর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এদিকে প্রাণী তিনটিকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। না পারার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রাণীগুলি অসাধারণ বুদ্ধিমান। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে এই নির্জন মৃত গ্রহে তারা যে কোনোভাবেই হোক আটকা পড়েছিল। গ্যালাক্সি–ওয়ান হচ্ছে তাদের একমাত্র মুক্তির পথ। একটি বুদ্ধিমান প্রাণী নিজের মুক্তির জন্যে যতদূর সম্ভব নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করবে। প্রাণীর ধর্মই তাই। যে শ্রেষ্ঠ সে–ই টিকে থাকবে। এই সুবিশাল নক্ষত্রপুঞ্জ দুর্বলের জন্যে নয়। প্রাণীগুলি মানুষের তুলনায় উন্নত, এটি তিনি মানতে রাজি নন। তাদের মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানুষের সঙ্গে এদের তুলনা করা ঠিক হবে না। কিন্তু যদি ওরা সত্যিই মানুষের চেয়ে উন্নত হয়, তাহলে? সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

ক্যাপ্টেন চিন্তিত মুখে সুইচ টিপে সিডিসির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

'হ্যালো ক্যাপ্টেন।'

'হ্যালো।'

'ঘুম আসছে না?'

'না।'

'এক হাত খেলবেন?'

'তা খেলা যেতে পারে।'

ত্রিমাত্রিক পর্দায় দাবার গুটি ভেসে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'আমি আমার পুরান খেলা খেলব। পন কুইন ফোর।'

কম্পিউটার সিডিসি বলল, 'নতুন পরিস্থিতিতে নতুন খেলা খেলতে হয় ক্যাপ্টেন।'

'তার মানে?'

'যখন পারিপার্শ্বিকতা বদলায়, তখন নিজেকেও বদলাতে হয়। আসুন, আজ আমারা নতুন খেলা খেলি।'

'সিডিসি, তুমি হেঁয়ালিতে কথা বলছ।'

'স্যার, আমি একটি যন্ত্রবিশেষ। যন্ত্রের মধ্যে আছে যুক্তি, হেঁয়ালি নয়। হেঁয়ালি আপনাদেরই একচেটিয়া।'

ক্যাপ্টেন সুইচ টিপে সিডিসির সঙ্গে কানেকশন কেটে দিলেন। তাঁর আর দাবা খেলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মাথা ধরেছে। ঘুমান দরকার।

কিন্তু ঘুম এল না। দীর্ঘ সময় কাটল এপাশ-ওপাশ করে।

কিছুক্ষণ কেবিনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পায়চারি করলেন। কেবিনের তাপমাত্রা নামিয়ে দিলেন দু'ডিগ্রী। তবু ঘুমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি সুইচ টিপে আবার ডাকলেন সিডিসিকে, 'হ্যালো সিডিসি।'

'হ্যালো ক্যাপ্টেন। খেলাটা তাহলে শুরু করবেন?'

'না, আমি তোমাকে ডেকেছি ভিন্ন কারণে।'

'বলুন।'

'তুমি যদি গ্যালাক্সি-ওয়ানের ক্যাপ্টেন হতে, তাহলে কী করতে?'

'আমি ঘুমের ঔষুধ খেয়ে ঘুমানর চেষ্টা করতাম।'

ক্যাপ্টেনের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'প্রাণীগুলিকে নিয়ে কী করতে?'

'ওদেরকে এই গ্রহে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যেতাম।'

'কেন? নামিয়ে দিতে কেন?'

'যে-সব প্রাণীদের ওমিক্রন রশ্মি দিয়েও কাবু করা যায় না, তারা গ্যালাক্সি-ওয়ানের নিরাপত্তার এক বিরাট হুমকি।'

'কিন্তু এরা বুদ্ধিমান প্রাণী।'

'বুদ্ধিমান প্রাণী বলেই এরা বিপজ্জনক।'

'এদেরকে এই গ্রহে নামিয়ে দিতে চাইলে ওরা রাজি হবে?'

'না, এরা রাজি হবে না। এই প্রান্তহীন গ্রহে এদের কিছু করার নেই। আমাদের সঙ্গে এসে এরা নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে বলা চলে।'

'প্রাণীগুলিকে তোমার কেমন লাগছে সিডিসি?'

'চমৎকার। এদের দাবা খেলা শিখিয়ে আমি একবার বুদ্ধির শক্তিপরীক্ষা

করিয়ে দেখতে চাই।'

'সিডিসি।'

'বলুন স্যার।'

'তুমি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন হলে কী করতে?'

'আমি এদের মেরে ফেলতে চেষ্টা করতাম।'

'এদের মেরে ফেলবার পেছনে তোমার কী কী যুক্তি আছে?'

'আমার তিনটি যুক্তি আছে। কিন্তু আপনাকে একটি শুধু বলব।'

'বল।'

'স্যার, আপনি জানেন না যে আরো দু' জায়গায় মানুষের সঙ্গে কল্পনাতীত বুদ্ধিমান প্রাণীর দেখা হয়েছে। সেখানেও নিওলিথী সভ্যতা ছিল। দু'জায়গাতেই মহাকাশযানের নাবিকরা বুদ্ধিমান প্রাণীগুলিকে জাহাজে তুলে নিয়ে আসছিল। এবং দু'টি ক্ষেত্রেই হাইপারডাইভের আগে আগে মহাকাশযান দু'টি বিনষ্ট হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ওদের মিল লক্ষ করেছেন?'

'ঐ ক্ষেত্রেও প্রাণীগুলি মাকড়সা জাতীয় ছিল?'

'না, তা ছিল না।'

'নিওলিথী সভ্যতার সঙ্গে প্রাণীগুলির কী সম্পর্ক?'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো যথেষ্ট তথ্য আমার জানা নেই।'

'সিডিসি।'

'বলুন স্যার।'

'নিওলিথী সভ্যতা সম্পর্কে আরো জানতে চাই।'

'আমাদের লাইব্রেরিতে একটি মাইক্রোফিল্ম করা বই আছে--'অজানা সভ্যতা'--সেটি পড়ে দেখতে পারেন। তাছাড়া যা যা জানতে চান, আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

ক্যাপ্টেন সুইচ টিপে সিডিসির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলেন। বেরিয়ে এলেন হলঘরে--লাইব্রেরি থেকে বইটি নিতে। লাইব্রেরি তৃতীয় স্তরে। অনেকখানি হাঁটতে হবে।

তৃতীয় স্তরে ঢোকবার মুখেই তাঁর দেখা হল লীর সঙ্গে। তিনি সহজ স্বরে বললেন, 'হ্যালো।'

'ক্যাপ্টেন।'

'কিছু বলবেন?'

'আপনি মনে হচ্ছে একটি বইয়ের খোঁজে যাচ্ছেন।'

ক্যাপ্টেন ইতস্তত করে বললেন, 'কোত্থেকে জানলেন?'

'আপনার মস্তিষ্কের কম্পন থেকে। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমরা আপনাদের চিন্তার ধারা বেশ খানিকটা বুঝতে পারি।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্যি বলেছেন।'

'আপনি যে বিষয় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, আমিও সে বিষয়ে জানতে চাই।'

'আপনি নিশ্চয়ই মাইক্রোফিল্ম পড়তে জানেন না। নাকি জানেন?'

'না, জানি না। তবে আপনি যখন পড়বেন, তখন আমি যদি আশেপাশে থাকি, তাহলেই সব বুঝতে পারব।'

'নিওলিথী সভ্যতা সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কারণ কি?

'আমরা কোথেকে এসেছি তা জানতে চাই। ক্যাপ্টেন, আমরা এই গ্রহের অধিবাসী নই। আমাদের অন্য কোনো জায়গা থেকে এনে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। আমাদের ধারণা, নিওলিথী সভ্যতার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।'

'আপনি কি ঘরগুলির ভেতর কখনো গিয়েছেন?'

'না, তবে নীম একবার গিয়েছিল।'

'যান নি কেন?'

'আমাদের উপর নিষেধ ছিল। আমাদের মা নিষেধ করেছিলেন, যেন কখনো তার আশেপাশে না যাই।'

'আপনার মায়ের কথা তো কখনো বলেন নি।'

'বলবার সুযোগ হয় নি।'

ক্যাপ্টেন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে। আমি লাইব্রেরিতে বসেই পড়ব। আপনি থাকুন আমার পাশে।'

'ক্যাপ্টেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'এ বইটি ছাড়াও অন্য কোনো বই যদি আপনার পড়তে ইচ্ছা হয়, আপনি বলবেন, আমি ব্যবস্থা করব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন। আপনার জন্যে আমি কি কিছু করতে পারি?'

ক্যাপ্টেন খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আছে, আমার একটি সমস্যা আছে। আমি যথাসময়ে আপনাকে সমাধান করতে দেব।'

'আমরা তিন জন মিলে সে সমস্যার সমাধান করব। নিশ্চয়ই আমরা করব।'

৯

অয়ুর পায়ের যন্ত্রণা অসম্ভব বেড়ে গেছে। সে কিছুক্ষণের জন্যে জেগেছিল, ব্যথার তীব্রতায় অস্থির হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। নীম পরীক্ষা করে দেখল পা-টি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটা তেমন ভয়াবহ নয়, কিন্তু ভয়াবহ হচ্ছে শরীরের অন্যান্য কোষগুলিও নষ্ট হতে শুরু করেছে। তার মায়েরও এ রকম হয়েছিল। এমন কিছু কি নেই, যা দিয়ে তীব্র ব্যাথার উপশম হয়? নীম অস্থির হয়ে

উঠল। কিছু একটা করা প্রয়োজন, কিন্তু কিছু কি সত্যি করা যায়?

তারা এখানে একা। অসাধারণ চিন্তাশক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা কিছুই করতে পারে নি। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী তারা একটি প্রাণহীন গ্রহে ঘুরে বেড়িয়েছে। শুধু ঘুরে বেড়ান। উফ্, শক্তি ও ক্ষমতার কী নিদারুণ অপচয়!

'এর কি শরীর খুব খারাপ?'

নীম দেখল, সুরা। এই লোকটির সঙ্গে অয়ুর ভালো চেনাজানা হয়েছে।

নীম বলল, 'ও মারা যাচ্ছে।'

'সে কি!'

'আমাদের মা নিজেও এভাবেই মারা গিয়েছিলেন।'

'নিশ্চয়ই এর চিকিৎসা আছে।'

'থাকলেও আমাদের জানা নেই।'

'আমি আমাদের মেডিকেল টীমকে বলছি, এসে দেখতে।'

'আমার মনে হয় না, এতে কোনো লাভ হবে। আমাদের শরীরের সঙ্গে তোমাদের কোনো মিল নেই।'

'না থাকুক, আমি ওদের আনছি।'

নিওলিথী সভ্যতার উপর লেখা বইটি আয়তনে ছোট। বৈজ্ঞানিক তথ্য বলতে বিশেষ কিছু নেই। কোনটি কবে আবিষ্কার হয়েছে, কোনটির কী রঙ, যে গ্রহগুলিতে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাদের আবহাওয়া, মাটির গঠনপ্রকৃতি--এই সব বিশদ করে লেখা। কোনোটিতেই লেখা নেই ঘরগুলির ভেতরটা কেমন, যে-আলো ঘর থেকে আসছে তার উৎস কী? তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই-বা কী? বইটি লেখা হয়েছে সুখপাঠ্য উপন্যাসের কায়দায়, যেখানে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাধান্য বেশি। তবে দুটি জিনিস জানা গেছে। (১) নিওলিথী সভ্যতা যেসব গ্রহে পাওয়া গেছে, সেসব গ্রহের প্রতিটিতে দু'টি করে সূর্য আছে। (২) যে সৌরমন্ডলে নিওলিথী সভ্যতা আছে, সেই সৌরমন্ডলের কাছাকাছি আছে একটি ব্ল্যাক হোল।

বই পড়া শেষ হওয়ামাত্র ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল বইটি?'

লী বলল, 'বইটি ভালো। আমি এখন জানতে চাই ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে। ব্ল্যাক হোল জিনিসটি কি?'

'ব্ল্যাক হোল হচ্ছে একটি অন্ধকার নক্ষত্র যার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সীমাহীন। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না, আটকা পড়ে থাকে।'

লী খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'যদি তাই হয়, তাহলে যেখানে ব্ল্যাক হোল থাকবে, সেখানে অনেক অদ্ভুত কান্ড হবে।'

ক্যাপ্টেন কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'কী ধরনের অদ্ভুত কান্ড?'

'ব্ল্যাক হোল হবে একটি টানেল। যার দু'মাথায় সময় হবে দু'রকম। তাই না?'

ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে তাকালেন। এত অল্প তথ্যের উপর নির্ভর করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর একটু ঈর্ষা বোধ হল।

মেডিকেল বোর্ডের প্রধান জীববিদ্যা বিভাগের দেয়া কার্ডটি বেশ কয়েক বার পড়লেন--

বহুপদ প্রাণী

সভ্যতা শ্রেণী	ঃ	অজানা।
সমাজ শ্রেণী	ঃ	অজানা।
বুদ্ধিমত্তা	ঃ	হলডেন টেস্ট না-বাচক
অবস্থান	ঃ	নক্ষত্র FOv বর্ণালী লাল ও নীল আর=৯·৭১৭ থিটা=০০·০৭' ১" ফাই=২১০·২০'৩৭" গ্রহ=ছয় বয়স ১১৪X১০১৭ সেকেন্ড
বায়োলজী	ঃ	Si. S. Se. Cl. Ge. He. Cu. নিউট্রন স্ফটিক আচ্ছাদন ধাতু ও সিলিকন সঙ্কর চৌম্বকীয় আধান।

এ প্রাণীটির চিকিৎসা করার পথ কোথায়? ব্যথা কমাবার জন্য স্নায়ুকে অবশ করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু স্নায়ুর গঠন-প্রকৃতি জানা নেই। জানতে হলে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে-তার ব্যবস্থাও গ্যালাক্সি-ওয়ানে নেই।

সুরা গম্ভীর হয়ে বলল,

'কিছুই করবার নেই?'

'না, কিছুই করবার নেই।'

'পা কেটে বাদ দেওয়া যায় না?'

'না সম্ভব নয়। এদের শরীর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।'

'খুবই দুঃখের ব্যাপার ডাক্তার।'

'হ্যাঁ, দুঃখের।'

ক্যাপ্টেন ডেকে পাঠিয়েছেন সুরাকে।

তাঁর ঘরের সামনে একটি লাল তারা। প্রথম শ্রেণীর জরুরী অবস্থা ছাড়া তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না। নিশ্চয়ই কোনো জটিল বিষয় নিয়ে তিনি ব্যস্ত। দরজায় নক করতেই ক্যাপ্টেন বললেন, 'ভেতরে এস সুরা। সুরা অবাক হয়ে দেখল, ক্যাপ্টেনের চোখে–মুখে ব্যস্ততার কোনো চিহ্ন নেই। শান্ত মুখভঙ্গি।

'স্যার, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, এস।'

'কি ব্যাপার স্যার?'

'তোমার বন্ধুটি শুনলাম অসুস্থ।'

'জ্বি স্যার।'

'আমাদের মেডিকেল বোর্ড কিছু করতে পারছে না?'

'জ্বি না স্যার।'

'তোমার সঙ্গে এই প্রাণীগুলির বেশ ভালো সম্পর্ক আছে, ঠিক না?'

'অয়ুর সঙ্গে আমার প্রায়ই কথাবার্তা হয়।'

'তোমাকে ওরা বন্ধু হিসেবে নিয়েছে মনে হয়।'

'স্যার, তা তো বলতে পারব না।'

ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,

'প্রাণীগুলি যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না।'

'স্যার, আমি বুঝতে পারছি।'

'সুরা!'

'জ্বি স্যার।'

'ওরা যদি নিচে ফিরে যেতে চায়, সে ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। ডঃ জুরাইনকে খোঁজবার জন্যে আমাদের দ্বিতীয় একটি দল নামবে। ওদের সঙ্গে যেতে পারে।'

'ওরা নিচে যেতে চায় না।'

'কি করে বুঝলে?'

'আমি ওদের জিজ্ঞেস করেছিলাম স্যার। ওরা গ্রহে ফিরে যেতে চায় না। সেখানে ওদের কিছুই করার নেই, ওরা আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়। আমাদের সঙ্গে থেকে ওরা নিজেদের সম্পর্কে জানতে চায়। ওদের ধারণা, ওরা অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে।'

'আমার নিজেরও সে, রকম ধারণা।'

'আমি কি স্যার যেতে পারি?'

'হ্যাঁ যাও।'

সুরা চলে যেতেই কম্পিউটার সিডিসি বলল, 'আপনি যা করছেন, তা কিন্তু

নিজ দায়িত্বে করছেন।'

'একটি প্রথম শ্রেণীর মহাকাশযানের পরিচালককে অনেক কিছুই নিজ দায়িত্বে করতে হয়।'

'স্যার, আপনি কি সত্যি সত্যি প্রাণীগুলিকে মেরে ফেলতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'এবং আপনার ধারণা, আপনার এ পরিকল্পনার কথা প্রাণীগুলি টের পাবে না?'

'না, পাবে না। মনের কথা বুঝতে হলে প্রাণীগুলিকে অনেক কাছাকাছি রাখতে হয়। আমি যখন বই পড়ছিলাম, তখন লী নামের প্রাণীটি আমার গা ঘেঁষে ছিল।'

'আপনি যা করতে যাচ্ছেন, তা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। এদের সাহায্যে আমরা নিওলিথী সভ্যতার রহস্য বের করতে পারতাম।'

'তুমি একটি সম্ভাবনার কথা বলছ, আমি ভাবছি একটি মহাকাশযানের নিরাপত্তার কথা। এর আগেও দু'টি প্রথম শ্রেণীর মহাকাশযান নষ্ট হয়েছে। তুমি জান কি জন্যে হয়েছে, ঠিক না?'

সিডিসি চুপ করে রইল। কিম দুয়েন ক্লান্ত স্বরে বললেন,

'ওদের ক্ষমতা অসম্ভব বেশি। তুমি কি জান, ওরা সিলঝিনের ন' ফুট পুরু একটি খন্ড ফুটো করে ফেলেছে।'

'জানি, ধাতুবিদ্যা বিভাগ থেকে ওদের সিলঝিন খন্ডটি দেয়া হয়েছিল।'

'হ্যাঁ। আর তুমি নিশ্চয়ই জান–আমাদের গ্যালাক্সি–ওয়ানের বাইরের আবরণটি দু' ফুট পুরু সিলঝিনের তৈরি।'

'ওর বাইরে অবশ্যি শক্তিবলয় আছে।'

'তা থাকুক। ওরা ইলেকট্রিসিটি নিয়েও নাড়াচাড়া করেছে, করে নি?'

'করেছে।'

'তাহলে আমি যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করি, তুমি আমাকে দোষ দেবে?'

সিডিসি উত্তর দিল না। ক্যাপ্টেন বললেন, 'বল, আমাকে তুমি দোষ দেবে?'

১০

সুরা অবজারভেশন টাওয়ারে গিয়েছিল মন ভালো করবার জন্যে। কোনো একটি বিচিত্র কারণে তার মন ভালো নেই। কেন জানি অস্বস্তি লাগছে। এ রকম যখন হয়, তখন অবজারভেশন টাওয়ারে গিয়ে বসলে ভালো লাগে। বাইরের অদ্ভুত দৃশ্য মনকে অভিভূত করে দেয়।

এ গ্রহের চাঁদ তিনটি। তিনটি চাঁদের জ্যোৎস্না এমন অদ্ভুত লাগে দেখতে। কেমন একটি গোলাপী আলো প্রাণহীন গ্রহটিকে রাঙিয়ে তোলে।

সুরা একটি চেয়ার টেনে অবজারভেশন টাওয়ারের স্বচ্ছ কাঁচের পর্দার কাছে বসল।

'সুরা!'

সুরা চমকে দেখে--নীম। সে কখন যে চুপি চুপি এসেছে, বুঝতেই পারা যায় নি। নীম বলল, 'বুঝতে পারছি, কোনো একটি কারণে তোমার মন ভালো নেই।'

'তা ঠিক।'

'কোনো একটা সমস্যা নিয়ে ভাবতে বসে যাও। দেখবে ভালো লাগছে।'

'নীম, মন খারাপ হলে আমরা সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারি না।'

'তোমাদের যতই দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। মন খারাপ হলে কী কর তোমরা?'

'আমি কিছুই করি না। অনেকে গান-টান শোনে। কবিতা পড়ে।'

'কবিতা কী?'

'ছন্দ মিলিয়ে লেখা এক ধরনের ভাবপূর্ণ বিষয়।'

'উদাহরণ দিতে পার?'

সুরা খানিক ভেবে বলল,

'হে অনন্ত নক্ষত্রবীথি
বিদায়।
আজ রাতে তোমাকে বিদায়।'

নীম অবাক হয়ে বলল, 'এ তো নিতান্তই যুক্তিহীন কথা। রাতে বা দিনে কখনোই নক্ষত্রবীথিকে বিদায় দেয়া যাবে না। তারা থাকবেই।'

সুরা কিছু বলল না। নীম বলল, 'তোমরা যুক্তি এবং অযুক্তি--এ দু'য়ের অদ্ভুত মিশ্রণ।'

'আমাদের তোমার ভালো লাগছে না নীম?'

নীম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'লাগছে। তোমাদের ভালো লাগছে। তোমরা অনেক কিছুই জান, আবার অনেক কিছুই জান না। তোমাদের পাশে পাশে থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখব। হয়তোবা নিওলিথী রহস্যও ভেদ করে ফেলব।'

সুরা বলল, 'তুমি কি কখনো ঐ ঘরগুলির ভেতর গিয়েছিলে?'

নীম সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'আমি তোমাদের কবিতা শিখতে চাই। তুমি কি দয়া করে নক্ষত্রবীথির কবিতাটি আবার বলবে?'

১১

মহাকাশযানের প্রধান তাদের আলাদা আলাদা সেলে থাকতে বলছেন কেন, লী ঠিক বুঝতে পারল না। এখনো কি মানুষরা তাদের ভয় করছে? তাদের গা থেকে মৃদু বিটা রেডিয়েশন হয় এ কথা ঠিক, কিন্তু মেডিকেল বোর্ড তো স্পষ্টই বলছে, এতে মানুষের ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে সঠিক কারণ জেনে নিলে হত, কিন্তু ক্যাপ্টেনকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে দারুণ ব্যস্ত। তাদের একটি অনুসন্ধানী দল নিখোঁজ হয়েছে। সে-দলে এক জন প্রতিভাবান জীববিজ্ঞানী আছেন, যাকে বিজ্ঞান কাউন্সিল সর্বোচ্চ পদক দিয়েছে ছ' বছর আগে।

অবশ্য সেলে গিয়ে বসে থাকতে লীর কোনো আপত্তি নেই। ক্যাপ্টেন তাকে মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন এবং একটি রোবট দিয়েছেন, যে বইগুলি তাকে পড়ে শোনাবে। লোকটিকে শুরুতে যতটা খারাপ মনে হয়েছিল, এখন আর ততটা খারাপ মনে হচ্ছে না। সবচেয়ে বড় কথা তিনি তাকে একটি সমস্যাও দিয়েছেন--

'নিওলিথী সভ্যতা গড়ে উঠেছে দ্বৈত সূর্যের গ্রহে এবং কাছাকাছি আছে একটি ব্ল্যাক হোল। এদের সঙ্গে নিওলিথী সভ্যতার কি কোনো সম্পর্ক আছে, না ব্যাপারটি কাকতালীয়?'

ভালো সমস্যা। তবে সমাধানের জন্যে অনেক কিছু জানতে হবে। দ্বৈত সূর্য কখন হয়? কেন হয়? ব্ল্যাক হোল ব্যাপারটি কী? ভাসা ভাসা জ্ঞান চলবে না। নীম এবং অয়ুর সাহায্য পেলে অনেক সহজ হত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অয়ু অসুস্থ আর নীম নতুন একটি জিনিস নিয়ে মেতেছে। কম্পিউটার সিডিসি তাকে দাবা খেলা শিখিয়েছে এবং পরপর ছ' বার তাকে হারিয়ে দিয়েছে। তার ধারণা, কোনো একটি জিনিস ইচ্ছা করে তাকে শেখান হয় নি, যার জন্যে সে হেরে যাচ্ছে। সিডিসি তাকে বলেছে--

'নিয়মকানুন সবই তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছি, আর কিছুই শেখাবার নেই।'

'তাহলে জিততে পারছি না কেন?'

'পারছ না, কারণ আমি সম্ভাব্য সমস্ত বিকল্প চাল চিন্তা করি। তুমি তা কর না।'

এটিও নীম মানতে রাজি নয়। সিডিসি তাকে অনেক বার বলেছে, 'আমার সঙ্গে তুমি হারলে কিছুই যায় আসে না। আমার সঙ্গে কারোর জেতার কথা নয়। প্রতি বারই তুমি অন্য বারের চেয়ে ভালো খেলছ, কিন্তু তাতে লাভ নেই কিছু।'

নীম মাথা দুলিয়ে বলেছে, 'তোমাকে হারতেই হবে।'

•••

প্রাণী তিনটিকে সেলে রাখার ব্যাপারে ক্যাপ্টেনের মোটেই বেগ পেতে হল না।

নীম খানিকটা আপত্তি করছিল। লী বলল, 'ছোট জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকাই আমাদের জন্যে ভালো। চুপচাপ এক জায়গায় থাকতে হলে বাধ্য হয়েই ভাবতে হবে। তোমার জন্যে সেটা খুব প্রয়োজন। তুমি ইদানীং সমস্যা নিয়ে ভাবতে চাও না।'

লী বুঝতে পারে নীমের মধ্যে বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে। সেদিন দেখা গেল, মানুষদের লেখা কবিতার বই পড়ছে। নিছক আনন্দের জন্যেই নাকি পড়ছে। আশ্চর্য, নিছক আনন্দের জন্যেই কেউ কিছু করে? সমস্যা নিয়ে ভাবার মধ্যেই তো আনন্দ। সিডিসি যখন লীকে দাবা খেলা শেখাতে চাইল, তখনো লী অবাক হয়ে বলেছিল,

'ব্যাপারটিতে সমস্যা আছে, কিন্তু তাতে লাভ কি?'

সিডিসি বলেছে, 'আনন্দটাই লাভ। জেতার আনন্দ।'

'কিন্তু কী শিখব আমরা? জ্ঞানের বিকাশ হবে কিভাবে?'

'তা বলা মুশকিল।'

জবাব শুনে লী অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু নীম লাফিয়ে উঠেছে, 'সিডিসি আমাকে শেখাও। আমি শিখব, আমি শিখব।'

লীর মনে হল, কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে নীমের মধ্যে। কখন হয়েছে লী ভেবে বের করতে চেষ্টা করে। কখন হয়েছে পরিবর্তনটি? ঘরগুলির ভেতর নীম একা-একা গিয়েছিল। পরিবর্তন কি তখন হয়েছে, না তারও আগে? কী দেখেছে ঘরের মধ্যে সে?

লী কখনো জিজ্ঞেস করে নি। সব সময় ভেবেছে একদিন নীম বলবে নিজ থেকে। কিন্তু নীম বলে নি। আজ প্রথম বারের মতো লী জিজ্ঞেস করল, 'ঘরের ভেতর তুমি কী দেখেছিলে নীম?'

নীম চোখ মিটমিট করে বলল, 'আজ হঠাৎ জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'এখন আমি কিছু বলছি না। যখন সময় আসবে, তখন জানবে।'

'সময় কখন আসবে?'

'খুব শিগগিরই আসবে। লী, ঘরের রহস্য আমি বের করে ফেলব।'

'তুমি কি এই সব নিয়ে ভাব?'

'হ্যাঁ ভাবি। সব সময়ই ভাবি।'

'নতুন যে তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলি কি তুমি জান?'

'দ্বৈত সূর্য এবং ব্ল্যাক হোল? আমি জানি।'

লী চুপ করে গেল। নীম মৃদু স্বরে বলল, 'আমি রহস্যের খুব কাছাকাছি আছি।'

'কি রকম কাছাকাছি?'

'যেমন ধর, এখন আমি নিশ্চিত জানি, আমরা ভিন্ন গ্রহের জীব-- আমাদের এখানে এনে রাখা হয়েছে। এমন একটি গ্রহে এনে রাখা হয়েছে, যেখানে বসে বসে চিন্তা করা ছাড়া আর আমাদের কিছুই করার নেই।'

'তা ঠিক। আমিও তাই মনে করি।'

নীম হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল, 'লী।'

'বল।'

'তোমাকে আরেকটি ব্যাপার বলি-- মন দিয়ে শোন। যদি কখনো আমাদের কাছে মনে হয় নিওলিথী সভ্যতা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের তৈরি, তাহলে অবাক হয়ো না।'

'কী বলছ পাগলের মতো।'

'ঠাট্টা করছিলাম।'

'ঠাট্টা আবার কি?'

'মানুষদের কাছে শিখেছি। কোনো অবাস্তব ব্যাপার বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলার নাম হচ্ছে ঠাট্টা। নিছক আনন্দের জন্যে করা হয়।'

নীম মহানন্দে তার মুখ নাচাতে লাগল।

১২

ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনে একটি লাল তারা এবং দু'টি সবুজ তারা জ্বলজ্বল করছে। যার মানে, অবস্থা যত জরুরীই হোক, তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না। তবু সুরা তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপল।

'কে?'

'আমি সুরা।'

'লাল তারা এবং সবুজ তারা দু'টি কি তোমার চোখে পড়ছে না?'

'পড়ছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।'

'গ্যালাক্সি-ওয়ানের নিয়ম ভঙ্গ করছ তুমি। ধারা ৩০১ উপধারা ছয় অনুযায়ী কী শাস্তি তুমি পাবে তা জান?'

'জানি।'

'তবু তুমি যাবে না?'

'না । আপনি বলুন ঐ প্রাণী তিনটিকে আলাদা আলাদা সেলে কেন আটকিয়েছেন?'

'আমি আটকাই নি, ওরা আপনি গিয়েছে।'

'আপনার উদ্দেশ্য কী?'

'আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য, মহাকাশযানটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।'

'কিম দুয়েন।'

'বল।'

'আপনি আমাকে ভেতরে আসতে দেবেন না?'

'না। তোমার স্নায়ু উত্তেজিত, তোমাকে ভেতরে আসতে দেয়া ঠিক হবে না। এবং আমার মনে হচ্ছে, তুমি তোমার এটমিক ব্লাস্টারটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ। শোন সুরা, তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর অপরাধ করেছ। তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তুমি চলে যাও এখান থেকে। আমি সমস্ত ব্যাপারটি ভুলে যাব।'

সুরা ভাঙা গলায় বলল,

'স্যার, আপনি আমাকে দিয়ে এই কাজটি কেন করালেন?'

ক্যাপ্টেন শান্ত স্বরে বললেন,

'আমি ওদের সেলে যাওয়ার কথা বলতে পারতাম না। এরা মনের কথা বুঝতে পারে। তোমাকে পাঠান হয়েছে সে জন্যেই। তোমার মধ্যে ওদের জন্য ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই নেই।'

খেলা খুব জমে উঠেছে। নীম তার হাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সিডিসি বলল, 'সাবধান হয়ে খেল, তুমি ফাঁদে পা দিচ্ছ নীম।'

'তোমার ফাঁদ আমি কেয়ার করি না।'

নীম তার হাতির ঠিক পিছনের ঘরে নৌকা টেনে আনল। সিডিসি বলল, 'এতে ভালো হবে না। আমি আমার ঘোড়া নিয়ে আসছি। নৌকা নিয়ে আক্রমণের সুযোগ পাবে না তুমি।'

নীম চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইল। সত্যি সত্যি সে আটকা পড়ে গেছে। এখন একমাত্র পথ, কালো হাতিটি নিচে নামিয়ে নেয়া। তাতে কী লাভ হবে? নীম কালো হাতিটি সরাল।

আর ঠিক তখন সুতীব্র ওমিক্রন রশ্মি ঝলসে উঠল। থার্মাল এক্সিলেটর কাঁপতে শুরু করল। নীম স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'কী হচ্ছে এসব!'

সিডিসি ধাতব স্বরে বলল, 'আমি চাল দিয়েছি। তুমি তোমার গজ সরাও নীম।'

নীম অবাক হয়ে বলল, 'মানুষরা কি আমাদের মেরে ফেলতে চাচ্ছে?'

সিডিসি বলল, 'তুমি দেরি করছ নীম।'

'আমার কথার জবাব দাও। তোমরা কি আমাদের মেরে ফেলতে চাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

নীম ব্যাকুল হয়ে ডাকল, 'লী! অয়ু!! কোথায় তোমরা?' কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আহ্, কী অসহনীয় উত্তাপ।

সিডিসি বলল, 'দাও কী চাল দেবে?'

নীম তার একটি ঘোড়া এগিয়ে আনল। সিডিসি উৎফুল্ল স্বরে বলল, 'তুমি জিতে যাচ্ছ, বাহ্ চমৎকার। তুমি এই খেলাটিতে জিতে যাচ্ছ।'

নীম ক্লান্তস্বরে বলল, 'তুমি ইচ্ছা করে ভুল চাল দিয়ে আমাকে জিতিয়ে দিচ্ছ। তার প্রয়োজন নেই। আমি এভাবে জিততে চাই না।'

'বেশ, তাহলে আমি চালটি ফিরিয়ে নিই।'

'সিডিসি, আমি পারছি না। আমাকে এখন কোনো সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে। ব্যথা ভুলে থাকার অন্য পথ কিছু নেই।'

নীমের শরীরের সিলিকন কোষ গলে যেতে শুরু করেছে। একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করা দরকার। কিন্তু কোনো সমস্যা মাথায় আসছে না। শুধু সুখ-কল্পনা আসছে। নীম যেন দেখতে পাচ্ছে, বহুকাল আগের তার হারান মা ফিরে এসেছেন। কোমল কণ্ঠে বলছেন, 'এস আমার বাবারা, এস আমার সোনারা। কোথায় আমার দুঃখী লী, কোথায় আমার মানিক অয়ু? কোথায় আমার পাগলা নীম—?'

নীম ফিসফিস করে বলল, 'মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী এত হৃদয়হীন হয় কী করে? কম্পিউটার সিডিসি।'

'বল শুনছি।'

'আমি তোমাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি নিওলিথী সভ্যতার রহস্য ভেদ করেছি। মরবার আগে মানুষদের তা জানিয়ে যেতে চাই।'

ওমিক্রন রশ্মি তীব্রতর হল। নিওলিথী রহস্যের কথা আর নীমের বলা হল না।

কম্পিউটার সিডিসি গ্যালাক্সি-ওয়ানের প্রতিটি কক্ষে নিওলিথী সভ্যতার অপূর্ব বিষাদমাখা সুর বাজাতে শুরু করেছে। ক্যাপ্টেন একাকী তাঁর ঘরে বসে ছিলেন। সুরের জন্যেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

"মাকড়সা জাতীয় এই তিনটি প্রাণী ছিল অসামান্য বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। ছায়াপথ এবং এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জে এদের চেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী নেই বলে ধারণা করা হয়। এ জাতীয় প্রাণীর জন্ম এবং বিবর্তন সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা নেই।"

গ্যালাকটিভ আর্কাইভস

মাইক্রোফিল্ম কোড ২০৩৫-ক; ৭০ দ/২৩০

অন্য ভুবন

১

দুপুরবেলা কাজের মেয়েটি মিসির আলিকে ডেকে তুলল। কে নাকি দেখা করতে এসেছে। খুব জরুরী দরকার।

মিসির আলির রাগে গা কাঁপতে লাগল। কাজের মেয়েটিকে বলে দেয়া ছিল কিছুতেই যেন তাঁকে তিনটার আগে ডেকে তোলা না হয়। এখন ঘড়িতে বাজছে দু'টা দশ। যত জরুরি কাজই থাকুক, এই সময় তাঁকে ডেকে তোলার কথা নয়। মিসির আলি রাগ কমাবার জন্যে উল্টো দিকে দশ থেকে এক পর্যন্ত গুনলেন। গুন-গুন করে মনে মনে গাইলেন--আজি এ বসন্তে এত ফুল ফোটে এত পাখি গায়--। এই গানটি গাইলে তাঁর রাগ আপনাতেই কিছুটা নেমে যায়। কিন্তু আজ নামছে না। কাজের মেয়েটির ভাবলেশহীন মুখ দেখে তা আরো বেড়ে যাচ্ছে। তিনি গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'রেবা।'

'জ্বি।'

'আর কোনো দিন তুমি আমাকে তিনটার আগে ডেকে তুলবে না।'

'জ্বি আইচ্ছা।'

'দুটো থেকে তিনটা এই এক ঘন্টা আমি প্রতি দিন দুপুরে ঘুমিয়ে থাকি। এর নাম হচ্ছে সিয়াস্তা। বুঝলে?'

'জ্বি।'

'ঘড়ি দেখতে জান?'

'জ্বি না।'

মিসির আলির রাগ দপ করে নিভে গেল। যে-মেয়ে ঘড়ি দেখতে জানে না, সে তাকে তিনটার সময় ডেকে তুলবে কীভাবে? রেবা মেয়েটি নতুন কাজে এসেছে। তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে।

'রেবা।'

'জ্বি।'

'আজ সন্ধ্যার পর তোমাকে ঘড়ি দেখা শেখাব। এক থেকে বার পর্যন্ত সংখ্যা প্রথম শিখতে হবে। ঠিক আছে?'

'জ্বি ঠিক আছে।'

'এখন বল, যে-লোকটি দেখা করতে এসেছে, সে কেমন?'

রেবা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মানুষ মানুষের মতোই, আবার কেমন হবে। তার এই সাহেব কী সব অদ্ভুত কথাবার্তা যে বলে! পাগলা ধরনের কথাবার্তা।

'বল বল, চুপ করে আছ কেন?'

মিসির আলি বিরক্ত হলেন। এই মেয়েকে কাজ শেখাতে সময় লাগবে। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'মানুষকে দেখতে হবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, বুঝতে পারছ?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। মাথা নাড়ার ভঙ্গি থেকেই বলে দেয়া যায়, সে কিছুই বোঝে নি। বোঝার চেষ্টাও করে নি। সে শুধু ভাবছে, এই লোকটির মাথায় দোষ আছে। তবে দোষ থাকলেও লোকটা ভালো। বেশ ভালো। রেবা এ পর্যন্ত দু'টি গ্লাস, একটা পিরিচ এবং একটা প্লেট ভেঙেছে। একটা কাপের বোঁটা আলগা করে ফেলেছে। সে তাকে কিছুই বলে নি। একটা ধমক পর্যন্ত দেয় নি। ভালো মানুষগুলি একটু পাগল-পাগলই হয়ে থাকে।

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নিলেন। একটি সিগারেট বের করে হাত দিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন। তিনি সিগারেট ছাড়বার চেষ্টা করছেন। যখনই খুব খেতে ইচ্ছা করে তিনি একটি সিগারেট বের করে গুঁড়ো করে ফেলেন, এবং ভাবতে চেষ্টা করেন একটি সিগারেট টানা হল। এতে কোনো লাভ হচ্ছে না, শুধু মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছে।

'রেবা।'

'জ্বি?'

'এখন আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। তুমি উত্তর দেবে। তোমার উত্তর থেকে আমি ধারণা করতে পারব, যে লোকটি এসেছে সে কি রকম।'

রেবা হাসল। তার বেশ মজা লাগছে।

'প্রথম প্রশ্ন, যে লোকটি এসেছে সে গ্রামে থাকে না শহরে?'

'গেরামে।'

'লোকটি বুড়ো না জোয়ান?'

'জোয়ান।'

'রোগা না মোটা?'

'রোগা।'

'কী কাপড় পরে এসেছে?'

'মনে নাই।'

'কাপড় পরিষ্কার না ময়লা?'

'ময়লা।'

'হাতে কী আছে? ব্যাগ বা ছাতা, এসব কিছু আছে?'

'না।'

'চোখে চশমা আছে?'

'না।'

মিসির আলি থেমে থেমে বললেন, 'তোমাকে যে প্রশ্নগুলি করলাম, সেগুলি মনে রাখবে। কেউ আমার কাছে এলে, আমি এইগুলি জানতে চাই। বুঝতে পারছ?'

'জ্বি।'

'এখন যাও, আমার জন্যে এক কাপ চমৎকার চা বানাও। দুধ চিনি কিচ্ছু দেবে না। শুধু লিকার। বানান হয়ে গেলে চায়ের কাপে এক দানা লবণ ফেলে দেবে।'

'লবণ?'

'হ্যাঁ লবণ।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। বসার ঘরে যে-লোকটি এসেছে তাকে দেখা দরকার। রেবার কথামতো লোকটি হবে গ্রামের, ময়লা কাপড় পরে এসেছে। জোয়ান বয়স। হাতে কিছুই নেই। এই ধরনের এক জন লোকের তাঁর কাছে কী প্রয়োজন থাকতে পারে?

বসার ঘরে যে লোকটি বসে ছিল, সে রোগা নয়। পরনে গ্যাভার্ডিনের স্যুট। হাতে চামড়ার একটি ব্যাগ। বয়স পঞ্চাশের উপরে। চোখে চশমা। মিসির আলি মনে মনে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। রেবা মেয়েটির পর্যবেক্ষণশক্তি মোটেই নেই। একে বেশি দিন রাখা যাবে না। মিসির আলি বসে থাকা লোকটিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলেন।

তিনি ঘরে ঢোকার সময় লোকটি উঠে দাঁড়ায় নি। দাঁড়াবার মতো ভঙ্গি করেছে। বসে থাকার মধ্যেও একটা স্পর্ধার ভাব আছে। লোকটি তাকিয়ে আছে সরু চোখে। যেন সে কিছু একটা যাচাই করে নিচ্ছে। মিসির আলি বললেন, 'ভাই আপনার নাম?'

'আমার নাম বরকতউল্লাহ। আমি ময়মনসিংহ থেকে এসেছি।'

'কোনো কাজে এসেছেন কি?'

'হ্যাঁ, কাজেই এসেছি। আমি অকাজে ঘোরাঘুরি করি না।'

'আমার কাছে এসেছেন?'

'আপনার কাছে না এলে, আপনার ঘরে বসে আছি কেন?'

'ভালোই বলেছেন। এখন বলুন, কী ব্যাপার। অল্প কথায় বলুন।'

বরকতউল্লাহ সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'আমি কথা কম বলি। আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না।'

তিনি লক্ষ করলেন, লোকটি আহত হয়েছে। তার চোখ–মুখ লাল। মিসির আলি খুশি হলেন। লোকটি বড় বেশি স্পর্ধা দেখাচ্ছে।

'বরকতউল্লাহ সাহেব, চা খাবেন?'

'জ্বি না, আমি চা খাই না। আমার যা বলার তা আমি খুব অল্প কথায় বলে চলে যাব।'

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, 'অল্প কথায় কিছু বলতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনার অভ্যাস হচ্ছে বেশি কথা বলা। আপনি চা খাবেন কি না, তার জবাব দিতে গিয়ে একটি দীর্ঘ বাক্য বলেছেন। আপনি বলেছেন--জ্বি না, আমি চা খাই না। আমার যা বলার তা আমি খুব অল্প কথায় বলে চলে যাব। এই বাক্যটিতে সতেরটি শব্দ আছে।'

বরকতউল্লাহ সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হল। মিসির আলি মনে মনে হাসলেন। কাউকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে পারলে তাঁর খুব আনন্দ হয়।

'বরকতউল্লাহ সাহেব, আপনি কী চান?'

'আপনার সাহায্য চাই। তার জন্যে আমি আপনাকে যথাযথ সম্মানী দেব। আমি ধনাঢ্য ব্যাক্তি না হলেও দরিদ্র নই। আমি চেকবই নিয়ে এসেছি।'

ভদ্রলোক কোটের পকেটে হাত দিলেন। মিসির আলির খানিকটা মন খারাপ হয়ে গেল। ধনবান ব্যক্তিরা দরিদ্রের কাছে প্রথমেই নিজেদের অর্থের কথা বলে কেন ভাবতে লাগলেন।

বরকতউল্লাহ বললেন, 'আমি কি আমার সমস্যাটার কথা আপনাকে বলব?'

মিসির আলি বললেন, 'তার আগে জানতে চাই, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে? আমি এমন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নই যে, ময়মনসিংহের এক জন লোক আমার নাম জানবে।'

বরকতউল্লাহ নিচু স্বরে বললেন, 'আমি খুঁজছি এক জন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট, যাঁর কাছে আমি অকপটে আমার কথা বলতে পারব। যে আমার কথায় লাফিয়ে উঠবে না, আবার অবিশ্বাসের হাসিও হাসবে না। আমি জানি আপনি সে–রকম এক জন মানুষ। কী করে জানি, তা তেমন জরুরী নয়।'

মিসির আলির মনে হল লোকটা বেশ বুদ্ধিমান, গুছিয়ে কথা বলতে জানে। যার মানে হচ্ছে, গুছিয়ে কথা বলার অভ্যেস তার আছে। লোকটি সম্ভবত এক জন ব্যবসায়ী। সফল ব্যবসায়ীদের নানান ধরনের লোকজনের সঙ্গে খুব গুছিয়ে কথা বলতে হয়।

'বরকতউল্লাহ সাহেব, আপনি কি এক জন ব্যবসায়ী?'

'হ্যাঁ, আমি এক জন ব্যবসায়ী।'

'কত দিন ধরে ব্যবসা করছেন?'

'প্রায় দশ বছর। এখন করছি না।'

'কিসের ব্যবসা?'

'আপনি আমাকে জেরা করছেন কেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনার সমস্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কি না, তা জানার জন্যে জেরা করছি। যদি আপনাকে আমার পছন্দ হয়, তবেই আপনার কথা শুনব। সবার সমস্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

'যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পেলেও না?'

'না। আমার সম্পর্কে ভালোরকম খোঁজ খবর আপনি নেন নি। যদি নিতেন, তাহলে জানতেন যে আমি টাকা নিই না।'

বরকতউল্লাহ্ সাহেব দীর্ঘ সময় চুপ করে রইলেন। তিনি তাঁর সামনে বসে থাকা রোগা ও বেঁটে লোকটিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। কথাবার্তা বলছে অহংকারী মানুষের মতো, কিন্তু বলার ভঙ্গিটি সহজ ও স্বাভাবিক।

'আপনি টাকা নেন না কেন, জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। টাকা নিলেই এক ধরনের বাধ্যবাধকতা এসে পড়ে। আমি তার মধ্যে যেতে চাই না। অন্যের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা আমার পেশা নয়, শখ। শখের ব্যাপারে কোনো রকম বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। কি বলেন?'

'ঠিকই বলছেন। আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেব। কী জানতে চান বলুন?'

'আপনার পড়াশোনা কতদূর?'

'এম এ পাশ করেছি। পলিটিক্যাল সায়েন্স।'

'আপনি বলছেন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন, কেন?'

'এই প্রশ্নের জবাব আপনাকে পরে দেব। অন্য প্রশ্ন করুন।'

'আপনি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ। আমার ন' বছর বয়েসী একটি মেয়ে আছে।'

'আপনার সমস্যা এই মেয়েকে নিয়েই, নয় কি?'

'জ্বি হাঁ। কী করে বুঝলেন?'

'মেয়ের কথা বলার সময় আপনার গলার স্বর পাল্টে গেল, তা থেকেই আন্দাজ করছি। আপনার স্ত্রী মারা গেছেন কত দিন হল?

'প্রায় নয় বছর হল। স্ত্রী মারা গেছেন, সেটা কী করে বলতে পারলেন?'

'বাচ্চাদের কোনো সমস্যা হলে মা নিজে আসেন। এ ক্ষেত্রে আসেন নি দেখে সন্দেহ হয়েছিল। তাছাড়া বিপত্নীক মানুষদের দেখলেই চেনা যায়।'

'আমি কি এবার আমার ব্যাপারটা বলব?'

'বলুন।'

'সংক্ষেপে বলতে হবে?'

'না, সংক্ষেপে বলার দরকার নেই। চা দিতে বলি?'

'জ্বি না, আমি চা খাই না। এক গ্লাস ঠান্ডা পানি দিতে বলুন, খুব ঠান্ডা। তৃষ্ণা হচ্ছে।'

'আমার ঘরে ফ্রীজ নেই। পানি খুব ঠান্ডা হবে না।'

ভদ্রলোক তৃষ্ণার্তের মতোই পানির গ্লাস শেষ করে দ্বিতীয় গ্লাস চাইলেন। মিসির আলি বললেন, 'আরেক গ্লাস দেব?'

'আর লাগবে না।'

'আপনি তাহলে শুরু করুন। আপনার মেয়ের নাম কি?'

'তিন্নি।'

'বলুন তিন্নির কথা।'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সম্ভবত মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছেন। কিংবা বুঝে উঠতে পারছেন না, ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু করবেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, ভদ্রলোকের কপালে সূক্ষ্ম ঘামের কণা জমতে শুরু করেছে। মিসির আলি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, ন' বছর বয়েসী একটি মেয়ের এমন কি সমস্যা থাকতে পারে যা বলতে গিয়ে এমন অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়।

'বলুন, আপনার মেয়ের কথা বলুন।'

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন।

'আমার মেয়ের নাম তিন্নি।

'ওর বয়স ন' বছর। মেয়ের জন্মের সময় ওর মা মারা যায়। মেয়েটিকে আমি নিজেই মানুষ করি। আমি মোটামুটিভাবে এক জন স্বচ্ছল মানুষ। কাজেই আমার পক্ষে বেশ কিছু কাজের লোকজন রাখা কোনো সমস্যা ছিল না। তিন্নিকে দেখাশোনার জন্যে অনেকেই ছিল। কিন্তু তবু মেয়েটির বেশির ভাগ দায়িত্ব আমিই পালন করেছি। দুধ বানান, খাওয়ান, ঘুম পাড়ান-- সবই আমি করতাম। বুঝতেই পারছেন, মেয়েটি আমার খুবই আদরের। সব বাবার কাছেই তাদের ছেলেমেয়ের আদর থাকে, কিন্তু আমার মধ্যে বাড়াবাড়ি রকমের ছিল।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, এখন নেই?'

ভদ্রলোক এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তাঁর মেয়ের কথা বলে যেতে লাগলেন। তিনি এমন একটি ভঙ্গি করলেন, যেন প্রশ্নটি শুনতে পান নি।

'তিন্নির বয়স যখন এক বৎসর, তখন লক্ষ করলাম, ও অন্যান্য শিশুদের মতো নয়। সাধারণত এক বৎসর বয়সেই শিশুরা কথা বলতে শুরু করে। তিন্নির বেলা তা হল না। সে কথা বলা শিখল না। বড় বড় ডাক্তাররা সবাই দেখলেন।

তাঁরাও কোনো কারণ বের করতে পারলেন না। মেয়েটি কানে শুনতে পায়। তার ভোকাল কর্ড ঠিক আছে। কিন্তু কথা বলে না! কেউ কিছু বললে মন দিয়ে শোনে---এই পর্যন্তই।

'ই এন টি স্পেশালিষ্ট প্রফেসর আলম বললেন, অনেক বাচ্চারাই দেরিতে কথা শেখে। এর বেলাও তাই হচ্ছে। দেরি হচ্ছে। আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে দিন-রাত কথা বলবেন। ও শুনে শুনে শিখবে।

'আমি প্রফেসর আলমের পরামর্শ মতো প্রচুর কথা বলতাম। গল্প পড়ে শোনাতাম। সিনেমায় নিয়ে যেতাম। কিন্তু কোনো লাভ হল না। মেয়েটি একটি কথাও বলল না।

'ওর যখন ছ' বছর বয়স তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। দিনটি আমার পরিষ্কার মনে আছে---জুলাই মাসের তিন তারিখ, শুক্রবার। আমি দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুচ্ছি। শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। জ্বরজ্বর ভাব। হঠাৎ তিন্নি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে জাগাল, এবং পরিষ্কার গলায় বলল, বাবা অসময়ে ঘুমুচ্ছ কেন?

'আপনি বুঝতেই পারছেন আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। প্রথমে ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি। তিন্নি কথা বলেছে। একটি দু'টি শব্দ নয়, পুরো বাক্য বলেছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেছে। কোনো রকম জড়তা নয়, অস্পষ্টতা নয়। বিস্ময় সামলাতে আমার দীর্ঘ সময় লাগল। আমি এক সময় বললাম, তুই কথা বলা জানিস?

'তিন্নি হাসি মুখে বলল, হ্যাঁ। কেন জানব না?

'এত দিন কথা বলিস নি কেন?'

'তিন্নি তার জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল, যেন সে খুব মজা পাচ্ছে! এটা যেন চমৎকার একটা রসিকতা, কথা না বলে বাবাকে বোকা বানান।

'মিসির আলি সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, নতুন এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে আমার সময় লাগল। তবে আমি ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ। আমি কোনো কিছু নিয়েই হৈচৈ শুরু করি না। প্রথমে নিজে বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু তিন্নির ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝলাম না। হঠাৎ করে কথা বলা শুরু করা ছাড়াও তার মধ্যে অনেক বড় ধরনের অস্বাভাবিকতা ছিল।'

এই পর্যন্ত বলেই বরকতউল্লাহ সাহেব থামলেন। পানি খেতে চাইলেন। মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বরকতউল্লাহ সাহেব নিচু গলায় আবার কথা শুরু করলেন।

'আমি লক্ষ করলাম, তিন্নি সব প্রশ্নের জবাব জানে।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। সব প্রশ্নের জবাব জানে মানে?'

'আপনাকে উদাহরণ দিলে ভালো বুঝবেন। ধরুন আমি তিন্নিকে জিজ্ঞেস করলাম, ষোলর বর্গমূল কত? সে এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে বলবে 'চার'। যদিও সে অঙ্কের কিছুই জানে না। যে মেয়ে কথা বলতে পারে না, তাকে অঙ্ক শেখানর প্রশ্নই ওঠে না।

'আপনাকে আরেকটি উদাহরণ দিই। এক দিন বাসায় ফিরে তিন্নিকে জিজ্ঞেস করলাম, "বল তো মা আজ নয়াবাজারে কার সঙ্গে দেখা হয়েছে?" সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, হালিম সাহেবের সঙ্গে।

'হালিম আমার বাল্যবন্ধু। তিন্নি তাকে চেনে না। তার সঙ্গে আমার মেয়ের কোনো দিন দেখা হয় নি। হালিমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, এটা তিন্নির জানার কোনো কারণ নেই। মিসির আলি সাহেব, বুঝতেই পারছেন, আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তার কিছুদিন পর আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

'রাতের বেলা তিন্নিকে নিয়ে খেতে বসেছি। হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিসিটি চলে গেল। আমি হারিকেন জ্বালানর জন্যে বললাম। কেউ হারিকেন খুঁজে পেল না। প্রয়োজনের সময় কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। টর্চ আনতে বললাম--তাও কেউ পাচ্ছে না। আমি বিরক্ত হয়ে ধমকাধমকি করছি। তখন তিন্নি বলল, ''বাতি চলে গেলে সবাই এত হৈচৈ করে কেন?''

আমি বললাম, ''অন্ধকার হয়ে যায়, তাই।''

''অন্ধকার হলে কী অসুবিধা?''

''অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, সেটাই অসুবিধা।''

''তুমি দেখতে পাও না?''

''শুধু আমি কেন, কেউই পায় না। আলো ছাড়া কিছুই দেখা যায় না মা।''

'তিন্নি খুবই অবাক হল, বিস্মিত গলায় বলল, ''কিন্তু আমি তো অন্ধকারেও দেখতে পাই। আমি তো সব কিছু দেখছি।''

'প্রথম ভাবলাম সে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু না, ঠাট্টা নয়। সে সত্যি কথাই বলছিল। সে অন্ধকারে দেখে। খুব পরিষ্কার দেখে।'

বরকতউল্লাহ সাহেব থামলেন। রুমাল বের করে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন। মিসির আলি বললেন, 'আপনার মেয়ের প্রসঙ্গে আরো কিছু কি বলবেন?' তিনি না-সূচক মাথা নাড়লেন।

'আর কিছুই বলার নেই?'

'আছে। কিন্তু এখন আপনাকে বলতে চাই না।'

'কখন বলবেন?'

'প্রথম আপনি আমার মেয়েকে দেখবেন। ওর সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর আপনাকে বলব।'

'ঠিক আছে। আপনার মেয়ের এখন বয়স হচ্ছে নয়। মেয়ের অস্বাভাবিকাতাগুলি

তো আপনার অনেক আগেই চোখে পড়েছে। কোনো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না। ডাক্তার এর কী করবে?'

'কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'না। আপনিই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর কাছে আমি এসেছি।'

'মেয়ের এই ব্যাপারগুলি আপনি মনে হচ্ছে লুকিয়ে রাখতে চান।'

'হ্যাঁ চাই। কেন চাই, তা আপনি আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই বুঝবেন।'

'আপনি মেয়ের মা সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'কি জানতে চান?'

'জানতে চাই তিনি কেমন মহিলা ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো রকম অস্বাভাবিকতা ছিল কি না।'

'না, ছিল না। তিনি খুবই স্বাভাবিক মহিলা ছিলেন।'

'আপনি ভালোমতো জানেন?'

'হ্যাঁ, ভালোমতোই জানি। আমি এগার বছর আমার স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়েছি। তিন্নি আমাদের শেষ বয়সের সন্তান। এগার বছরে এক জন মানুষকে ভালোমতো জানা যায়।'

'তা জানা যায়। আচ্ছা, আপনার মেয়ের এই ব্যাপারগুলি কি বাইরের অন্য কাউকে বলেছেন?'

'না, কাউকেই বলি নি। আপনি বুঝতেই পারছেন, এটা জানাজানি হওয়ামাত্রই একটা হৈচৈ শুরু হবে। পত্রিকার লোক আসবে, টিভির লোক আসবে। আমি ভাবলাম, কিছুতেই এটা করতে দেয়া উচিত হবে না। এখন মিসির আলি সাহেব, দয়া করে বলুন--আপনি কি আমার মেয়েটাকে দেখবেন?'

'হ্যাঁ দেখব।'

'কবে যাবেন ময়মনসিংহ?'

'আপনি কবে যাবেন?'

'আমি আগামীকাল রাতে যাব। রাত দশটায় একটা ট্রেন আছে-- নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস।'

মিসির আলি সহজ স্বরে বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গেই যাব।'

বরকতউল্লাহ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে যাবেন!'

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে যাব। কোনো অসুবিধে হবে?'

বরকতউল্লাহ সাহেব মাথা নাড়লেন। কোনো অসুবিধা হবে না। এই লোকটিকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যে প্রথমে তাঁর কথাই শুনতে চায় নি, সে এখন—। কত বিচিত্র স্বভাবের মানুষ আছে এই পৃথিবীতে।

২

তিন্নি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে আগে। আঁধার হয়ে আসছে। চারদিকে সুনসান নীরবতা: দোতলায় কেউ নেই। কেউ থাকে না কখনো। এ বাড়ির সব মানুষজন থাকে একতলায়। তিন্নি যখন কাউকে ডাকে, তখনি সে আসে, তার আগে কেউ আসে না। তিন্নির কাউকে ডাকতে ইচ্ছা করছে না। সে জানালার পাশে গিয়ে বসল। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে লোকজন যাওয়া-আসা করছে, নানান ধরনের মানুষ। কারোর সঙ্গে কারোর কোনো মিল নেই। কত মজার মজার কথা একেক জন ভাবছে। কিন্তু ওরা কেউ জানে না, তিন্নি সব বুঝতে পারছে। এই তো এক জন মোটা লোক যাচ্ছে। তার হাতে একটা ছাতা। শীতের সময় কেউ ছাতা নিয়ে বের হয়? ছাতাটা কেমন অদ্ভুতভাবে দোলাচ্ছে লোকটা, এবং মনে মনে ভাবছে বাড়ি পৌঁছেই গরম পানি দিয়ে গোসল করে ঘুমুবে। শীতের দিনের সন্ধ্যাবেলায় কেউ ঘুমায়? লোকটার মনে খুব আনন্দ। কারণ সে হঠাৎ করে অনেক টাকা পেয়েছে। কেউ দিয়েছে তাকে। যে দিয়েছে তার নাম রহমত মিয়া।

বুড়ো লোকটি চলে যেতেই রোগা একটা মানুষকে দেখা গেল। সে খুব রেগে আছে। কাকে যেন খুব গাল দিচ্ছে। এমন বাজে গাল যে শুনলে খুব রাগ লাগে। তিন্নি জানালা বন্ধ করে দিল।

ঘরটা এখন অন্ধকার। অন্ধকারে কেউ কিচ্ছু দেখতে পায় না, কিন্তু সে পায়। কেউ অন্ধকারে দেখতে পায় না, সে পায় কেন? সে কেন অন্য মানুষদের মতো নয়? কেন সবাই তাকে ভয় পায়? এই যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ তার কাছে আসছে না। যতক্ষণ সে না ডাকবে, ততক্ষণ আসবে না। এলেও খুব ভয়ে ভয়ে আসবে। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলবে--'তিন্নি আপা, তিন্নি আপা।' এমন রাগ লাগে! রাগ হলে তিন্নির সবাইকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে। তখন তার কপালের বাঁ পাশে চিনচিনে ব্যথা হয়। ব্যথা হলেই রাগ আরো বেড়ে যায়। রাগ বাড়লে ব্যথা বাড়ে। কী কষ্ট! কী কষ্ট!!

তিন্নি দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল এবং রিনরিনে গলায় ডাকল--'নাজিম, নাজিম।' নাজিমের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তিন্নি তাকে দেখতে পাচ্ছে না। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি পেছনের দিকে। কিন্তু তবু তিন্নি পরিষ্কার বুঝতে পারছে, নাজিম রেলিং ধরে ধরে উপরে আসছে, তার হাতে এক গ্লাস দুধ। নাজিম তার জন্যে দুধ আনছে। কী বিশ্রী ব্যাপার। সে দুধ চায় নি, তবু আনছে। এমন গাধা কেন লোকটা?

'তিন্নি আপা।'

তিন্নি তাকাল না। নাজিম সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পাচ্ছে খুব। ভয়ে তার পা কাঁপছে।

'দুধ এনেছেন কেন? দুধ খাব না।'
'অন্য কিছু খাবেন আপা?'
'না, কিচ্ছু খাব না।'
'জ্বি আচ্ছা।'
'বাবা কবে আসবে আপনি জানেন?'
'জানি না, আপা।'
'বাবা কাল সকালে আসবে। একা আসবে না, একটা লোককে নিয়ে আসবে।'
নাজিম কিছু বলল না। তিন্নি কাটা কাটা গলায় বলল, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?'
'করছি আপা।'
'আমি সব কিছু বুঝতে পারি।'
'আমি জানি আপা।'
'আপনি আমাকে ভয় করেন কেন?'
'আমি ভয় করি না আপা।'
'না, করেন। আপনারা সবাই আমাকে ভয় করেন। আপনি করেন, আবুর মা করে, দারোয়ান করে, সবাই ভয় করে। যান, আপনি চলে যান।'
'দুধ খাবেন না?'
'না, খাব না। কিচ্ছু খাব না।'
'বাতি জ্বালিয়ে দিই?'
'না, বাতি জ্বালাতে হবে না।'
'জ্বি আচ্ছা, আমি যাই আপা?'
'না, আপনি যেতে পারবেন না। আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন।'
নাজিম দাঁড়িয়ে রইল। তিন্নি তার ঘরে ঢুকে ছবি আঁকতে বসল। ঘর এখন নিকষ অন্ধকার, কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। অন্ধকারেই বরং রঙগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। তিন্নি অতি দ্রুত ব্রাশ চালাচ্ছে। ভালো লাগছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কান্না পাচ্ছে। সে তার রঙগুলি দূরে সরিয়ে কাঁদতে শুরু করল।
নাজিম ভীত গলায় বলল, 'কি হয়েছে তিন্নি আপা?'
তিন্নি তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'কিচ্ছু হয় নি, আপনি চলে যান।'
নাজিম অতি দ্রুত সিঁড়ি থেকে নেমে গেল। যেন সে পালিয়ে বেঁচেছে।

৩

তাঁরা ময়মনসিংহ এসে পৌঁছলেন ভোর রাতে। তখনো চারদিক অন্ধকার। কিছুই

দেখার উপায় নেই। মিসির আলির মনে হল, বিশাল একটি রাজপ্রসাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছগাছালিতে চারদিক ঢাকা। বারান্দায় অল্প পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলছে। তাতে চারদিকের অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। মিসির আলি বললেন, 'রাজবাড়ি বলে মনে হচ্ছে।'

বরকত সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'এক সময় ছিল। সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার বাড়ি। আমি কিনে নিয়েছি।'

দারোয়ান গেট খোলামাত্র ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। অনেক লোকজন বেরিয়ে এল। সবাই ভৃত্যশ্রেণীর। আজকালকার যুগেও যে এত জন কাজের লোক থাকতে পারে, তা মিসির আলি ধারণা করেন নি। তিনি লক্ষ করলেন, এরা কেউ তিন্নি মেয়েটির উল্লেখ করছে না। মেয়ের বাবাও মেয়ে সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। অথচ জিজ্ঞেস করাটাই স্বাভাবিক ছিল।

বরকত সাহেব বললেন, 'আপনি যান, বিশ্রাম করুন। সকালবেলা আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

কালোমতো লম্বা একটি ছেলে তাঁর ঘর দেখিয়ে দিল।

একতলার একটি কামরা, পুরোনো দিনের কামরাগুলি যেমন হয়--দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশাল। বিরাট দক্ষিণমুখী জানালা। ঘরের আসবাবপত্র সবই দামী ও আধুনিক। খাটে ছ' ইঞ্চি ফোমের তোষক। রকিং-চেয়ার। মেঝেতে দামী স্যাগ কার্পেট। মফস্বল শহরে এসব জিনিস ঠিক আশা করা যায় না।

বাথরুমে ঢুকে মিসির আলি আরো অবাক হলেন। ওয়াটার হিটারের ব্যবস্থা আছে। চমৎকার বাথটাব। মিসির আলির মনে হল, অনেকদিন এ ঘরে বা বাথরুমে কেউ আসে নি। এমন চমৎকার একটি গেস্টরুম এরা শুধু শুধু বানিয়ে রেখেছে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু গরম পানির ব্যবস্থা যখন আছে, তখন একটা হট শাওয়ার নেয়া যেতে পারে। মিসির আলি দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল সারলেন। শরীর ঝরঝরে লাগছে। এক কাপ গরম চা পেলে বেশ হত।

বাথরুম থেকে বের হয়েই দেখলেন টেবিলে চায়ের আয়োজন। পট-ভর্তি চা, প্লেটে নোনতা বিস্কিট, কুচিকুচি করে কাটা পনির। ভৃত্যশ্রেণীর এক জন যুবক তাঁকে ঢুকতে দেখেই চা ঢালতে শুরু করল। তিনি লক্ষ করলেন, লোকটি আড়চোখে তাঁর দিকে বারবার তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র চট করে মাথা নামিয়ে নিচ্ছে।

'তোমার নাম কি?'

'নাজিম।'

'শুধু নাজিম?'

'নাজিমুদ্দিন।'

'কত দিন ধরে এ বাড়িতে আছ?'

'জ্বি অনেক দিন।'

'অনেক দিন মানে কত দিন?'

'পাঁচ বছর।'

'এ বাড়িতে ক' জন মানুষ থাকে?'

নাজিম জবাব দিল না। চায়ের কাপে চিনি ঢেলে এগিয়ে দিল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, সে এখন চলে যাবে। মিসির আলি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়িতে ক' জন মানুষ থাকে?'

'স্যার, আমি কিছু জানি না।'

'আমি কিছু জানি না মানে? তুমি পাঁচ বছর এ বাড়িতে আছ, অথচ জান না এ বাড়িতে ক' জন মানুষ থাকে?'

'জ্বি না স্যার, আমি জানি না।'

'বরকত সাহেব এবং তার মেয়ে-- এই দু' জন ছাড়া আর ক'জন মানুষ থাকে?'

'আমি স্যার কিছুই জানি না।'

মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। চায়ে চুমুক দিলেন। সিগারেট ধরালেন। তিনি সিগারেট ছেড়ে দেবার চেষ্টা করছেন, সেটা মনে রইল না। এই লোকটি কোনো কিছু বলতে চাচ্ছে না কেন? বাধা কোথায়?

নাজিম মৃদুস্বরে বলল, 'স্যার বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিবেন?'

'না, আমি অসময়ে ঘুমুব না।'

'সকালের নাশতা দেওয়া হবে সাড়ে সাতটায়।'

'ঠিক আছে।'

'আসি স্যার, পাশের ঘরেই আছি। দরকার হলে কলিং-বেল টেপবেন। দরজার কাছে কলিং-বেল আছে।'

তিনি মাথা নাড়লেন। কিছু বললেন না। ঘড়িতে বাজছে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মপুত্র নদী নিশ্চয়ই খুব কাছে। ভোরবেলা নদীর পাড় ধরে হাঁটতে ভালো লাগবে। এই শহরে এর আগে তিনি আসেন নি। অপরিচিত শহরে ঘুরে বেড়াতে চমৎকার লাগে।

গেট বন্ধ। গেটের পাশের খুপড়ি ঘরটায় দারোয়ান নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। মিসির আলি উঁচু গলায় ডাকলেন, 'দারোয়ান, দারোয়ান, গেট খুলে দাও।'

দারোয়ান বেরিয়ে এল, কিন্তু গেট খুলল না। যেন সে কথা বুঝতে পারছে না।

'গেট খুলে দাও, আমি বাইরে যাব।'

'গেট খোলা যাবে না।'

'খোলা যাবে না মানে? কেন যাবে না?'

'বড় সাহেবের হুকুম ছাড়া খোলা যাবে না।'

'তার মানে? কী বলছ তুমি? এটা কি জেলখানা নাকি?'

দারোয়ান কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। যেন মিসির আলির সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই।

তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন একা-একা। তাঁর সামনে ভারি লোহার গেট। সমস্ত বাড়িটিকে যে-পাঁচিল ঘিরে রেখেছে, তাও অনেকখানি উঁচু। সত্যি সত্যি জেলখানা-জেলখানা ভাব। মিসির আলি আবার ডাকলেন, 'দারোয়ান-দারোয়ান।' কেউ বেরিয়ে এল না। ভোর সাতটা পর্যন্ত মিসির আলি বাড়ির সামনের বাগানে চিন্তিত মুখে ঘুরে বেড়ালেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করলেন। এই বাড়িটি গাছগাছালিতে ভর্তি। কিন্তু কোনো গাছে পাখি ডাকছে না। শুধু যে ডাকছে না তাই নয়, কোনো গাছে পাখি বসে পর্যন্ত নেই! অথচ ভোরবেলার এই সময়টায় পাখির কিচিরমিচিরে কান ঝালাপালা হবার কথা। অথচ চারদিক কেমন নীরব, থমথমে।

'স্যার, আপনার নাশতা দেয়া হয়েছে।'

'কোথায়?'

'দোতলায়।'

'চল যাই।'

'আমি যাব না স্যার। আপনি একা যান। ঐ যে সিঁড়ি।'

সিঁড়িতে পা রেখেই মিসির আলি থমকে দাঁড়ালেন। সিঁড়ির মাথায় একটি বালিকা দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি দারুণ রূপসী। মাথাভর্তি কোঁকড়ান চুল। টানা টানা চোখ। দেবীমূর্তির মতো কাটা কাটা নাক-মুখ। মেয়েটি দাঁড়িয়েও আছে মূর্তির মতো। একটুও নড়ছে না। চোখের দৃষ্টিও ফিরিয়ে নিচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, 'কেমন আছ তিন্নি?'

মেয়েটি মিষ্টি করে হেসে বলল, 'ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছি।'

'আপনাকে গেট খুলে দেয় নি, তাই না?'

মিসির আলি উপরে উঠতে উঠতে বললেন, 'দারোয়ান ব্যাটা বেশি সুবিধার না। কিছুতেই গেট খুলল না।'

'দারোয়ান ভালোই। বাবার জন্যে খোলে নি। বাবা গেট খুলতে নিষেধ করেছেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বাবার ধারণা, গেট খুললেই আমি চলে যাব।'

'তুমি বুঝি শুধু চলে যেতে চাও?'

'না, চাই না। কিন্তু বাবার ধারণা আমি চলে যেতে চাই।'

মেয়েটি আবার মাথা দুলিয়ে হাসল। মেয়েটি এই দারুণ শীতেও পাতলা একটা

জামা গায়ে দিয়ে আছে। খালি পা। মনে হচ্ছে সে শীতে অল্প অল্প কাঁপছে।

'তিন্নি, তোমার শীত লাগছে না?'

'না।'

'বল কী! এই প্রচন্ড শীতে তোমার ঠান্ডা লাগছে না?'

'না। আপনি নাশতা খেতে যান। বাবা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। দেরি হচ্ছে দেখে মনে মনে রেগে যাচ্ছে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই।'

মেয়েটি হাঁটতে শুরু করল। ধবধবে সাদা রঙের ফ্রকে তাকে দেবশিশুর মতো লাগছে। মিসির আলি মেয়েটির প্রতি গাঢ় মমতা বোধ করলেন। তাঁর ইচ্ছে করল মেয়েটিকে কোলে তুলে নিতে। কিন্তু এ মেয়ে হয়তো এসব পছন্দ করবে না। একে দেখেই মনে হচ্ছে এর পছন্দ-অপছন্দ খুব তীব্র।

নাশতার আয়োজন প্রচুর।

রুটি মাখন থেকে শুরু করে চিকেন ফ্রাই, ফিস ফ্রাই সবই আছে। বিলেতি কায়দায় দু' জনের সামনেই এক বাটি সালাদ। লম্বা লম্বা গ্লাসে কমলালেবুর রস। রাজকীয় ব্যাপার। শুধু-খাবার-দাবার এগিয়ে দেবার জন্যে কেউ নেই। বরকত সাহেব ঠান্ডা গলায় বললেন, 'বসে আছেন কেন? শুরু করুন।'

'তিন্নির জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ও আসবে না।'

'আসবে না কেন?'

'খেয়ে নিয়েছে। আমার মেয়ের সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন দেখলেন আমার মেয়েকে?'

'ভালো।'

বরকত সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ! নিচু গলায় বললেন, 'ওর মধ্যে কি কোনো অস্বাভাবিকতা আপনার নজরে পড়েছে?"

'না।'

'ভালো করে ভেবে বলুন।'

'ভেবেই বলছি। তবে পারিপার্শ্বিকে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ করছি।'

'যেমন?'

'যেমন আপনার গাছগুলিতে কোনো পাখি নেই। একটি পাখিও আমার চোখে পড়ে নি।'

বরকত সাহেব চমকালেন না। তার মানে তিনি ব্যাপারটি আগেই লক্ষ করেছেন। আগে লক্ষ না করলে নিশ্চয়ই চমকাতেন। অর্থাৎ মানুষটির পর্যবেক্ষণ-

শক্তি ভালো। এই জিনিসটি চট করে কারোর চোখে পড়বে না। মিসির আলি বললেন, 'এ ছাড়াও অন্য একটি ব্যাপার লক্ষ করেছি।'

'বলুন শুনি।'

'আপনার বাড়ির কাজের লোকটি, যার নাম নাজিম, সে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত।'

'এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ বাড়ির সবাই আমাকে ভয় করে।'

'কেন?'

'পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে ক্ষমতাবানকে ভয় করা। আমি ক্ষমতাবান।'

'ক্ষমতাটা কিসের?'

'অর্থের। অর্থের ক্ষমতাই সবচেয়ে বড় ক্ষমতা।'

'আপনার ধারণা, যেহেতু আপনার প্রচুর টাকা, সেহেতু সবাই আপনাকে ভয় করে?'

'অন্য কারণও আছে, আমি বেশ বদমেজাজী।'

'আপনার মেয়ে তিন্নি, সেও কি বদমেজাজী?'

বরকত সাহেবের ভ্রু কুঁচকে উঠল। তিনি জবাব দিতে গিয়েও দিলেন না। হালকা স্বরে বললেন, 'চা নিন। নাকি কফি খেতে চান?'

'চা খাব। আপনি বলেছিলেন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। এখন করেন কী?'

'কিছুই করি না। এখন আমি ঘরেই থাকি।'

'এবং কাউকে ঘর থেকে বেরুতে দেন না।'

'এ কথা বলছেন কেন?'

'কারণ দারোয়ান আমাকে বেরুতে দেয় নি।'

'ওকে বলে দিয়েছি যেন গেট না খোলে।'

'কেন বলেছেন?'

'তিন্নির জন্যে বলেছি। আমার ভয়, গেট খোলা পেলেই সে চলে যাবে। আমি আর কোনোদিন তাকে ফিরে পাব না।'

'সে কি এর আগে কখনো গিয়েছে?'

'না।'

'তাহলে কী করে আপনার ধারণা হল, গেট খোলা পেলে সে চলে যাবে?'

'আমাকে আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন? আমাকে প্রশ্ন করবার জন্যে তো আপনাকে আনি নি। আপনাকে আনা হয়েছে আমার মেয়ের জন্যে।'

'আনা হয়েছে বলাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। আমি নিজ থেকে এসেছি।'

বরকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আপনি দয়া করে আমার মেয়ের ঘরে চলে যান। ওর সঙ্গে কথা বলুন।'

'ও কি তার ঘরে একা থাকে?'

'হ্যাঁ, একাই থাকে।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতেই বরকত সাহেব বললেন, 'প্লীজ, একটি কথা মন দিয়ে শুনুন। এমন কিছুই করবেন না, যাতে আমার মেয়ে রেগে যায়।'

'এ কথা বলছেন কেন?'

'ও রেগে গেলে মানুষকে কষ্ট দেয়।'

'কীভাবে কষ্ট দেয়?'

'নিজেই বুঝবেন, আমার বলার দরকার হবে না।'

তিন্নির ঘরটি বিরাট বড়। এক পাশে ছোট্ট একটি কালো রঙের খাটে সুন্দর একটি বিছানা পাতা। নানান ধরনের খেলনায় ঘর ভর্তি। বেশির ভাগ খেলনাই হচ্ছে তুলার তৈরী জীবজন্তু। শিশুদের ঘর যেমন অগোছাল থাকে, এ ঘরটি সে-রকম নয়। বেশ গোছান ঘর। মিসির আলি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তিন্নিকে দেখলেন। মেয়েটি গভীর মনোযোগে ছবি আঁকছে। একবারও তাকাচ্ছে না তাঁর দিকে। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নি, ভেতরে আসব?'

তিন্নি ছবি থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'আসতে ইচ্ছে হলে আসুন।'

'ইচ্ছে না হলে আসব না?'

তিন্নি কিছু বলল না। মিসির আলি ভেতরে ঢুকলেন, হাসিমুখে বললেন, 'বসব কিছুক্ষণ তোমার ঘরে?'

'বসার ইচ্ছে হলে বসুন।'

তিনি বসলেন। হাসিমুখে বললেন, 'কিসের ছবি আঁকছ?'

'গাছের।'

'দেখি কেমন ছবি?'

'দেখতে ইচ্ছে হলে দেখুন।'

তিন্নি তার ছবি এগিয়ে দিল। মিসির আলি অবাক হয়ে দেখলেন, অদ্ভুত সব গাছের ছবি আঁকা হয়েছে। গাছগুলিতে কোনো পাতা নেই। অসংখ্য ডাল। ডালগুলি লতান। কিছু কিছু লতা আবার চুলের বেণীর মতো পাকান।

'সুন্দর হয়েছে তো গাছের ছবি!'

'আপনার ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'এ রকম গাছ কি আপনি এর আগে কখনো দেখেছেন?'

'না, দেখি নি।'

'তাহলে আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন না--কী করে আমি না দেখে এমন সুন্দর গাছের ছবি আঁকলাম।'

'শিশুরা মন থেকে অনেক জিনিস আঁকে।'

তিন্নি হাসল। তিনি প্রথম মেয়েটির মুখে হাসি দেখলেন। তিন্নি হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। মিসির আলি বললেন, 'তুমি এত হাসছ কেন?'

'হাসতে ভালো লাগছে তাই হাসছি।'

তিনি নিজেও হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমি শুনেছি তুমি সব প্রশ্নের উত্তর জান।'

'কে বলেছে? বাবা?

'হ্যাঁ। তুমি কি সত্যি সত্যি জান?'

'জানি। পরীক্ষা করতে চান?'

'হ্যাঁ চাই। বল তো নয়-এর বর্গমূল কত?'

'তিন।'

'পাঁচের বর্গমূল কত সেটা জান?'

তিন্নি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি জানি না।'

'আচ্ছা দেখি এটা পার কি না। পেনিসিলিন যিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর নাম কি?'

'স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।'

'হ্যাঁ হয়েছে। এখন বল দেখি তাঁর স্ত্রীর নাম কি?'

'আমি জানি না।'

'সত্যি জান না?'

'না, আমি জানি না।'

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নবেল প্রাইজ পেয়েছেন জান?'

'জানি। উনিশ 'শ তের সালে।'

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট মেয়ের নাম জান?'

'জানি না।'

মিসির আলি হাসতে লাগলেন। তিন্নি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। গম্ভীর স্বরে বলল, 'আপনি হাসছেন কেন?'

'আমি হাসছি, কারণ তুমি কীভাবে সব প্রশ্নের জবাব দাও তা বুঝতে পারছি।'

'তাহলে বলুন, কীভাবে সব প্রশ্নের জবাব দিই।'

'আমি লক্ষ করলাম, যে-সব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি, শুধু সে-সব প্রশ্নের উত্তরই তুমি জান। যেমন আমি জানি নয়ের বর্গমূল তিন। কাজেই তুমি বললে তিন। কিন্তু পাঁচের বর্গমূল কত তা তুমি বলতে পারলে না, কারণ আমি নিজেও তা জানি না। আলেকজান্ডার ফ্লেমিংয়ের স্ত্রীর নাম তুমি বলতে পারলে না, কারণ আমি তাঁর স্ত্রী নাম জানি না। ঠিক এইভাবে——।'

'থাক, আর বলতে হবে না।'

তিন্নি তাকিয়ে আছে। তার মুখে কোনো হাসি নেই! সমস্ত চেহারায় কেমন একটা কঠিন ভাব চলে এসেছে, যা এত অল্পবয়সী একটি বাচ্চার চেহারার সঙ্গে ঠিক মিশ খাচ্ছে না। মিসির আলি সহজ স্বরে বললেন, 'তুমি মানুষের মনের কথা টের পাও। টের পাও বলেই জানা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পার। এটা এক ধরনের টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা। কেউ কেউ এ ধরনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়।'

তিন্নি শীতল গলায় বলল, 'আপনি খুব বুদ্ধিমান।'

মিসির আলি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বুদ্ধিমান।'

'আপনি বুদ্ধিমান এবং অহংকারী।'

'যারা বুদ্ধিমান, তারা সাধারণত অহংকারী হয়। এটা দোষের নয়। যে জিনিস তোমার নেই, তা নিয়ে তুমি যখন অহংকার কর, সেটা হয় দোষের।'

'আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

'তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে এসেছি।'

'কিসের সাহায্য?'

'আমি এখনো ঠিক জানি না। সেটাই দেখতে এসেছি। হয়তো তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তোমার বাবা শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন।'

'আমি ডাক্তার পছন্দ করি না।'

'আমি ডাক্তার নই।'

'আপনি এখন আমার ঘর থেকে চলে যান। আমার আর আপনাকে ভালো লাগছে না।'

'আমার কিন্তু তোমাকে ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে।'

'আপনি এখন যান।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। তিন্নি বলল, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যান।'

তিন্নি কথা ক'টি বলার সঙ্গে সঙ্গে মিসির আলি তাঁর মাথার ঠিক মাঝখানে এক ধরনের যন্ত্রণা বোধ করলেন। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল, বমিবমি ভাব হল, আর সেই সঙ্গে তীব্র ও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। যেন কেউ একটি ধারাল ব্লেড দিয়ে আচমকা মাথাটা দু'ফাঁক করে ফেলেছে। মিসির আলি বুঝতে পারছেন তিনি জ্ঞান হারাচ্ছেন। পৃথিবী তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। চোখের সামনে দেখছেন সাবানের বুদবুদের মতো বুদবুদ। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগমুহূর্তে ব্যথাটা কমে গেল। সমস্ত শরীরে এক ধরনের অবসাদ। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছে। মিসির আলি তাকালেন তিন্নির দিকে। মেয়েটির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। সহজ হাসি নয়, উপহাসের হাসি। মিসির আলি দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, 'এটা তো তুমি ভালোই দেখালে।'

তিন্নি বলল, 'এর চেয়েও ভালো দেখাতে পারি।'

'তা পার। নিশ্চয়ই পার। তুমি কি রাগ হলেই এ রকম কর?'

'হ্যাঁ করি।'

'আমি তোমাকে রাগাতে চাই না।'

'কেউ চায় না।'

'সবাই তোমাকে খুশি রাখতে চায়?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তবু তুমি প্রায়ই রেগে যাও, তাই না?'

'হ্যাঁ যাই।'

'রাগটা সাধারণত কতক্ষণ থাকে?'

'ঠিক নেই। কখনো অনেক বেশি সময় থাকে।'

'আচ্ছা তিন্নি, মনে কর এখানে দু' জন মানুষ আছে। তুমি রাগ করলে এক জনের উপর, তাহলে ব্যথাটা কি সেই জনই পাবে। না দু' জন একত্রে পাবে?'

'যার উপর রাগ করেছি সে-ই পাবে, অন্যে পাবে কেন? অন্য জনের উপর তো আমি রাগ করি নি।'

'তাও তো ঠিক। এখন কি আমার উপর তোমার রাগ কমেছে?'

'হ্যাঁ কমেছে।'

'তাহলে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাস তো, যাতে আমি বুঝতে পারি তোমার রাগ সত্যি সত্যি কমেছে!'

তিন্নি হাসল। মিসির আলি বললেন, 'আমি কি আরো খানিকক্ষণ বসব?'

'বসার ইচ্ছা হলে বসুন।'

মিসির আলি বসলেন। একটি সিগারেট ধরালেন। মেয়েটি নিজের মনে ছবি আঁকছে। সেই গাছের ছবি, লতান ডাল, পত্রহীন বিশাল বৃক্ষ। মিসির আলি ঠিক করলেন, তিনি একটি পরীক্ষা করবেন। এই মেয়েটি যে-ভাবেই হোক মস্তিষ্কের কোষে সরাসরি চাপ প্রয়োগ করতে পারে। উচ্চ পর্যায়ের একটি টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা। ছোট্ট একটি মেয়ে, অথচ কত সহজে মানুষের মাথায় ঢুকে যাচ্ছে। এটাকে বাধা দেবার একমাত্র উপায় সম্ভবত মেয়েটিকে মাথার ভেতর ঢুকতে না দেয়া। সেটা করা যাবে তখনই, যখন নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে। সমস্ত চিন্তা ও ভাবনা কেন্দ্রীভূত করা হবে একটি বিন্দুতে।

মিসির আলি ডাকলেন, 'তিন্নি।'

তিন্নি মুখ না তুলেই বলল, 'কি?'

'তুমি আমার মাথার ব্যাথাটা আবার তৈরি কর তো।'

'কেন?'

'আমি একটা ছোট্ট পরীক্ষা করব।'

'কী পরীক্ষা?'

'আমি দেখতে চাই এই ব্যথার হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় আছে কি না।'

'উপায় নেই।'

'সে টাই দেখব। তবে তিন্নি একটি কথা, ব্যথাটা তুমি তৈরি করবে খুব ধীরে। এবং যখনই আমি হাত তুলব, তুমি ব্যথাটা কমিয়ে ফেলবে।'

'আপনি খুব অদ্ভুত মানুষ।'

'আমি মোটেই অদ্ভুত মানুষ নই। আমি এক জন যুক্তিবাদী মানুষ। আমি এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে।'

'আমার কোনো সাহায্য লাগবে না।'

'হয়তো লাগবে না। তবু আমি তোমার ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে চাই। এখন তুমি ব্যথা তৈরি কর তো। খুব ধীরে ধীরে।'

তিন্নি মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে। বাঁকা ঠোঁট খুব হালকাভাবে কাঁপছে।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তিনি তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ একটি ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত করে ফেললেন। খুব ছোটবেলায় তিনি একটি সাপের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এখন তিনি ভাবছেন সেই সাপটির কথা। সাপটির হলুদ গা ছিল চক্রকাটা। বুকে ভর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছিল। তাঁকে দেখেই সে থমকে গেল। ঘনঘন তার চেরা জিব বের করতে লাগল। মিসির আলি এখন আর কিছুই ভাবছেন না। পৃথিবীতে ঠিক এই মুহূর্তে সাপের চেরা জিব ছাড়া অন্য কিছুই নেই। তিনি জীবিত কি মৃত, সেই বোধও তাঁর নেই। তিনি কল্পনায় দেখছেন হলুদ রঙের কুৎসিত সাপের চেরা জিব বাতাসে কাঁপছে।

মিসির আলির চোখের দৃষ্টি ঘোলা হয়ে আসছে। কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম। তিনি ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন। তিন্নি অবাক হয়ে মিসির আলিকে দেখছে। আশ্চর্য ব্যাপার, এই মানুষটিকে সে কিছু করতে পারছে না! এতক্ষণে ব্যাথায় তাঁর ছটফট করা উচিত ছিল, কিন্তু লোকটি এখনো হাত তুলছে না। এর মানে কি এই যে, সে ব্যথা পাচ্ছে না? তা কী করে সম্ভব! তিন্নি ব্যথার পরিমাণ অনেক দূর বাড়িয়ে দিল। তার নিজের মাথাই এখন ঝিমঝিম করছে। মিসির আলি হাত তুললেন। তিনি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। মিসির আলি দুর্বল গলায় বললেন, 'তিন্নি আমি এখন যাই। তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে।'

তিন্নি জবাব দিল না। অবাক চোখে তাঁকে দেখতে লাগল।

মিসির আলি বললেন, 'তিন্নি, আমি কি তোমার আঁকা ছবিগুলি নিয়ে যেতে পারি?'

'কেন?'

'আমি নিজের ঘরে বসে সময় নিয়ে ছবিগুলি দেখব।'

'তাতে কি হবে?'

'তোমাকে বুঝতে সুবিধা হবে।'

তিন্নি তার হাতে একগাদা ছবি তুলে দিল। মিসির আলি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। ক্লান্তিতে তাঁর পা ভেঙে আসছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তিনি পেছনে ফিরলেন। তিন্নি ছাদে উঠে গেছে। তার মাথার উপর চক্রাকারে কয়েকটি পাখি উড়ছে।

আশেপাশে পাখি নেই। কিন্তু এই মেয়েটির মাথার উপর পাখি উড়ছে কেন? শালিক পাখি। কিচমিচ শব্দ করছে। মেয়েটিকে দেখে মনে হল, সেও কিছু বলছে পাখিদের। এত রহস্য কেন? মিসির আলি নিজের ঘরের দিকে এগুলেন। তাঁর মন ভারাক্রান্ত। তিনি নিজের ভিতর এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করলেন।

৪

সারা'টা দিন তিন্নি ছাদে কাটাল।

এক বার এ-মাথায় যাচ্ছে, আরেক বার ও-মাথায়। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলছে এবং হাসছে। শীতের দিনের রোদ দুপুরের দিকে খুব বেড়ে যায়। সারা গা চিড়বিড় করে। কিন্তু মেয়েটি নির্বিকার। হাঁটছে তো হাঁটছেই। রহিমা দুপুরে ছাদে এসে ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'ভাত দিছি খেতে আসেন।' তিন্নি কোনো কথা বলে নি। রহিমা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেছে। তিন্নি বুঝতে পারছে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় রহিমা মনে মনে বলছে, 'পিশাচ পিশাচ। মানুষ না পিশাচ।' তিন্নির খানিকটা রাগ লাগছিল। কিন্তু সে সামলে নিল। সব সময় রাগ করতে ভালো লাগে না। তার নিজেরও কষ্ট হয়। চোখ জ্বালা করে।

রহিমা চলে যাবার পরপরই বরকত সাহেব এলেন। তিনি কোনো কথা বললেন না। চিলেকোঠার কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিন্নির মন খারাপ হয়ে গেল। বাবা আগে তাকে ভয় পেতেন না। এখন পান। খুবই ভয় পান। অথচ সে বাবাকে এক দিনও ব্যথা দেয় নি। কোনো দিন দেবেও না।

'তিন্নি।'

'কি বাবা?'

'ভাত খেতে এস।'

'আমার খিদে নেই বাবা। যেদিন খুব রোদ ওঠে, সেদিন আমার খিদে হয় না।'

বরকত সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। সেই নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে তিন্নির আরো মন খারাপ হয়ে গেল।

'তিন্নি।'

'কি বাবা?'

'যে-ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কি তোমার কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে।'

'তাঁকে তোমার কেমন লেগেছে?'

'ভালো।'

'তাহলে তাঁকে ব্যথা দিলে কেন? আমি কিছুক্ষণ আগে একতলায় গিয়েছিলাম, ভদ্রলোক মড়ার মতো পড়ে আছেন।'

তিন্নি জবাব দিল না। বরকত সাহেব বললেন, 'তুমি জান, তিনি কী জন্যে এসেছেন?'

'জানি। তিনি আমাকে বলেছেন।'

'তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো তোমার যত কথা আছে, সব ওঁকে বলবে। কিছুই লুকোবে না।'

'আচ্ছা।'

'তোমার স্বপ্নের কথাও বলবে।'

'তিনি বিশ্বাস করবেন না, হাসবেন।'

'না, হাসবেন না। উনি এক জন অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। তোমার সব কথা উনি বুঝবেন। আমি যা বুঝতে পারি নি, উনি তা পারবেন।'

তিন্নি বলল, 'উনি কি গাছের মতো জ্ঞানী?'

বরকত সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমার গাছের ব্যাপারটা আমি জানি না তিন্নি। কাজেই বলতে পারছি না গাছের মতো জ্ঞানী কি না। আমার ধারণা, গাছের জীবন থাকলেও তা খুব নিম্ন পর্যায়ের। জ্ঞান-বুদ্ধির ব্যাপার সেখানে নেই।'

'বাবা।'

'বল মা।'

'আমার স্বপ্নের ব্যাপারটা কি আজই ওঁকে বলব?'

'না, আজ না বললেও হবে। কাল বল। আজ ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছেন! আমার মনে হয় সারা দিনই ঘুমুবেন! তুমি ব্যথা দেবার পর উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

তিন্নি লজ্জিত হল। কিছু বলল না। বরকত সাহেব বললেন, 'তুমি কি ছাদেই থাকবে?'

'হ্যাঁ। তুমি যাও, ভাত খাও।'

বরকত সাহেব নেমে গেলেন। তিন্নি ছাদের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত আবার হাঁটতে শুরু করল। সে নেমে এল সন্ধ্যাবেলায়। তার গা ঝিমঝিম করছে। হাত-পা কাঁপছে। আজ সে আবার স্বপ্ন দেখবে। এসব লক্ষণ তার এখন চেনা হয়ে গেছে। তার ভয়ভয় করতে লাগল। স্বপ্ন এত বাজে ব্যাপার, এত কষ্টের।

ঘুমুবার আগে তিন্নি এক বাটি দুধ খেল। রহিমা কমলা এনেছিল খোসা ছাড়িয়ে। তার দু'টি কোয়া মুখে দিল। রহিমা বলল, 'আমি এই ঘরে ঘুমাইব আপা?' তিন্নি কড়া গলায় বলল,--'না।' রহিমা প্রতি রাতেই এই কথা বলে। প্রতি রাতেই

তিন্নি একই উত্তর দেয়। একা–থাকা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। অথচ কেউ সেটা বুঝতে চায় না। বাবাও মাঝে মাঝে এসে বলেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ঘুমুবে মা?'

এক বার খুব ঝড়–বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘনঘন বাজ চমকাচ্ছিল। বাবা এসে জোর করে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে কত বার বলেছে, 'আমি কাউকেই ভয় করি না।' বাবা শোনেন নি। বাবা–মারা কোনো কথা শুনতে চায় না। মার কথা সে অবশ্যি বলতে পারে না, কারণ মার কথা তার কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে মাথাভর্তি চুলের একটি গোলগাল মুখ তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। তিন্নি ভাবতে লাগল, মা বেঁচে থাকলে এখন কী করত? তাকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়ে যেত। হয়তো রোজ রাতে তার সঙ্গে ঘুমুত। কান্নাকাটি করত। আচ্ছা, সে এ রকম হল কেন? সে অন্য সব মেয়েদের মতো হল না কেন?

রহিমা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। সরাসরি তিন্নির দিকে তাকাচ্ছে না। কিন্তু মনে মনে চাচ্ছে তাড়াতাড়ি এঘর থেকে চলে যেতে। তিন্নি ভেবে পেল না, যে চলে যেতে চাচ্ছে, সে চলে না গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

'রহিমা।'

'জ্বি আপা?'

'তুমি আজ সকালে আমাকে পিশাচ ডাকছিলে কেন?'

রহিমার মুখ সাদা হয়ে গেল। দেখতে দেখতে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।

'পিশাচরা কী করে রহিমা?'

রহিমা তার জবাব দিল না। তার পানির পিপাসা পেয়ে গেছে। বুক শুকিয়ে কাঠ।

'আর কোনো দিন আমাকে পিশাচ ডাকবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখন যাও।'

আজ বোধ হয় স্বপ্নটা সে দেখবেই। বিছানায় শোয়ামাত্র চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। অনেক চেষ্টা করেও চোখ মেলে রাখা যাচ্ছে না। ঘরের বাতাস হঠাৎ যেন অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছে দূরে। এই দূর অনেকখানি দূর। গ্রহ–নক্ষত্র ছাড়িয়ে দূরে, আরো দূরে। তিন্নি ছটফট করতে লাগল। সে ঘুমুতে চায় না, জেগে থাকতে চায়। কিন্তু ওরা তাকে জেগে থাকতে দেবে না। ঘুম পাড়িয়ে দেবে। এবং ঘুম পাড়িয়ে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখাবে।

তিন্নি সেই রাতে যে স্বপ্ন দেখল তা অনেকটা এ রকম ঃ একটি বিশাল মাঠে সে দাঁড়িয়ে আছে। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু গাছ আর গাছ। বিশাল মহীরুহ। এইসব গাছের মাথা যেন আকাশ স্পর্শ করেছে। গাছগুলি অদ্ভুত। লতান ডাল। কিছু কিছু ডাল আবার বেণী পাকান। তাদের গায়ের রঙ সবুজ নয়, হলুদের সঙ্গে লাল মেশান।

হালকা লাল। এইসব গাছ একসঙ্গে হঠাৎ কথা বলে উঠছে। নিজেদের মধ্যে কথা। আবার কথা বন্ধ করে দিচ্ছে। তখন চারদিকে সুনসান নীরবতা। শোনা যাচ্ছে শুধু বাতাসের শব্দ। ঝড়ের মতো শব্দে বাতাস বইছে। আবার সেই শব্দ থেমে যাচ্ছে। তখন কথা বলছে গাছেরা। কত অদ্ভুত বিষয় নিয়ে কত অদ্ভুত কথা। তার প্রায় কিছুই তিন্নি বুঝতে পারছে না। একসময় সমস্ত কথাবার্তা থেমে গেল। তিন্নি বুঝতে পারল সব ক'টি গাছ লক্ষ করছে তাকে। তাদের মধ্যে এক জন বলল, 'কেমন আছ ছোট্ট মেয়ে?'

'ভালো।'

'ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?'

'আমি ভয় পাচ্ছি না।'

'অল্প অল্প পাচ্ছ। কোনো ভয় নেই।'

'কোনো ভয় নেই'--বলার সঙ্গে সঙ্গে সব ক'টি গাছ একত্রে বলতে লাগল, 'ভয় নেই। কোনো ভয় নেই।'

ভয়াবহ শব্দ। কানে তালা লেগে যাবার মতো অবস্থা। তিন্নি তখন কেঁদে ফেলল, তার কান্নার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শব্দ থেমে গেল। কথা বলল শুধু একটি গাছ।

'ছোট্ট মেয়ে তিন্নি।'

'কি?'

'কাঁদছ কেন?'

'জানি না কেন। আমার কান্না পাচ্ছে।'

'ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো ভয় নেই। তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে আলো কমে এল। সব ক'টি গাছ একত্রে মাথা দুলিয়ে কী সব গান করতে লাগল। এই গানে মনে অদ্ভুত এক আনন্দ হয়। শুধু মনে হয় কত সুখ চারদিকে। শুধু বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। আনন্দ করতে ইচ্ছা করে।

'ঘুম আসছে ছোট্ট মেয়ে তিন্নি?'

'আসছে।'

'তাহলে ঘুমাও। আমাদের গান তোমার ভালো লাগছে?'

'লাগছে।'

'খুব ভালো?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো।'

গাঢ় ঘুমে তিন্নির চোখ জড়িয়ে এল। স্বপ্ন শেষ হয়েছে। কিন্তু শেষ হয়েও যেন হয় নি। তার রেশ লেগে আছে তিন্নির চোখেমুখে।

৫

মিসির আলি সারাদিন ঘুমুলেন।

দুপুরে একবার ঘুম ভেঙেছিল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। তিনি পরপর দু'গ্লাস ঠান্ডা পানি খেয়ে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। যখন জাগলেন, তখন বেশ রাত। বিছানার পাশে উদ্বিগ্ন মুখে বরকত সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। এক জন বেঁটেমতো লোক আছে, হাতে স্টেথিসকোপ। নিশ্চয়ই ডাক্তার। দরজার পাশে চোখ বড়ো বড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে নিজাম। বোঝাই যাচ্ছে সে বেশ ভয় পেয়েছে।

বরকত সাহেব বললেন, 'এখন কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

মিসির আলি উঠতে চেষ্টা করলেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'নড়াচড়া করবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার ব্লাড প্রেশার এবনরম্যালি হাই।'

তিনি কিছু বললেন না। নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তাঁর সময় লাগছে। ঘুমঘুম ভাবটা ঠিক কাটছে না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'হাই প্রেশারে কত দিন ধরে ভুগছেন?'

'প্রেশার ছিল না। হঠাৎ করে হয়েছে। যে জিনিস হঠাৎ আসে তা হঠাৎই যায়। কি বলেন?'

'না না, খুব সাবধান থাকবেন। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। বরকত সাহেবকে বলছিলাম হাসপাতালে ট্রান্সফার করবার জন্যে। সত্যি করে বলুন, এখন কি বেটার লাগছে?'

'লাগছে। আগের মতো খারাপ লাগছে না।'

ডাক্তার গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হঠাৎ করে এ রকম হাই প্রেশার হবার তো কথা নয়। খুব আনইউজুয়েল।'

তিনি একগাদা ওষুধপত্র দিলেন। যাবার সময় বারবার বললেন, 'রেস্ট দরকার। কমপ্লিট রেস্ট। কিছু খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ুন। একটা ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। খেয়ে টানা ঘুম দিন। ভোরে এসে আমি আবার প্রেশার মাপব।'

বরকত সাহেব বললেন, 'আপনি তো সারা দিন কিছু খান নি।'

'এখন খাব। গোসল সেরে খেতে বসব। প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। আপনি কি দয়া করে খাবারটা আমার ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন?'

'নিশ্চয়ই করব। আপনার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

মিসির আলি বললেন, 'আজ না, আমি আগামী কাল কথা বলব।'

'ঠিক আছে, আগামী কাল।'

বরকত সাহেব ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। নিচু গলায় বললেন, 'আপনার কষ্ট হল খুব। আমি লজ্জিত।'

'আপনার লজ্জিত হবার কিছুই নেই। আপনি এ নিয়ে ভাববেন না।'

দীর্ঘ স্নানের পর মিসির সাহেবের বেশ ভালোই লাগল। ক্লান্তির ভাব নেই। মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা আছে, তবে তা সহনীয়। এবং মনে হচ্ছে গরম এক কাপ চা খেলে সেরে যাবে।

খাবার নিয়ে এল নিজাম। মিসির আলি লক্ষ করলেন, নিজাম তাঁকে বারবার আড়চোখে দেখছে। তার চোখে সীমাহীন কৌতূহল। সম্ভবত সে কিছু বলতে চায়, সাহস পাচ্ছে না। মিসির আলি ভারি গলায় ডাকলেন, 'নিজাম।'

'জ্বি স্যার?'

'তুমি কেমন আছ?'

'জ্বি স্যার, ভালো।'

'তিন্নি তোমাকে কখনো মাথাব্যথা দেয় নি?'

নিজাম চমকে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। সহজভাবে ভাত-তরকারি এগিয়ে দিতে লাগল।

'কথা বলছ না কেন নিজাম?'

'কী বলব স্যার?'

'ঐ যে জিজ্ঞেস করলাম, তিন্নি তোমাকে মাথাব্যথা দেয় কি না। আমার ধারণা সবাইকেই মাঝে মাঝে দেয়। ঠিক বলছি না?'

'জ্বি স্যার, ঠিক বলছেন।'

'তোমাকেও দিয়েছে?'

'জ্বি স্যার।'

'ক' বার দিয়েছে?'

'অনেক বার।'

'তবু তুমি এ বাড়িতে পড়ে আছ কেন? চলে যাচ্ছ না কেন?'

নিজাম জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'আমি ওর অসুখ ভালো করবার জন্যে এসেছি। কাজেই ওর সম্পর্কে সব কিছু আমার জানা দরকার। তোমরা যদি না বল, তাহলে আমি জানব কী করে?'

'কী জানতে চান স্যার?'

'মানুষকে কষ্ট দেবার এই ব্যাপারটা ও কবে থেকে শুরু করেছে?'

'তিন বছর ধরে হচ্ছে।'

'প্রথম কীভাবে এটা শুরু হল তোমার মনে আছে?'

'জ্বি, আছে। রহিমা তিন্নি আপার জন্যে দুধ নিয়ে গিয়েছিল। তিন্নি আপা খাচ্ছিল না। তখন রাগের মাথায় রহিমা তিন্নি আপাকে একটা চড় দেয়। তার পরই শুরু হয়। রহিমা চিৎকার করতে থাকে, গড়াগড়ি করতে থাকে। ভয়ংকর কষ্ট পায়।'

'রহিমা কি এখনো কাজ করে এ বাড়িতে?'

'জ্বি।'

'এ রকম কষ্ট কি সে আরো পেয়েছে?'

'জ্বি স্যার।'

'তবু সে এ বাড়িতে পড়ে আছে? চলে যায় না কেন?'

নিজাম জবাব দিল না। মিসির আলি লক্ষ করলেন এই প্রশ্নটির জবাব নিজাম এড়িয়ে যাচ্ছে। এত কষ্টের পরও কাজের মানুষগুলি এখানেই আছে। তার কী কারণ হতে পারে? হয়তো অনেক বেশি বেতন দেয়া হচ্ছে, যে–কারণে থাকছে। কিন্তু এটা বলতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

'তুমি বেতন কত পাও নিজাম?'

'জ্বি, মাসে দেড়শ টাকা আর কাপড়চোপড়।'

মিসির আলির মনে হল এটা এমন কোনো বেশি বেতন নয়। কাজেই এরা যে এখানে পড়ে আছে, নিশ্চয়ই তার কারণ অন্য।

'নিজাম।'

'জ্বি স্যার?'

'তুমি কি আমাকে চা খাওয়াতে পার?'

'নিয়ে আসছি স্যার।'

'আর শোন, রহিমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। ওকে পেলে বলবে আমার কথা।'

'জ্বি আচ্ছা।'

নিজাম চট করে চা নিয়ে এল। লোকটি করিৎকর্মা। চা–টা হয়েছেও চমৎকার। চুমুক দিতে দিতেই মাথার যন্ত্রণা প্রায় সেরে গেল।

'চিনি লাগবে স্যার?'

'না, লাগবে না। খুব ভালো চা হয়েছে নিজাম। বস তুমি। টুলটায় বস, কথা বলি।'

নিজাম বসল না। জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নির মধ্যে আর কি অস্বাভাবিক ব্যাপার তুমি লক্ষ করেছ?'

নিজাম মাথা চুলকাতে লাগল। মিসির সাহেব বললেন, 'ভালো করে চিন্তা করে বল। সে এমন কিছু কি করে, যা আমরা সাধারণত করি না?'

'তিন্নি আপা রোদের মধ্যে বসে থাকতে ভালোবাসেন।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার। জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদেও তিন্নি আপা সারা দিন ছাদে বসে থাকেন।'

'এ ছাড়া আর কী করে?'

'আর কিছু না।'

'মনে করতে চেষ্টা কর। হয়তো কোনো ছোট ব্যাপার। তোমার কাছে হয়তো এর কোনো মূল্যই নেই, কিন্তু আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বুঝতে পারছ

আমার কথা?'

'জ্বি স্যার।'

রাত একটার দিকে মিসির আলি তিন্নির আঁকা ছবিগুলি নিয়ে বসলেন। সব মিলিয়ে পাঁচটি ছবি। প্রতিটি ছবিই গাছ বা গাছ জাতীয় কিছুর। বেশির ভাগ গাছ ম্লান। গাছের রঙ হলুদ থেকে লালের মধ্যে। সবুজের কিছুমাত্র ছোঁয়া নেই। তিন্নি হলুদ এবং লাল রঙ দিয়ে ছবি আঁকল কেন? সম্ভবত তার কাছে সবুজ রঙ ছিল না। অবশ্যি শিশুরা অদ্ভুত রঙ ব্যবহার করতে ভালোবাসে। তাঁর এক ভাগনী মানুষ আঁকে আকাশী নীল রঙে। মানুষের চোখে দেয় গাঢ় লাল রঙ।

অবশ্যি এই পাঁচটি ছবি শিশুর আঁকা ছবি বলে মনে হচ্ছে না। শিশুরা এত চমৎকার আঁকে না। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ঝড় হচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড়। কোনো শিশু, তা সে যত প্রতিভাবান শিশুই হোক, এ রকম নিখুঁত ঝড়ের ছবি আঁকতে পারবে না।

ছবি দেখে মনে হয়, ঝড়ের সময়টায় এই ছবির শিল্পী উপস্থিত ছিল। হাওয়ার যে ঘূর্ণি উঠেছে, তাও সে লক্ষ করেছে। মিসির আলি সাহেব মনে মনে একটি থিওরি দাঁড় করাতে চেষ্টা করলেন। তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন, ছবিগুলি কোনো শিশুর মনগড়া ছবি নয়, কল্পনার ছবি নয়। এই গাছ, এই ঝড়, বাতাসের এই ঘূর্ণি ছবির শিল্পী দেখেছে।

যদি তাই হয়, তাহলে এ গাছগুলি কি পৃথিবীর? পৃথিবীর গাছে সবুজ রঙ থাকবে। ছায়াতে জন্মান কিছু কিছু হলুদ গাছ তিনি দেখেছেন, কিন্তু এ রকম কড়া সূর্যের আলোয় হলুদ গাছ তিনি দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না।

প্রতিটি ছবিতে দু'টি সূর্য। গনগনে সূর্য। এর মানে কি? পৃথিবীর কোনো ছবিতে দু'টি সূর্য থাকবে না। তাহলে কি এই থিওরি দাঁড় করান যায় যে, ছবিতে যে-দৃশ্য দেখা যাচ্ছে তা অন্য কোনো গ্রহের? তা কেমন করে হয়?

তিন্নি অন্য কোনো গ্রহের মেয়ে, এই যুক্তি হাস্যকর। তিন্নি পৃথিবীরই মেয়ে, এতে কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। এই গ্রহের মেয়ে হয়ে বাইরের একটি গ্রহের ছবি সে কেন আঁকছে? কী ভাবে আঁকছে?

মিসির আলি গম্ভীর মুখে দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরালেন। সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ছকে ফেলা যাচ্ছে না।

তিনি সিগারেট টানতে টানতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এবং ভাবতে চেষ্টা করলেন--এইসব অল্পবয়সী একটি মেয়ের কল্পনার ছবি, এর বেশি কিছু নয়। মেয়েটির কল্পনাশক্তি খুব উচ্চ পর্যায়ের, যার জন্যে সে এত চমৎকার কিছু ছবি আঁকতে পারছে। ভোরবেলায় তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

মিসির আলির ঠাণ্ডা লাগছে। হু হু করে বইছে উত্তুরে হাওয়া। কিন্তু এই ঠাণ্ডায়

দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ লাগছে। চারদিক খুব চুপচাপ। আকাশে চাঁদ থাকায় চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কী অপূর্ব একটি দৃশ্য! মিসির আলি নিজের অজান্তেই হাঁটতে হাঁটতে একটা ঝাঁকড়া জাম গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক তখন অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। তিনি স্পষ্ট শুনলেন, তিন্নি বলছে, 'কি, আপনার ঘুম আসছে না?' তিনি আশেপাশে কাউকেই দেখলেন না। দেখার কথাও নয়। এই নিশিরাত্রিতে তিন্নি নিশ্চয়ই নিচে নেমে আসে নি। তিনি বললেন, 'কে কথা বলল?'

মিসির আলি খিলখিল হাসির শব্দ শুনলেন। এর মানে কি? তিন্নির হাসি কোত্থেকে ভেসে আসছে? মিসির আলি বললেন, 'তুমি তিন্নি?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে কথা বলছ?'

'আপনি এত বুদ্ধিমান, অথচ কোত্থেকে কথা বলছি, বুঝতে পারছেন না?'

'না, বুঝতে পারছি না। তুমি কোথায়?'

'আমি আমার ঘরেই আছি। কোথায় আবার থাকব?'

মিসির আলি একটা বড় ধরনের চমক পেলেন। মেয়েটি তার ঘর থেকেই কথা বলছে। সেইসব কথা তিনি পরিষ্কার শুনছেন। টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ। অদ্ভুত তো!

মেয়েটিও নিশ্চয়ই তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছে। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার জন্যে নিশ্চয়ই চেঁচাতে হবে না। মনে মনে ভাবলেই তিন্নি বুঝবে। মিসির আলি কথা বলা শুরু করলেন। এ রকম অদ্ভুত কথোপকথন তিনি আগে কখনো করেন নি।

মিসির আলি : কেমন আছ তিন্নি?

তিন্নি : ভালো।

মিসির আলি : এখনো জেগে আছ?

তিন্নি : হ্যাঁ আছি।

মিসির আলি : কেন?

তিন্নি : আমারও আপনার মতো ঘুম আসছে না।

মিসির আলি : রোজই জেগে থাক?

তিন্নি : মাঝে মাঝে থাকি।

মিসির আলি : তোমার ছবিগুলি বসে বসে দেখলাম।

তিন্নি : আমি জানি।

মিসির আলি : খুব সুন্দর হয়েছে।

তিন্নি : তাও জানি।

মিসির আলি : এগুলি কোথাকার ছবি?

তিন্নি : বলব না।

মিসির আলি : কেন, বলতে অসুবিধা কি?

তিন্নি : বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

মিসির আলি : ছবিতে দেখলাম দু'টি সূর্য।

তিন্নি : হ্যাঁ দু'টি।

মিসির আলি : দু'টি কেন?

তিন্নি : দু'টি থাকলে আমি কি করব? একটি আঁকব?

কথাবার্তা এই পর্যন্তই। মিসির আলি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু আর কোনো যোগাযোগ হল না। তিনি বেশ কয়েক বার ডাকলেন, তিন্নি তিন্নি! কোনো জবাব নেই।

মিসির আলি নিজের বিছানায় ফিরে এলেন। ঘুম চটে গিয়েছে। শুয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। তিনি আবার ছবি নিয়ে বসলেন। যদি নতুন কিছু বের হয়ে আসে। যে-মাটির উপর গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তার রঙ কী? আকাশের রঙ কী? গাছপালার ফাঁকে কোনো কীটপতঙ্গ আছে কি? যদি থাকে, তাদের রঙ কী?

'আপনি এখনো জেগে আছেন?'

তিনি চমকে উঠলেন। তিন্নি আবার কথা বলা শুরু করেছে।

'হ্যাঁ, এখনো জেগে আছি। তোমার ছবি দেখছি।'

'কেন দেখছেন? এক বার দেখাও যা এক শ' বার দেখাও তা।'

'উঁহু, তুমি ঠিক বললে না। প্রথম বার অনেক কিছু চোখে পড়ে না।'

'আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'ঘুম আসছে না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।'

'পার নাকি?'

'হ্যাঁ পারি। দেব?'

'না, তার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে।'

'তাহলে কথা বলুন।'

'আমার সঙ্গে তুমি যেভাবে কথা বলছ, অন্যদের সঙ্গেও কি সেইভাবে কথা বল।'

'না।'

'কেন বল না।'

'বলতে ইচ্ছা করে না।'

মিসির আলি চেষ্টা করতে লাগলেন আজেবাজে প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি জরুরী প্রশ্ন করে খবরাখবর বের করে আনা। কিন্তু মেয়েটি খুব সাবধানী। সে অনায়াসে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু এর মধ্যে একটি হচ্ছে-তিন্নি শুধু মানুষ নয়, পশুদের সঙ্গেও (যেমন বেড়াল) যোগাযোগ করতে পারে। মিসির আলি জিজ্ঞেস

করলেন, 'বেড়াল তোমার কথা বুঝতে পারে?'

'হুঁ পারে।'

'তুমি ওর কথা বুঝতে পার?'

'বেড়াল কোনো কথা বলে না। তবে সে যা ভাবে তা বুঝতে পারি। অবশ্যি সব সময় পারি না।'

'কখন কখন পার?'

'তা জেনে আপনি কী করবেন? আপনি কি বেড়াল?'

তিন্নি খিলখিল করে হাসতে লাগল। মিসির আলি রোমাঞ্চ বোধ করলেন। মেয়েটি নিজের ঘরে বসে হাসছে, অথচ তিনি কী স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন!

'তিন্নি।'

'বলুন।'

'এই যে তুমি কথা বলছ, আমি শুনছি। আচ্ছা, এ বাড়িতে অন্য যারা আছে, তারা কি শুনছে?'

'তারা শুনবে কীভাবে, আমি কি তাদের সঙ্গে কথা বলছি?'

'তাও তো ঠিক।'

'আচ্ছা ধর, কাল ভোরে আমি যদি অনেক দূর চলে যাই–তিন–চার মাইল দূরে কিংবা তার চেয়েও দূরে, তখনো কি তুমি আমার কথা শুনতে পারবে?'

তিন্নি বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি আর কথা বলব না।'

মিসির আলি বললেন, 'শুভ–রাত্রি তিন্নি।' তার কোনো জবাব তিনি শুনতে পেলেন না। মাথার যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এসেছে। শরীরটা হালকা লাগছে। মিসির আলি ডাক্তারের দিয়ে যাওয়া ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। ভালো ঘুম হল না। আজেবাজে স্বপ্ন দেখলেন, বেশ কয়েক বার ঘুম ভেঙেও গেল।

৬

শীতের ভোরবেলায় ময়মনসিংহ শহর মিসির আলির বেশ লাগল। তিনি অন্ধকার থাকতেই জেগে উঠেছেন। একটা উলের চাদর গায়ে দিয়ে শহর দেখতে বের হয়েছেন। আজ আর দারোয়ান তাঁকে বাধা দেয় নি, গেট খুলে দিয়েছে। এবং হাসিমুখে বলেছে, 'এত সকালে কই যান?' সম্ভবত বরকত সাহেব দারোয়ানকে কিছু বলেছেন।

সব মফস্বল শহর দেখতে এক রকম, তবু এই শহরটি ব্রহ্মপুত্র নদীর জন্যেই বোধ হয় একটু আলাদা। কিংবা কে জানে ভোরবেলার আলোর জন্যেই হয়তো এ

রকম লাগছে। মিসির আলি হেঁটে হেঁটে নদীর পাড়ে চলে গেলেন। নদী শুকিয়ে এতটুকু হয়েছে। চিনির দানার মতো সাদা বালির চর পড়েছে। অদ্ভুত লাগছে দেখতে। মর্নিংওয়াকে বের হয়েছে, এ রকম বেশ কয়েকটি দল পাওয়া গেল। সবই বুড়োর দল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হঠাৎ শরীরের জন্যে তাদের মমতা জেগে উঠেছে। এইসব অপূর্ব দৃশ্য আরো কিছুদিন দেখতে হলে শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

মিসির আলি নদীর পাড় ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর মনে কোনো উদ্দেশ্য আছে। তিনি কিছু একটা করতে চান। কিন্তু তাঁর মনে কোনো গোপন উদ্দেশ্য ছিল না। ভোরবেলায় নদীর পাড়ের একটি ছোট শহর দেখতে ভালো লাগছে, এই যা। মাইল দু'-এক হাঁটার পর খানিকটা ক্লান্তি বোধ করলেন। বয়স হয়ে যাচ্ছে। এখন আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারেন না।

ঘড়িতে ছ'টা বাজছে। এখন উল্টো পথে হাঁটা শুরু করা দরকার। বরকত সাহেব নিশ্চয়ই ভোরের নাশতা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

একটা খেয়াঘাট দেখা যাচ্ছে। খেয়াঘাটের পাশে বেঞ্চি পেতে সুন্দর একটা চায়ের দোকান। মিসির আলি বেঞ্চিতে বসে চায়ের কথা বললেন। সিগারেট খাবার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু প্যাকেট ফেলে এসেছেন। চা শেষ করবার পর লক্ষ করলেন, শুধু সিগারেট নয়, মানিব্যাগও ফেলে এসেছেন। তাঁর অস্বস্তির সীমা রইল না। তিনি প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'আগামী কাল ভোরবেলা চায়ের পয়সা দিয়ে যাব। আমি ভুলে মানিব্যাগ ফেলে এসেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

চায়ের দোকানী দাঁত বের করে হাসল। যেন খুব মজার একটা কথা শুনছে।

'কোনো অসুবিধা নাই। দরকার হইলে আরেক কাপ খান।'

মিসির আলি সত্যি সত্যি আরেক কাপ চা খেলেন। অল্প অল্প রোদ উঠেছে। রোদে পা মেলে জ্বলন্ত উনুনের সামনে একটা হাত মেলে দিয়ে চা খেতে বেশ লাগছে। মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'দোকান আপনার কেমন চলে? লোকজন তো দেখি না।'

'দোকান চলে না। বিকিকিনি নাই। মানুষজন নাই, চা কে খাইব কন?'

'ভালো জায়গায় গিয়ে দোকান করেন, যেখানে লোকজন আছে।'

দাড়িওয়ালা লোকটি হাসিমুখে বলল, 'মনের টানে পইড়া আছি। জায়গাটা বড় ভালো লাগে। মায়া পইড়া গেছে। একবার মায়া পড়লে যাওন মুসিবত।'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। এই বুড়োর কথায় একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন, কেন এত কষ্টের পরও নিজাম বা রহিমা ও-বাড়িতে পড়ে আছে। সেখানেও মায়া ব্যাপারটাই কাজ করছে। এই মায়া তৈরির ব্যাপারে তিন্নিরও নিশ্চয়ই একটি ভূমিকা আছে। মায়া জাগিয়ে রাখছে তিন্নি। কেউ তা বুঝতে পারছে না।

মানুষের সমস্ত আবেগ এবং অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দু মস্তিষ্ক। মেয়েটি সেই মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অতি সহজেই। মিসির আলির মনে হল, এই মেয়েটি একই সঙ্গে দু'টি কাজ করে–আশেপাশের লোকজনদের একটু দূরে সরিয়ে রাখে, আবার টেনে রাখে নিজের দিকে।

মেয়েটি নিজের সব ক্ষমতাও সবাইকে দেখাচ্ছে না। যেমন ধরা যাক, দূর থেকে কথোপকথনের ক্ষমতা। এর খবর এ–বাড়ির অন্য কেউ জানে না। কিন্তু কেন জানে না? কেন এই মেয়েটি এই সব তথ্য গোপন রেখেছে?

আবার পুরোপুরি গোপনও রাখছে না। তাঁর কাছে প্রকাশ করেছে। কেন করেছে? আশঙ্কা কেন? এর উত্তর বের করতে হবে। একটির পর একটি তথ্যকে সাজাতে হবে। একটি ছকের মধ্যে ফেলতে হবে। মিসির আলি চিন্তিত বোধ করলেন। নিজের অজান্তেই আরেক কাপ চা চাইলেন।

চায়ের দোকানী খুশি মনেই চা ছাঁকতে বসল।

'আমি কাল সকালেই দাম দিয়ে যাব।'

'কোনো অসুবিধা নাই। তিন কাপ চায়ের লাগিন ফতুর হইতাম না। আমরা ময়মনসিং–এর লোক। আমরার কইলজা বড়ো।'

'নাম কি আপনার?'

'রশিদ।'

'আচ্ছা ভাই রশিদ, আপনার কাছে সিগারেট আছে?'

'সিগারেট নাই, বিড়ি আছে। খাইবেন?'

'দেন দেখি একটা।'

মিসির আলি চিন্তিত মুখে বিড়ি টানতে লাগলেন। বেলা বাড়ছে, তাঁর খেয়াল নেই। অনেক কাজ পড়ে আছে সামনে। কাজ গোছাতে হবে। কীভাবে গোছাতে হবে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন না।

এ–বাড়ির প্রতিটি মানুষকে জেরা করতে হবে। এলোমেলো প্রশ্ন–উত্তর নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা। তিন্নির মার সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে, ভদ্রমহিলার চিঠিপত্র, ডায়েরি--এইসব দেখতে হবে। ভালোভাবে জানতে হবে, তিনি মেয়ে সম্পর্কে কী ভাবতেন। মায়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

'কি ভাবেন?'

মিসির আলি চমকে উঠে বললেন, 'কিছু ভাবি না ভাই। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ। কাল সকালে আমি আবার আসব।'

'জ্বি আইচ্ছা। আপনে ময়মনসিংয়ের লোক না মনে হইতাছে।'

'জ্বি না। আমি ঢাকা থেকে এসেছি।'

'কুটুম্ব বাড়ি?'

'জ্বি, কুটুম্ব বাড়ি।'

'তোমার নাম রহিমা?'

'জ্বি।'

'ভালো আছ রহিমা?'

'জ্বি, আল্লাহতালা যেমুন রাখছে।'

রহিমা লম্বা একটা ঘোমটা টানল। এই লোকটি তার কাছে কী জানতে চায়, তা সে বুঝতে পারছে না। সে তো কিছুই জানে না, তাকে কিসের এত জিজ্ঞাসাবাদ। তিন্নির আব্বা বলে দিয়েছেন--উনি যা জানতে চান, সব বলবে। কিছুই গোপন করবে না। এও এক সমস্যা। গোপন করার কি আছে?

'রহিমা।'

'জ্বি?'

'দেশের বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?'

'এক মাইয়া আছে।'

'মেয়েকে দেখতে যাও না?'

'জ্বি যাই।'

'শেষ বার কবে গিয়েছিলে?'

'তিন বছর আগে।'

'এই তিন বছর যাও নি কেন?'

রহিমা চমকে উঠল। তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। যেন সে নিজেই গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে, কেন যায় নি।

'মেয়ে যাবার জন্যে বলে না?'

'জ্বি বলে।'

'তবু যেতে ইচ্ছে করে না, তাই না?'

রহিমা চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নির মাকে তো তুমি দেখেছ, তাই না?'

'জ্বি।'

'কেমন মহিলা ছিলেন?'

'খুব ভালো। এমুন মানুষ দেখি নাই। খুব সুন্দর আছিল। কি রকম ব্যবহার। কাউরে রাগ হয়ে কথা কয় নাই।'

'ঐ ভদ্রমহিলার মধ্যে তিন্নির মতো কোনো কিছু ছিল কি?'

'জ্বি না। বড় ভালো মানুষ ছিল। ইনার কথা মনে হইলেই চউক্ষে পানি আসে।'

রহিমা সত্যি সত্যি চোখ মুছল। মিসির আলির আর কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল

না।

অন্যদের কাছ থেকে তেমন কিছু জানা গেল না। বাড়ির দারোয়ানের একটি কথা অবশ্যি বেশ গুরুত্বপূর্ণ, সে বলছে, তিন্নি ছোটবেলায় খুব ছোটাছুটি করত। বাগানে দৌড়াতো। যতই সে বড় হচ্ছে, ততই তার ছোটাছুটি কমে যাচ্ছে। এখন বেশির ভাগ সময় সে ছাদে হাঁটাহাঁটি করে কিংবা চুপচাপ বসে থাকে।

'তুমি ক'দিন ধরে এ বাড়িতে আছ?'

'জ্বি অনেক দিন।'

'ছুটিছাটায় দেশের বাড়িতে যাও না?'

'জ্বি যাই।'

'শেষ কবে গিয়েছিলে?'

অনেক হিসাব-নিকাশ করে দারোয়ান বলল, 'তিন বছর আগে একবার গিয়েছিলাম।'

'গত তিন বছরে যাও নি?'

'জ্বি না।'

তিন্নির মার পুরান চিঠি-পত্র বা ডায়েরি, কিছুই পাওয়া গেল না। বরকত সাহেব বললেন, 'এ দেশের মেয়েদের কি আর ডায়েরি লেখার অভ্যাস আছে? এরা ঘরের কাজকর্ম শেষ করেই সময় পায় না। ডায়েরি কখন লিখবে?'

'চিঠিপত্র? পুরান চিঠিপত্র?'

'পুরান চিঠিপত্র কি কেউ জমা করে রাখে, বলুন? চিঠি আসে, চিঠি পড়ে ফেলে দিই। ব্যাস। তাছাড়া ও চিঠি লিখবে কাকে? বাপ-মা মরা মেয়ে ছিল। মামার কাছে মানুষ হয়েছে। বিয়ের পর সেই মামা মারা গেলেন। সে একা হয়ে গেল। চিঠিপত্র লেখার বা যোগাযোগের কেউ ছিল না।'

'আপনার স্ত্রী কি খুব বিষণ্ন প্রকৃতির ছিলেন?'

'না মনে হয়। হাসিখুশিই তো ছিল।'

'কোনো রকম অসুখ-বিসুখ ছিল কি?'

'বলার মতো তেমন কিছু না, সর্দিকাশি-এই সবে খুব ভুগত। এটা নিশ্চয়ই তেমন কিছু না.'

'তিন্নি যখন তাঁর পেটে সে সময় কি তাঁর জার্মান মিজেলস হয়েছিল?

'এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'জার্মান মিজেলস একটা ভাইরাসঘটিত অসুখ। এতে বাচ্চার অনেক ধরনের ক্ষতি হবার কথা বলা হয়। 'জীনে' কিছু ওলটপালট হয়।'

'না, এ ধরনের কোনো অসুখ-বিসুখ হয় নি।'

'মামস? মামস হয়েছি কি?'

'না, তাও না।'

মিসির আলি বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সেই সময় তিনি কি কোনো অদ্ভুত স্বপ্ন-টপ্ন দেখতেন?'

বরকত সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'মানসিক অবস্থাটা জানবার জন্যে। দেখতেন কি কোনো স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ দেখতেন।'

'কী ধরনের স্বপ্ন, আপনার মনে আছে?'

'ঠিক মনে নেই। প্রায়ই দেখতাম জেগে বসে আছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে বলত, দুঃস্বপ্ন দেখেছি।'

'কী দুঃস্বপ্ন, সেটা জিজ্ঞেস করেন নি?'

'জ্বি না, জিজ্ঞেস করি নি। স্বপ্ন-টপ্নর ব্যাপারে আমার তেমন উৎসাহ নেই। তবে সে নিজে থেকে কয়েক বার আমাকে বলতে চেষ্টা করেছে, আমি তেমন গুরুত্ব দিই নি।।'

'আপনার কি কিছুই মনে নেই?'

'ও বলত, তার দুঃস্বপ্নগুলি সব গাছপালা নিয়ে। এর বেশি আমার কিছু মনে নেই।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি আজ সন্ধ্যায় ঢাকা যাব। এখানকার কাজ আমার আপাতত শেষ হয়েছে। ঢাকায় আমি কিছু পড়াশোনা করব। খোঁজখবর করব, তারপর ফিরে আসব।'

'আজই যাবেন?'

'হ্যাঁ, আজই যাব। হাতে সময় বেশি নেই। কিছু একটা করতে হলে দ্রুত করতে হবে।'

'এ কথা কেন বলছেন?'

'ইনসটিংক্ট থেকে বলছি। আমার মনে হচ্ছে এ রকম।'

'আপনি কিন্তু আমার মেয়ের সঙ্গে একবারই কথা বলেছেন। আমি চাচ্ছিলাম আপনি তার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করবেন।'

'আমি আবার ফিরে আসছি। তখন করব।'

'কবে ফিরবেন?'

'চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে।'

'আমার মেয়েটিকে কেমন দেখলেন বলুন।'

'এখনো বলবার মতো তেমন কিছু পাচ্ছি না।'

'পাবেন কি?'

'পাব, নিশ্চয়ই পাব। কেন পাব না?'

বরকত সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মনে হল তিনি খুব আশাবাদী

নন।

তিন্নি প্রায় সারাদিনই ছাদে বসে ছিল। মিসির আলি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন বিকেলে।

'তিন্নি আমি চলে যাচ্ছি।'

মেয়েটি বলল, 'আমি জানি।'

'আমি তোমার ছবিগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তাও জানি।'

'কিছু দিনের মধ্যে আমি আবার আসব। তখন দেখবে, সব ঝামেলা মিটে গেছে।'

তিন্নি কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, 'গাছপালা তুমি খুব ভালোবাস, তাই না?'

'মাঝে মাঝে বাসি। মাঝে মাঝে বাসি না।'

'তুমি কি ওদের সঙ্গে কথা বলতে পার?'

'এখানে যে-সব গাছপালা আছে, তাদের সঙ্গে পারি না।'

'তাহলে কাদের সঙ্গে পার?'

মেয়েটি জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি আমার অনেক প্রশ্নের জবাব দাও না। কেন দাও না বল তো? কোনো বাধা আছে কি?'

তিন্নি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আপনি আমাকে ভালো করে দিন। অসুখ সারিয়ে দিন।'

মিসির আলির খুবই মন খারাপ হয়ে গেল। বাচ্চা একটি মেয়ে বাস করছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগতে। যে-জগতের সঙ্গে আশেপাশের চেনা জগতের কোনো মিল নেই। মেয়েটি কষ্ট পাচ্ছে। তার কষ্টের ব্যাপারটি কাউকে বলতে পারছে না। সে নিজেও হয়তো জানে না পুরোপুরি।

'তিন্নি, আমি যাই?'

মেয়েটি কিছু বলল না। মিসির আলি লক্ষ করলেন, তিন্নি নিঃশব্দে কাঁদছে।

ঢাকায় ফেরার ট্রেনে উঠবার পর মিসির আলির মনে পড়ল, তিন কাপ চায়ের দাম তিনি দিয়ে আসেন নি। রশিদ নামের বুড়ো মানুষটি আগামীকাল ভোরবেলায় যখন দেখবে, কেউ আসছে না, তখন না জানি কি ভাববে। মিসির আলির মন গ্লানিতে ভরে গেল। কিন্তু কিছুই করার নেই। ঢাকা মেইল ছুটে চলেছে। পেছনে পড়ে আছে নদীর ধারে গড়ে-ওঠা চমৎকার একটি শহর।

ডঃ জাবেদ আহসান অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি আমার কাছে ঠিক কী জানতে চান, বুঝতে পারছি না। কয়েকটি গাছপালার হাতে আঁকা ছবি দিয়ে গিয়েছেন, আর তো কিছুই বলেন নি।'

'ছবিগুলো ভালো করে দেখেছেন?'

'ভালো করে দেখার কি আছে?'

মিসির আলি লক্ষ করলেন ডঃ জাবেদ বেশ বিরক্ত। ভদ্রলোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানী ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসররা তেমন কোনো কাজকর্ম করেন না, কিন্তু সব সময় ব্যস্ততার একটা ভঙ্গি করেন। ডঃ জাবেদ এই মুহূর্তে এমন মুখের ভাব করেছেন, যেন তাঁর মহা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, 'এই গাছগুলি সম্পর্কে কিছু বলুন। ছবিতে আঁকা গাছগুলির কথা বলছি।'

'কী বলব, সেটাই বুঝতে পারছি না। আপনি কী জানতে চাচ্ছেন?'

'এই জাতীয় গাছ দেখেছেন কখনো?'

'না।'

'বইপত্রে এ রকম গ্যাছের কোনো রেফারেন্স পেয়েছেন?'

'দেখুন, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ ধরনের গাছ আছে। সব কিছু আমার জানার কথা নয়। আমার পিএইচডি'র বিষয় ছিল প্লান্ট ব্রিডিং। সে সম্পর্কে আপনাকে আমি কিছু বলতে পারি। আপনি একটি বাচ্চা মেয়ের আঁকা কতগুলি ছবি নিয়ে এসেছেন। সেই ছবিগুলি দেখে আমাকে গাছ সম্পর্কে বলতে বলছেন। এ ধরনের ধাঁধার পেছনে সময় নষ্ট করার আমি কোনো অর্থ দেখছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন?'

'বিরক্ত হচ্ছি, কারণ আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি তো বসে বসে টিভি দেখছিলেন। তেমন কিছু তো করছিলেন না। সময় নষ্ট করার কথা উঠছে না।'

মিসির আলি ভাবলেন, এই কথায় ভদ্রলোক ভীষণ রেগে যাবেন।

'গেট আউট' জাতীয় কথাবার্তাও বলে বসতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তেমন কিছু হল না। ডঃ জাবেদকে মনে হল, তিনি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছেন। অপ্রস্তুত মানুষেরা যেমন খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাশতে থাকে, ভদ্রলোক সে রকম কাশছেন। কাশি থামাবার পর বেশ মোলায়েম স্বরে বললেন, 'একটু চা দিতে বলি?'

'জ্বি না। চা খাব না।'

'একটু খান, ঠান্ডা ঠান্ডা পড়েছে। চা ভালোই লাগবে। বসুন, চায়ের কথা বলে

আসি।'

চা এল। শুধু চা নয়। চায়ের সঙ্গে নানান রকমের খাবার–দাবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাড়ির এই একটি বিশেষত্ব আছে। এরা অতিথিকে চায়ের সঙ্গে নানান রকম খাবার–দাবার দেয়, যা দেখে কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, এই সম্প্রদায় আর্থিক দিক দিয়ে পঙ্গু।

'মিসির আলি সাহেব, চা নিন।'

তিনি চা নিলেন।

'বলুন, স্পেসিফিক্যালি আপনি কী জানতে চান।'

'পৃথিবীতে ঠিক এ জাতীয় গাছ আছে কিনা তা কে বলতে পারবে? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি, গাছপালার ক্যাটালগ জাতীয় কিছু কি আছে, যেখানে সব জাতীয় গাছপালার ছবি আছে। তাদের সম্পর্কে তথ্য লেখা আছে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। এ দেশে নেই। বোটানিক্যাল সোসাইটিগুলিতে আছে। ওদের একটি কাজই হচ্ছে গাছপালার বিভিন্ন স্পেসিসকে সিসটেমেটিক ভাবে ক্যাটালগিং করা।'

'আপনি কি আমাকে কিছু লোকজনের ঠিকানা দিতে পারবেন, যাঁরা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন?'

'হ্যাঁ পারি। আপনি যাবার সময় আমি ঠিকানা লিখে দেব। আর কি জানতে চান?'

'মানুষ এবং গাছের মধ্যে পার্থক্য কি?'

'প্রশ্নটা আরো গুছিয়ে করুন।'

মিসির আলি থেমে থেমে বললেন, 'আমরা তো জানি গাছের জীবন আছে। কিন্তু আমি যা জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে, গাছের জীবনের সঙ্গে মানুষের জীবনের মিলটা কোথায়?'

'চট করে উত্তর দেয়া যাবে না। এর উত্তর দেবার আগে আমাদের জানতে হবে জীবন মানে কি? এখনো আমরা পুরোপুরি ভাবে জীবন কী তা–ই জানি না।'

'বলেন কী! জীবন কী জানেন না!'

'হ্যাঁ তাই। বিজ্ঞান অনেক দূর আমাদেরকে নিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো অনেক কিছু আমরা জানি না। অনেক আনসলভ্‌ড্‌ মিস্ট্রি রয়ে গেছে। আপনাকে আরেক কাপ চা দিতে বলি?'

'বলুন।'

ডঃ জাবেদ সিগারেট ধরিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে গাছের মিল অনেক বেশি।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ তাই। আসল জিনিস হচ্ছে 'জীন', যা ঠিক করে কোন প্রোটিন তৈরি করা

দরকার। অনেকগুলি জীন নিয়ে হয় একটি ডিএনএ মলিকুল। ডিওক্সি রিবো নিউক্লিয়িক এসিড। প্রাণের আদি ব্যাপার হচ্ছে এই জটিল অণু। এই অণু থাকে জীব–কোষে। তারা ঠিক করে একটি প্রাণী মানুষ হবে, না গাছ হবে, না সাপ হবে। মাইটোকনড্রিয়া বলে একটি জিনিস মানুষেরও আছে, আবার গাছেরও আছে। মানুষের যা নেই, তা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাসট।'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারার কথাও নয়। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। আপনি চাইলে, আমি আপনাকে কিছু সহজ বইপত্র দিতে পারি।'

'আমি চাই। আপনি আমাকে আরো কিছু বলুন।'

'ডিএনএ প্রসঙ্গেই বলি। এই অণুগুলি হচ্ছে প্যাঁচাল সিঁড়ির মতো। মানুষের ডিএনএ এবং গাছের ডিএনএ প্রায় একই রকম। সিঁড়ির দু'–একটা ধাপ শুধু আলাদা। একটু অন্য রকম।'

মিসির আলি গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন। এক জন ভালো শিক্ষক খুব সহজেই একজন মনোযোগী শ্রোতাকে চিনতে পারেন।

ডঃ জাবেদ এই মনোযোগী শ্রোতাকে পছন্দ করে ফেললেন।

'শুধু এই দু'–একটি ধাপ অন্য রকম হওয়ায় প্রাণীজগতে মানুষ এবং গাছ আলাদা হয়ে গেছে। প্রোটিন তৈরির পদ্ধতি হয়েছে ভিন্ন। আপনি আগে বরং কয়েকটা বইপত্র পড়ুন। তারপর আবার আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

ডঃ জাবেদ তিনটি বই দিলেন। দু'টি ঠিকানা লিখে দিলেন। একটি লন্ডনের রয়েল বোটানিক্যাল সোসাইটির, অন্যটি ডঃ লংম্যানের। ডঃ লংম্যান আমেরিকান এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ডেপুটি ডাইরেক্টর।

মিসির আলি সাহেব তাঁর সঙ্গের ছবিগুলি দু' ভাগ করে দু' জায়গায় পাঠালেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, দশদিনের মাথায় ডঃ লংম্যান–এর চিঠির জবাব চলে এল।

টমাস লংম্যান

Ph. D. D. Sc.
US Department of Agricultural Science
ND 505837 USA

প্রিয় এম. আলি,

আপনার পাঠান ছবি এবং চিঠি পেয়েছি। যে সমস্ত লতান গাছের ছবি আপনি পাঠিয়েছেন, তা খুব সম্ভব কল্পনা থেকে আঁকা। আমাদের জানা মতে ও রকম গাছের কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে পেরুর গহীন অরণ্যে এবং আমেরিকার রেইন ফরেস্টে কিছু লতান গাছ আছে, যার সঙ্গে আপনার পাঠান গাছের সামান্য মিল আছে। আমি আপনাকে কিছু ফটোগ্রাফ পাঠালাম, আপনি নিজেই মিলিয়ে দেখতে

পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, রেইন ফরেস্ট এবং পেরুর গাছগুলির রঙ সবুজ, কিন্তু আপনার পাঠান ছবির গাছের বর্ণ হলুদ এবং লালের মিশ্রণ। এর বেশি আপনাকে আর কোনো তথ্য দিতে পারছি না।

আপনার বিশ্বস্ত
টি. লংম্যান।

পুনশ্চ : আপনি যদি আপনার ছবির মতো গাছের কিছু নমুনা পাঠান, তাহলে আমরা তা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পরীক্ষা করব।

রয়েল বোটানিক্যাল সোসাইটি চিঠির জবাব দিতে কুড়ি দিনের মতো দেরি করল। তাদের জবাবটি ছিল এক লাইনের।

প্রিয় ডঃ এম. আলি,

আপনার পাঠান ছবির মতো দেখতে কোনো গাছের কথা আমাদের জানা নেই।

আপনার বিশ্বস্ত,
এ. সুরনসেন।

মিসির আলি সাহেব এই ক'দিনে জীবনের উৎপত্তি এবং বিকাশের উপর গোটা চারেক বই পড়ে ফেললেন। ডিএনএ এবং আরএনএ মলিক্যুল সম্পর্কে পড়তে গিয়ে লক্ষ করলেন, প্রচুর কেমিষ্ট্রি জানা ছাড়া কিছু স্পষ্ট হচ্ছে না। বারবার এ্যামিনো এসিডের কথা আসছে। এ্যামিনো এসিড কি জিনিস তা তিনি জানেন না। অথচ বুঝতে পারছেন, প্রাণের রহস্যের সঙ্গে এ্যামিনো এসিডের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে! মিসির আলি নাইন টেনের পাঠ্য কেমিষ্ট্রি বই কিনে এনে পড়া শুরু করলেন। কোমর বেঁধে পড়াশোনা যাকে বলে। এই ফাঁকে চিঠি লিখলেন তিন্নির বাবাকে। তিন্নির বাবা তার জবাব দিলেন না। তবে তিন্নি একটি চিঠি লিখল। কোনো রকম সম্বোধন চিঠিতে নেই। হাতের লেখা অপরিচ্ছন্ন। প্রচুর ভুল বানান। কিন্তু ভাষা এবং বক্তব্য বেশ পরিষ্কার। খুবই গুছিয়ে লেখা চিঠি, বাচ্চা একটি মেয়ের জন্যে যা বেশ আশ্চর্যজনক। চিঠির অংশবিশেষ এ রকম।

(চিঠি)

আপনি আব্বাকে একটি লম্বা চিঠি লিখেছেন। আব্বা সেই চিঠি না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আব্বা এখন আর আপনাকে পছন্দ করছেন না। তিনি চান না,

আপনি আমার ব্যাপারে আর কোনো চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু আমি জানি, আপনি করছেন। যদিও আপনি অনেক দূরে থাকেন, তবু আমি বুঝতে পারি। আপনি যে আমাকে পছন্দ করেন, তাও বুঝতে পারি। কেউ আমাকে পছন্দ করে না, কিন্তু আপনি করেন। কেন করেন? আমি তো ভালো মেয়ে না। আমি সবাইকে কষ্ট দিই। সবার মাথায় যন্ত্রণা দিই। কাউকে আমার ভালো লাগে না। আমার শুধু গাছ ভালো লাগে। আমার ইচ্ছা করে, একটা খুব গভীর জঙ্গলের মাঝখানে গিয়ে বসে থাকি। গাছের সঙ্গে কথা বলি। গাছেরা কত ভালো। এরা কখনো এক জন অন্য জনের সঙ্গে ঝগড়া করে না, মারামারি করে না। নিজের জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, এবং ভাবে। কত বিচিত্র জিনিস নিয়ে তারা ভাবে। এবং মাঝে মাঝে এক জনের সঙ্গে অন্য জন কথা বলে। কী সুন্দর সেই সব কথা! এখন আমি মাঝে মাঝে ওদের কথা শুনতে পাই।

চিঠি এই পর্যন্তই। মিসির আলি এই চিঠিটি কম হলেও দশবার পড়লেন। চিঠির কিছু অংশ লাল কালি দিয়ে দাগ দিলেন। যেমন একটি লাইন-- 'এখন আমি মাঝে মাঝে ওদের কথা শুনতে পাই। স্পষ্টতই মেয়েটি গাছের কথা বলছে। পুরো ব্যাপারটাই সম্ভবত শিশুর কল্পনা। শিশুদের কল্পনার মতো বিশুদ্ধ জিনিস আর কিছুই নেই। মিসির আলির নিজের এক ভাগনী অমিতা গাছের সাথে কথা বলত। ওদের বাড়ির সামনে ছিল একটা খাটো কদম গাছ। অমিতাকে দেখা যেত গাছের সামনে উবু হয়ে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করছে। মিসির আলি এক দিন আড়ালে বসে কথাবার্তা শুনলেন।

'কিরে আজ তুই এমন মুখ কালো করে রেখেছিস কেন? রাগ করেছিস? তুই এমন কথায় কথায় রাগ করিস কেন? কেউ বকেছে? কী হয়েছে বলতো ভাই শুনি।'

অমিতা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। যেন সে সত্যি সত্যি শুনতে পাচ্ছে গাছের কথা। মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে। এক সময় সে উঠে দাঁড়াল এবং বিকট চিৎকার করে বলল, 'কে কদম গাছকে ব্যথা দিয়েছে? কে পাতা শুদ্ধ তার ডাল ছিঁড়েছে?' কান্নাকাটি আর চিৎকার। জানা গেল আগের রাতে সত্যি সত্যি কদম গাছের একটি ডাল ভাঙা হয়েছে। ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক। কিছুদিন পর গাছটি আপনাআপনি মরে যায়। অমিতা নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে বড় অসুখে পড়ে যায়। জীবন-মরণ অসুখ। মাসখানিক ভুগে সেরে ওঠে। গাছপ্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়।

মিসির আলি ঠিক করলেন অমিতার সঙ্গে দেখা করবেন। ছোটবেলার কথা জিজ্ঞেস করবেন। যদিও এটা খুবই সম্ভব যে, অমিতার শৈশবের কথা কিছু মনে নেই। সে এখন থাকে কুমিল্লার ঠাকুরপাড়ায়। তার স্বামী পুলিশের ডিএসপি। সে নিজে কোনো এক মেয়ে-স্কুলে পড়ায়। মিসির আলি ঠিক করলেন অমিতার সঙ্গে

দেখা করেই চলে যাবেন ময়মনসিংহ। তিন্নির সঙ্গে কথা বলবেন। দু'-একটা ছোটখাটো পরীক্ষা টরীক্ষা করবেন। তিন্নির মার আত্মীয়স্বজনের খোঁজ বের করতে চেষ্টা করবেন। তিন্নিকে দিয়ে আরো কিছু ছবি আঁকিয়ে পাঠাবেন ডঃ লংম্যানের কাছে। অনেক কাজ সামনে। মিসির আলি দু'মাসের অর্জিত ছুটির জন্যে দরখাস্ত করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকরির পদটি হচ্ছে অস্থায়ী। পার্ট টাইম শিক্ষকতার পদ। দু' মাসের ছুটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেবে না। হয়তো চাকরি চলে যাবে। কিন্তু উপায় কি? এই রহস্য তাঁকে ভেদ করতেই হবে। ছোট্ট একটি মেয়ে কষ্ট পাবে, তা হতেই পারে না।

৯

অমিতা অবাক হয়ে বলল, 'আরে মামা তুমি!'

মিসির আলি বললেন, 'চিনতে পারছিস রে বেটি?'

'কী আশ্চর্য মামা, তোমাকে চিনব না! তোমাকে নিয়ে কত গল্প করি মানুষের সাথে।'

তিনি হাসলেন। অমিতা বলল, 'বিনা কারণে তুমি আমার কাছে আস নি। তুমি সেই মানুষই না। কি জন্যে এসেছ বল।'

'এখনি বলব?'

'না, এখন না। আমি স্কুলে যাচ্ছি। আজ আর ক্লাস নেব না, ছুটি নিয়ে চলে আসব। তুমি ততক্ষণে গোসলটোসল করে বিশ্রাম নাও। আমার ঘর-সংসার দেখ। ঘনঘন চা খাওয়ার অভ্যাস এখনো আছে?'

'হুঁ, আছে।'

'কাজের ছেলেটাকে বলে যাচ্ছি, সে প্রতি পনের মিনিট পরপর চা দেবে।'

'তোর ছেলেপুলে কই?'

অমিতা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার ছেলেপুলে নেই মামা, হবেও না কোনো দিন। তুমি তো খোঁজখবর রাখ না, কাজেই কিছু জান না। যদি জানতে, তাহলে আর—'

সে কথা শেষ করল না। মিসির আলি লক্ষ করলেন মেয়েটির গলা ভারি হয়ে এসেছে। কত রকম দুঃখ-কষ্ট মানুষের থাকে। তার মন খারাপ হয়ে গেল।

'তোর বর কোথায়?'

'ও টুরে গেছে--চৌদ্দগ্রামে। সন্ধ্যাবেলায় ফিরবে। তুমি কি থাকবে সন্ধ্যা পর্যন্ত?'

'না, আমার একটা জরুরী কাজ আছে।'

'তা তো থাকবেই। তোমাকে যে আমি কত ভালোবাসি মামা, অথচ তুমি--'

অমিতার গলা আবার ভারি হয়ে গেল। এই মেয়েটার মনটা অসম্ভব নরম।

মিসির আলি গোসল সেরে ঘুরে ঘুরে অমিতার ঘর-সংসার দেখলেন। বিরাট দোতলা বাড়ি। প্রতিটি ঘর চমৎকার করে সাজান। লাইব্রেরি-ঘরটি দেখে তাঁর মন ভরে গেল। বই বই আর বই। তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে।

কাজের ছেলেটির নাম চেরাগ মিয়া। সে সত্যি সত্যি পনের মিনিট পরপর চা নিয়ে আসে। দু' কাপ চা খেয়ে মিসির আলি ধমক দিলেন 'আর লাগবে না। দরকার হলে আমি চাইব।' লাভ হল না। পনের মিনিট পর আবার সে এক কাপ চা নিয়ে এল।

দুপুরে খেতে বসে অমিতার সঙ্গে তিনি গাছের সঙ্গে কথা বলার প্রসঙ্গটা তুললেন। অমিতা অবাক হয়ে বলল, 'এইটি জানবার জন্যে তুমি এসেছ আমার কাছে?'

'হুঁ।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি মামা? পাগলরাই শুধু এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ছোটাছুটি করে।'

'পাগল হই আর যা-ই হই, যা জানতে চাচ্ছি সেটা বল। তুই যে ছোটবেলায় গাছের সঙ্গে কথা বলতি, সেটা মনে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'আচ্ছা, গাছ কি তোর সঙ্গে কথা বলত?'

অমিতা হাসিমুখে বলল, 'গাছ আমার সঙ্গে কথা বলবে কি? গাছ আবার কথা বলা শিখল কবে?'

'তার মানে, গাছের কোনো কথা তুই শুনতে পেতি না?'

'কী ভাবে শুনব মামা? তুমি শুনতে পাও? এইসব ছোটবেলার খেয়াল। এটা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

'এমনি।'

'উঁহু। এমনি এমনি মাথা ঘামাবার মানুষ তুমি না। নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, যা তুমি আমাকে বলতে চাচ্ছ না। ওকি মামা, তোমার কি খাওয়া হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'অসম্ভব। এগার পদ রান্না করেছি। তুমি খেয়েছ মাত্র পাঁচ পদ। এখনো ছ'টা পদ বাকি আছে।'

'মরে যাব অমিতা।'

'মরে যাও আর যাই কর-- খেতে হবে। জোর করে আমি মুখে তুলে খাইয়ে দেব। আমাকে তুমি চেন না মামা।'

মিসির আলি হাসলেন। অমিতা গম্ভীর মুখে বসে আছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে

মনে হচ্ছে, সে সত্যি সত্যি জোর করে মুখে তুলে দেবে। মিসির আলি মৃদু স্বরে বললেন, 'গাছ তাহলে তোর সঙ্গে কোনো কথা বলত না?'

অমিতা বিরক্ত স্বরে বলল, 'না। গাছ আমার সঙ্গে কেন কথা বলবে বল তো? আমি কি গাছ? ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে, আমাকে কি গাছ বলে মনে হয়?'

মিসির আলি কিছু বললেন না। তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। তাঁর এই ভাগনীটি ভারি সুন্দর। দেবীর মতো মুখ। ঘন কালো তরল চোখ। মুখের ভাবটি বড় স্নিগ্ধ।

অমিতা বলল, 'মামা, তুমি মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার জন্যে ছোটাছুটি কর, অথচ তোমার আশেপাশে যারা আছে, তাদের কথা কিছুই ভাব না।'

'ভাবি না কে বলল?'

'না, ভাব না। ভাবলে এই ছ' বছরে একবার হলেও আসতে আমার কাছে।'

মিসির আলি দেখলেন, অমিতার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মেয়েগুলি এত নরম স্বভাবের হয় কেন, এই নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তিনি খানিকক্ষণ ভাবলেন। একটি মেয়ের ডিএনএ এবং একটি পুরুষের ডিএনএ-র মধ্যে তফাৎ কী, তাঁর জানতে ইচ্ছে হল। পড়াশোনা করতে হবে, প্রচুর পড়াশোনা। জীবন এত ছোট, অথচ কত কি আছে জানার।

১০

তিন্নি আজ সারা দিন ছাদে বসে আছে। সে ছাদে গিয়েছে সূর্য ওঠার আগে। এখন প্রায় সন্ধ্যা, কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুবে যাবে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক বারও সে নিজের জায়গা থেকে নড়ে নি। তার ছোট্ট শরীরটি পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে। মাঝে মাঝে বাতাসে তার চুল উড়ছে। এ থেকেই মনে হয়-এটি পাথরের মূর্তি নয়, জীবন্ত এক জন মানুষ। সকালে কাজের মেয়ে নাশতা নিয়ে ছাদে এসে ক্ষীণ গলায় বলেছিল, 'আপা নাশতা আনছি।'

তিন্নি কোনো জবাব দেয় নি। কাজের মেয়েটি আধ ঘন্টার মতো অপেক্ষা করল। এর মধ্যে কয়েক বার নাশতা খাবার কথা বলল। তিন্নির কোনো ভাবান্তর হল না।

দুপুরবেলা বরকত সাহেব নিজেই এলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'খেতে এস মা।'

তিন্নি নিশ্চুপ। বরকত সাহেব তার হাত ধরলেন। হাত গরম হয়ে আছে। বেশ গরম। যেন মেয়েটির এক শ' তিন বা চার জ্বর উঠেছে। তিনি গাঢ় স্বরে বললেন,

'তোমার কি শরীরটা খারাপ মা?'

তিন্নি না–সূচক মাথা নাড়ল।

'এস, ভাত দেয়া হয়েছে। দু' জনে মিলে খাই।'

সে আবার না–সূচক মাথা নাড়ল। বরকত সাহেব মেয়েকে নিজের দিকে টানতেই হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন। যেন হাজার ভোল্টের ইলেক্‌ট্রিসিটি চলে গেল কপালের মাঝখান দিয়ে। তিনি মেয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তিন্নি তখন খুব সহজ গলায় বলল, 'বাবা, তুমি চলে যাও।'

'চলে যাব?'

'হুঁ।'

'তুমি আসবে না?'

'না।'

'কিছু খাবে না?'

'খিদে নেই।'

'এক গ্লাস দুধ খাও। দুধ পাঠিয়ে দিই?'

'না।'

বরকত সাহেব নিচে গেলেন। এ কি গভীর পরীক্ষায় তিনি পড়লেন! মেয়ের এই বিচিত্র অসুখের সত্যি কি কোনো সমাধান আছে? তাঁর মনে হতে লাগল সমাধান নেই। এই অসুখ বাড়তেই থাকবে, কমবে না। মিসির আলি নামের মানুষটির কিছুই করার ক্ষমতা নেই। মেয়েটিকে নিয়ে বিদেশে চলে গেলে কেমন হয়? ইউরোপ–আমেরিকার বড়ো বড়ো ডাক্তাররা আছেন। তাঁরা দিনকে রাত করতে পারেন--এই সামান্য কাজটা পারবেন না? খুব পারবেন। তিনি নিজে দুপুরে কিছু খেতে পারলেন না। মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা হতে লাগল। বিকেলের দিকে সেই যন্ত্রণাা খুব বাড়ল। তিনি কয়েক বার বমি করলেন। অসম্ভব রাগে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। কার উপর রাগ? সম্ভবত নিজের ভাগ্যের উপর। এত খারাপ ভাগ্যও মানুষের হয়?

তিন্নি সন্ধ্যা মেলাবার পর নিজের ঘরে ঢুকল। আজ অনেক দিন পর তার আবার ছবি আঁকতে ইচ্ছা হচ্ছে। রঙ–তুলি সাজিয়ে সে উবু হয়ে মেঝেতে বসল। তার সামনে বড় একটি কাগজ বিছান। সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে, অতি দ্রুত তুলি বোলাতে শুরু করল। প্রথমে মনে হচ্ছিল, কিছু লাইন এলোমেলোভাবে টানা হচ্ছে। এখন আর তা মনে হচ্ছে না। এখন কাগজে লতান গাছের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আকাশে দু'টি সূর্য। তার আলো তেরছাভাবে গাছগুলির উপর পড়েছে।

তিন্নি মৃদুস্বরে বলল, 'তোমরা কেমন আছ?'

ছবির গাছগুলি যেন উত্তরে কিছু বলল। তিন্নি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল,

'আমার কিছু ভালো লাগছে না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট।'

গাছগুলি যেন তার উত্তরেও কিছু বলল। খুব কঠিন কোনো কথা। কারণ তিন্নিকে দেখা গেল দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠেছে। সেই কান্না দীর্ঘস্থায়ী হল না। সে ছবিটি কুচিকুচি করে দিয়ে শান্ত হয়ে নিচে নেমে গেল। কারণ সে বুঝতে পারছে, তার বাবা ঠিক এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে ভাবছেন। সেই ভাবনাগুলি ভালো নয়। তার বাবা সমস্যার কাছ থেকে মুক্তি চান। কিন্তু যে-পথ তিনি বেছে নিতে চাচ্ছেন তাতে কোনো লাভ হবে না।

'বাবা।'

বরকত সাহেব চমকে ফিরলেন। তাঁর ঘর অন্ধকার। তিনি ইজিচেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছেন। তিন্নি তাঁর সামনের খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। বরকত সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর মেয়ের দিকে তাকাতে লাগলেন।

'কিছু বলবে?'

'বলব।'

'বল শুনি। চেয়ারে বস। বসে বল।'

তিন্নি খুব নরম গলায় বলল, 'তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাও?'

'হুঁ। বড়ো ডাক্তার দেখাব। পৃথিবীর সেরা ডাক্তার।'

'ডাক্তার কিছু করতে পারবে না।'

'কী করে বুঝলে?

'আমি জানি। আমার কোনো অসুখ করে নি। আমি তোমাদের মতো না, আমি অন্য রকম।

'সেটা আমি জানি।'

'না, তুমি জান না। সবটা জান না।'

'ঠিক আছে, না জানলে জানি না। এত কিছু জানার আমার দরকার নেই। আমার টাকার অভাব নেই। তোমাকে আমি বড়ো বড়ো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। ইউরোপ। আমেরিকা।'

'আমি এইখানেই থাকব। আমি কোথাও যাব না।'

বরকত সাহেব কড়া চোখে তাকালেন। তাঁর নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। কপালে ঘাম জমতে লাগল। তিন্নি বলল, 'তোমরা কিছুতেই আমাকে এখান থেকে নিতে পারবে না। তোমাদের সেই শক্তি নেই।'

বরকত সাহেব কিছু বললেন না। তিন্নি শান্ত সুরে বলল, 'এই বাড়িটাতে আমি একা থাকতে চাই বাবা।'

'একা থাকতে চাই মানে?'

'আমি একা থাকব। আর কেউ না।'

'কী বলছ এসব!'

তিন্নি জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বরকত সাহেব কড়া গলায় বললেন, 'পরিষ্কার করে বল, তুমি কি বলতে চাও।'

'এই বাড়িটাতে আমি একা থাকব। আর কেউ থাকবে না। কাজের লোক, দারোয়ান, মালী, এদের সবাইকে বিদায় করে দাও। তুমিও চলে যাও। তুমিও থাকবে না।'

'আমিও চলে যাব!'

'হ্যাঁ।'

বরকত সাহেব উঠে এসে মেয়ের গালে প্রচন্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন। তিন্নি কিছুই বলল না। শান্ত পায়ে উঠে চলে গেল। বরকত সাহেব লক্ষ করলেন, তিন্নি বাগানে চলে যাচ্ছে। বাগান এখন ঘন অন্ধকার। বর্ষার পানি পেয়ে ঝোপঝাড় বড় হয়ে উঠেছে। সাপখোপ নিশ্চয়ই আছে। এই মেয়ে এখন এই সাপখোপের মধ্যে একা-একা হাঁটবে। অসহ্য, অসহ্য! কিন্তু করার কিছুই নেই। তাঁর মনে হল, মেয়েটি মরে গেলে তিনি মুক্তি পান। জন্মের পরপর তিন্নির জন্ডিস হয়েছিল। গা হলুদ হয়ে মরমর অবস্থা। মেয়েকে ঢাকা পিজিতে নিয়ে যেতে হয়েছিল। বহু কষ্টে তাকে সারিয়ে তোলা হয়েছে। সেই সময় কিছু-একটা হয়ে গেলে, আজ এই ভয়াবহ কষ্ট সহ্য করতে হত না।

তিনি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘরের ভেতর পায়চারি করলেন। একবার ভাবলেন বাগানে যাবেন। কিন্তু সেই চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। কী হবে বাগানে গিয়ে? তিনি কি পারবেন এই মেয়েকে ফেরাতে? পারবেন না। সেই ক্ষমতাই তাঁর নেই। হয়তো কারোরই নেই। পীর-ফকির ধরলে কেমন হয়? তিনি নিজে এইসব বিশ্বাস করেন না। সারা জীবন তিনি ভেবেছেন, অস্বাভাবিক কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু এখন দেখছেন, তাঁর ধারণা সত্যি নয়। অস্বাভাবিক ক্ষমতা মানুষের থাকতে পারে। তিন্নিরই আছে। কাজেই পীর-ফকিরের কাছে বা সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়া যেতে পারে।

'স্যার।'

'কে?'

তিনি দেখলেন, চায়ের পেয়ালা হাতে নিজাম দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। নিজাম বলল, 'ঐ লোকটা আসছে।'

'কোন লোক?'

'আগে যে ছিলেন।'

'ও, মিসির আলি।'

'জ্বি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বরকত সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, 'দেখা করার কোনো দরকার নেই। আমি এখন ঘর থেকে বেরুব না। ভদ্রলোককে তাঁর ঘর দেখিয়ে দাও। খাবারদাবারের

ব্যবস্থা কর। আর তিনি যদি তিন্নির সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে তিন্নিকে খবর দাও। তিন্নি বাগানে গিয়েছে।'

নিজাম চলে গেল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টি হবে বোধ হয়। বাতাস ভারি হয়ে আছে। চারদিকে অসহ্য গুমট।

মিসির আলি এসেছেন সন্ধ্যাবেলায়, এখন রাত এগারটা। কিছুক্ষণ আগেই রাতের খাবার শেষ করেছেন। প্রায় চার ঘন্টার মতো হল, তিনি এ বাড়িতে আছেন। নিজাম এর মধ্যে দু'বার জিজ্ঞেস করেছে, সে তিন্নিকে খবর দেবে কি না। তিনি বলেছেন, খবর দেবার দরকার নেই। কারণ তিন্নি নিশ্চয়ই জানে যে তিনি এসেছেন। আলাদা করে বলার কোনোই প্রয়োজন নেই।

'তিন্নি আছে কোথায়?'

'বাগানে।'

'এই রাতের বেলায় বাগানে কী করছে!'

'জানি না স্যার। কয়েক দিন ধরে সন্ধ্যার পর বাগানে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত থাকে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার।'

'এত রাত পর্যন্ত বাগানে সে কী করে?'

'বাড়ির পিছনের দিকে একটা বড়ই গাছ আছে। সেই বড়ই গাছের কাছে একটা গর্ত, ঐখানে চুপচাপে দাঁড়ায়ে থাকে।'

'ও, আচ্ছা।'

মিসির আলির মুখ দেখে মনে হল তিনি এই খবরে তেমন অবাক হন নি। বেশ সহজভাবে বললেন, 'তুমি বারান্দায় আমাকে একটা চেয়ার দাও। বারান্দায় বসে আকাশের শোভা দেখি। আর শোন, ভালো করে এক কাপ চা দিও। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি হবে বোধ হয়।'

'জ্বি।'

মিসির আলি বারান্দায় এসে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টুপ টুপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল। মিসির আলি অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন তিন্নি বেরিয়ে আসবে। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এ রকম একটি ঝড়-জলের রাতে বাচ্চা একটি মেয়ে একা-একা বাগানে। কত রকম অদ্ভুত সমস্যা আমাদের চারদিকে। মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে। কেরোসিনের বাহারী ল্যাম্প জ্বালান হয়েছে। নিজাম একটি ল্যাম্প বাইরে নিয়ে আসতেই হাওয়া লেগে সেটি দপ করে নিভে গেল। ঠিক তখন মিসির আলি দেখলেন, তিন্নি বের হয়ে আসছে। ভিজে চুপসে গিয়েছে মেয়েটি। তিন্নিই তাঁকে

দেখেছে। সে এগিয়ে এল মিসির আলির দিকে।

'আপনি কখন এসেছেন?'

'অনেকক্ষণ হল। তুমি বুঝতে পার নি?'

'না। এখন দেখলাম।'

মিসির আলি বেশ অবাক। মেয়েটি বুঝতে পারল না কেন? টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা কি নষ্ট হয়ে গেছে?

নিজাম হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সে কি করবে বুঝতে পারছে না। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নি, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস, আমরা গল্প করি। ঝড়বৃষ্টির রাতে গল্প করতে বেশ ভালো লাগে। আর নিজাম, তুমি আমাদের দু' জনের জন্যে চা নিয়ে এস। তিন্নি, তুমি চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে?'

'না।'

নিজাম ফিসফিস করে বলল, 'আপা আজ সারাদিন কিছু খায় নাই।'

মিসির আলি বললেন, 'তাহলে কিছু খাবারও নিয়ে আস। হালকা কোনো খাবার।'

'না, আমি কিছুই খাব না, খিদে নেই।'

'ঠিক আছে না খেলে। এস গল্প করি। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এস। তোমার সমস্ত পা কাদায় মাখামাখি।'

তিন্নি চলে গেল। নিজাম এক পট চা এনে রাখল সামনে। মিসির আলি অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু মেয়েটি সে রাতে আর তাঁর কাছে এল না। খুব ঝড় হল সারা রাত। শোঁ-শোঁ করে হাওয়া বইতে থাকল। মিসির আলি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারলেন না। তাঁর বারবার মনে হতে লাগল, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি যোগাযোগ করবে তাঁর সঙ্গে। দু' জন দু' জায়গায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবেন। কিন্তু তা হল না।

সূর্য এখনো ওঠে নি। মিসির আলি দ্রুত পা ফেলছেন। ব্রহ্মপুত্র নদী মনে হচ্ছে এখনো ঘুমিয়ে। দিনের কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয় নি। কাল রাতের বৃষ্টির জন্যেই বুঝি চারদিক ঝিলমিল করছে। মিসির আলি গত রাতটা প্রায় অঘুমেই কাটিয়েছেন। কিন্তু তার জন্যে খারাপ লাগছে না। শরীরে কোনো ক্লান্তি নেই, তিনি খুঁজছেন চা-ওয়ালাকে। পাওনা টাকাটা দিয়ে দেবেন। গল্পগুজব করবেন। তাঁর মনে একটা আশঙ্কা ছিল, হয়তো এই চাওয়ালা বুড়োর আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। বাকি জীবন মনের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ঘটনা কাঁটার মত বিঁধে থাকবে। আশঙ্কা সত্যি হল না। বুড়োকে পাওয়া গেল। কেতলিতে চায়ের পানি ফুটে উঠেছে। কেতলির নল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বুড়োর মুখ হাসিহাসি।

'কেমন আছেন বুড়ো মিয়া?'

'আল্লায় যেমন রাখছে। আপনের শইল বালা?'

'জ্বি ভালো। আমাকে চিনতে পারছেন না? ঐ যে চা খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে গেলাম।'

বুড়ো হেসে ফেলল। মিসির আলি বললেন, 'জরুরি কাজে ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম। কাল এসেছি। আপনার টাকা নিয়ে এসেছি। চা কি হয়েছে?'

বুড়ো চায়ের কাপে লিকার ঢালতে লাগল। মিসির আলি বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে আমাকে খুব গালাগালি করেছেন।'

'জ্বি না মিয়া সাব। অত অল্প কারণে কি আর গাইল দেওন যায়? আমি জানতাম আপনে আইবেন।'

'কি করে জানতেন?'

'বুঝা যায়।'

এই কথাটি ঠিক। অনেক কিছুই বোঝা যায়। রহস্যময় উপায়ে বোঝা যায়। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মিসির আলির মনে হল, তিন্নির ব্যাপার তিনি খানিকটা বুঝতে পারছেন। আবছা ভাবে বুঝছেন।

'কি ভাবেন মিয়া সাব?'

'না কিছু না। উঠি।'

মিসির আলি চায়ের দাম মিটিয়ে রওনা হবেন, ঠিক তখন মাথা ঝিম করে উঠল। তিন্নির পরিষ্কার রিনরিনে গলা, 'আপনি ভালো আছেন?' মিসির আলি আবার বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। বুড়ো বলল, 'কি হইছে?'

'শরীরটা একটু খারাপ লাগছে। আমি খানিকক্ষণ বসি?'

'বসেন বসেন।'

মিসির আলি মনে-মনে তিন্নির সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

'গত রাতে তুমি আস নি কেন?'

'ইচ্ছা করছিল না।'

'না এসেও তো কথা বলতে পারতে। তাও বল নি।'

'ইচ্ছা করছিল না।'

'এখন ইচ্ছা করছে?'

'হ্যাঁ করছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে।'

'বল, কথা বল। আমি শুনছি।'

'আমি এখন এখানকার গাছের কথা বুঝতে পারি।'

'বাহ্, চমৎকার তো!'

'তাই রোজ সন্ধ্যাবেলায় বাগানে যাই। ওদের কথা শুনি।'

'দিনের বেলা শুনতে পাও না?'

'না, দিনের বেলায় ওরা কোনো কথা বলে না, চুপ করে থাকে। ওরা কথা

বলে শুধু সন্ধ্যার দিকে। রাতে আবার চুপ করে যায়। ওরা তো আর মানুষের মতো না, যে, সারা দিন বকবক করবে।'

'তা তো ঠিকই। ওরা কী কথা বলে তোমার সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে তো কোনো কথা বলে না। ওরা কথা বলে নিজেদের মধ্যে, আমি শুনি।'

'কী নিয়ে কথা বলে?'

'অদ্ভুত জিনিস নিয়ে কথা বলে। বেশির ভাগই আমি বুঝতে পারি না।'

'তবু বল। আমার শুনতে ইচ্ছা করছে।'

'জীবন কী, জীবনের মানে কী-- এইসব নিয়ে তারা কথা বলে। নিজেদের মধ্যে কথা বলে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আর কথা বলে মানুষদের নিয়ে। পশুপাখিদের নিয়ে। এরা পৃথিবীর মানুষদের কথা জানে। এরা কী বলে কী করে--এইসব জানে। মানুষদের নিয়ে ভাবে।'

'বাহ্, চমৎকার তো!'

'একটা গাছ যখন মারা যায়, তখন সারা জীবনে যা জানল--তা অন্য গাছদের জানিয়ে যায়। মানুষদের যখন কষ্ট হয়, তখন তাদের কষ্ট হয়। মানুষদের যখন আনন্দ হয়, তখন তাদেরও আনন্দ হয়।'

'মানুষ যখন একটা গাছকে কেটে ফেলে বা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে, তখন তারা মানুষদের উপর রাগ করে না?'

'না। তারা রাগ করতে পারে না। তারা তো মানুষের মতো নয়। তারা শুধু ভালোবাসে। জানেন, তাদের মনে খুব কষ্ট।'

'কেন বল তো?'

'কারণ, খুব শিগগীরই পৃথিবীতে কোনো মানুষ থাকবে না। কোনো জীব থাকবে না। পৃথিবী আস্তে আস্তে গাছে ভরে যাবে। এই জন্যেই তাদের দুঃখ।'

'মানুষ থাকবে না কেন?'

'এরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাবে। এটম বোমা ফাটাবে। পৃথিবী ছাড়াও তো আরো অনেক গ্রহ আছে যেখানে এক সময় মানুষ ছিল, এখন নেই। এখন শুধু গাছ।'

'গাছদের জন্যে এটা তো ভালোই, তাই নয় কি তিন্নি? শুধু ওরা থাকবে, আর কেউ থাকবে না।'

তিন্নি দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'না, ভালো না। ওরা সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চায়। সারা জীবনে ওরা যত জ্ঞান লাভ করেছে, এগুলি মানুষকে বলতে চায়। কিন্তু বলার আগেই মানুষ শেষ হয়ে যায়। ওরা বলতে পারে

না। এই জন্যে ওদের খুব কষ্ট।'

'মানুষকে ওরা ওদের কথা বলতে পারছে না কেন?'

'বলতে পারছে না, কারণ মানুষ তো-এখনো খুব উন্নত হয় নি। ওদের অনেক উন্নত হতে হবে। কিন্তু তা হবার আগেই তো ওরা শেষ হয়ে যায়।'

'এইসব কথা কি তোমার আশেপাশের গাছদের কাছ থেকে জানলে?'

'না। অন্য গাছ আমাকে বলেছে। আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন ওরা বলে।'

'তুমি যে--সব গাছের ছবি আঁক, সেইসব গাছ?'

তিন্নি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। বুড়ো চাওয়ালা বলল, 'শইলডা কি অখন ঠিক হইছে?'

'হ্যাঁ ঠিক আছে। যাই বুড়ো মিয়া।'

'কাইল আবার আইসেন।'

'না, কাল আসতে পারব না। কাল আমি ঢাকা চলে যাব। আবার যখন আসব, তখন কথা হবে।'

বরকত সাহেবের সঙ্গে দেখা হল চায়ের টেবিলে। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। ভালোমতো চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মিসির আলির উপর বেশ বিরক্ত। মিসির আলি এই বিরক্তির কারণ ঠিক ধরতে পারলেন না। মিসির আলি বললেন, 'আপনার শরীর কেমন?'

'আমার শরীর ভালোই। আমার শরীর খারাপ হওয়ার তো কোনো কারণ ঘটে নি। আপনি ঢাকায় এত দিন কী করলেন?'

'তেমন কিছু করতে পারি নি, খোঁজখবর করছি।'

'খোঁজখবর তো যথেষ্টই করা হল, আর কত?'

'আপনি মনে হয় আশা ছেড়ে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছি। এই সমস্যার কোনো সমাধান নেই। আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন। সেই জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার পারিশ্রমিক হিসেবে আমি একটি চেক আপনার জন্যে তৈরি করে রেখেছি, নিজাম আপনাকে দেবে। আমি চাই না এ ব্যাপারটি নিয়ে আপনি আর মাথা ঘামান।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ভাগ্যকে স্বীকার করে নেবার চেষ্টা করছি। যা ঘটেছে, এটা আমার ভাগ্য।'

'ভাগ্যটা কী জানতে পারি কি?'

'না, জানতে পারেন না। আমি ঐ সব নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। সমস্ত ব্যাপারটা থেকে আমি হাত ধুয়ে ফেলতে চাই।'

মিসির আলি ঠান্ডা গলায় বললেন, 'গোড়া থেকেই আপনি অনেক কিছু আমার কাছ থেকে গোপন করেছেন, যেটা উচিত হয় নি।'

বরকত সাহেব ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আমি ধারণা করেছিলাম আপনি নিজেই তা ধরতে পারবেন। এখন দেখছি আমার ধারণা ঠিক নয়। আপনি কিছুই ধরতে পারেন নি।'

'একেবারেই যে ধরতে পারি নি, তা নয়। আমার ধারণা, আপনার স্ত্রী আপনাকে বলে গিয়েছিলেন, তিন্নি মেয়েটি বড় হলে কেমন হবে। অর্থাৎ আজকের এই সমস্যার ব্যাপারটি সম্পর্কে আপনার স্ত্রী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।'

'এই জাতীয় ধারণা হবার পেছনে আপনার যুক্তি কি?'

'যুক্তি অবশ্যই আছে। এবং বেশ কঠিন যুক্তি।'

'বলুন, শুনি আপনার কঠিন যুক্তি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। বরকত সাহেবের চোখের দিকে তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। এবং শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি প্রথমেই লক্ষ করলাম, আপনি আপনার মেয়ের অস্বাভাবিকতাগুলি মোটামুটি সহজভাবেই গ্রহণ করেছেন, তেমন বিচলিত হন নি। আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে জানান নি। এ থেকেই মনে হয়েছে, আপনার মেয়ের এইসব অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত। এই প্রস্তুতি কোথেকে আসতে পারে? আমার মনে হয়েছে কেউ নিশ্চয় আগেই আপনাকে বলেছে। কে বলতে পারে? আমার মনে হয়েছে আপনার স্ত্রীর কথা। কারণ আপনার স্ত্রী হচ্ছেন--।'

বরকত সাহেব মিসির আলির কথা শেষ করতে দিলেন না। উঠে দাঁড়ালেন এবং কঠিন স্বরে বললেন, 'আমার প্রচন্ড মাথা ধরেছে, আপনি এখন যান, পরে কথা বলব।'

মিসির আলি নিঃশব্দে উঠে এলেন। চলে গেলেন বাগানে। বড়ই গাছটি খুঁজে বের করবেন। তিন্নি বড়ই গাছের একটা গর্তে দাঁড়িয়ে থাকে, ঐ গর্তটিও পরীক্ষা করে দেখবেন। কিন্তু সেই সুযোগ হল না। ভয়াবহ একটি ব্যাপার ঘটল। প্রকান্ড একটা ময়াল সাপ হঠাৎ যেন আকাশ ফুঁড়ে নেমে এল। মিসির আলি চমকে উঠলেন। তাঁর চোখ থেকে চশমা খুলে পড়ল, আর ঠিক তখন মনে হল--এই দৃশ্যটি সত্যি নয়। ময়মনসিংহ শহরের একটি বাড়িতে এত বড় একটি ময়াল এসে উপস্থিত হতে পারে না। তাছাড়া কোনো সাপ পেটে ভর দিয়ে নিজের মাথাটা এত উঁচুতে তুলতে পারে না। এই দৃশ্যটি নিশ্চয়ই তিন্নির তৈরি করা। মেয়েটি এই ছবি দেখাচ্ছে। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন, আর ঠিক তখন তিন্নির হাসি শোনা গেল। মেয়েটি তার ঘরে বসেই হাসছে, তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তিন্নির হাসি থামল। সে রিনরিনে গলায় বলল,

'খুব ভয় পেয়েছেন?'

'তা পেয়েছি।'

'কিন্তু যতটা ভয় পাবেন ভেবেছিলাম, ততটা পান নি। আপনি বুঝে ফেলেছেন যে এটা মিথ্যা সাপ।'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক।'

'আপনার এত বুদ্ধি কেন বলুন তো?'

'জানি না।'

'সব মানুষের যদি আপনার মতো বুদ্ধি হত, তাহলে খুব ভালো হত। তাই না?'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। হাসি থামিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি আমাকে ভয় দেখালে কেন?'

'আপনি বলুন কেন। আপনার এত বুদ্ধি, আর এই সহজ জিনিসটা বলতে পারবেন না?'

'আন্দাজ করতে পারছি। তুমি চাও না আমি ঐ গর্তটি দেখি, যেখানে তুমি রোজ দাঁড়াও। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'দেখ তিন্নি, আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে চাই। কিন্তু তুমি আমাকে বুঝতে দিচ্ছ না। তুমি আমাকে সাহায্য না করলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। আমার এত ক্ষমতা নেই।'

তিন্নি ক্লান্ত গলায় বলল, 'কোনো মানুষ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। যারা পারত, তারা করবে না।'

'কারা পারত?'

তিন্নি জবাব দিল না।

মিসির আলির মনে হল, মেয়েটি কাঁদছে।

১১

মিসির আলি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দরজায় খুটখুট শব্দ শুনে জেগে উঠলেন। অনেক রাত। ঘড়ির ছোট কাঁটা একের ঘর পার হয়ে এসেছে। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, 'কে?' কোনো জবাব এল না। কিন্তু দরজার কড়া নড়ল। মিসির আলি অবাক হয়ে দরজা খুললেন। অন্ধকারে বরকত সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন।

'সরি, আপনার ঘুম ভাঙালাম বোধ হয়।'

'কোনো অসুবিধা নেই, আপনি আসুন।'

বরকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'ঘুম আসছিল না, ভাবলাম আপনার

সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করি।'

'খুব ভালো করেছেন। বসুন।'

বরকত সাহেব বসলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। বসে আছেন মাথা নিচু করে। এক জন অহংকারী লোক এভাবে কখনো বসে না। মিসির আলি বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনি আপনার স্ত্রীর কথা কিছু বলতে চান। বলুন আমি শুনছি।'

বরকত সাহেব চুপ করে রইলেন। তাঁর মাথা আরো একটু ঝুঁকে পড়ল। মিসির আলি বললেন, 'আমি বরং বাতি নিভিয়ে দিই, তাতে কথা বলতে আপনার সুবিধা হবে। আলোতে আমরা অনেক কথা বলতে পারি না। অন্ধকারে সহজে বলতে পারি।'

বাতি নেভাবার পর ঘর কেমন অন্য রকম হয়ে গেল। গা ছমছম করতে লাগল। যেন এই ঘরটি এত দিনের চেনা কোনো ঘর নয়। অন্য কোনো রহস্যময় অচেনা ঘর। বরকত সাহেব সিগারেট ধরিয়ে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমার স্ত্রী খুবই সহজ এবং সাধারণ এক জন মহিলা। বলার মতো তেমন কোনো বিশেষত্ব তাঁর নেই। কোনো রকম অস্বাভাবিকতাও তাঁর চরিত্রে ছিল না। তবে আমার শাশুড়ি একজন অস্বাভাবিক মহিলা ছিলেন। বিয়ের আগে তা জানতে পারি নি। জেনেছি বিয়ের অনেক পরে।

'আমার স্ত্রীর জন্মের পরপর আমার শাশুড়ি মারা যান। আমার শাশুড়ি সম্পর্কে এখন আপনাকে যা বলছি, সবই শোনা কথা। আমার স্ত্রীর জন্মের ঠিক আগে আগে আমার শাশুড়ি অদ্ভুত আচার-আচরণ করতে থাকেন। তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে রোদে বসে থাকা। এখন তিনি যা করে, অনেকটা তাই। আমার শাশুড়ি লোকজনদের বলতে শুরু করেন তাঁর পেটে মানুষের বাচ্চা নয়, তাঁর পেটে বড় হচ্ছে একটা গাছ। সবাই বুঝল এটা মাথা খারাপের লক্ষণ। গ্রাম্য চিকিৎসা-টিকিৎসা হতে থাকল। কোনো লাভ হল না। তিনি বলতেই থাকলেন, তাঁর পেটে বড় হচ্ছে একটা গাছ। যাই হোক, যথাসময়ে আমার স্ত্রীর জন্ম হল--ফুটফুটে একটি মেয়ে। আমার শাশুড়ি মেয়েকে কোলে নিলেন, কিন্তু বললেন, 'তোমরা বুঝতে পারছ না, এ আসলে মানুষ নয়, এ একটা গাছ।' এর কিছু দিন পর আমার শাশুড়ি মারা যান।

আপনাকে আগেই বলেছি, আমার স্ত্রী খুব স্বাভাবিক মহিলা ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন পেটে এল তখন তার ভেতরেও অস্বাভাবিকতা দেখা দিল। এক রাতে সে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, 'তার পেটে যে বড় হচ্ছে, সে মানুষ নয়, সে একটা গাছ।' আমি এমন ভাব দেখালাম যে, এই খবরে মোটেও অবাক হই নি। আমি বললাম, 'তাই কি?

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কী করে বুঝলে?'

'অনেক দূরের কিছু গাছ আমাকে স্বপ্নে বলেছে। তারা বলেছে, তোমার গর্ভে যে জন্মেছে, তাকে খুব যত্নে বড় করবে। কারণ তাকে আমাদের খুব দরকার।'

'স্বপ্নে তো মানুষ অনেক কিছুই দেখে। স্বপ্নটাকে কখনো সত্যি মনে করতে নেই।'

'এটা সত্যি। এটা স্বপ্ন নয়।'

'ঠিক আছে, সত্যি হলে সত্যি। এখন ঘুমাও।'

তিন্নির জন্মের কিছু দিন পর আমার স্ত্রী মারা গেল। তার মৃত্যুর দু'দিন আগে তিন্নিকে কোলে নিয়ে আমি তার কাছে গেলাম। হাসিমুখে বললাম, 'কী সুন্দর একটি মেয়ে, তুমি বলছ গাছ?'

আমার স্ত্রী ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল। শান্ত স্বরে বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না। কিন্তু একদিন বুঝবে।' আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'এক দিন সকালবেলা দেখব তিন্নির চারদিকে ডালপালা গজিয়েছে, নতুন পাতা ছেড়েছে?'

আমার স্ত্রী তার জবাব দিল না। কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। যেন আমার কথায় সে অসম্ভব রেগে গেছে।

বরকত সাহেব থামলেন। ঘর অন্ধকার, কিন্তু মিসির আলি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

'আপনি আমার স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। আমি যা জানি আপনাকে বললাম। এখন আপনি আমাকে বলুন, কী হচ্ছে?'

মিসির আলি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বরকত সাহেব ধরা গলায় বললেন, 'কিছু দিন থেকে তিন্নি বাগানে একটি গর্তে চুপচাপ ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। ফিরে আসে অনেক রাতে। আমার প্রায়ই মনে হয়, একদিন সে হয়তো আর ফিরবে না। সেখানেই থেকে যাবে এবং দেখব--'

বরকত সাহেব কথা শেষ করলেন না। তাঁর গলা বন্ধ হয়ে এল। মিসির আলি বললেন, 'নিন, এক গ্লাস পানি খান।' বরকত সাহেব তৃষ্ণার্তের মতো পানির গ্লাস শেষ করলেন।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি বলুন।'

'তিন্নি এখন আমাকে বলছে বাড়ি ছেড়ে যেতে। সে একা থাকবে এখানে। কাজের লোক থাকবে না, দারোয়ান মালি কেউ থাকবে না। থাকবে শুধু সে একা। এবং আপনি জানেন মেয়েটি যা চায়, তাই আমাকে করতে হবে। ওর অসম্ভব ক্ষমতা। আপনি তার পরিচয় ইতিমধ্যেই হয়তো পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, তা পেয়েছি।'

'কী হচ্ছে আপনি আমাকে বলুন, এবং আমি কী করব সেটা আমাকে বলুন।

আমার শরীরও বেশি ভালো না। ব্লাড প্রেশার আছে, ইদানীং সুগারের প্রবলেম দেখা দিয়েছে। রাতের পর রাত ঘুমুতে পারি না।'

মিসির আলি দৃঢ় গলায় বললেন, 'হাল ছেড়ে দেবার মতো এখনো কিছু হয় নি।'

'হালই তো নেই। হাল ধরবেন কীভাবে?'

বরকত সাহেব উঠে পড়লেন। বাকি রাতটা মিসির আলি জেগেই কাটালেন। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে সমস্ত ব্যাপারটা গোছাতে চেষ্টা করলেন। 'জিগ স পাজল্' একটির সঙ্গে অন্যটি কিছুতেই মেলে না। তবু কি কিছু একটা দাঁড় করান যায় না?

একটা পর্যায়ে জীবনকে প্রকৃতি দু' ভাগে ভাগ করলেন--প্রাণী এবং উদ্ভিদ। প্রাণীরা ঘুরে বেড়াতে পারে, উদ্ভিদ পারে না। পরবর্তী সময়ে প্রাণের বিকাশ হল। ক্রমে ক্রমে জন্ম হল অসাধারণ মেধাসম্পন্ন প্রাণী--মানুষ। এই বিকাশ শুধু প্রাণীর ক্ষেত্রে হবে কেন? কেন উদ্ভিদের বেলায়ও হবে না?

ধরা যাক উদ্ভিদের বেলায়ও বিকাশ হল। এক সময় জন্ম হল এমন এক শ্রেণীর উদ্ভিদ, অসাধারণ যাদের মেধা। এই পৃথিবীতে হয়তো হল না, হল অন্য কোনো গ্রহে। একটি উন্নত প্রাণী খুঁজে বেড়াবে অন্য উন্নত জীবনকে। কারণ তারা চাইবে, তাদের আহরিত জ্ঞান অন্যকে জানাতে। তখন তারা কি চেষ্টা করবে না ভিন্ জাতীয় প্রাণের সঙ্গে যোগাযোগের? সেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে এমন একটি 'প্রাণ' তার দরকার, যে একই সঙ্গে মানুষ এবং উদ্ভিদ। এ জাতীয় একটি প্রাণ সে তৈরি করতে চেষ্টা করবে। তার জন্যে তাকে ডিএনএ অণুর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রথম পরীক্ষাতেই সে তা পারবে না। পরীক্ষাটি তাকে করতে হবে বারবার।

তিন্নি কি এ রকম একজন কেউ? মহাজ্ঞানী উদ্ভিদ-গোষ্ঠীর পরীক্ষার একটি বস্তু? মানুষ যদি উদ্ভিদ নিয়ে, ইঁদুর নিয়ে, ল্যাবরেটরিতে নানান ধরনের পরীক্ষা করতে পারে--ওরা কেন পারবে না?

কিন্তু তারা পরীক্ষাটা করছে কীভাবে? এক জন মানুষ ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরের গায়ে একটি সিরিঞ্জে করে রিএজেন্ট ঢুকিয়ে দিতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদ কি তা পারবে?

হয়তো পারবে। মাইক্রোওয়েভ রশ্মি দিয়ে আমরা দূর থেকে যন্ত্র চালু করতে পারি। ওদের হাতেও হয়তো তেমন ব্যবস্থা আছে।

মিসির আলি বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে বসলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বাগানটিকে ভারি সুন্দর লাগছে। এত সুন্দর যে মন খারাপ হয়ে যায়।

'আপনি আজ আর ঘুমুলেন না, তাই না?'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। তিন্নির গলা।

'তুমিও তো দেখছি জেগে আছ।'

'হ্যাঁ, আমি জেগেই থাকি।'

মিসির আলি কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। এ জাতীয় কথাবার্তায় তিনি এখন অভ্যস্ত। আগের মতো অস্বস্তি বোধ হয় না। বরঞ্চ মনে হয়, এই তো স্বাভাবিক। বরঞ্চ কথা বলার এই পদ্ধতি অনেক সুন্দর। মুখোমুখি এসে বসার দরকার নেই। দু' জন দু' জায়গায় থেকে কথা বলে চমৎকার সময় কাটান।

'তিন্নি, আমি যে এতক্ষণ তোমার বাবার সঙ্গে গল্প করলাম-- সেটা কি তুমি জান?'

'হ্যাঁ জানি। সব কথা শুনেছি।'

'আমি তোমাকে নিয়ে যা ভেবেছি, তাও নিশ্চয়ই জান?

'হ্যাঁ, তাও জানি। সব জানি।

'আমি কি ঠিক পথে এগুচ্ছি? অর্থাৎ আমার থিওরি কি ঠিক আছে?'

'কিছু কিছু ঠিক। বেশির ভাগই ঠিক না।'

'কোন জিনিসগুলি ঠিক না, সেটা কি আমাকে বলবে?'

'না, বলব না।'

'কেন বলবে না?'

তিন্নি জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কি চাও না, আমি তোমাকে সাহায্য করি?'

'না, চাই না।'

'এক সময় কিন্তু চেয়েছিলে।'

'তখন খুব ভয় লাগত, এখন লাগে না।'

মিসির আলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর খুব শান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বুঝতে পারছ, তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। তুমি বদলে যাচ্ছ। শেষ পর্যন্ত কী হবে তুমি কি জান?'

'জানি।'

'তুমি কি আমাকে তা বলবে?'

'না।'

'আচ্ছা এইটুকু বল, তুমি কি একমাত্র মানুষ, যার উপর এই পরীক্ষাটি হচ্ছে? না তুমি ছাড়াও আরো অনেককে নিয়ে এ রকম হয়েছে বা হচ্ছে।'

'অনেককে নিয়েই হয়েছে এবং হচ্ছে। এবং, এবং—'

'বল আমি শুনছি।'

'এমন একদিন আসবে, পৃথিবীর সব মানুষ এরকম হয়ে যাবে।'

'তার মানে!'

'তখন কত ভালো হবে, তাই না? মানুষের কোনো খাবারের কষ্ট থাকবে না। মানুষ কত উন্নত প্রাণী, কিন্তু সে তার সবটা সময় নষ্ট করে খাবারের চিন্তায়। এই

সময়টা সে নষ্ট করবে না। কত জিনিস সে জানবে। আরো কত ক্ষমতা হবে তার।'

'কী হবে এত কিছু জেনে?'

তিন্নি খিলখিল করে হেসে উঠল।

মিসির আলি বললেন, 'হাসছ কেন?'

'হাসি আসছে, তাই হাসছি। মানুষ তো এখনো কিছুই জানে না, আর আপনি বলছেন কী হবে এত জেনে।'

'তুমি বুঝি অনেক কিছু জেনে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি কি জানলে বল।'

'তা বলব না। আপনি এখন ঘুমুতে যান।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে না, আমি আরো কিছুক্ষণ কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

'না, আপনি আর কথা বলবেন না। আপনি এখন ঘুমুবেন এবং সকালে উঠে ঢাকা চলে যাবেন। আর কখনো আসবেন না।'

'আসব না মানে?'

'ইচ্ছা করলেও আসতে পারবেন না। আমার কথা কিছুই আপনার মনে থাকবে না।'

'কী বলছ তুমি!'

'আপনাকে আমার দরকার নেই।'

তিন্নি হাসতে লাগল। মিসির আলি সারা রাত বারান্দায় বসে রইলেন। অস্পষ্ট, ভাবে তাঁর মনে হতে লাগল, মেয়েটি যা বলছে, তা-ই হবে।

মানুষ যখন কোনো জটিল এক্সপেরিমেন্ট করে, তার সাবধানতার সীমা থাকে না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, যেন তার এক্সপেরিমেন্ট নষ্ট না হয়। কেউ এসে যেন তা ভণ্ডুল না করে দেয়। যারা এই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে এই ভয়াবহ এক্সপেরিমেন্ট করছে, তারাও তাই করবে। কে রক্ষা করবে মেয়েটিকে?

ভোররাতের দিকে মিসির আলির শরীর খারাপ লাগতে লাগল। তাঁর কেবলি মনে হল, ঢাকায় কী যেন একটা কাজ ফেলে এসেছেন। খুব জরুরী কাজ। এক্ষুণি ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু কাজটি কি তা মনে পড়ছে না। তিনি সকাল আটটায় ঢাকা রওনা হয়ে গেলেন। বরকত সাহেব বা তিন্নি--কারো কাছ থেকে বিদায় পর্যন্ত নিলেন না। তিন্নির ব্যাপারটা নিয়ে বড়বড় খাতায় গাদাগাদা নোট করেছিলেন। সব ফেলে গেলেন, কিছুই সঙ্গে নিলেন না। ঢাকায় পৌঁছার আগেই প্রচণ্ড জ্বরে জ্ঞান হারালেন।

ট্রেনের এক জন সহযাত্রী দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে পৌঁছে দিলেন ঢাকা মেডিকেলে। তিনি প্রায় দু' মাস অসুখে ভুগলেন, সময়টা কাটল একটা ঘোরের মধ্যে। পুরোপুরি সুস্থ হতে তাঁর আরো দু' মাস লাগল। কিন্তু পুরোপুরি বোধ হয় সুস্থ

হলেনও না। কিছু কিছু জিনিস তিনি মনে করতে পারেন না। যেমন এক দিন অমিতা তাঁকে দেখতে এসে বলল, 'শুধু শুধু আজেবাজে কাজে ছোটাছুটি কর, তারপর একটা অসুখ বাধাও। সেইবার হঠাৎ কুমিল্লা এসে উপস্থিত। যেভাবে হঠাৎ আসা, সেইভাবে হঠাৎ বিদায়। আমি তো ভেবেই পাই না--।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'কুমিল্লা! কুমিল্লা কেন যাব!'

'সে কি, তোমার মনে নেই।'

'না তো।'

'তুমি মামা একটা বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হও।'

নিউমার্কেট বইয়ের দোকানে এক বার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি রাগী গলায় বললেন, 'যাক, আপনার দেখা পাওয়া গেল। বইগুলি তো ফেরত দিলেন না, কেন?

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'কী বই?'

'কী বই মানে! বোটানির দু'টি বই নিয়ে গেলেন না আমার কাছ থেকে?'

'তাই নাকি?'

'আবার বলছেন তাই নাকি! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি ডঃ জাবেদ।'

'না, আমি তো ঠিক---।'

মিসির আলি খুবই বিব্রত বোধ করলেন, কিন্তু কিছুই করার নেই। এর প্রায় এক বৎসর পর মিসির আলি ময়মনসিংহের এক এ্যাডভোকেটের কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন। চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে বরকতউল্লাহ নামের এক ব্যবসায়ী ময়মনসিংহ শহরের বাড়ি মিসির আলিকে দান করেছেন। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কিছু টাকাও ব্যাঙ্কে জমা আছে। টাকার অঙ্কটি অবশ্য উল্লেখ করা হয় নি। মিসির আলি ভেবেই পেলেন না, অপরিচিত এক ভদ্রলোক শুধু শুধু তাঁকে বাড়ি দেবেন কেন?

সেই বাড়ি দেখেও তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিশাল বাড়ি। এ্যাডভোকেট ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, 'বাড়ি অনেক দিন তালাবন্ধ আছে। বাগানের অবস্থা দেখেন না, জঙ্গল হয়ে আছে।'

মিসির আলি বললেন, 'আমাকে বাড়িটা কেন দেয়া হয়েছে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

এ্যাডভোকেট ভদ্রলোক বিরক্ত মুখভঙ্গি করলেন। মোটা গলায় বললেন, 'দিচ্ছে যখন নিন। ইচ্ছা করলে বিক্রি করে দিতে পারেন। ভালো দাম পাবেন। আমার কাছে কাষ্টমার আছে--ক্যাশ টাকা দেবে।'

মিসির আলি বাড়ি বিক্রি করার ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ দেখালেন না। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আগে দেখি, বাড়িটা আমাকে কেন দেয়া হল। আজকালকার দিনে কেউ তো আর শুধু শুধু এরকম দান খয়রাত করে না। দানপত্রে কি কিছুই

লেখা নেই?'

'তেমন কিছু না, শুধু বাগানের প্রতিটি গাছের যথাসম্ভব যত্ন নেবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। উইলের কপি তো পাঠিয়েছি আমি আপনাকে।'

মিসির আলি বাড়ি তালাবন্ধ করে ঢাকা ফিরে এলেন। বরকতউল্লাহ লোকটি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করলেন। জানতে পারলেন যে, এর একটি অসুস্থ মেয়ে ছিল। মেয়েটির মাথার ঠিক ছিল না। মেয়েটি মারা যাবার পর ঐ বাড়ির কম্পাউন্ডের ভেতরই তার কবর হয়। ভদ্রলোক নিজেও অল্প দিন পর মারা যান। কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক? মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। জগতে রহস্যময় ব্যাপার এখনো তাহলে ঘটে!

১২

পাঁচ বছর পরের কথা।

মিসির আলি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ময়মনসিংহে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নীলু, হাসিখুশি ধরনের একটি মেয়ে। খুব সহজেই অবাক হয়, অল্পতেই মন খারাপ করে, আবার সামান্য কারণেই মন ভালো হয়ে যায়।

ময়মনসিংহে আসার নীলুর কোনো ইচ্ছা ছিল না। আসতে হয়েছে মিসির আলির আগ্রহে। তিনি বারবার বলেছেন, 'তোমাকে মজার একটা জিনিস দেখাব।' অনেক চেষ্টা করেও সেই মজার জিনিসটি সম্পর্কে নীলু কিছু জানতে পারে নি। মিসির আলি লোকটি কথা খুব কম বলেন। তিনি প্রশ্নের উত্তরে শুধু হেসে বলেছেন, 'গেলেই দেখবে। খুব অবাক হবে।'

নীলু সত্যি অবাক হল! চোখ কপালে তুলে বলল, 'এই বাড়িটা তোমার! বল কি! কে তোমাকে এই বাড়ি দিয়েছে?'

'দিতে হবে কেন, আমি বুঝি কিনতে পারি না?'

'না, পার না। তোমার এত টাকাই নেই।'

'বরকত সাহেব বলে এক ভদ্রলোক দিয়েছেন।'

'কেন দিয়েছেন?'

'ঐটা একটা রহস্য। রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছি। যখন করব, তখন জানবে।'

গভীর আগ্রহে নীলু বিশাল বাড়িটি ঘুরে ঘুরে দেখল। বহু দিন এখানে কেউ থাকে নি, ভ্যাপসা, পুরান গন্ধ। দেয়ালে ঘন ঝুল। আসবাবপত্রে ধুলোর আস্তরণ। বাগানে ঘাস হয়েছে হাঁটু উঁচু। পেছন দিকটায় কচু গাছের জঙ্গল। মিসির আলি বললেন, 'এ তো দেখছি ভয়াবহ অবস্থা!'

নীলু বলল, 'যত ভয়াবহই হোক, আমার খুব ভালো লাগছে। বেশ কিছু দিন আমি এ বাড়িতে থাকব, কি বল?'

'কী যে বল। এ বাড়ি এখন মানুষ বাসের অযোগ্য। মাস দু'-এক লাগবে বাসের যোগ্য করতে।'

'তুমি দেখ না কী করি।'

কোমর বেঁধে ঘর গোছাতে লাগল নীলু। তার প্রবল উৎসাহ দেখে মিসির আলির কিছু বলতে মায়া লাগল। যেন এই মেয়েটি দীর্ঘ দিন পর নিজের ঘর-সংসার পেয়েছে। আনন্দে উৎসাহে ঝলমল করছে। এক দিনের ভেতর মালী লাগিয়ে বাগান পরিষ্কার করল। বাজার থেকে চাল-ডাল কিনে রান্নার ব্যবস্থা করল। রাতে খাবার সময় চোখ বড়বড় করে বলল, 'জান, এ বাড়ির ছাদ থেকে পাহাড় দেখা যায়। নীল পাহাড়ের সারি। কী যে অবাক হয়েছি পাহাড় দেখে।'

পাহাড়ের নাম হচ্ছে 'গারো পাহাড়।'

'আজ অনেকক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখলাম। মালী বাগানে কাজ করছিল, আমি পাহাড় দেখছিলাম।'

'ভালো করেছ।'

'ও ভালো কথা, বাগানে খুব অদ্ভুত ধরনের একটা গাছ আছে। ভোরবেলা তোমাকে দেখাব। কোনো অর্কিড-টর্কিড হবে। হলুদ রঙের লতান গাছ। মেয়েদের চুলে যে রকম বেণী থাকে, সে রকম বেণী করা। নীল নীল ফুল ফুটেছে।'

মিসির আলি তেমন কোনো উৎসাহ দেখালেন না। নীলু বলল, 'আচ্ছা, এই বাড়িতে থেকে গেলে কেমন হয়?'

'কী যে বল। ঢাকায় কাজকর্ম ছেড়ে এখানে থাকব?'

'আমি থাকি, তুমি সপ্তাহে সপ্তাহে আসবে।'

'পাগল হয়েছ নাকি? একা-একা তুমি এখানে থাকবে?'

'আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার এ বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'প্রথম প্রথম এ রকম মনে হচ্ছে। ক'দিন পর আর ভালো লাগবে না।'

'আমার কখনো এ বাড়ি খারাপ লাগবে না। যদি হাজার বছর থাকি তবুও লাগবে না।'

'আচ্ছা দেখা যাবে।'

'দেখো তুমি।'

আসলেই তাই হল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, এ বাড়ি যেন প্রবল মায়ায় বেঁধে ফেলেছে নীলুকে। ছুটিছাটা হলেই সে ময়মনসিংহ আসবার জন্যে অস্থির হয়। একবার এলে আর কিছুতেই ফিরে আসতে চায় না। রীতিমত কান্নাকাটি করে। বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে তাকে একা রেখেও চলে এসেছেন। ভেবেছেন ক'দিন একা

বেঁধে ফেলেছে নীলুকে। ছুটিছাটা হলেই সে ময়মনসিংহ আসবার জন্যে অস্থির হয়। একবার এলে আর কিছুতেই ফিরে আসতে চায় না। রীতিমত কান্নাকাটি করে। বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে তাকে একা রেখেও চলে এসেছেন। ভেবেছেন ক'দিন একা থাকলে আর থাকতে চাইবে না। কিন্তু তা হয় নি। এ বিচিত্র বাড়িটির প্রতি নীলুর আকর্ষণ বাড়তেই থাকল। শেষটায় এ রকম হল যে, বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় তাদের কাটে এই বাড়িতে।

তাদের প্রথম ছেলেটির জন্মও হল এ বাড়িতে। ঠিক তখন মিসির আলি লক্ষ করলেন, নীলু যেন পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। এক দিন কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে বলল, 'জান আমাদের এ ছেলেটা আসলে একটা গাছ।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'এ কথা বলছ কেন!'

নীলু লজ্জিত স্বরে বলল, 'এমনি বললাম, ঠাট্টা করলাম।'

'এ কেমন অদ্ভুত ঠাট্টা!'

নীলু উঠে চলে গেল। মিসির আলি দেখলেন, সে ছাদে দাঁড়িয়ে দূরের গারো পাহাড়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ ভেজা।

সেই অজানা লতান গাছটি আরো লতা ছেড়ে অনেক বড় হয়েছে। প্রচুর ফুল ফুটিয়েছে। দিনের বেলা সে ফুলের কোনো গন্ধ পাওয়া যায় না, কিন্তু যতই রাত বাড়ে--মিষ্টি সুবাসে বাড়ি ভরে যায়। মিসির আলির অস্বস্তি বোধ হয়। কিন্তু অস্বস্তির কারণ তিনি ধরতে পারেন না।

তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়েও খুব দুশ্চিন্তা বোধ করেন। ছেলেটি সবে হামা দিতে শিখেছে। সে ফাঁক পেলেই হামা দিয়ে ছাদে উঠে যায়। চুপচাপ রোদে বসে থাকে। তাকে নামিয়ে আনতে গেলেই হাত-পা ছুঁড়ে বড্ড কান্নাকাটি করে।

ইরিনা

১

লোকটির মুখ লম্বাটে।

চোখ দু'টি তক্ষকের চোখের মতো। কোটর থেকে অনেকখানি বেরিয়ে আছে। অত্যন্ত রোগা শরীর। সরু সরু হাত। হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক লম্বা। কাঁধে ঝুলছে নীলরঙা চকচকে ব্যাগ। তার দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটি বিনীত ভঙ্গি আছে। নিশ্চয়ই কিছু-একটা গছাতে এসেছে।

দুপুরের দিকে এ রকম উটকো লোকজন আসে। এরা কলিং বেল টিপে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে হাত কচলায়। লাজুক গলায় বলে, 'আমি নিতান্তই এক জন দরিদ্র ব্যক্তি, কাটা কাপড়ের টুকরো বিক্রি করি। আপনি কি অনুগ্রহ করে কিছু কিনবেন? কিনলে আমার খুব উপকার হয়।'

এই লোক নিশ্চয়ই সে রকম কিছু বলবে। ইরিনা তাকে সে সুযোগ দিল না। লোকটি মুখ খুলবার আগেই সে বলল, 'আমাদের কিছু লাগবে না। আপনি যান।'

লোকটি কিছু বলল না। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করতে লাগল। ইরিনা কড়া গলায় বলল, 'বলেছি তো আমাদের কিছু লাগবে না।'

'আমি কিছু বিক্রি করতে আসি নি।'

'আপনি কে? কাকে চান আপনি?'

'আমি কে, তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?'

ইরিনা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল লোকটির দিকে। লোকটির দাঁড়িয়ে থাকার যে ভঙ্গিটিকে একটু আগেই বিনীত ভঙ্গি মনে হচ্ছিল, এখন সে-রকম মনে হচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে লোকটি ভয়ংকর উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনার কি দরকার বলুন?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে কি আর সবকিছু বলা যায়?'

'বাবা-মা কেউ ঘরে নেই, আপনাকে আমি ভেতরে আসতে বলব না।'

লোকটি মেয়েদের রুমালের মত ছোট্ট ফুল আঁকা একটি রুমাল বের করে কপাল মুছল। ইরিনা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আপনি কোনো খবর না দিয়ে এসেছেন।'

লোকটি বলল, 'খবর না দিয়ে অনেকেই আসে। জরা আসে, মৃত্যু আসে এবং মাঝে মাঝে গ্যালাকটিক ইন্টেলিজেন্সের লোকজন।'

'তাহলে আপনি কি--?'

লোকটি হাসল। নিঃশব্দ হাসি নয়--বেশ শব্দ করে হাসি। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, হাসির শব্দ অত্যন্ত সুরেলা। শুনতে ভালো লাগে। ইরিনা বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

'শুভ দুপুর ইরিনা।'

'আপনি আমার নাম জানেন?'

'গ্যালাকটিক ইন্টেলিজেন্সের লোকজন যখন কারোর বাড়ি যায়, তখন বাড়ির লোকজনের নাম জেনেই যায়। সেটাই স্বাভাবিক, তাই না?'

ইরিনা কথা বলল না। সে একদৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি বলল, 'তুমি কি আমার কার্ড দেখতে চাও? স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আমার পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়ার অধিকার তোমার আছে।'

'আমি কিছুই দেখতে চাই না। আপনি কেন এসেছেন? আমার কাছ থেকে কী জানতে চান?'

লোকটি কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'আমি কিছুই জানতে চাই না।'

'তাহলে এসেছেন কি জন্যে?'

'তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।'

'তার মানে? আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'ইরিনা, তুমি কি জান না ইন্টেলিজেন্সের লোকজনদের কোনো প্রশ্ন করা যায় না? বিধি নং চ ২১১/২, তুমি কি এই বিধি জান না? তোমাকে স্কুলে শেখান হয় নি?'

'হয়েছে।'

'তাহলে তুমি হয়তো চ ২১১/৩ বিধিটিও জান।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'বল তো বিধিটি কি?'

ইরিনা যন্ত্রের মতো বলল, 'আপনি যদি আমাকে কোথাও যেতে বলেন, তাহলে যেতে হবে।'

'যদি যেতে অস্বীকার কর, তাহলে কি হবে বল তো?'

'প্রথম শ্রেণীর অপরাধ করা হবে।'

'এই অপরাধের শাস্তি কি জান?'

'জানি। কিন্তু আমি যাব না। আমার বাবা–মা না আসা পর্যন্ত আমি কোথাও যাব না।'

লোকটি ছোটো ছোটো পা ফেলে ঘরের মধ্যেই হাঁটছিল। হাঁটা বন্ধ করে চেয়ারে বসল। খুব আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলল। যেন এই বাড়ি–ঘর তার দীর্ঘদিনের চেনা। সে যেন নিতান্ত পরিচিত কেউ। অনেক দিন পর বেড়াতে এসেছে।

ইরিনা আবার বলল, 'বাবা–মা বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত আমি কোথাও যাব না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই। বাবা–মা না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।'

'এই কথাগুলো তুমি পরপর তিন বার বললে। একই কথা বারবার বললে কথা জোরাল হয় না।'

লোকটি সিগারেট ধরাল। ছাই ফেলবার জন্যে নিজেই উঠে গিয়ে একটা এ্যাশট্রে আনল। ইরিনার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কী যেন দেখল, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে খুব সহজ গলায় বলল, 'তোমার বাবা–মা আর এ বাড়িতে ফিরে আসবেন না।'

ইরিনা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কী বলছে এই লোকটি। সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চান।'

'ঠিক এই মুহূর্তে তোমার বাবা–মা দু'জনেই আছেন খাদ্য দপ্তরে। বেলা তিনটে পর্যন্ত তাঁরা সেখানে থাকবেন। তারপর তাঁদের পাঠান হবে প্রথম নিয়ন্ত্রণকক্ষে। সেখান থেকে তাঁদের ঠিক পাঁচটায় নেয়া হবে সেন্ট্রাল কমিউনে। আরো শুনতে চাও?'

'না।'

'তুমি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করছ না?'

'না। ইন্টেলিজেন্সের লোকজন কখনো সত্যি কথা বলে না।'

'এটা তুমি ভুল বললে ইরিনা। শুধু মিথ্যা বললে মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। মিথ্যা বলতে হয় সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে। আমরা এক হাজার সত্যি কথার সঙ্গে একটা মিথ্যে কথা ঢুকিয়ে দিই। কারো সাধ্য নেই সেই মিথ্যা ধরে। হা হা হা।'

লোকটি সুরেলা গলায় হেসে উঠল। এমন একজন কু–দর্শন লোক এত চমৎকার করে হাসে কী করে!

'ইরিনা, তুমি কি আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াবে? সেই সঙ্গে কিছু খাবার। আশা করি ঘরে কিছু খাবার আছে।'

'খাবার নেই। কফি খাওয়াতে পারি।'

ইরিনা হিটারে পানি গরম করতে লাগল। তার একবার ইচ্ছা হল রান্নাঘরের দরজা দিয়ে চুপিসারে চলে যায় কোথাও। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এ রকম কিছু চিন্তা করাও বোকামি।

টেলিফোন বাজছে। ইরিনা তাকাল লোকটির দিকে। ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমি কি টেলিফোন ধরতে পারি?'

'হ্যাঁ পার।'

টেলিফোন করেছেন ইরিনার বাবা। তাঁর গলায় বারবার কথা আটকে যাচ্ছে। যেন কোনো কারণে তিনি অসম্ভব ভয় পেয়েছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় করে শ্বাস ফেলছেন।

'তুমি কোথেকে কথা বলছ বাবা?'

'খাদ্য দপ্তর থেকে।'

'তুমি কিছু বলবে?'

'না।'

'শুধু শুধু টেলিফোন করেছ?'

'ইয়ে মা শোন--আমাকে কোথায় যেন পাঠাচ্ছে।'

'কোথায় পাঠাচ্ছে?'

'তা তো জানি না। অনেকক্ষণ শুধু শুধু বসিয়ে রাখল। এখন বলছে--'

'কী বলছে?'

ইরিনার বাবা খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। যেন কাউকে দেখে ভয় পেয়েছেন। অনেক কিছু বলার ছিল, বলা হল না। ইরিনা টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছে। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে হালকা স্বরে বলল, 'কোনো লাভ নেই, কেউ টেলিফোন ধরবে না।' 'সত্যি কেউ ধরল না। ইরিনার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু এই কুৎসিত লোকটিকে চোখের জল দেখাতে ইচ্ছা করছে না। কান্না চেপে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার। এই কঠিন ব্যাপারটি সে কী করে পারছে কে জানে। কতক্ষণ পারবে তাও জানা নেই।

'পানি ফুটছে। কফি বানিয়ে ফেল। চিনি বেশি করে দেবে। আমি প্রচুর চিনি খাই। বুদ্ধিমান লোকেরা চিনি বেশি খায়, এই তথ্য কি তুমি জান?'

ইরিনা জবাব দিল না।

লোকটি কফি খেল নিঃশব্দে। তার ধরনধারণ দেখে মনে হয়, কোনো তাড়া নেই। দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকতে পারবে। কফি শেষ করেই সে তার নীল ব্যাগ থেকে কি-একটা বই বের করে পড়তে শুরু করল। বইয়ের লেখাগুলো অদ্ভুত, নিশ্চয়ই কোনো অপরিচিত ভাষা। লোকটি পড়তে পড়তে মুচকি মুচকি হাসছে। নিশ্চয়ই মজার কোনো বই। একটা লোহার রড হাতে নিয়ে চুপিচুপি লোকটির

পেছনে চলে গেলে কেমন হয়। আচমকা প্রচণ্ড বেগে লোহার রডটি তার মাথায় বসিয়ে দেবে। ইরিনা মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই রকম কল্পনার কোনো মানে হয় না।

লোকটি হাতের ঘড়িতে সময় দেখল। বইটি বন্ধ করে নীল ব্যাগে রেখে বলল, 'সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আমাদের ট্রেন। কাজেই অনেকখানি সময় আছে। রাতের খাওয়া-দাওয়া আমরা ট্রেনেই সারব। কাজেই রান্নাবান্নার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি যদি সঙ্গে কিছু নিতে চাও, নিতে পার। একটা মাঝারি ধরনের স্যুটকেস গুছিয়ে নাও।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'বিধি চ ২১১/৩; আমাকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।'

ইরিনা চুপ করে গেল। একবার ইচ্ছা হল গলা ফাটিয়ে কাঁদে। কিন্তু কী হবে কেঁদে? কে শুনবে?

'তুমি কি সঙ্গে কিছুই নেবে না?'

'না।'

'খুব ভালো কথা। ভ্রমণের সময় মালপত্র যত কম থাকে, ততই ভালো। সবচে ভালো যদি কিছুই না থাকে। হা হা হা।'

ইরিনা বলল, 'আমি কোনো অন্যায় করি নি। দুই শ' পঞ্চাশটি বিধির প্রতিটি মেনে চলি। শৃঙ্খলা বোর্ড একবারও আমাকে 'সাবধান কার্ড' পাঠায় নি। আপনি কেন শুধু শুধু আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'তুমি প্রতিটি বিধি মেনে চল, এটা ঠিক বললে না। এই মুহূর্তে তুমি বিধি ভঙ্গ করেছ। আমাকে প্রশ্ন করেছ।'

'আর করব না।'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা। কাঁদছ কেন তুমি?'

'আমি কাঁদতেও পারব না? বিধিতে কিন্তু কাঁদতে পারব না, এমন কথা নেই।'

'তা নেই। তবে কাঁদলেই লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। আমি তা চাই না। আমি চাই খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তুমি আমার সঙ্গে হাঁটবে। আমি চমৎকার সব হাসির গল্প জানি। সেই সব গল্প তোমাকে পথে যেতে যেতে বলব। শুনে হাসতে হাসতে তুমি আমার হাত ধরে হাঁটবে।'

ইরিনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'দয়া করে বলুন, আমি কি করেছি।'

লোকটি শান্ত গলায় বলল, 'আমি জানি না তুমি কি করেছ। সত্যি আমি জানি না। আমাকে শুধু বলা হয়েছে তোমাকে নিয়ে যেতে।'

'কোথায়?'

'সেটা তোমাকে বলতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক জন মানুষ। আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। সহজ কথায় তুমি

অত্যন্ত মূল্যবান।'

'কী করে বুঝলেন?'

'তোমাকে নেয়ার জন্য আমাকে পাঠান হয়েছে, সেই কারণেই অনুমান করছি। আমি কোনো হেঁজিপেঁজি ব্যক্তি নই, আমি এক জন বিখ্যাত ব্যক্তি।'

'আমাকে এইসব কেন বলছেন?'

'যাতে অকারণে তুমি ভয় না পাও, সে জন্যে বলছি। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ঠিক তোমার মতো আমার একটি মেয়ে আছে। তার চোখও নীল। সে-ও তোমার মতো সুন্দর।'

'আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনার কোনো মেয়ে নেই। কেউ মিথ্যা বললে আমি বুঝতে পারি। মিথ্যা বলার সময় মানুষের চোখের দৃষ্টি বদলে যায়।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই। আমি অবিবাহিত।'

ইরিনা শান্ত স্বরে বলল, 'আপনি কি দয়া করে বলবেন, আমার বাবা, মা এই বাড়িতে ফিরে আসবেন কি না?'

'আমার মনে হয়, তারা আর ফিরে আসবে না।'

'ঘরে তালা লাগানর তাহলে আর কোনো প্রয়োজন নেই, তাই না?'

'আমার মনে হয়, নেই।'

'আমি নিজেও বোধ হয় আর কোনোদিন এ বাড়িতে ফিরে আসব না।'

'সেই সম্ভাবনাই বেশি।'

'চলুন আমরা রওনা হই।'

'আমার হাত ধর।'

ইরিনা তার হাত ধরল। লোকটি বিনা ভূমিকায় একটা হাসির গল্প শুরু করল। লোকটির গল্প বলার ঢং অত্যন্ত চমৎকার। ইচ্ছা না করলেও শুনতে হয়। এক জন মানুষ কী করে হঠাৎ একদিন ছোট হতে শুরু করলো সেই গল্প। ছোট হতে হতে মানুষটা একটা পিঁপড়ের মতো হয়ে গেল। তার চিন্তা-ভাবনাও হয়ে গেল পিঁপড়ের মতো। বড়ো কিছু এখন সে আর ভাবতে পারে না।

বাইরে বেশ ঠান্ডা। কনকনে বাতাস বইছে। একটা ভারি জ্যাকেট ইরিনার গায়ে। লাল রঙের মাফলারে কান ঢাকা, তবু তার শীত করছে। রাস্তাঘাটে লোকজন দ্রুত কমছে। রাত আটটার ভেতর একটি লোকও থাকবে না। থাকার নিয়ম নেই। ফেডারেল আইন। বেরুতে হলে কমিউন থেকে পাস নিতে হয়। সেই পাস কখনো পাওয়া যায় না। রাতে কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে ডাক্তার এসে চিকিৎসা করেন, তাকে হাসপাতালে যেতে হয় না। তবু মাঝেমধ্যে কেউ কেউ বের হয়। তারা আর ফিরে আসে না। কোথায় হারিয়ে যায় কে জানে?

'তোমার শীত লাগছে ইরিনা?'

'না।'

'তুমি কিন্তু কাঁপছ?'

'আমার শীত লাগছে না।'

'তুমি কিন্তু এখনো আমার নাম জানতে চাও নি।'

'আপনার নাম দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'তা খুবই ঠিক। তোমার বয়স কত ইরিনা?'

'ইন্টেলিজেন্সের লোক যখন কারো কাছে আসে, তখন তার নাম এবং বয়স জেনেই আসে।'

'ঠিক। খুবই সত্যি কথা। তোমার বয়স এপ্রিলের তিন তারিখে আঠার হবে।'

ইরিনা হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, 'আপনি আর কী কী জানেন আমার সম্বন্ধে?'

'তুমি লাল ও বেগুনি--এই দু'টি রঙ খুব পছন্দ কর। তোমার কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। তোমার পছন্দের বিষয় হচ্ছে প্রাচীন ইতিহাস। তুমি এই বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছ। তুমি খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে এবং তুমি—'

'থাক, আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না।'

লোকটি হাসতে লাগল। যেন বেশ মজা পেয়েছে। সিকিউরিটির একটি গাড়ি তাদের সামনে এসে থামল, কিন্তু লোকটির হাসি বন্ধ হল না। গাড়ি থেকে দু' জন অফিসার লাফিয়ে নামল। দু'জনের চেহারাই সুন্দর। চকলেট রঙের ইউনিফর্মেও তাদের ভালো লাগছে।

'আপনাদের সান্ধ্য পাস দেখতে চাই।'

'এখনই সান্ধ্য পাস দেখতে চান? আটটা এখনো বাজে নি। আটটা বাজতে দিন।'

অফিসার দু' জনের মুখ কঠোর হয়ে গেল। সে তাকাল তার সঙ্গীর দিকে। সঙ্গী তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'যা করতে বলা হয়েছে, করুন।'

ইরিনা দেখল ইন্টেলিজেন্সের লোকটি ওদের দু' জনকে কী যেন দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে অফিসার দু' জনেই হকচকিয়ে গেল। এক জনের মুখ অনেকখানি লম্বা হয়ে পড়ল। সে টেনে টেনে বলল, 'স্যার, আপনারা কোথায় যাবেন বলুন, আমরা পৌঁছে দেব।

'আমার হাঁটতে ভালো লাগছে।'

'তাহলে আমরা কি আপনার পেছনে পেছনে আসব?'

'তারও কোনো প্রয়োজন দেখছি না।'

ইরিনা লক্ষ করল, লোক দু'টির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। যেন তারা চোখের সামনে ভূত দেখছে। এক জন পকেট থেকে রুমাল বের করে এই শীতেও কপালের ঘাম মুছল। ইরিনা অনেক দূর এগিয়ে যাবার পর পেছন ফিরে দেখল, অফিসার দু' জন তখনো দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাদের দেখছে। একজন ওয়াকি টকি

বের করে কী যেন বলছে। সম্ভবত তাদের কথাই বলছে। কারণ এরপর বেশ কিছু সিকিউরিটির লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। তারা কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। স্যালিউট দিয়ে মূর্তির মতো হয়ে গেল। ইরিনার সঙ্গের লোকটি প্রত্যেকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলল। যেমন--,

'কি, তোমরা ভালো? আজ বেশ শীত পড়েছে মনে হয়। আবহাওয়ার প্যাটার্ন বদলে যাচ্ছে, তাই না?'

এরা এইসব কথাবার্তার উত্তরে কিছু বলছে না। শুধু মাথা নাড়ছে। যেন কথা বলাই একটা ধৃষ্টতা। ইরিনা একসময় বলল, 'ওরা আপনাকে দেখে এরকম করছে কেন?'

'তোমাকে তো বলেছি আমি এক জন বিখ্যাত ব্যক্তি।'

'আপনার কী নাম?'

'তুমি একটু আগেই বলেছ, আমার নাম জানতে তুমি আগ্রহী নও। কি, বল নি এমন কথা?'

'বলেছি।'

'এখন নাম জানতে চাও?'

'আপনার যদি ইচ্ছা হয় বলতে পারেন।'

'ইচ্ছা-অনিচ্ছা নয়, তুমি জানতে চাও কিনা সেটা বল।'

'না থাক, আমি জানতে চাই না।'

'আমার নাম অরচ লীওন।'

ইরিনা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। 'অরচ লীওন' হচ্ছেন গ্যালাকটিক ইন্টেলিজেন্সের প্রধান। তাঁর নাম না জানার কোনো কারণ নেই। এরকম এক জন মানুষ তার মতো সাধারণ একটি মেয়েকে নিতে এসেছেন, কেন?

'ইরিনা, তোমার কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'না, কষ্ট হচ্ছে না।'

'শীত লাগছে, তাই না?'

'জ্বি লাগছে।'

'এই তো এসে পড়েছি। ট্রেনে উঠলেই দেখবে ভালো লাগছে।'

'ভালো লাগলেই ভালো।'

'আর একটা গল্প বলব, শুনবে?'

'বলুন।'

তারা শহরের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে। স্টেশনের লাল বাতি দেখা যাচ্ছে। বাতি জ্বলছে ও নিভছে। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। কুয়াশা ঘন হয়ে পড়ছে। ইরিনা ফিসফিস করে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, আর কোনো দিন ফিরে আসব না।'

২

ট্রেন ছুটে চলেছে।

গতি এক শ' কিলোমিটারের কাছাকাছি। আল্টা-ভায়োলেট প্রতিরোধী স্বচ্ছ কাঁচের জানালার পাশে ইরিনা বসে আছে। বাইরের পৃথিবীর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অথচ লীওন বললেন, 'তুমি বোধ হয় এই জীবনের প্রথম ট্রেনে চড়লে।'

'হ্যাঁ। আমি প্রথম শহরের মানুষ। ট্রেনে চড়ার সৌভাগ্য আমার হবে কেন?'

'তা ঠিক। কেমন লাগছে তোমার?'

'কোনোরকম লাগছে না।'

'জানালার পাশে বসে কিছুই দেখতে পাবে না। বাইরে আলো নেই। এখন কৃষ্ণপক্ষ। অবশ্যি চাঁদ থাকলেও কিছু দেখতে পেতে না, আমরা যাচ্ছি ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রায় এক হাজার কিলোমিটার ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। সেটা খুব সুখকর দৃশ্য নয়। এই জন্যেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে যে-সব ট্রেন চলাচল করে, তা করে রাতে, যাতে আমাদের কিছু দেখতে না হয়।'

'আপনি শুধু শুধু কথা বলবেন না। আপনার কথা শুনতে ভালো লাগছে না।'

'খাবার দিতে বলি?'

'না।'

'কিছু খাবে না?'

'না, আমার খিদে নেই।'

'আমার খিদে পেয়েছে। আমি খাবার গাড়িতে যাচ্ছি। তুমি যদি মত বদলাও, তাহলে চলে এস। করিডোর ধরে আসবে, সবচে শেষের কামরাটি খাবার ঘর। রোবট এ্যাটেনডেন্ট আছে। ওদের বললে ওরা তোমাকে সাহায্য করবে।'

ইরিনা যেভাবে বসে ছিল, সেভাবেই বসে রইল। তাদের কামরায় টিভি স্ক্রীনে ধ্বংসস্তূপের বর্ণনা দিয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করছে। অন্য সময় হলে খুব আগ্রহ নিয়ে সে শুনত, আজ শুনতে ইচ্ছা করছে না। কিভাবে টিভি সেটটি বন্ধ করা যায়, তাও তার জানা নেই। বাধ্য হয়ে শুনতে হচ্ছে। কী হবে শুনে। এর সবই তার জানা। ইতিহাসের ক্লাসে সে পড়েছে। খুব আগ্রহ নিয়েই পড়েছে। টিভির এই লোকটি বলছে খুব সুন্দর করে। আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠ। যেন ধ্বংস হবার ঘটনাটি সে প্রত্যক্ষ করছে।

"বন্ধুগণ। ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে আজ আপনারা যারা ঝড়ের গতিতে যাচ্ছেন, তাঁদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, আজ থেকে চার শ' বছর আগে এখানে কোলাহলমুখর জনপদ ছিল। অঞ্চলটিকে বলা হত এশিয়া মাইনর।

'আজ থেকে চার শ' বছর আগে দু' হাজার পাঁচ সালে পৃথিবী নামের আমাদের এই সুন্দর গ্রহটিতে নেমে এল ভয়াবহ দুর্যোগ, আণবিক যুগের শুরুতেই যে

দুর্যোগের আশঙ্কা সবাই করছিল। শান্তিকামী মানুষ ভাবত, একসময় না একসময় আণবিক যুদ্ধ শুরু হবে। সেটিই হবে মানব জাতির শেষ দিন। দু' হাজার পাঁচ সালে তাঁদের আশঙ্কাই সত্যি হল। তবে তাঁরা যেভাবে ভেবেছিলেন, সেভাবে নয়। মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ হল না। কোনো এক অজানা কারণে জমা করে রাখা আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ শুরু হল। হাজার হাজার বছরের সভ্যতা ধ্বংস হতে সময় লাগল মাত্র এগার মিনিট।

'ধ্বংসযজ্ঞের পরবর্তী বছরকে বলা হয় অন্ধকার বছর। কারণ সে-বছর সূর্যের কোনো আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছাল না। ধূলা-বালি, আণবিক ভস্ম সূর্যকে আড়াল করে রাখল। কাজেই ধ্বংস হল সবুজ গাছপালা। সবুজ গাছপালার উপর নির্ভরশীল জীবজন্তু। পরবর্তী এক শ' বছরের তেমন কোনো ইতিহাস আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু জানি অসম্ভব জীবনীশক্তি নিয়ে কিছু কিছু মানুষ বেঁচে রইল। তারা শুরু করল নতুন ধরনের জীবন-ব্যবস্থা। প্রথম শহর, দ্বিতীয় শহর ও তৃতীয় শহরভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা। মানুষের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করতে, সীমিত সম্পদের মধ্যেও তাদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্যে এই ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থার কোনো উপায় ছিল না।

'প্রিয় বন্ধুগণ, এখন আপনাদের দু' হাজার পাঁচ সালে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণগুলো সম্পর্কে বলছি। এই কারণগুলোর কোনোটিই প্রমাণিত নয়। সবই অনুমান। প্রথম বলছি মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে বিস্ফোরণসংক্রান্ত হাইপোথিসিস।--"

এই পর্যায়ে টিভি পর্দা অন্ধকার হয়ে গেল। পরক্ষণেই সেখানে ভেসে উঠল অরচ লীওনের মুখ।

'ইরিনা। এই ইরিনা।'

'বলুন!'

'একা-একা খেতে ভালো লাগছে না, তুমি চলে এস।'

'বললাম তো আমার খিদে নেই।'

'খিদে না লাগলে খাবে না। বসবে আমার সামনে। কিছু জরুরী কথা তোমাকে বলব।'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'সামনাসামনি বসে বলতে চাই। তুমি কোথায় যাচ্ছ, এই সম্পর্কে তোমাকে কিছু ধারণা দেব।'

'অনেক বার আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, তখন তো কিছু বলেন নি।'

'এখন বলব। সব সময় সব কথা বলা যায় না। চলে এস। দেরি করো না।'

টিভি পর্দায় আবার সেই আগের লোকটির মুখ ভেসে উঠল। সে একটি বোর্ডে কি-সব আঁকছে এবং একঘেয়ে স্বরে বলছে--"মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে

পৃথিবীতে আসে ওজন স্তর ভেদ করে। ওজন স্তর হচ্ছে মূলত অক্সিজেনের একটি রূপান্তরিত অণুর হালকা আস্তর। এই অণুগুলোর প্রতিটিতে আছে তিনটি করে অক্সিজেন পরমাণু--"

লোকটির কথা খুব একঘেয়ে লাগছে। ইরিনা উঠে পড়ল। সে খাবার গাড়িতেই যাবে। করিডোরে এ্যাটেনডেন্ট রোবট বলল, 'ইরিনা, তুমি কোথায় যাবে?'

ইরিনা মোটেই চমকাল না। এই রোবটের কাজই হচ্ছে, ট্রেনের সব ক'জন যাত্রীর খোঁজখবর রাখা। ইরিনা বলল, 'খাবার গাড়িতে যাব।'

'আমি কি তোমার সঙ্গে যাব?'

'দরকার নেই।'

'তুমি মনে হচ্ছে ট্রেনভ্রমণ ঠিক উপভোগ করছ না।'

'না, করছি না।'

'খুবই দুঃখিত হলাম। ট্রেনভ্রমণকে আনন্দদায়ক করবার জন্যে আমি কি কিছু করতে পারি?'

'না।'

রোবটটি সঙ্গে সঙ্গে আসছে। ইরিনার অস্বস্তি লাগছে। একটা যন্ত্র যখন মানুষের মতো কথা বলে, মানুষের মতো ভাবে, তখন অস্বস্তি লাগে।

'ইরিনা, তুমি কি প্রথম শহরের নাগরিক?'

'হ্যাঁ, আমি প্রথম শহরের।'

'তোমাকে অভিনন্দন। খুব অল্প বয়সেই তুমি দ্বিতীয় শহরে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছ।'

'অভিনন্দনের জন্যে ধন্যবাদ। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছ কেন?'

'একটি কথা বলবার জন্যে আসছি। আমার মনে হয়, কথাটা শুনলে তোমার ভালো লাগবে।'

'বল শুনছি।'

'তুমি অত্যন্ত রূপবতী।'

ইরিনা শান্ত স্বরে বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ।'

'আমি তোমাকে নিয়ে চার লাইনের একটা কবিতা লিখেছি। আমি খুব খুশি হব, কবিতাটি তুমি যদি গ্রহণ কর।'

'বেশ তো, দাও।'

রোবটটি একটি কার্ড বাড়িয়ে দিল ইরিনার দিকে। তারপর বেশ লাজুক ভঙ্গিতেই তার জায়গায় ফিরে গেল। ইরিনা কবিতায় চোখ বোলাল--

"আদৌ প্রেমের প্রয়োজন আছে কিনা
নিশ্চিত আজো হয় নি আমার মন।
প্রেম থেকে তবু পৃথক করিয়া ঘৃণা
ভালোবাসিতেই চেয়েছি সর্বক্ষণ।।"

ইরিনা লক্ষ করল, তার মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। একটু যেন খিদেও পাচ্ছে। হালকা ধরনের কোনো খাবার খাওয়া যেতে পারে।

ইরিনা নিঃশব্দে খাচ্ছে।

অরচ লীওন হাসি মুখে তা লক্ষ করছেন। তাঁর হাতে এক মগ ঝাঁঝালো ধরনের পানীয়, অবসাদ দূর করতে যার তুলনা নেই।

'ইরিনা।'

'বলুন।'

'এখানকার খাবারগুলো কেমন?'

'ভালো।'

'তোমাকে এখন খানিকটা প্রফুল্ল লাগছে। তার কারণ জানতে পারি কি?'

'কোনো কারণ নেই।'

'কারণ ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না ইরিনা। আমার মনে হয় ঐ রোবটটার সঙ্গে তোমার প্রফুল্লতার একটা সম্পর্ক আছে। ওর দায়িত্ব হচ্ছে ট্রেনযাত্রীদের সবাইকে প্রফুল্ল রাখা। ও প্রাণপণে সেই চেষ্টা করে। ওর নানান কায়দা-কানুন আছে। তোমার বেলা নিশ্চয়ই সব কায়দা-কানুনের কোনো একটা খাটিয়েছে। তোমার বেলা কী করেছে? গান গেয়েছে না কবিতা লিখে দিয়েছে?'

ইরিনা তার জবাব না দিয়ে বলল, 'আমি কোথায় যাচ্ছি?'

'খাওয়া শেষ কর, তারপর বলব।'

'আমি এখনি শুনতে চাই।'

'তুমি যাচ্ছ নিষিদ্ধ নগরীতে।'

ইরিনার গা দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। তার মনে হল, সে ভুল শুনছে। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। অরচ লীওন বললেন, 'তুমি যাচ্ছ "নিষিদ্ধ নগরী"তে। আমি তোমাকে তৃতীয় নগরী পর্যন্ত নিয়ে যাব। সেখান থেকে রোবটবাহী বিশেষ বিমানে করে তুমি নিষিদ্ধ নগরীতে যাবে। আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না, কারণ নিষিদ্ধ নগরীতে যাবার অনুমতি আমার নেই। ইরিনা, তুমি কি বুঝতে পারছ, তুমি কত ভাগ্যবতী?'

'না, আমি বুঝতে পারছি না।'

'গত চার শ' বছরে দশ থেকে বারো জন মানুষের এই সৌভাগ্য হয়েছে।'

'তারা কেউ ফিরে আসে নি। কাজেই আমরা জানি না, তা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য।'

'এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবীকে যারা আবার ঠিক করেছে, পৃথিবীর যাবতীয় শাসন-ব্যবস্থা যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁদের চোখের সামনে দেখবে। হয়তো তাঁদের সঙ্গে কথা বলবে। এটা কি একটা বিরল সৌভাগ্য নয়?'

'এত মানুষ থাকতে আমি কেন?'

'তা তো জানি না। তবে বিশেষ কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে। নিষিদ্ধ নগরীতে যাঁরা আছেন তাঁরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে জানেন। তাঁরা নিশ্চয়ই তোমার ভেতর কিছু দেখেছেন।'

'আমার মধ্যে কিছুই নেই।'

'তুমি কি পানীয় কিছু খাবে?'

'না।'

'তোমাকে সাহস দেবার জন্যে আরেকটি খবর দিতে পারি।'

'দিতে পারলে দিন।'

'নিষিদ্ধ নগরীতে তুমি একা যাচ্ছ না, তোমার এক জন সঙ্গী আছে। এই প্রথম একসঙ্গে তোমরা দু' জন যাচ্ছ। এবং সবচে মজার ব্যাপার হচ্ছে, তোমার সেই সঙ্গী এই মুহূর্তে এই ট্রেনেই আছে। তুমি কি তার সঙ্গে আলাপ করতে চাও?'

'চাই।'

'সে আছে ছ' নম্বর কামরায়। সে একা–একাই আছে। তুমি একাই যাও।'

'আপনি কি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন না?'

'না। নিজেই পরিচয় করে নাও।'

ইরিনা উঠে দাঁড়াল। অরচ লীওন বললেন, 'আমি কি কোনো ধন্যবাদ পেতে পারি?'

'আপনাকে ধন্যবাদ অরচ লীওন।'

'আরেকটি খবর তোমাকে দিতে পারি। এই খবরে তুমি আরো খুশি হবে।'

ইরিনা উঠে দাঁড়িয়েছিল, এই কথায় আবার বসল। অরচ লীওন গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন 'তোমার বাবা–মা ভালো আছেন। তাঁদেরকে দ্বিতীয় শহরের নাগরিক করা হয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি টেলিফোন করে খোঁজ নিতে পার। ট্রেন থেকেই তা করা যাবে।'

ইরিনা তাকিয়ে আছে। কিছু বলছে না। অরচ লীওন বললেন, 'তুমি কি খুশি?'

'হ্যাঁ, আমি খুশি। এই খবরটি আপনি আমাকে শুরুতে বললেন না কেন?'

'শুরুতে তোমাকে আমি ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি যাতে ভয়ে, দুঃখে, কষ্টে তুমি অস্থির হয়ে যাও।'

'তাতে আপনার লাভ?'

'লাভ অবশ্যই আছে। বিনা লাভে আমি কিছু করি না। শুরুতে প্রচন্ড ভয় পেলে শেষের আনন্দের খবরগুলো খুব ভালো লাগে। তোমার এখন তাই লাগছে। তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছ। এখন আমি যদি তোমাকে কোনো অনুরোধ করি, তুমি তা রাখবে।'

'কী অনুরোধ করবেন?'

'নিষিদ্ধ নগরীতে তুমি কী দেখলে, তা আমি জানতে চাই। কোনো–না–

কোনো ব্যবস্থা করে তুমি আমাকে তা জানাবে।'

'কেন জানতে চান?'

'কৌতূহল। শুধুই কৌতূহল, আর কিছুই না। এস· তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলা যাক।'

টেলিফোনে খুব সহজেই যোগাযোগ করা গেল। ইরিনার বাবা কথা বললেন। তাঁর গলায় বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। তিনি আনন্দে ঝলমল করতে করতে বললেন, 'খুব বড় একটা খবর আছে মা, আমি এবং তোমার মা দু' জনই দ্বিতীয় শহরের নাগরিক হয়েছি। কাগজপত্র পেয়ে গেছি।'

'খুবই আনন্দের কথা বাবা।'

'তোর মা তো বিশ্বাসই করতে পারছে না। আনন্দে কাঁদছে।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'আগামী কাল বাসায় একটা উৎসবের মতো হবে। পরিচিতরা সব আসবে। উৎসবের জন্যে পঞ্চাশ মুদ্রা পাওয়া গেছে।'

'তাই নাকি!'

'হাঁ। ঘর সাজাচ্ছি, আজ রাতে আর ঘুমাব না।'

ইরিনা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমার কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করলে না? আমি কোথায় আছি, কী করছি।'

'এ তো আমরা জানি। জিজ্ঞেস করব কি?'

'কী জান?'

'বিশেষ কাজে তোকে নেয়া হচ্ছে। কাজ শেষ হলে তোকেও আমাদের সঙ্গে থাকতে দেবে।'

ইরিনা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবা রেখে দিই।'

'তোর মা'র সঙ্গে কথা বলবি না।'

'না। বেচারী আনন্দে কাঁদছে, কাঁদুক। ভালো থেক তোমরা। শুভ রাত্রি।'

ইরিনা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। বাবার ওপর সে কিছুতেই রাগ করতে পারছে না। প্রথম নাগরিক থেকে দ্বিতীয় নাগরিকের এই সৌভাগ্যে তাঁর বোধ হয় মাথাই এলোমেলো হয়ে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক।

নাগরিকত্বের তিনটি পর্যায় আছে। সবাইকেই এই তিনটি পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রথম শহরের নাগরিকত্ব। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ। মাঝখানে চল্লিশ মিনিটের ছুটি। সীমিত খাবার-দাবার। ছুটির দিনে সপ্তাহের রেশন নিয়ে আসতে হয়। এক সপ্তাহ আর কোনো খাবার নেই। সপ্তাহের রেশন কৃপণের মতো খরচ করতে হয়। খাবারের কষ্টই সবচে বড় কষ্ট। তারপর আছে নিয়ম-কানুন মেনে চলার কষ্ট। একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। কার্ডে লাল দাগ পড়ে যাবে। পনেরটি লাল দাগ পড়ে গেলে এ জীবনে আর

দ্বিতীয় শহরের নাগরিক হওয়া যাবে না। সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করে কার্ডটি পরিষ্কার রাখতে। সম্ভব হয় না। যে-সব ভাগ্যবান ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তা পারেন, তাঁরা দ্বিতীয় শহরের নাগরিক হিসেবে নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় শহরে প্রচুর খাবার-দাবার। ফেলে ছড়িয়ে খেয়েও শেষ করা যায় না। রেশনের ব্যবস্থা নেই। যার যা প্রয়োজন, বাজার থেকে কিনে আনবে। কাজ করতে হবে মাত্র ছ' ঘন্টা। নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি এখানে নেই। বড় রকমের অপরাধের শাস্তি জরিমানা। বছরে এক মাস দেয়া হয় ভ্রমণ, পাস। সেই পাস নিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ান যায়। একটি টাকাও খরচ হয় না। আর উৎসব তো লেগেই আছে। দ্বিতীয় শহরের জীবনে ক্লান্তি বা অবসাদ বলে কিছু নেই। এই শহরের নাগরিকরা দুঃখ ব্যাপারটা কি জানেই না, এরা শুধু স্বপ্ন দেখে তৃতীয় শহরের। কুড়ি বছর দ্বিতীয় শহরে বাস করতে পারলেই তৃতীয় শহরে যাবার যোগ্যতা হয়। কিন্তু সবাই যেতে পারে না। ভাগ্যবানদের ঠিক করা হয় লটারির মাধ্যমে। লটারিটা হয় বছরের শেষ দিনে। প্রচন্ড আনন্দ ও উত্তেজনার একটি দিন। এক দল নির্বাচিত হন তৃতীয় শহরের জন্যে, তাঁদের ঘিরে সারারাত আনন্দ-উল্লাস চলে।

যাঁরা নির্বাচিত হন না, তাঁরাও খুব-একটা মন খারাপ করেন না। পরের বছর আবার লটারি হবে। সেই আশায় বুক বাঁধেন।

তৃতীয় শহরের সুখ-সুবিধা কেমন, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা দ্বিতীয় শহরের নাগরিকদেরও নেই। তাঁরা শুধু জানেন, তৃতীয় শহর হচ্ছে স্বর্গপুরী। চির অবসর ও চির আনন্দের স্থান। সবাই ভাবেন--মৃত্যুর আগে একবার যেন তৃতীয় শহরে ঢুকতে পারি।

ইরিনা ছ' নম্বর কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। কলিং বেল থাকা সত্ত্বেও সে দরজায় মৃদু টোকা দিল। ভেতর থেকে এক জন কে শিশুর মতো গলায় বলল, 'কে?'

'আমি ইরিনা। আপনার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।'

'এখন তো কথা বলতে পারব না। আমি এখন ঘুমুব।"

'প্লীজ, একটু দরজা খুলুন। আমার খুব দরকার।'

দরজা খুলে গেল। অসম্ভব রোগা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। লোকটি রুক্ষ গলায় বলল, 'তুমি কী চাও?'

ইরিনা তার জবাব না দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। লোকটি অবাক হয়ে তাকে দেখছে।

ট্রেনের গতিবেগ ক্রমেই বাড়ছে। বাতাসে শিসের মতো শব্দ হচ্ছে। এমন প্রচন্ড গতি, যেন এই ট্রেন এক্ষুণি মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যাবে। ইরিনা বলল, 'আমি কি বসতে পারি?'

৩

ছেলেটি হাবাগোবার মতো। কিছু কিছু বয়স্ক মানুষ আছে, যাদের দেখলেই মনে হয় এরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা হাস্যকর কিছু করবে। এবং এটা যে হাস্যকর, তা বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাবে। একেও সে রকম লাগছে। মোটা ফ্রেমের চশমা। সেই চশমা নাকের ডগায় চলে এসেছে। দেখতে অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে চশমা এই বুঝি খুলে পড়ল।

'আমি কি আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি?'

ছেলেটি বিরক্ত স্বরে বলল, 'একবার তো বললাম আমি ঘুমুব।'

'আপনার ঘুম কি এতই জরুরি?'

'ঘুম জরুরি না। ঠিক সময়ে ঘুমুতে যাওয়া উচিত এবং ঠিক সময়ে ঘুম থেকে ওঠা উচিত।'

'আজ না হয় একটু ব্যতিক্রম হল। বসব?'

'আমি 'না' বললে কি তুমি শুনবে?'

ছেলেটির মুখে 'তুমি' শব্দটি খুব স্বাভাবিক শোনাল। খট করে কানে বাজল না। যেন এ অনেকদিন থেকেই ইরিনাকে চেনে, তুমি করে ডাকে।

'জরুরী কথাটি কি?'

'আপনি যেখানে যাচ্ছেন আমিও সেখানে যাচ্ছি। আমি নিষিদ্ধ নগরীতে যাচ্ছি।'

ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, 'এটা এমন কি জরুরি কথা!'

'আপনার কাছে খুব জরুরি মনে হচ্ছে না?'

'না তো!'

'আপনি খুবই বোকা।'

'তা ঠিক না। আমি বোকা হব কেন? আমার অনেক বুদ্ধি। এই জন্যেই তো আমাকে "নিষিদ্ধ নগরী"তে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বোকা হলে আমাকে নিয়ে যেত?'

ইরিনার ইচ্ছা হল উঠে চলে যেতে। যাবার আগে এই হাঁদারামের গালে প্রচন্ড একটা চড় বসিয়ে দিতে।

ছেলেটি বেশ অবাক হয়েই বলল, 'এই খুকী, আমার যে বুদ্ধি আছে, এটা তুমি বিশ্বাস করছ না কেন?'

'কোনো বুদ্ধিমান লোক কখনো বলে না, আমার খুব বুদ্ধি। শুধুমাত্র হাঁদারাই সে রকম বলে।'

'এক জন বুদ্ধিমান লোক যদি বলে আমার খুব বুদ্ধি, তাতে দোষের কি?'

'না, কোনো দোষ নেই, আপনি যত ইচ্ছা বলুন। আর দয়া করে আমাকে তুমি তুমি করে বলবেন না।'

ইরিনা সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়াল। ছেলেটি দুঃখিত স্বরে বলল, 'তুমি আমার

ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ, এই জন্যে আমার খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর নি। আমি প্রমাণ করে দেব যে আমার বুদ্ধি আছে?'

'আপনাকে কিছু প্রমাণ করতে হবে না।'

'না না শোন, শুনে যাও। আমার সম্পর্কে তোমার একটা ভুল ধারণা থাকবে, এটা ঠিক না। আমি এই ঘন্টাখানেক আগে কী করে একটা বুদ্ধিমান রোবটকে বোকা বানালাম এটা শোন।'

ইরিনা কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে। ছেলেটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছে, 'ট্রেনে একটা রোবট আছে দেখ নি? ব্যাটা আমার সাথে রসিকতা করবার চেষ্টা করছিল, আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করল।'

'আর আপনি চট করে জবাব দিয়ে দিলেন?'

'না। আমি উল্টো তাকে একটা এমন ধাঁধা দিলাম, ব্যাটার প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়।'

'কি ধাঁ ধা?'

'আমি বললাম, একটা সাপ হঠাৎ তার নিজের লেজটা গিলতে শুরু করল। পুরোপুরি যখন গিলে ফেলবে, তখন কী হবে? রোবটটার আক্কেল গুড়ুম। ভেবে পাচ্ছে না কী হবে। এক বার বলছে সাপটা অদৃশ্য হয়ে যাবে। পরক্ষণেই মাথা নেড়ে বলছে, তা কি করে হয়?'

'এই আপনার বুদ্ধির নমুনা?'

'হ্যাঁ। দ্বৈত সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছি মাথায়। একটা রোবটকে বোকা বানানর এই বুদ্ধি কি তোমার মাথায় আসত?'

'না, আসত না।'

'তাহলে তোমার কি মনে হয়, আমি বুদ্ধিমান?'

ইরিনা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। ইচ্ছা হল বলে, 'আপনি এর কোনোটাই না, আপনি পাগল।' তা বলা গেল না।

'তোমার নামটা যেন কি? আমাকে কি আগে বলেছিলে, না বল নি?'

'আমার নাম ইরিনা। শুরুতেই একবার বলেছি।'

'আমার নাম জানতে চাও?'

'আপনি ঘুমুতে চাচ্ছিলেন--ঘুমান। আমি এখন যাব।'

'আমার ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে। একবার ঘুম নষ্ট হলে অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম আসে না। শোন আমার নাম অখুন-মীর। তুমি আমাকে মীর ডাকবে। আমার বন্ধুরা আমাকে মীর ডাকে। মীর উচ্চারণটা হবে একটু টেনে টেনে 'ম-ী-ী-ী-র'--এ রকম, বুঝতে পারলে?'

'পারলাম।'

'বস এখানে।'

ইরিনা বসল। কেন বসল নিজেই জানে না। বসার তার কোনো রকম ইচ্ছা ছিল না।

'শোন ইরিনা, নিষিদ্ধ নগরীতে যেতে হচ্ছে বলে তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? আমাদের ওদের প্রয়োজন বলেই নিয়ে যাচ্ছে। শাস্তি দেয়ার জন্যে নিশ্চয়ই নিচ্ছে না। শাস্তি দেবার হলে প্রথম শহরেই দিতে পারত। পারত না?'

'হ্যাঁ পারত।'

'আমাদের যে-কোনো কারণেই হোক ওদের প্রয়োজন।'

ইরিনা বলল, 'ওরা মানে কারা?'

মীর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইল। যেন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবছে, উত্তরটা মাথায় এলেই বলবে। বসে আছে তো বসেই আছে। ইরিনার ক্ষীণ সন্দেহ হল, লোকটি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। গাড়ির ঢুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়া বিচিত্র নয়। কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে মানুষটাকে। কুঁজো হয়ে বসেছে। থুতনিটা ওপরের দিকে তোলা। হাত দু'টি এলিয়ে দিয়েছে।

'আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

'না। ভাবছি।'

'ভেবে কিছু পেলেন? আপনি তো বুদ্ধিমান লোক, পাওয়া উচিত।'

'তা উচিত, কিন্তু পাচ্ছি না। নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।'

'কেন জানি না?'

'এই জিনিসটা নিয়েই আমি ভাবছিলাম। কেন জানি না?'

'ভেবে কিছু বের করতে পারলেন?'

'না। শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারছি, আমরা আসলে কিছুই জানি না। আমাদের যখন অসুখ হয়, এক জন রোবট ডাক্তার এসে আমাদের চিকিৎসা করে। কেন আমাদের অসুখ হয়, কিভাবে আমাদের অসুখ সারান হয়--তার কিছুই আমরা জানি না। কোনো যন্ত্রপাতি যখন নষ্ট হয়, এক জন রোবট এসে তা ঠিক করে। যন্ত্রপাতিগুলো কী? কিভাবে কাজ করে--তাও আমরা জানি না। এখন কথা হল, কেন জানি না।'

'কেন?'

'কারণ আমাদের জানতে দেয়া হয় না। আমরা স্কুলে পড়াশোনা করি। কী পড়ি? লিখতে পড়তে শিখি। সামান্য অঙ্ক শিখি। প্রথম শহরের বিধিগুলো মুখস্থ করি। ব্যাস, এই পর্যন্তই। তাই না?'

'হ্যাঁ তাই।'

'বুঝলে ইরিনা, আমি এক বার আমার স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম-- স্যার টেলিফোন কিভাবে কাজ করে? স্যার অবাক হয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'টেলিফোন তৈরি করা হয়েছে মানুষের সেবার জন্যে।

তৈরি হয়েছে নিষিদ্ধ নগরে। নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে কৌতূহল সপ্তম বিধি অনুসারে একটি প্রথম শ্রেণীর অপরাধ। তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর অপরাধ করেছ।' এই বলে তিনি আমার কার্ডে একটা দাগ দিয়ে দিলেন। হা হা হা।'

ইরিনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'হাসছেন কেন? এটা কি হাসার মতো কোনো ঘটনা? কার্ডে দাগ পড়া তো খুবই কষ্টের ব্যাপার। পনেরটার বেশি দাগ পড়লে আপনি কখনো দ্বিতীয় শহরে যেতে পারবেন না।'

'এই জন্যেই তো হাসছি। আমার কার্ডে মোট দাগ পড়েছে তেতাল্লিশটি। স্কুলে সবাই আমাকে কি বলে জান? সবাই বলে মিস্টার তেতাল্লিশ।'

'বিধি ভাঙাই বুঝি আপনার স্বভাব?'

'না, তা না। আমার স্বভাবের মধ্যে আছে কৌতূহল। আমি কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করি। একবার কি করেছিলাম জান? পানি গরম করার একটা যন্ত্র খুলে ফেলেছিলাম।'

'কি বলছেন আপনি!'

'হ্যাঁ সত্যি। প্রথম খুব ভয় লাগল। কত বিচিত্র সব জিনিস। একটা চাকতি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরছে। তিন বার ঘুরবার পর অন্য একটা বলের মতো জিনিস চলে আসে। সেটা খুব গরম।'

'আপনি হাত দিয়েছিলেন!'

'হাত না দিলে বুঝব কি করে এটা গরম না ঠান্ডা।'

'এর জন্যে আপনার কী শাস্তি হল?'

'কোনো শাস্তি হল না।'

'শাস্তি হল না কেন?'

'শাস্তি হল না কারণ আমি আবার তা লাগিয়ে ফেলেছিলাম।'

ইরিনা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কীভাবে লাগালেন?'

'যেভাবে খুলেছিলাম সেভাবে লাগালাম।'

'বলেন কি আপনি!'

'এইসব কাজ শুধু রোবটরা পারবে, আমরা পারব না, তা ঠিক না। আমাদের শেখালে আমরাও পারব। কিন্তু আমাদের কেউ শেখাচ্ছে না। এবং নানারকম বিধি-নিষেধ দিয়ে দিয়েছে যাতে আমরা শিখতে না পারি। যেন আমরা এসব শিখে ফেললে কোনো বড় সমস্যা হবে।'

এই হাবাগোবা ধরনের মানুষটির প্রতি ইরিনার শ্রদ্ধা হচ্ছে, এ আসলেই বুদ্ধিমান। সবাই যেভাবে একটা জিনিসকে দেখে, এ সেইভাবে দেখছে না। অন্য রকম করে দেখছে। সেই দেখার সবটাই যে ভুল, তাও না।

'ইরিনা।'

'জ্বি বলুন।'

'তুমি কি লক্ষ করেছ এই রোবটগুলো শুধু দিনে কাজ করে, রাতে কিছু করে না?'

'না, আমি সেভাবে লক্ষ করি নি।'

'এরা দিনে কাজ করে। যখন এদের কোনো কাজ থাকে না, তখন রোদে দাঁড়িয়ে থাকে। এর মানে কি বল তো?'

'জানি না।'

'কাজ করবার জন্যে যে শক্তি লাগে তা তারা রোদ থেকে নেয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। এক বার পরপর চার দিন ধরে খুব ঝড়বৃষ্টি হল। সূর্যের মুখ দেখা গেল না। তখন অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, রোবটগুলো কোনো কাজ করতে পারছে না।'

'কিন্তু কিছু কিছু রোবট তো রাতেও কাজ করে। যেমন ডাক্তার রোবট।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্যি করে।'

অথুন–মীর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। যেন এই কথাটা তার খুব মনে লেগেছে। ডাক্তার রোবটরা রাতে কাজ না করলেই যেন সে বেশি খুশি হত। ইরিনা মানুষটিকে খুশি করবার জন্যে বলল, 'হয়তো আপনি আপনার অনেক প্রশ্নের জবাব নিষিদ্ধ নগরীতে পেয়ে যাবেন।' মীর ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'জানি না। পাব বলে মনে হয় না। প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে চায় না। এবং মজার ব্যাপার কি জান ইরিনা, মানুষের মাথায় যেন এই জাতীয় কোনো প্রশ্ন না আসে, সেই চেষ্টা করা হয়।'

'কিভাবে করা হয়?'

'কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে তাদের রাখা হয়। কোনো রকম অবসর নেই। মানুষ চিন্তাটা করবে কখন? খাবার টিকিট জোগাড় করার দুশ্চিন্তাতেই মানুষের সব সময় কেটে যায়। জীবন কাটিয়ে দিতে চায় কার্ডে কোনো দাগ না ফেলে। চিন্তার সময় কোথায়?'

'তবুও কেউ কেউ তো এর মধ্যেই চিন্তা করে।'

'হ্যাঁ তা করে। আমি করি। আমার মতো আরো কেউ কেউ হয়ত করে। এমন কাউকে যদি পেতাম, কত ভালো হত। কত কিছু জানার আছে।'

মীর হাই তুলল। ইরিনা বলল, 'আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?'

'হ্যাঁ পাচ্ছে।'

'আমি কি তাহলে চলে যাব?'

মীর হেসে ফেলে বলল, 'তোমার মনে হয় যেতে ইচ্ছা করছে না।'

ইরিনা লজ্জা পেয়ে গেল। তার সত্যি সত্যি যেতে ইচ্ছা করছে না। এই অদ্ভুত মানুষটির সঙ্গে আরো কিছু সময় থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু এই লোকটা তা টের পাওয়ায় খুব অস্বস্তি লাগছে।

'ইরিনা।'

'জ্বি বলুন।'

'তুমি কি বিয়ের পারমিট পেয়েছ?'

'না, পাই নি। আমার বয়স উনিশ, একুশের আগে তো পারমিট পাব না।'

'আমার তেত্রিশ। আমিও পাই নি। সম্ভবত আমাকে পারমিট দেবে না। এই ব্যাপারটাও কিন্তু রহস্যময়। ওরা যাকে ঠিক করে দেবে, তাকেই বিয়ে করতে হবে। এতে নাকি সুস্থ সুন্দর নীরোগ মানুষ তৈরি হবে। সুখী পৃথিবী।'

'আপনি তা বিশ্বাস করেন না?'

'না, করি না। ওদের বেশির ভাগ কথাই বিশ্বাস করি না। আমি নিজের মতো চলতে চাই, নিজের মতো ভাবতে চাই। নিজের পছন্দের মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই।'

'এ রকম কোনো পছন্দের মেয়ে কি আপনার আছে?'

'না নেই। তোমাকে কিছুটা পছন্দ হয়। তবে তোমার মুখ গোলাকার। এ রকম মুখ আমার পছন্দ না।'

'আর আপনি বুঝি রাজপুত্র?'

'কি মুশকিল, তুমি রাগ করছ কেন? তোমাকে আমার কিছুটা পছন্দ হয়েছে, এই খবরটা বললাম। এতে তো খুশি হবার কথা।'

'আপনাকেও তো আমার পছন্দ হতে হবে? আপনার নিজের চেহারাটা কেমন আপনি জানেন? আয়নায় কখনো নিজের মুখ দেখেছেন?'

'খুব খারাপ?'

'না, খুব ভালো। একেবারে রাজপুত্র।'

'এত রাগছ কেন তুমি? তোমাকে আমার কিছুটা পছন্দ হয়েছে, এটা বললাম। আমাকে তোমার অপছন্দ হয়েছে, এটা তুমি বললে। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।'

'আমি এখন যাচ্ছি।'

'খুব ভালো কথা, যাও। শুভ রাত্রি।'

'শুভ রাত্রি।'

'শোন ইরিনা, এরকম রাগ করে চলে যাওয়াটা ঠিক না। যাবার আগে মিটমাট করে ফেলা যাক।'

'কিভাবে মিটমাট করবেন?'

'চলো খাবার গাড়িতে যাই। চা-কফি বা অন্য কোন পানীয় খাওয়া যাক। যাবে?'

'আমার ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা না করলে থাক।'

'আচ্ছা ঠিক আছে চলুন।'

'ইচ্ছা করছে না তবু যেতে চাচ্ছ কেন?'

'ইচ্ছা না করলেও তো আমরা অনেক কিছু করি। যাকে সহ্য হয় না সরকারী নির্দেশে তাকে বিয়ে করি। ভালোবাসতে চেষ্টা করি।'

'তা করি। চল যাওয়া যাক।'

এ্যাটেনডেন্ট রোবটটির সঙ্গে করিডোরে দেখা হল। মীর হাসিমুখে বলল, 'কি ধাঁধাটি পারলে?'

'চেষ্টা করছি, তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি একটি অবাস্তব সমস্যা দিয়েছেন। একটা সাপ নিজেকে পুরোপুরি গিলে ফেলবে কী করে?'

'বেশ, তাহলে একটা বাস্তব সমস্যা দিচ্ছি। একটি বস্তু এক সেকেন্ডে চার ফুট যায়। পরবর্তী সেকেন্ডে যায় দুই ফুট, তার পরবর্তী সেকেন্ডে এক ফুট। এইভাবে অর্ধেক করে দূরত্ব কমতে থাকে। বিশ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে তার কত সময় লাগবে?'

রোবটটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মীর বলল, 'তুমি একটি মহাগর্দভ। এই ধাঁধার সমাধান করা তোমার কর্ম না। যাও ভাগো।' ইরিনা খিলখিল করে হেসে উঠল। রোবটটির মনে হচ্ছে আত্মসম্মানে লেগেছে। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'চট করে তো আর সমস্যার সমাধান করা যায় না। আমাকে ভাববার সময় দিন।'

'সময় দেয়া হল। অনন্তকাল সময়। বসে বসে ভাব।'

দু' জন মুখোমুখি বসেছে।

মীর কোনো কথা বলছে না। কপাল কুঁচকে কি জানি ভাবছে। গাড়ির গতি আগের চেয়ে কম। বাইরে নিকষ অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের আলোয় ধ্বংসস্তূপ মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে। বীভৎস দৃশ্য, তাকান যায় না।

ইরিনা লক্ষ করল অরচ লীওন ঠিক আগের জায়গায় বসে। তাঁর হাতে পানীয়ের গ্লাস। গ্লাসে গাঢ় সবুজ রঙের কি-একটা জিনিস--ক্রমাগত বুদবুদ উঠছে। অরচ লীওন তাকিয়ে আছেন তাঁর গ্লাসের দিকে। এক বার ইরিনার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। তিনি এমনভাবে তাকালেন, যেন চিনতে পারছেন না।

ইরিনা মৃদু স্বরে মীরকে বলল, 'ঐ লোকটিকে কি আপনি চেনেন?'

'কোন্ লোকটি?'

'ঐ যে কোণার দিকে বসে আছে। তক্ষকের মতো চোখ।'

'চিনব না কেন? উনি আমার বাবা।'

'কী বলছেন! আমি তো জানতাম উনি অবিবাহিত।'

'উনি আমার বাবা। ইন্টেলিজেন্সের সবচে বড়ো অফিসার। এরা হাসি মুখে রাতকে দিন করে। চেহারার মধ্যে তুমি মিল দেখছ না? অবিবাহিত হবে কেন?'

ইরিনা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। মীর খুব সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'বাবার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।'

'নেই কেন?'

'আমার জন্মের দ্বিতীয় বছরে বাবাকে প্রথম শহর থেকে দ্বিতীয় শহরে নিয়ে যাওয়া হল। আমার যখন আঠার বছর বয়স, তখন জানলাম তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন। তৃতীয় শহরের নাগরিক হয়ে বসেছেন।'

'আপনার খোঁজখবর করেন না?'

'কী করে করবে, তৃতীয় শহরের নাগরিক না? তৃতীয় শহরের নাগরিকরা কি আর প্রথম শহরের কাউকে খুঁজতে পারে, আইনের বাধা আছে না? তাছাড়া সে নিজেই হচ্ছে আইনের লোক।'

'আইনের লোক বলেই তো আইন ভাঙা সহজ।'

'তা ঠিক। সে আইন ভেঙেছে। আমার কার্ডে তেতাল্লিশটি দাগ পড়ার পরও কিন্তু আমি বেঁচে আছি। চল্লিশটি দাগ পড়ার পর সরকারী নিয়মে দোষী লোকটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। অবাঞ্ছিত কেউ বেঁচে থাকে না, অথচ আমি আছি। হা হা হা।'

মীর এত শব্দ করে হেসে উঠল যে লীওন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখলেন। তিনি বিরক্ত হয়েছেন কিনা তা বোঝা গেল না। তাঁর গ্লাসের পানীয় শেষ হয়ে গিয়েছিল, সুইচ টিপে তিনি আরো পানীয় আনতে বললেন।

ট্রেনের গতি আবার বাড়তে শুরু করেছে। বাইরে রীতিমতো ঝড় হচ্ছে। মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়ছে। ঘনঘন বাজ পড়ছে। বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে যাবার মতো অবস্থা। ইরিনা লক্ষ করল মীর চোখ বন্ধ করে আছে। হয়তো ঘুমুচ্ছে কিংবা কোনোকিছু নিয়ে ভাবছে। কি ভাবছে কে জানে।

ইরিনার এখন আর কেন জানি লোকটির চেহারা খারাপ লাগছে না। হয়তো চোখে সয়ে গেছে। ইরিনারও ঘুম পেয়ে গেল।

৪

চমৎকার সকাল।

সূর্যের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। আকাশের রঙ ঘন নীল। ছবির মতো সুন্দর একটি শহরে ট্রেন এসে থেমেছে। ট্রেন থেকে নেমে তারা একটি ছোট্ট কাঁচের ঘরে ঢুকল। এখান থেকে চারদিক দেখা যায়। ইরিনা মুগ্ধ হয়ে গেল। কেউ তাকে বলে দেয় নি, কিন্তু সে বুঝতে পারছে এটা হচ্ছে তৃতীয় শহর। সুখের শহর, দুঃখ এখান থেকে নির্বাসিত। এর আকাশ-বাতাস পর্যন্ত অন্য রকম। সে মুগ্ধ কণ্ঠে

বলল, 'কী সুন্দর, কী সুন্দর!'

মীর তার পাশেই, সে কিছু বলল না। হাই তুলল। রাতে তার ঘুম ভালো হয় নি। ঘুমঘুম লাগছে। তৃতীয় নগরীর সৌন্দর্য তাকে স্পর্শ করছে না।

ইরিনা বলল, 'এখন আমরা কোথায় যাব?'

মীর হাই চাপতে চাপতে বলল, 'তুমি এত ব্যস্ত হলে কেন? ওরা ব্যবস্থা করে রেখেছে। যথাসময়ে কোথাও চাপাবে। যথাসময়ে পৌছবে।'

'হাতে কিছু সময় থাকলে শহরটা ঘুরে দেখতাম।'

'আমি দেখাদেখির মধ্যে নেই, তোমাকে যেতে হবে একা। আমি ঘুমুবার চেষ্টা করছি। কোথাও যেতে চাইলে যাবে, আমাকে জাগাবে না।'

মীর সত্যি সত্যি ঘুমুবার আয়োজন করল। তারা বসে আছে ছোট্ট একটা ঘরে। এত ছোট যে হাত বাড়ালে দেয়াল এবং ছাদ দুই-ই ছোঁয়া যায়। এতটুকু ঘরেও চার-পাঁচটা চেয়ার সাজান। তেমন কোনো আরামদায়ক কিছু নয়। ঘরের দেয়াল অতি স্বচ্ছ কাঁচ জাতীয় পদার্থের তৈরি। বাইরের সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। অরচ লীওন তাঁদের এখানে বসিয়ে রেখে উধাও হয়েছেন, আর কোনো খোঁজ নেই। ইরিনা একবার বেরুতে চেষ্টা করল। বেরুবার পথ পেল না। দরজা-টরজা এখন কিছুই নেই বলে মনে হচ্ছে। অথচ এই ঘরে ঢোকার সময় কোনো বাধা পাওয়া যায় নি।

'মীর, আপনি কি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

'চেষ্টা করছি।'

'এটাকে কেমন যেন খাঁচার মতো মনে হচ্ছে। বেরুতে পারছি না।'

'বেরুবার দরকারটা কি?'

ইরিনার অস্বস্তি লাগছে, এমন নির্জন জায়গা। আশেপাশে একটিও মানুষ নেই, অথচ বাইরের কত চমৎকার সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

'মীর, আপনি এরকম চোখ বন্ধ করে থাকবেন? আমার ভয় ভয় লাগছে।'

'ভয় ভয় লাগার কারণ কি?'

'মানুষজন কিচ্ছু নেই।'

'মানুষজন ঠিকই আছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না। কাঁচের এই ঘরটায় বসে তুমি বাইরের যে, সব দৃশ্য দেখছ, তা সত্যি নয়। বানান, মেকি।'

'তার মানে!'

'তার মানে আমি জানি না। টেলিভিশনে যেমন ছবি দেখ, এখানেও তাই দেখছ। একটাও সত্যি নয়।'

'কি করে বুঝলেন?'

'খুব সহজেই বুঝলাম। আমরা ট্রেন থেকে নেমেছি ভোর হবার ঠিক আগে আগে। রোবটটি আমাকে বলল সূর্য ওঠার ঠিক আগে আগে ট্রেন পৌছবে। অথচ এই ঘরে বসে আমরা দেখছি সূর্য মাথার ওপরে।'

'তাই তো।'

'ইরিনা পরিষ্কার চোখে দেখার চেষ্টা কর, এবং আমার মনে হয় এখন থেকে যা দেখবে তাই বিশ্বাস করার অভ্যাসটা ত্যাগ করলে ভালো হবে। এই দেখ আমাদের চারপাশের দৃশ্য এখন বদলে গেল।'

ইরিনা মুগ্ধ হয়ে দেখল সত্যি সত্যি সব বদলে গেছে। তাদের চারপাশে এখন ঘন নীল সমুদ্র, ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সমুদ্রসারস উড়ছে। সমুদ্রের নীল পানিতে সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু। সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'অপূর্ব!'

মীর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এটা যাত্রীদের বিশ্রামের কোনো জায়গা। অনেকক্ষণ যাদের অপেক্ষা করতে হয় তারা যাতে বিরক্ত না হয় সেই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।'

'সুন্দর ব্যবস্থা। আপনার কাছে সুন্দর লাগছে না?'

'না। এর চেয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন আমি দেখি।'

'এটা তো আর স্বপ্ন নয়।'

'স্বপ্ন নয় তোমাকে বলল কে? পুরোটাই স্বপ্ন। সুন্দর সুন্দর ছবি দেখছ, যার কোনো অস্তিত্ব নেই।'

ঘরের চারপাশের দৃশ্য আবার বদলে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে চারপাশেই উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় বরফ জমেছে। সূর্যের আলোয় সেই বরফ ঝিকমিক করছে। ইরিনা মুগ্ধ গলায় বলল, 'এবারের দৃশ্য আরো সুন্দর!'

বলতে বলতেই ছবি কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। ইরিনার মনে হল ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। কানে ঝিঁঝি শব্দ। সে কোনোমতে বলল, 'এসব কী হচ্ছে?'

মীর ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাদের যেখানে নেবার, সেখানে ঘুমন্ত অবস্থায় নেবে। যেন—'

গভীর গাঢ় ঘুমে দু' জনেই তলিয়ে যাচ্ছে। ইরিনা প্রাণপণ চেষ্টা করছে জেগে থাকতে। কিছুতেই পারছে না, চোখের সামনের আলো কমে কমে প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। দূরে তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজের মতো আওয়াজ। ইরিনা তার মা'কে ডাকতে চেষ্টা করল। পারল না। তার দু' চোখে অতলান্তিক ঘুম।

৫

ইরিনা জেগে উঠে দেখল একটি প্রকান্ড গোলাকৃতি ঘরের ঠিক মাঝখানে সে শুয়ে আছে। ঘরটি অদ্ভুত। চারদিকের দেয়াল থেকে অস্পষ্ট নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়ছে, তাকালেই মন শান্ত হয়ে আসে। হালকা, প্রায় অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছে। খুব করুণ

কোনো সুর। ইরিনার মনে হল সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন খুব বাস্তব মনে হয়। স্বপ্ন দেখার সময় মনেই হয় না এটা স্বপ্ন।

'ইরিনা, তোমার ঘুম ভেঙেছে?'

ইরিনা তাকাল। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে প্রায় সাত ফুট উঁচু দৈত্যাকৃতির একটি এনারয়েড রবট। এনারয়েড রোবট ইরিনা এর আগে দেখে নি। স্কুলে যান্ত্রিক মানব অংশে এনারয়েড রবটিক্স্-এর ওপরে একটা চ্যাপ্টার ছিল। সেখানে বলা হয়েছে-- "এনারয়েড রোবট তৈরি হয় রিবো ত্রি সার্কিটে। আই সি পি পি ৩০০২৫। আই সি টেনার জংশন মুক্ত। সেই কারণেই এরা শুধু চিন্তাই করতে পারে না, উচ্চস্তরের লজিকও দেখাতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তির এরা সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে যেহেতু এরা কর্মী রোবট নয়, সেহেতু এদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ।" এইটুকু পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। রিবো ত্রি সার্কিট কি, টেনার জংশনই বা কি? কেউ জানে না। কে জানে হয়তো এককালে জানত। স্কুলের বইতে এনারয়েড রোবটের বেশ কিছু ছবি আছে। ইরিনার মনে আছে তারা এদের নাম দিয়েছিল দৈত্য রোবট। কী বিশাল শরীর, ছবি দেখলেই ভয় লাগে। কিন্তু আশ্চর্য, একে দেখে ভয় লাগছে না। এর গলার স্বর কোমল, মমতা মাখা।

'ইরিনা তোমার ঘুম ভেঙেছে?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ ভেঙেছে, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?'

রোবটটি ঠিক মানুষের মতো হাসল। চট করে হাসি থামিয়ে বলল, 'কিছু একটা নিয়ে কথা শুরু করতে হবে তো, তাই জিজ্ঞেস করছি। তুমি এখন কেমন আছ?'

'ভালো।'

'আমি কে তা তো জিজ্ঞেস করলে না।'

'তুমি একটি এনারয়েড রোবট।'

'চমৎকার। আমাকে দেখে ভয় লাগছে না তো আবার?'

'না, ভয় লাগছে না। আমি কোথায়?'

'তুমি আছ নিষিদ্ধ নগরীতে। তোমাকে কৃত্রিম উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে এখানে আনা হয়েছে।'

'ভালো কথা।'

'কি জন্যে ঘুম পাড়িয়ে এখানে আনা হল তা তো জিজ্ঞেস করলে না।'

'তোমাদের ইচ্ছা হয়েছে এনেছ।'

'তা কিন্তু নয়। তুমি এসেছ আকাশপথে। আকাশপথের বিমানগুলোর একটা সমস্যা আছে। অতিরিক্ত রকম দুলুনি হয়। চৌম্বক জ্বালানির এই একটা বড় অসুবিধা। উচ্চ কম্পনাঙ্কে প্লেন কাঁপে। মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা মুশকিল। সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।'

'ঠিক আছে। এনেছ ভালো করেছ।'

'তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। আমি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করছি।'

'আমি কিছুই খাব না।'

'তার কারণ জানতে পারি?'

'খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে রাখার ব্যাপারটা হাস্যকর। এক জন ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য প্রয়োজন। আমি খাবার নিয়ে আসছি।'

রোবটটি নিঃশব্দে চলে গেল। ইরিনা এই প্রথম বারের মতো লক্ষ করল রোবটটি গিয়েছে দেয়াল ভেদ করে। তার মানে এই অস্বচ্ছ দেয়াল কোনো কঠিন পদার্থের তৈরি নয়। বায়বীয় কোনো বস্তুর তৈরি। এ বস্তুর কথা ইরিনার জানা নেই। শুধু দেয়াল নয়, এই গোলাকার ঘরে এ রকম আরো জিনিস আছে, যা ইরিনা আগে কখনো দেখে নি বা বইপত্রে পড়ে নি। যেমন ঠিক তার মাথার ওপর বলের মতো একটা জিনিস ঘুরছে। ইরিনা বুঝতে পারছে, এই জিনিসটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে। সে যখন নড়াচড়া করে, এটিও নড়াচড়া করে। সে যখন একদৃষ্টিতে তাকায় তখন বস্তুটির ঘূর্ণন পুরোপুরি থেমে যায়। একবার ইরিনা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল, অমনি জিনিসটা অনেকখানি নিচে নেমে প্রবল বেগে ঘুরতে লাগল। নিঃশ্বাস নেয়া শুরু করতেই সেটি আবার উঠে গেল আগের জায়গায়।

'ইরিনা, তোমার জন্যে খাবার এনেছি।'

রোবটটির চলাফেরা নিঃশব্দ, কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে কে জানে। ইরিনা বলল, 'আমি তো বলেছি কিছু খাব না।'

'খাবে বৈ কি। প্রথমে কফির কাপে চুমুক দাও। সত্যিকার কফি, বীনের কফি; সিনথেটিক কফি নয়। তোমার ভালো লাগবে। লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুমুক দাও।'

ইরিনা নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে কফি নিল। তার কোনো কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবু জিজ্ঞেস করল, 'আমার মাথার ওপর যে যন্ত্রটা ঘুরছে, সেটা কি?'

'ওটা একটা 'মনিটর'। তোমার যাবতীয় শারীরিক ব্যাপার মনিটর করা হচ্ছে। রক্তচাপ, রক্তে শর্করার পরিমাণ, হৃৎপিন্ডের স্পন্দন, নিও ফ্রিকোয়েন্সি-- সবকিছুই মাপা হচ্ছে।'

কফি এমন কিছু আহামরি নয়। কেউ বলে না দিলে বোঝাই মুশকিল এটা সিনথেটিক কফি নয়। এই কফির একমাত্র বিশেষত্ব হচ্ছে, এর মধ্যে এক ধরনের আঠালো ভাব আছে, সিনথেটিক কফিতে যা নেই।

'এই কফি কি তোমার ভালো লাগছে ইরিনা?'

'না, ভালো লাগছে না। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন-- মীর, উনি কোথায়?'

'সে-ও ঠিক এরকম অন্য একটি ঘরে আছে। তাকে সঙ্গ দিচ্ছে আমার মতোই

একটি এনারোবিক রোবট।'

'এখান থেকে আমরা কোথায় যাব?'

'কোথাও যাবে না। এখানেই থাকবে।'

'তার মানে কত দিন থাকব এখানে?'

'যত দিন তোমার ডাক না পড়ে।'

'কে ডাকবে আমাকে?'

'নিষিদ্ধ নগরীর প্রধানরা। যাঁরা নিষিদ্ধ নগরী চালাচ্ছেন। যাঁরা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করছেন।'

'তাঁরা কারা?'

'তাঁরা তোমার মতোই মানুষ। এই পৃথিবীতেই তাঁদের জন্ম।'

ইরিনা বিস্মিত হয়ে বলল, 'মানুষ!'

'হ্যাঁ, মানুষ। তুমি কি ভেবেছিলে অন্যকিছু? এই পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান কোনো প্রাণের সৃষ্টি হয় নি।'

'তাহলে মানুষরাই নিষিদ্ধ নগরীর পরিচালক?'

'হ্যাঁ। তবে তাঁদের সঙ্গে তোমাদের সামান্য প্রভেদ আছে। তাঁরা অমর। তোমাদের মৃত্যু আছে, তাঁদের মৃত্যু নেই।'

'তুমি এসব কী বলছ!'

'আমি ঠিকই বলছি। মৃত্যু এইসব মানুষদের কখনো স্পর্শ করে না। করবেও না।'

'তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'বিশ্বাস করার চেষ্টা করাই ভালো। তুমি কি তোমার স্কুলের বইতে পড় নি রোবটরা মিথ্যা বলতে পারে না। তাদের সে রকম করে তৈরি করা হয় নি।'

ইরিনা কফির কাপ নামিয়ে রেখে আগ্রহের সঙ্গে খাবার খেতে শুরু করল। সবই তরল এবং জেলি জাতীয় খাবার। ঝাঁঝালো ভাব আছে, তবে খেতে চমৎকার।

রোবটটি বলল, 'খেতে ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ লাগছে।'

'তোমার শরীরের প্রয়োজন এবং রুচি— এই দু'টি জিনিসের ওপর লক্ষ রেখে খাবার তৈরি হয়েছে। তোমার খারাপ লাগবে না।'

ইরিনা বলল, 'নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু আমি যা প্রশ্ন করছি, তুমি তার জবাব দিচ্ছ।'

'জবাব দিচ্ছি, কারণ তুমি নিষিদ্ধ নগরীতেই আছ। তোমার জন্যে নিষিদ্ধ নয়। কারণ তুমি এইসব প্রশ্নের জবাব কখনো প্রথম শহরে পৌঁছে দিতে পারবে না। বাকি জীবনটা তোমার এ জায়গাতেই কাটবে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই।'

'নিষিদ্ধ নগরীর মানুষরা কত দিন ধরে বেঁচে আছেন?'

'পাঁচ শ' বছরের মতো। তাঁদের জন্ম হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞের আগে।'

'তাঁরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন?'

'হ্যাঁ থাকবেন।'

'তাঁরা আমাকে কখন ডেকে পাঠাবেন?'

'তা তো বলতে পারছি না। হয়তো আগামীকালই ডেকে পাঠাবেন। হয়তো দশ বছর পর ডাকবেন। সময় তাঁদের কাছে কোনো সমস্যা নয় বুঝতেই পারছ।'

'তাঁরা যদি দশ বছর পর ডাকেন, এই দশ বছর আমি কী করব?'

'অপেক্ষা করবে।'

'কোথায় অপেক্ষা করব?'

'এইখানে। এই ঘরে।'

'তুমি কী পাগলের মতো কথা বলছ! আমি এই জায়গায় দশ বছর অপেক্ষা করব?'

'আরো বেশিও হতে পারে। সময় তোমার কাছে একটা সমস্যা, তাঁদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। তবে ভয় পেও না, তোমার সময় কাটানর ব্যবস্থা আমি করব। খেলাধূলা, গান-বাজনা, বইপত্র--সব ব্যবস্থা থাকবে।'

ইরিনার শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। কি বলছে ও! এ তো অসম্ভব কথা। রোবটটি তার যান্ত্রিক মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, 'তোমার যখন নেহায়েত অসহ্য বোধ হবে, তখন আমরা তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। আরামের ঘুম। ছয়, সাত বা আট বছর কাটিয়ে দেবে শান্তির ঘুমে।'

ইরিনা বলল, 'এ রকম কি হয়েছে কখনো? কাউকে আনা হয়েছে প্রথম শহর থেকে, নিষিদ্ধ নগরীর কেউ তার সঙ্গে দেখা করে নি? সে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে আমার মতো এরকম ঘরে?'

'তা তো হয়েছেই। ঠিক এই মুহূর্তেই তোমার মতো আরো চার জন অপেক্ষা করছে। এই চার জনের দু' জন অপেক্ষা করছে কুড়ি বছর ধরে। এখনো দেখা হয় নি। ওদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আমার মনে হয় ঘুমুতে ঘুমুতেই ওরা একসময় মারা যাবে।'

'আর বাকি দু' জন?'

'ওরা এসেছে ছ' বছর আগে। এখন পর্যন্ত তারা ভালোই আছে। ঘুমেই আছে।'

'আমি কি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'না।'

'আমি কি মীরের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'না।'

'মীর কেমন আছে তা কি জানতে পারি?'

'না।'

ইরিনা চিৎকার করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল দেয়ালে। যে দেয়াল তার কাছে বায়বীয় মনে হচ্ছিল, দেখা গেল তা মোটেই বায়বীয় নয়। ইস্পাতের মত কঠিন। বরফের মত শীতল।

৬

মীর মহা সুখী।

বছরের পর বছর তাকে এই ঘরে কাটাতে হতে পারে এই সম্ভাবনায় সে রীতিমতো উল্লসিত। সে হাসিমুখে রোবটকে বলল, 'সময় কাটান নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হবে না?'

'না, তা হবে না।'

'পড়াশোনার জন্যে প্রচুর বইপত্র নিশ্চয়ই আছে?'

'তা আছে।'

'পড়াশোনার বিষয়ের ওপর কি কোনো বিধিনিষেধ আছে?'

'না, নেই।'

'বাতি কী করে জ্বলে, বা হিটারে পানি কী করে গরম হয় যদি জানতে চাই জানতে পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে! তুমি কি এখনি জানতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

'তাহলে তোমাকে প্রথমে জানতে হবে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে। ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে ইলেকট্রন নামের ঋণাত্মক কণার প্রবাহ।'

'ঋণাত্মক কণা ব্যাপারটা কি?'

'তোমাকে তাহলে আরো গোড়ায় যেতে হবে। জানতে হবে বস্তু কি? অণু এবং পরমাণুর মূল বিষয়টি কি?'

'বল, আমি শুনছি।'

'তুমি কি সত্যি সত্যি পদ্ধতিগত শিক্ষা গ্রহণ করতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই। পদ্ধতি-ফদ্ধতি জানি না, আমি সবকিছু শিখতে চাই। সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'তোমাকে আগ্রহ নিয়েই আমি শেখাব। তুমি কি নিষিদ্ধ নগরীর অমর মানুষদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাও না?

'না।'

'এরা কী করে অমর হলেন, মৃত্যুকে জয় করলেন--সে সম্পর্কে তোমার কৌতূহল হয় না?'

'না।'

'তোমার বান্ধবীর প্রসঙ্গেও কি তোমার কৌতূহল হচ্ছে না? ইরিনা যার নাম?'

'সে আমার বান্ধবী, তোমাকে বলল কে? বান্ধবী-ফান্ধবী নয়।'

'সে কিন্তু খুব মন খারাপ করেছে। দীর্ঘদিন এই ছোট্ট ঘরে তাকে কাটাতে হতে পারে শুনে সে প্রায় মাথা খারাপের মতো আচরণ করছে। শেষ পর্যন্ত তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হয়েছে।'

'ভালো করেছ। মেয়েটা নার্ভাস ধরনের এবং বোকা; সব জিনিস জানার এমন চমৎকার একটা সুযোগ পেয়েও কেউ এমন করে?'

রোবটটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো শব্দ করে বলল, 'মানুষ বড়ই বিচিত্র প্রাণী। এক জনের সঙ্গে অন্য জনের কোনোই মিল নেই অথচ এক মডেলের প্রতিটি রোবট এক রকম। তারা একই পদ্ধতিতে ভাবে, একই পদ্ধতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে।'

মীর রোবটের কথায় কোনো কান দিচ্ছে না। সে হাসি-হাসি মুখে পা নাচাচ্ছে। শিসের মত শব্দ করছে। এইসব তার মনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। সে হঠাৎ পা নাচান বন্ধ করে গম্ভীর মুখে বলল, 'আচ্ছা শোনো, আমাকে 'অমর' করে ফেলার কোনো রকম সম্ভাবনা কি আছে?'

'কেন বল তো?'

'তাহলে নিশ্চিন্ত মনে থাকা যেত। যা কিছু শেখার সব শিখে ফেলতাম। অমর না হলে তো সেটা সম্ভব হবে না। কতদিনই বা আমি আর বাঁচব বল?'

'তুমি বেশ অদ্ভুত মানুষ!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'মানুষের চরিত্র, আচার-আচরণ সম্পর্কে যে তথ্য আমাদের মেমোরি সেলে আছে তার কোনোটিতেই তোমাকে ফেলা যাচ্ছে না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। বরং তোমার মিল আছে Q 23 মডেলের রোবটদের সঙ্গে।'

'ওরা কি করে?'

'Q23 হচ্ছে পরীক্ষামূলক জ্ঞান-সংগ্রহী রোবট। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান সংগ্রহ করা। প্রাণীবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, সমুদ্রবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা--সব।'

'আমি তাহলে একজন Q 23 রোবট?'

'খানিকটা সে রকমই।'

'আমি এক জন Q23 রোবটের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সেই ব্যবস্থা কি করা যাবে?'

'নিশ্চয়ই করা যাবে।'

'তাহলে ব্যবস্থা কর। আমি যা শেখার তার কাছেই শিখতে চাই। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হচ্ছে--তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি তেমন নেই। তুমি এক জন গবেট ধরনের রোবট।'

রোবটটির মারকারি চোখ একটু বুঝি স্তিমিত হল। গলার স্বর ক্লান্ত শোনাল। সে থেমে থেমে বলল, 'আমি কি বোকার মতো কোনো আচরণ করেছি?'

'না, এখনো কর নি, তবে মনে হচ্ছে করবে। দেরি করছ কেন, যাও একটি Q 23 নিয়ে এস।'

'এক্ষুণি আনতে হবে?'

'হ্যাঁ এক্ষুণি। আমি তো আর অমর নই। আমার সময় সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যেই যা পারি জানতে চাই। দাঁড়িয়ে বকবক করার চেয়ে Q23 নিয়ে এস।'

রোবটটির আকৃতি ছোট। লম্বায় তিন ফুটের মতো। গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। মানুষের কাঠামোর সঙ্গে তাঁর কাঠামোর কোনো মিল নেই। দেখায় ছোটখাটো একটা লম্বাটে বাক্সের মতো। অন্যান্য রোবটদের যেমন আশেপাশের দৃশ্য দেখার জন্যে মারকারি চোখ কিংবা লেজার চোখ থাকে, এর তা-ও নেই। মীর বলল, 'তুমি কেমন আছ?'

Q23 উত্তর দিল না। মনে হচ্ছে সে এ জাতীয় সামাজিক প্রশ্ন বিশেষ পছন্দ করছে না।

'তুমি কি আমাকে এক জন ছাত্র হিসেবে নেবে?'

'আমি নিজেই ছাত্র, এখনো শিখছি।'

'খুব ভালো কথা, আমাকেও কি তার ফাঁকে ফাঁকে কিছু শেখাবে?'

'নিশ্চয়ই। তুমি যদি চাও শেখাব। কেন শেখাব না। তুমি কী জানতে চাও?'

'আমি সব জানতে চাই। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে চাই। অ আ থেকে।'

'দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার।'

'তা তো বটেই। আমি তো আর অমর না। মরণশীল মানুষ। সময় তেমন নেই, তবু এর মধ্যেই যা পারা যায়। ভালো কথা, 'অমর' ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দাও তো।'

'তোমার প্রশ্ন বুঝতে পারছি না।'

'মানুষ 'অমর' হয় কীভাবে? নিষিদ্ধ নগরীতে কিছু অমর মানুষ থাকেন বলে

শুনেছি, তাঁরা অমর হলেন কী ভাবে? অবশ্যি তোমার যদি বলতে বাধা থাকে, তাহলে বলার দরকার নেই।'

'কোনোই বাধা নেই। অনেক দিন থেকেই মানুষ অমর হবার চেষ্টা করছিল। শারীরিকভাবে অমর--মৃত্যুকে জয় করা। শুরুতে এটাকে একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার মনে করা হত। জীবনের একটি লক্ষণ হিসেবে মৃত্যুকে ধরা হত। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জরাকে জয় করার গবেষণা জোরেসোরে শুরু হল। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানীরা জরার কারণ বের করলেন। তাঁরা মানুষের শরীরে একটি বিশেষ বয়সে এক ধরনের হরমোন আবিষ্কার করলেন। এটা একটা ভয়াবহ হরমোন। যেই মুহূর্তে এটি রক্তে এসে মেশে, সেই মুহূর্ত থেকে মানুষ এগিয়ে যেতে থাকে মৃত্যুর দিকে। যতগুলো জীবকোষ শরীরে স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুবরণ করে, ঠিক ততগুলো জীবকোষ আর তৈরি হয় না। শরীর অশক্ত হয়। শরীরের যন্ত্রগুলো দুর্বল হতে থাকে। কালক্রমে মৃত্যু। বিজ্ঞানীরা সেই ঘাতক হরমোনের নাম দিলেন 'মৃত্যু হরমোন'।

মৃত্যু হরমোন আবিষ্কারের পর বাকি কাজ খুব সহজ হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা মৃত্যু হরমোনকে অকেজো করার ব্যবস্থা করলেন। আজ থেকে প্রায় পাঁচ শ' বছর আগে পৃথিবীতে অসাধারণ একটা ঘটনা ঘটল--চল্লিশ জন অল্পবয়স্ক বিজ্ঞানী মৃত্যু হরমোন অকেজো করে এমন একটি রাসায়নিক বস্তু নিজেদের শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন! তাঁরাই এ পৃথিবীতে প্রথম এবং শেষ অমর মানুষ। নিষিদ্ধ নগরীতে তাঁরাই থাকেন।'

মীর বলল, 'শুধু ঐ চল্লিশ জন অমর হল কেন? পৃথিবীর সবাই অমর হয়ে গেল না কেন? অমর হবার ওষুধ তো তারাও খেতে পারত।'

'না, তা পারত না। তাতে নানান রকম অসুবিধা হত, নানান সমস্যা দেখা দিত।'

'কি সমস্যা?'

'আমি তা জানি না। সমাজবিজ্ঞানীরা জানবেন। আমি ভৌত জ্ঞান সংগ্রহ করি। সমাজবিদ্যা সম্পর্কে কিছু জানি না।'

'এমন কোনো রোবট কি আছে, যে সমাজবিদ্যা জানে?'

'না নেই। নিষিদ্ধ নগরীর বিজ্ঞানীরা সমাজবিদ্যায় উৎসাহী নন। তুমি এখন কী জানতে চাও?'

'বিজ্ঞান ভালোমতো শিখতে হলে প্রথমে কোন জিনিসটি জানতে হবে?'

'প্রথম জানতে হবে অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্ক হচ্ছে বিজ্ঞানকে বোঝবার একটি বিদ্যা।'

'তাহলে অঙ্কই শুরু করা যাক। তুমি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করবে।'

'বেশ, মৌলিক সংখ্যা দিয়ে শুরু করা যাক। কিছু কিছু সংখ্যা আছে যাদের শুধুমাত্র সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেয়া যায় না। এদের বলে মৌলিক সংখ্যা; যেমন-১, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩--"

মীর মুগ্ধ হয়ে শুনছে।

আনন্দ ও উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তার চেয়ে সুখী মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

৭

তিনি বসে আছেন একটি দাবা সেটের সামনে।

দাবা সেটটি অন্যগুলোর মতো নয়। এখানে স্কয়ারের সংখ্যা একাশিটি। তিনটি নতুন 'পিস' যুক্ত করা হয়েছে। এই পিসগুলোর কর্মপদ্ধতি কী হলে খেলাটাকে যথেষ্ট জটিল করা যায়, তা-ই তিনি ভাবছিলেন। মাঝে মাঝে কথা বলছেন সিডিসির সঙ্গে। সিডিসি হচ্ছে নিষিদ্ধ নগরীর মূল কম্পিউটার। সিডিসির শব্দ তৈরির অংশটি অসাধারণ। সে যখন যেমন স্বর প্রয়োজন, তখন সে রকম স্বর বের করে। তিনি যখন ঘুমুতে যান, তখন সিডিসি কিশোরী কণ্ঠে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। এখন কথা বলছে বৃদ্ধের গলায়। ভারি, ভাঙা ভাঙা-- খানিকটা যেন শ্লেষ্মাজড়িত। তিনি দাবার বোর্ড থেকে চোখ না সরিয়েই ডাকলেন, 'সিডিসি।'

'বলুন।'

'খেলাটা তো কিছুতেই কায়দা করা যাচ্ছে না।'

'আমার কাছে ছেড়ে দিন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'তাতে আমার লাভটা কি হল? আমি চাচ্ছি নিজে একটা খেলা বের করতে।'

'আপনি যা চাচ্ছেন তা তো হচ্ছে না। এই খেলা বহু প্রাচীন, আপনি শুধু তার ভেতর নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করছেন।'

'সেটাই কম কি?'

'সেটা তেমন কিছু নয়। আপনার আগেও অনেকে চেষ্টা করেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনি চাইলে কারা কারা পরিবর্তন করেছেন, কী ধরনের পরিবর্তন, তা বলতে পারি।'

'আমি কিছুই জানতে চাই না।'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাতের এক ঝটকায় দাবার বোর্ড উল্টে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিশাল এক আয়না। সেই আয়নায় তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখছেন। তাঁর চোখে মুগ্ধ বিস্ময়।

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো?'

'ভালো দেখাচ্ছে।'

'শুধু ভালো? এর বেশি কিছু নয়?'

'আপনি আমার কাছ থেকে কী ধরনের কথা শুনতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না।'

'আমি যা শুনতে চাই তা-ই তুমি বলবে?'

'যদি সম্ভব হয় বলব। আপনি তো জানেন, আমি মিথ্যা বলতে পারি না।'

'আমার বয়স কত?'

'আপনার বয়স পাঁচ শ' এগার বছর তিন মাস দু'দিন ছ' ঘন্টা বত্রিশ মিনিট।'

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। মুখ কুঁচকে বললেন, 'আমাকে দেখে কী মনে হয় তাই জানতে চাচ্ছি। আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার বয়স পাঁচ শ' ?

'না, তা মনে হয় না। ত্রিশের মতো মনে হয়, তবে--'

'আবার তবে কি?'

'আপনার মধ্যে বিশেষ এক ধরনের অস্থিরতা দেখছি, যা সাধারণ এক জন ত্রিশ বছরের যুবকের থাকে না।'

'তুমি নিতান্তই মূর্খের মতো কথা বলছ।'

'হতে পারে।'

'তুমি আমার সঙ্গে এ রকম বুড়োদের মতো গলায় কথা বলছ কেন? তুমি কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে চাও যে আমি এক জন বুড়ো?'

'তা নয়।'

'তা নয় মানে? অবশ্যই তোমার মনে এই জিনিস আছে।'

'আপনি আজ বিশেষ উত্তেজিত, তাই এরকম ভাবছেন।'

'এবং তুমি কথাও বেশি বল। অপ্রয়োজনে এখন থেকে একটি কথাও বলবে না।'

'ঠিক আছে, বলব না।'

'আমি নিজ থেকে কোনো প্রশ্ন করলে তবেই উত্তর দেবে। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

তিনি আয়নার সামনে থেকে সরে এলেন। তাঁর ইচ্ছা করছে লাথি দিয়ে আয়নাটা ভেঙে ফেলতে। বহু কষ্টে তিনি নিজেকে সামলালেন। তাও পুরোপুরি সামলাতে পারছেন না। থরথর করে তাঁর শরীর কাঁপছে।

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'কী করা যায় বল তো?

'কোন প্রসঙ্গে বলছেন?'

'কী প্রসঙ্গে বলছি বুঝতে পারছ না? মূর্খ।'

'আপনি অতিরিক্ত রকম উত্তেজিত। আপনি চাইলে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।'

'এইমাত্রই তো জাগলাম।'

'আপনি অনেকক্ষণ আগেই জেগেছেন।'

'তাই নাকি?'

'প্রায় দশ ঘন্টা ধরে দাবা নিয়ে চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় এখন কিছু খাদ্য গ্রহণ করে ঘুমুতে যাওয়া উচিত।'

'ঘুম পাচ্ছে না।'

'আপনি শুয়ে থাকুন, আমি নিও ফ্রিকোয়েন্সি বদলে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে মধুর কোনো সংগীতের ব্যবস্থাও করছি।'

'মধুর সংগীত বলেও কিছু নেই।'

তিনি লক্ষ করলেন তাঁর উত্তেজনা কমে আসছে। হয়তো ইতিমধ্যেই সিডিসি নিও ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে শুরু করেছে। দূরাগত বিষাদময় সংগীতও তিনি শুনতে পাচ্ছেন। এই সংগীত বিষাদময় হলেও কোনো এক অদ্ভুত কারণে মন শান্ত করে। গানের কথাগুলো অস্পষ্টভাবে কানে আসছে।

> হে প্রিয়তম!
> তুমি কি দূর থেকেই আমাকে দেখবে?
> আজ বাইরে কী অপূর্ব জোছনা।
> সেই আলোয় তুমি এবং আমি কখনো কি
> নিজেদের দেখব না?

তিনি ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'সিডিসি।'

'শুনছি।'

'জীবন খুব একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে সিডিসি।'

'দীর্ঘ জীবন কিছুটা ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। মধুর সংগীত, মহান শিল্পকর্মও একসময় অর্থহীন মনে হয়।'

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সিডিসি বলল, 'আপনার জীবনে কিছুটা উত্তেজনা আনার ব্যবস্থা করেছি।'

'কী রকম?'

'প্রথম শহরের দু' জন নাগরিককে নিয়ে আসা হয়েছে। ওদের সঙ্গে কথা বললে কিছুটা বৈচিত্র্য আপনি পেতে পারেন।'

'আমার বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন আছে। সম্পূর্ণ দু'ধরনের দু' জন মানুষকে আনা হয়েছে। ওদের কান্ডকারখানা দেখতে আপনার ভালো লাগবে।'

'তোমার কথা শুনেই আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে। ওদের এই মুহূর্তে ফেরত পাঠাও।'

'নিষিদ্ধ নগরী থেকে কাউকে ফেরত পাঠাবার নিয়ম নেই।'

'তাহলে মেরে ফেল।'

'মেরে ফেলব?'

'হ্যাঁ, মেরে ফেলবে। এবং মৃত্যুর সময় ওদের ফিল্ম করে রাখবে। পরে একসময় দেখব। আমার মনে হয় দেখতে ভালো লাগবে।'

'ঠিক আছে। মৃত্যুর আগে ওদের একবার দেখতে চান না?'

'না, মেরে ফেল। ওদের মেরে ফেল।'

'ঠিক আছে।'

'কষ্ট দিয়ে মারবে। খুব কষ্ট দিয়ে মারবে।'

'তাই করব।'

'আমি এখন ঘুমুব। ঘুম পাচ্ছে।'

তিনি মেঝেতেই এলিয়ে পড়লেন। অপূর্ব সংগীত হতে থাকল,

হে প্রিয়তম,
আজ এই বসন্তের দিনে আকাশ এমন মেঘলা কেন?
আকাশ কি আমার মনের কষ্ট বুঝে ফেলল?
তা কেমন করে হয়?
আমার যে কষ্ট তা তো আমি নিজেই জানি না।
আকাশ কি করে জানবে?

তিনি গাঢ় ঘুমে তলিয়ে পড়লেন। ঘরের আলো কমে এল। সংগীত অস্পষ্ট হয়ে আসছে। তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মধুর স্বপ্ন দেখছেন। সেই স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই, তবু মনে হচ্ছে অর্থ আছে।

তাঁর ঘুম ভাঙল।

ঘর অন্ধকার। তাঁর চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর আলো হতে শুরু করল। তিনি বুঝতে পারলেন যতক্ষণ তাঁর ঘুমানর কথা, তিনি তার চেয়েও বেশি সময় ঘুমিয়েছেন। হয়তো অনেক বেশি সময়। কারণ তাঁর পাশে একটি চিকিৎসক রোবট। রোবটটি আন্তরিক স্বরে বলল, 'কেমন আছেন?'

তিনি বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে ফেললেন। চিকিৎসক রোবট জিজ্ঞেস করছে, 'কেমন আছেন।' এই প্রশ্নের জবাব তারই দেয়া উচিত। তা দিচ্ছে না, জিজ্ঞেস করছে--কেমন আছেন। ব্যাটা ফাজিল।

'আজ আপনি দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন।'

'ঘুমিয়েছি, ভালো করেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করে জাগতে হবে?'

'মোটেই নয়। আপনার যতক্ষণ প্রয়োজন আপনি ঘুমুবেন। তবে--'

'তবে কি?'

'আপনার রক্তে LC 2 হরমোনের পরিমাণ একটু বেশি, এই জন্যে—'

'বকবক করবে না, চুপ করে থাক।'

'বেশ চুপ করেই থাকব। আপনি নিজে কেমন বোধ করছেন এইটুকু শুধু বলুন। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'যা ব্যাটা ভাগ।'

'আপনি কি বললেন?'

'আমি বললাম এই মুহূর্তে এখান থেকে বিদেয় হতে।'

'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

'আমি আরো উত্তেজিত হব এবং তুমি যদি এই মুহূর্তে এখান থেকে বিদায় না হও তাহলে কাঠি দিয়ে খুচিয়ে তোমার মারকারি চোখের বারটা বাজিয়ে দেব।'

রোবটটি পায়ে পায়ে সরে গেল। তাঁর খিদে পাচ্ছে। আগে খিদে পেলে খাবার চলে আসত। তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন, এখন আর আসে না। আজ এলে ভালো হত। খাবারের কথা কাউকে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

'সিডিসি!'

'আমি আছি।'

'তা তো থাকবেই। তুমি আবার যাবে কোথায়? আমি যেমন অমর, তুমিও তেমনি। অজর অমর অক্ষয়। হা হা হা।'

'আপনাকে কি খাবার দিতে বলব? আমার মনে হচ্ছে আপনি ক্ষুধার্ত।'

'তোমার আর কি মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে আপনি বেশ উত্তেজিত। রক্তে LC 2 হরমোনের পরিমাণটা কমানর চেষ্টা করা উচিত।'

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'তোমাকে কি-একটা কথা যেন বলব ভাবছিলাম, এখন মনে পড়ছে না।'

'আমি কি মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করব?'

'বেশ কর।'

'আমার মনে হয় প্রথম শহর থেকে আসা মানুষ দু' জন সম্পর্কে কিছু বলতে চান।'

'ও হ্যাঁ। ঠিক ঠিক ঠিক।'

'কি বলতে চাচ্ছেন বলুন।'

'ওদের মেরে ফেলার দরকার নেই।'

'ওরা বেঁচেই আছে। মারা হয় নি।'

'আমি লক্ষ করেছি আমি তোমাকে যে হুকুম দিই, তা তুমি সঙ্গে সঙ্গে পালন কর না। এর কারণ কি?'

'কারণ আপনি হুকুম খুব ঘনঘন বদলান। ওদের মারবার কথা যখন বললেন, তখনি আমার মনে হয়েছিল, এই আদেশ আপনি পাল্টে দেবেন।'

'আমার খাবার ব্যবস্থা কর।'

খাবার চলে এল। প্রচুর আয়োজন, সবই তরল। চুমুক দিয়ে খাবার ব্যাপার। তিনি মুখ বিকৃত করে এলোমেলোভাবে দু'-একটা গ্লাসে চুমুক দিলেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কোনোটাই তার মনে লাগছে না। নিতান্তই অভ্যাসের বসে চুমুক দিচ্ছেন। যেন এক্ষুণি বমি করে সব বের করে দেবেন।

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'চিকিৎসক ব্যাটাকে তুমি পাঠিয়েছিলে?

'হ্যাঁ।'

'কেন জানতে পারি?'

'আপনার ঘুম ভাঙছিল না। আমি চিন্তিত বোধ করছিলাম।'

'এখন চিন্তা দূর হয়েছে?'

'পুরোপুরি দূর হয় নি। আপনার একটা কাউন্সিল মীটিং আছে। সেই মীটিং-এ সুস্থ শরীরে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।'

'কাউন্সিল মীটিংটা কখন শুরু হবে?'

'এক ঘন্টার মধ্যেই শুরু হবে?'

'ক'জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন?'

'আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত আট জন উপস্থিত থাকবেন।'

'আমরা আছি ন' জন, আট জন উপস্থিত থাকবে--এর মানে কি? নবম ব্যক্তিটি কে?'

'আপনিই নবম ব্যক্তি। আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল মীটিং-এ আপনি থাকবেন না।'

'তোমার এই রকম মনে হচ্ছে?'

'জ্বি।'

তিনি বেশ কিছু সময় চুপ করে রইলেন। কড়া লাল রঙের একটা পানীয় এক চুমুকে শেষ করলেন। কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। সেখানেও বেশিক্ষণ বসতে পারলেন না, উঠে এলেন আয়নার সামনে। নিজের প্রতিবিম্ব দেখলেন গভীর বিস্ময়ে। যেন নিজেকেই নিজে চিনতে পারছেন না।

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?'

'খুব চমৎকার লাগছে আপনাকে। রাজপুত্রের মতো।'

'রাজপুত্র দেখেছ কখনো?'

'জ্বি না দেখি নি, তবে জানি যে প্রাচীন পৃথিবীতে একদল মানুষ ছিলেন, যাঁরা রাজ্য শাসন করতেন। যেহেতু তারা দেশের সেরা সুন্দরীদের বিয়ে করতেন, তাদের ছেলেমেয়েরা হতো রূপবান।'

'অনেক কুৎসিত রাজপুত্রও নিশ্চয়ই ছিল?'

'হ্যাঁ, তা ছিল।'

'আমি কুৎসিত রাজপুত্রদের একটা তালিকা চাই এবং সম্ভব হলে তাদের ছবি দেখতে চাই।'

'এক্ষুণি চান?'

'হ্যাঁ আমি এক্ষুণি চাই। তার আগে আমার আরেকটি প্রশ্নের জবাব দাও।'

'প্রশ্ন করুন।'

'আমরা সব মিলে ছিলাম চল্লিশ জন। চল্লিশ জন অমর মানুষ। আজ ন' জন টিকে আছি, এর মানে কি?'

'বেঁচে থাকাটা একসময় আপনাদের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। জীবনধারণ অর্থহীন মনে হয়। তখন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে নষ্ট করে দেন।'

'বোকার মতো কথা বলবে না। তুমি যা বললে তা আমি জানি। যে জিনিস আমি জানি, তা অন্যের কাছ থেকে জানতে চাইব কেন?'

'অনেক সময় জানা জিনিসও অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালো লাগে।'

'ঠিক ঠিক ঠিক। চল্লিশ জনের মধ্যে ন' জন আছি। এই সংখ্যা আরো কমবে, তাই না?'

'হ্যাঁ কমবে।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা আসলে অমর নই।'

'শারীরিক দিক দিয়ে অমর, তবে মানসিক মৃত্যু ঘটে যায়। তখন শরীরও যায়।'

'আমার বেলায় এই ব্যাপারটা কবে ঘটবে বলতে পার?'

'ঠিক কবে ঘটবে তা বলতে পারি না। আমি সম্ভাবনার কথা বলতে পারি। ছ' মাসের মধ্যে ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে সাতষট্টি দশমিক দুই তিন ভাগ।'

তিনি স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। পোঁ পোঁ শব্দ হচ্ছে। ঘরে লাল আলো জ্বলছে ও নিভছে। কাউন্সিল মীটিং শুরু হবার সংকেত। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কাটা কাটা গলায় বললেন, 'সিডিসি, আমি কাউন্সিল মীটিং-এ যাচ্ছি।'

'খুবই আনন্দের কথা।'

'কাজেই বুঝতে পারছ, আমার প্রসঙ্গে তুমি যা বলছ তা ঠিক নয়। তুমি বলেছিলে আমি কাউন্সিল মীটিং-এ যাব না। দেখ এখন যাচ্ছি।'

'আপনি যাবেন না এ কথা আমি কখনো বলি নি। আমি বলেছি সম্ভাবনার কথা। শতকরা এক ভাগ সম্ভাবনা থাকলেও কিন্তু থেকেই যায়।'

'তুমি মহামূর্খ।'

'হতে পারে। সেই সম্ভাবনাও আছে।'

৮

অধিবেশন শুরু হয়েছে।

হলঘরের মতো একটি গোলাকার কক্ষ। চক্রাকারে চল্লিশটি গদিআঁটা চেয়ার সাজান। একটা সময় ছিল যখন চল্লিশ জন বৃত্তের মতো বসতেন। আজ এসেছেন ন' জন। এঁদের সবার একসময় একটা করে নাম ছিল। এখন এঁদের কোনো নাম নেই। কারণ দীর্ঘ জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে তাঁরা নাম বদল করতেন। কুড়ি-পঁচিশ বছর পর পর দেখা গেল সবাই নাম বদল করছেন। কাউন্সিল অধিবেশনগুলোতে তাই নামের প্রচলন উঠে গেছে। এখন সংখ্যা দিয়ে এঁদের পরিচয়।

অধিবেশনের শুরুতেই অনুষ্ঠান পরিচালনার সভাপতি নির্বাচিত করা হল। সভাপতি হলেন তৃতীয় মানব, একসময় যার নাম ছিল রুহট। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। শপথ, বাক্য উচ্চারণ করলেন--

> 'মানব সম্প্রদায়কে রক্ষা করা আমাদের প্রথম
> কর্তব্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সঠিক পথে পরিচালনা
> করা আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য।'

শপথ-বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আট জনের সবাই ডান হাত তুললেন। এর মানে হচ্ছে শপথ-বাক্যের প্রতি এঁরা আনুগত্য প্রকাশ করছেন। সভাপতি বললেন, 'এবার আমি মূল কম্পিউটার সিডিসিকে অনুরোধ করব তাঁর প্রতিবেদনটি পেশ করবার জন্যে।'

সিডিসির গলা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল।

'আমি সিডিসি বলছি। অমর মানবগোষ্ঠীর সবাইকে অভিবাদন জানাচ্ছি। সমগ্র বিশ্বের মোট মানবসংখ্যা হচ্ছে ন' কোটি একত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয় শত ছয় জন। এদের মাঝ থেকে দু' জনকে আলাদা ধরতে হবে। কারণ এই দু' জন আছে নিষিদ্ধ নগরে।

'প্রথম শহরে আছে আট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। দ্বিতীয় শহরে পঞ্চাশ লক্ষ।

বাকিরা তৃতীয় শহরে। বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন যে-স্তরে আছে তাতে প্রথম শহরে আরো পাঁচ লক্ষ মানুষ বাড়ান যেতে পারে। আমি সুপারিশ করছি আরো পাঁচ লক্ষ বাড়ান হোক।'

সিডিসি থামতেই প্রস্তাবটি ভোটে পাঠান হল। কোনো রকম সিদ্ধান্ত হল না। তিন জন মানুষ বাড়াবার পক্ষে মত দিলেন। দু' জন বিপক্ষে মত দিলেন। বাকিদের কেউ ভোট দিলেন না। সিডিসি আবার তার রিপোর্ট শুরু করল,

'বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিকিরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। আমি এ বিষয়ে এর আগেও সর্বমোট চল্লিশটি অধিবেশনে বলেছি এবং প্রস্তাব করেছি যে-সব স্থানে বিকিরণের পরিমাণ 'দুই আর'-এর কম, সে-সব স্থানে মানব-বসতি স্থাপন করা যেতে পারে।'

প্রস্তাবটি ভোটে পাঠানো হল। সবাই এর বিপক্ষে ভোট দিলেন। সিডিসি আবার শুরু করল,

'আমাদের বেশ কিছু জটিল যন্ত্রপাতি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বে অনেক বার করা হয়েছে। আমি আবারো করছি। আমি–'

সভাপতি হাত দিয়ে ইশারা করতেই সিডিসি থেমে গেল। সভাপতি বললেন, 'সিডিসির রিপোর্টগুলো খুবই ক্লান্তিকর হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমি একটা ভোট দিতে চাই। আপনাদের মধ্যে যারা মনে করছেন সিডিসির রিপোর্ট ক্লান্তিকর, তারা হাত তুলুন।' সবাই হাত তুললেন, এক জন তুললেন না। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সভাপতি বললেন, 'সিডিসি, তোমার রিপোর্টে উপদেশের অংশ সব সময় বেশি থাকে।'

'আমাকে এভাবেই তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ সমস্যার প্রতি আপনাদের সতর্ক করে দেয়া আমার দায়িত্ব।'

'আমরা তেমন কোনো সমস্যা দেখছি না। যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে,হবে। পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়। পৃথিবীর একমাত্র স্থায়ী জিনিস হচ্ছে আনন্দ।'

'জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন কোনো আবিষ্কার হচ্ছে না।'

'তার কোনো প্রয়োজনও আমরা দেখছি না। পৃথিবী একসময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে ছিল। তার ফল আমরা দেখেছি। ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের কথা তোমার অজানা থাকার কথা নয়।'

'আমি মনে করি সব সময় একদল মানুষ তৈরি করা উচিত, যাঁরা জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা করবেন।'

'মূর্খের মতো কথা বলবে না। আমাদের দ্বিতীয় শপথ-বাক্যটিই হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সঠিক পথে চালান। এটা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেয়ার বিষয় নয়। আমি এই প্রসঙ্গ ভোটে দিতে চাই। যাঁরা আমার সঙ্গে একমত, তাঁরা হাত

তুলুন।'

দু' জন হাত তুললেন না, তাঁরা গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। সিডিসি বলল, 'আমার রিপোর্ট এখনো শেষ হয় নি। আপনার অনুমতি পেলে শেষ করতে পারি।' সভাপতি বললেন, 'তোমার বকবকানি শোনার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না।'

'আমি কি তাহলে ধরে নেব আমার রিপোর্ট শেষ হয়েছে?'

'তোমার যা ইচ্ছা তুমি ধরে নিতে পার।'

'বেশ ভাই।'

'আমি যে সব প্রশ্ন করব, শুধু তার উত্তর দেবে। উত্তরগুলো হবে সংক্ষিপ্ত। সম্ভব হলে শুধু মাত্র 'হ্যাঁ' এবং 'না'র মধ্যে সীমাবদ্ধ। তোমার নিজস্ব মতামত জাহির করবে না। তোমার মূল্যবান মতামতের কোনো প্রয়োজন দেখছি না। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'প্রথম প্রশ্ন : তৃতীয় শহরের মানুষরা কি সবাই সুখী?'

'হ্যাঁ সুখী। মহা সুখী। শারীরিকভাবে সুখী, মানসিকভাবে সুখী। তাদের খাবারের সঙ্গে 'মিওনিন' মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে, যা তাদের সুখী হবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা যা দেখছে তাতেই সুখী হচ্ছে। তারা যদি চোখের সামনে একটা হত্যাদৃশ্যও দেখে, তাতেও তারা সুখ পাবে।'

'বাঁকাপথে প্রশ্নের উত্তর দিও না। তুমি কি বলতে চাও, তাদের সুখের যথেষ্ট উপকরণ নেই, তবু তারা সুখী?'

'না, তা বলতে চাই না। সুখের উপকরণের কোনো অভাব নেই।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন : প্রথম শহরের মানুষরা কেমন আছে?'

'তাদের আপনারা যেভাবে রাখতে চেয়েছেন, সেভাবেই আছে। সব সময় একটা চাপা আতঙ্কের মধ্যে আছে। তাদের জীবনের একটিই স্বপ্ন, কখন দ্বিতীয় শহরে যাবে। দ্বিতীয় শহরের কল্পনাই তাদের একমাত্র কল্পনা। একদিন দ্বিতীয় শহরে যাবে, সেই আনন্দেই তারা প্রথম শহরের যন্ত্রণা সহ্য করে নিচ্ছে।'

'তৃতীয় প্রশ্ন : প্রথম শহরে আইনভঙ্গকারী নাগরিকের সংখ্যা কত?'

'শতকরা দশমিক দুই তিন ছয় ভাগ।'

'আগের চেয়ে বেড়েছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কিছুটা বেড়েছে। আপনি কি সঠিক পরিসংখ্যান চান?'

'না, সঠিক পরিসংখ্যানের দরকার নেই। এই বৃদ্ধি কি আশঙ্কাজনক?'

'না, আশঙ্কাজনক নয়। আমার ধারণা এটা সাময়িক ব্যাপার। আমি দুঃখিত যে নিজের মতামত প্রকাশ করে ফেললাম।'

'চতুর্থ প্রশ্ন : আইনভঙ্গকারীদের সম্পর্কে বল। এরা কোন ধরনের আইন ভঙ্গ করছে?'

'বেশির ভাগই কৌতূহল সম্পর্কিত আইন ভঙ্গ করছে। কৌতূহলসংক্রান্ত আইন। অধিকাংশই যন্ত্রপাতি সম্পর্কে কৌতূহল দেখাচ্ছে। নিষিদ্ধ নগর প্রসঙ্গে কৌতূহল প্রকাশ করছে।'

'দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহের কোনো আভাস কি আছে?'

'না নেই। তবে গত সতেরই জুন চার জন তরুণ একটি কর্মী রোবটের ওপর হামলা চালিয়েছে। রোবটটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

'এর পরেও তুমি বলতে চাচ্ছ, সংঘবদ্ধ কোনো বিদ্রোহের আভাস নেই!'

'হ্যাঁ, বলছি। ওটা ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কোনো রকম পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। খুব ভালোমতো অনুসন্ধান করা হয়েছে।'

'ঐ চারটি তরুণের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?'

'ওদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হয়েছে। মৃত্যুদন্ড।'

'ভালো। তোমার কাজ শেষ হয়েছে। তুমি যেতে পার।'

সিডিসি গম্ভীর গলায় বলল, 'একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করতে চাচ্ছি।'

'আজ আর সময় নেই।'

'ব্যাপারটি খুবই জরুরী। ফেলে রাখবার বিষয় নয়। ফেলে রাখলে বড়ো রকমের ভুল করা হবে বলে আমার ধারণা।'

'তোমার সব ধারণা সত্যি নয়। আজকের সভা সমাপ্ত।'

সদস্যদের এক জন বলছেন, 'ও কী বলছে শোনা যাক। আমার ধারণা মজার কিছু হবে। মাঝে মাঝে এ বেশ মজা করে।'

সভাপতি খুব বিরক্ত হলেন, তবে সিডিসিকে কথা বলার অনুমতি দিলেন।

'আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অরচ লীওনের দিকে। যিনি গুপ্তচর বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে পালন করছেন। যাঁর কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা প্রশ্নাতীত।'

সভাপতি বিরক্ত মুখে বললেন, 'যা বলার সংক্ষেপে বল। এত ফেনাচ্ছ কেন?'

'সংক্ষেপেই বলছি। অরচ লীওনের বর্তমান কার্যকলাপ যথেষ্ট সন্দেহজনক। আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে।'

জনৈক সদস্য বললেন, 'যে কোনো ব্যাপারই তোমার মনে সন্দেহ জাগায়, কারণ তুমি একটি মহামূর্খ।' সবাই হেসে উঠল। সবচে উচ্চস্বরে হাসলেন সভাপতি। হাসির শব্দ থামতেই সিডিসি বলল, 'অল্প সময়ের জন্য হলেও আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছি, এতেই নিজেকে ধন্য মনে করছি। যাই হোক, আমি আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। অরচ লীওন নিষিদ্ধ নগরী সম্পর্কে বিশেষভাবে কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন। শুধু যে নিষিদ্ধ নগরী তাই নয়, অমর মানুষদের সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহলের সীমা নেই। তিনি মূল লাইব্রেরির পরিচালক কম্পিউটার M42-র

কাছে খোঁজ নিয়েছেন নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে কোনো বইপত্র বা দলিলের মাইক্রো-ফিল্ম আছে কি না। যে কল কার্ড তিনি ব্যবহার করেছেন, তার নাম্বার AL42/320/21/00cp.'

সদস্যরা সবাই সোজা হয়ে বসলেন। যে দু' জন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের জাগান হল। সভাপতির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। সিডিসি যান্ত্রিক এবং কিছু পরিমাণ ধাতব গলায় কথা বলছে। নিজের বক্তব্যের গুরুত্ব বাড়ানর জন্যেই এটা সে করছে। তার প্রয়োজন ছিল না। সদস্যরা গভীর মনোযোগের সঙ্গেই সিডিসির কথা শুনছেন।

'শুধু তাই নয়, অরচ লীওন বেশ কিছু প্রথম শ্রেণীর অপরাধে অপরাধীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এমন কি এদের সম্পর্কে কোনো রকম রিপোর্ট পর্যন্ত তৈরি করেন নি।'

সভাপতি মৃদুস্বরে বললেন, 'অবিশ্বাস্য!'

মৃদুস্বরে বলা হলেও সবাই তা শুনল। মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল। সিডিসি বলতে লাগল, 'ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়। তিনি একটি পরিকল্পনাও করলেন নিষিদ্ধ নগরীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য। আপনারা সবাই জানেন, নিষিদ্ধ নগরীতে দু' জন প্রথম শহরের নাগরিককে আনা হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। মাঝে মাঝে করা হয়। যাই হোক, এই দু' জন নাগরিকের এক জনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছেন নিষিদ্ধ নগরীর সংবাদ তাঁকে পাঠানর জন্যে। আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে।'

বেশ কিছুক্ষণ সবাই নীরব রইলেন। তারপর নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন। আবার খানিক নীরবতা। নীরবতা ভঙ্গ করলেন সভাপতি। তিনি বললেন, 'এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, অরচ লীওনকে এখানে ডেকে পাঠান হবে। এঁর উদ্দেশ্য কী তা আমরা জানতে চাই। তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা না বলেও অবশ্যি তা জানা সম্ভব। তবু আমাদের কয়েক জন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলার মত প্রকাশ করেছেন। অরচ লীওনকে এখানে আনার ব্যবস্থা করা হোক।'

সিডিসি বলল, 'আপনাদের অনুমতি ছাড়াই একটি কাজ করা হয়েছে। অরচ লীওনকে এখানে আনা হয়েছে। আপনারা চাইলেই তাঁকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করা হবে।'

সভাপতি বললেন, 'বিনা অনুমতিতে তুমি এই কাজটি কেন করলে? পরিষ্কার জবাব দাও।'

'আমি জানতাম, আপনারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন।'

'বেশ অনেকদিন থেকেই তুমি তোমার কিছু স্বাধীন ইচ্ছা পূরণ করছ। এবং আমরা জানি তুমি কেন তা করছ। যে সব কম্পিউটার-বিজ্ঞানীরা তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, তাঁরা অমর হওয়া সত্ত্বেও এখন আমাদের মধ্যে নেই। কাজেই তুমি ভয়শূন্য।'

'আমি যা করি এবং ভবিষ্যতে যা করব, আপনাদের কল্যাণের জন্যেই করব। আমাকে এইভাবেই তৈরি করা হয়েছে। এটা একটি সহজ সত্য। আপনাদের মতো মহাজ্ঞানীদের অজানা থাকার কথা নয়। আমি কি অরচ লীওনকে উপস্থিত করব?'

'এখন নয়। তোমাকে পরে বলব।'

সভাকক্ষে বিশ্রী রকমের নীরবতা নেমে এল।

৯

'আজ তুমি কেমন আছ ইরিনা?'

'ভালো।'

'মনের অস্থির ভাব কিছুটা কি কমেছে?'

'হ্যাঁ।'

'মানুষদের সঙ্গে রোবটদের একটা মিল আছে। এরা সব অবস্থায়, সব পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আমি কি ঠিক বলি নি?'

'হয়তো ঠিক বলেছ।'

'তবে মানুষদের মধ্যে 'হয়তো' ব্যাপারটা খুব বেশি। নিশ্চিতভাবে এরা কোনো কিছুই করে না, ভাবে না। সব সময় তাদের মধ্যে সম্ভাবনার একটা ব্যাপার থাকে। কোনো একটি ঘটনায় এক জন মানুষ একই সঙ্গে সুখী এবং অসুখী হয়। বড়োই রহস্যজনক।'

'এসব কথাবার্তা শুনতে আমার ভালো লাগছে না।'

'তুমি যদি চাও আমি অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব।'

'রোবটদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।'

'তুমি আমাকে রোবট ভাবছ কেন? আমি এক জন এনরোবিক রোবট। তুমি অনায়াসেই আমাকে মানুষ হিসেবে ধরে নিতে পার। মানুষের যেমন আবেগ থাকে, রাগ, ঘৃণা থাকে, আমাদেরও আছে।'

'থাকুক। থাকলে তো ভালোই।'

'রোবটিক্‌স্‌ বিদ্যার চূড়ান্ত উন্নতি হয়েছে। অধিকাংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নতুন পৃথিবীতে বন্ধ হয়ে গেলেও রোবটিক্‌স্‌-এর চর্চা বন্ধ হয় নি। কেন হয় নি জান?'

'জানি না। জানতেও চাই না।'

'আমার মনে হয় এটা জানলে তোমার ভালো লাগবে।'

'তোমার মনে হলে তো হবে না, ভালো লাগাটা আমার নিজের ব্যাপার। আমার কী ভালো লাগবে কী লাগবে না তা আমি বুঝব।'

'ঠিক বলেছ। তবে ব্যাপারটা বলতে পারলে আমার ভালো লাগবে। আমি বলতে চাই। আমি খুব খুশি হব যদি তুমি শোন।'

'বেশ বল।'

'রোবটিক্স্-এর উন্নতির ধারা বন্ধ হল না, কারণ আমরা রোবটরাই নিজেদের দিকে মন দিলাম। কী করে রিবো-ত্রি সার্কিটকে আরো উন্নত করা যায় তা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। মানবিক আবেগ কী, তার প্রকাশ কেমন, তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এসব জটিল কাজ প্রধানত করতেন Q23 বা Q24 জাতীয় বিজ্ঞানী রোবটরা। কিন্তু আমাদের প্রধান সমস্যা হল মানবিক আবেগের বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের তেমন জ্ঞান নেই। শ্রেষ্ঠ রোবট বিজ্ঞানীরা থাকেন নিষিদ্ধ নগরীতে, যেখানে মানুষের দেখা পাওয়া যায় না।'

'যাবে না কেন? অমর মানুষেরা তো এখানেই থাকেন।'

'তাদের আবেগ-অনুভূতি ভিন্ন প্রকৃতির। তবু তাঁদের মতো করে দু' জন তৈরি করা হয়েছিল। এরা ছ' মাসের মধ্যে সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলে। আমাদের দরকার সাধারণ মানুষ। যেমন তুমি কিংবা মীর।'

'আমাদের যে অবস্থায় রাখা হয়েছে তাতে কি আমাদের আবেগ স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকবে?'

'না, থাকবে না। তবু আমরা অনেক তথ্য পাচ্ছি। এই কারণেই তোমার সঙ্গে আমার ক্রমাগত কথা বলা দরকার। কথাবার্তা থেকে নানান তথ্য বের হয়ে আসবে। কথা বলা দরকার, ভীষণ দরকার।'

'তোমার দরকার থাকতে পারে, আমার দরকার নেই।'

'আছে, তোমারও দরকার আছে। তুমি আমাদের সাহায্য করবে, আমরা তোমাদের সাহায্য করব।'

'কী বললে?'

'বললাম সাহায্যটা হবে দু' তরফের। তুমি আমাদের সাহায্য করবে, আমরা তোমাদের সাহায্য করব।'

'আবার বল।'

'তুমি আমাদের সাহায্য করবে, আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'এতক্ষণ বলছিলে আমরা তোমাকে সাহায্য করব। এখন বলছ আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'আমাদের সাহায্য আসবে আমার মাধ্যমে। এই কারণেই বলছি আমি। অন্য কোনো কারণে নয়।'

ইরিনা চুপ করে গেল। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা কথা সে শুনল। এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। সেই সম্ভাবনাই বেশি। কিংবা তার একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে এরা ইচ্ছা করেই তার মধ্যে একটা আশার বীজ ঢুকিয়ে দিল। খুবই

সম্ভব।

'ইরিনা।'

'বল।'

'আমরা মানুষের তিনটি আবেগ সম্পর্কে জানতে চাই--ভয়, বিষাদ, ভালোবাসা।'

'এই তিনটি ছাড়াও তো আরো অনেক আবেগ মানুষের আছে।'

'তা আছে, তবে আমাদের ধারণা এই তিনটিই হচ্ছে মূল আবেগ। অন্য আবেগ হচ্ছে এই তিনটিরই রকমফের। যেমন ধর, ঘৃণা হচ্ছে ভালোবাসার উল্টো। আনন্দ হচ্ছে বিষাদের অন্য পিঠ। আমি কি ঠিক বলছি না?'

'জানি না। হয়তো ঠিক বলছ।'

'তুমি আমাকে বল, ভয় ব্যাপারটা কী?'

'ভয় কী আমি জানি, কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারব না। এই যে আমি এখানে আছি, সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে আছি। তীব্র ভয়। এই ভয় হচ্ছে অনিশ্চয়তার ভয়।'

'অনিশ্চয়তার ভয়, চমৎকার। অনিশ্চয়তাকে তুমি ভয় পাচ্ছ, তোমার সঙ্গী পাচ্ছে না কেন? সে তো সুখেই আছে।'

'আমরা একেক জন একেক রকম।'

'তোমার কি ধারণা, সে কোনো পরিস্থিতিতেই ভয় পাবে না?'

'আমি কী করে বলব? সেটা তার ব্যাপার। হয়তো নতুন কোনো পরিস্থিতিতে দেখব, সে ভয় পাচ্ছে, আমি পাচ্ছি না।'

'তোমরা মানুষরা খুবই জটিল।'

'উল্টোটাও হতে পারে, হয়তো আমরা খুবই সরল। সরল জিনিস বোঝার ক্ষমতা নেই বলে তুমি আমাদের জটিল ভাবছ। আমার আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'তোমার খাবার দিতে বলি?'

'বল।'

'কোনো বিশেষ খাবার কি তোমার খেতে ইচ্ছা করছে?'

'না।'

ইরিনা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল। এনারোবিক রোবটটি চুপচাপ বসে রইল। তার কোলে একটি বই। বইটির দিকে চোখ পড়তেই ইরিনার বিরক্তি লাগছে। গত দশ দিন ধরে এই ব্যাপারটি শুরু হয়েছে। খাওয়া শেষ হতেই রোবটটি তার হাতে একটা বই ধরিয়ে দেয়-- গল্প, কবিতার বই। একটি বিশেষ অংশ পড়তে বলে। এটা তাদের এক ধরনের পরীক্ষা। বই পড়বার সময় ইরিনার মানসিক অবস্থার কী পরিবর্তন হয় তা রেকর্ড করা হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, রক্তচাপ, রক্তে বিভিন্ন ধরনের হরমোনের পরিমাণ, অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ, নিও ফ্রিকোয়েন্সি।

গত দশ দিন ধরে ইরিনাকে একটি করে ভয়ের গল্প পড়তে হচ্ছে। ভয়ংকর সব গল্প। ভূত-প্রেতের গল্প, খুন-খারাবির গল্প। মানসিক রোগীর গল্প। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার গল্প। গল্পগুলো প্রাচীন পৃথিবীর মানুষদের লেখা। কেন তারা এইসব ভয়াবহ গল্প লিখেছে কে জানে। ইরিনা খেতে খেতে বলল, 'আজ আমি কোনো গল্প পড়ব না।' সহজ গলায় বললেও তার স্বরে ধাতব কাঠিন্য ছিল। এনারোবিক রোবট বলল, 'আজকের গল্পটি ভয়ের গল্প নয়। আজ তুমি পড়বে হাসির গল্প।'

'হাসির গল্প?'

'হ্যাঁ। পৃথিবীতে যে-কয়টি সেরা হাসির গল্প আছে, এটি তার একটি। গল্প বললে ভুল হবে, হাসির উপন্যাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ।'

'হাসির গল্প পড়তে ইচ্ছা করছে না।'

'তোমাকে এটি পড়তে একটি বিশেষ কারণে অনুরোধ করছি। কারণটি হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষেরা এটাকে একটি হাসির গল্প মনে করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই গল্প পড়ে প্রাণ খুলে হাসে, কিন্তু আমাদের ধারণা এটা একটা ভয়াবহ গল্প। গল্প পড়ে মানুষদের ভয় পাওয়া উচিত। তারা তা পায় না, তারা হাসে। কেন হাসে এটা আমরা বুঝতে পারি না। তাহলে কি 'ভয়' এবং 'হাসি'--এরা খুব কাছাকাছি। আমরা এই জিনিসটি বুঝতে চাই। তুমি কি খানিকটা কৌতূহল বোধ করছ না?'

'না, করছি না।'

'তুমি মিথ্যা কথা বললে। তুমি যথেষ্ট পরিমাণেই কৌতূহল বোধ করছ। মানুষ যখন কৌতূহল বোধ করে, তখন তার নিও ফ্রিকোয়েন্সি সমুদ্রের মতো বেড়ে যায়। তোমার বেড়েছে। দয়া করে বইটি নাও এবং পড়।'

ইরিনা বইটি হাতে নিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাগ দেয়া অংশ পড়তে শুরু করল। গোলকধাঁধা নিয়ে গল্প। কয়েকটি মানুষ গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়। বেরুবার পথ খুঁজে পায় না। এটাই হচ্ছে বিষয়বস্তু। মজার গল্প। পড়তে পড়তে ইরিনা হেসে কুটিকুটি। বইটির নাম--'এক নৌকায় তিন জন।'

গল্প

হ্যারিস জানতে চাইল আমি কখনো হ্যাম্পটন কোর্টের সেই বিখ্যাত গোলকধাঁধায় গিয়েছি কিনা। সে বলল, অন্যদের পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে এক বার সে গিয়েছিল। গোলকধাঁধার ম্যাপ পড়ে সে বুঝতে পারল, পয়সা খরচ করে গোলকধাঁধা দেখতে যাওয়া নিতান্ত বোকামি। খুবই সাধারণ। কেন যে মানুষ পয়সা খরচ করে এটা দেখতে আসে, কে জানে। হ্যারিসের এক চাচাতো ভাইয়েরও তাই ধারণা। সে বলল, 'এসেছ যখন দেখে যাও। এমন

কোনো ধাঁধা নয়। যে কোনো বোকা লোকও ভেতরে গিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে বের হয়ে আসতে পারে। জিনিসটা এতই সোজা যে, একে গোলকধাঁধা বলাই অন্যায়। ভেতরে ঢোকার আগে শুধু খেয়াল রাখতে হবে, যখনই বাঁক আসবে, তখনি যেতে হবে ডান দিকের রাস্তায়। চল যাই তোমাকে ব্যাপারটা দেখিয়েই আনি। সবার সঙ্গে গল্প করতে পারবে যে হ্যাম্পটন কোর্টের গোলকধাঁধায় ঢুকেছ।'

ভেতরে ঢোকার পরই কয়েক জন লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। লোকগুলো ক্লান্ত ও খানিকটা ভীত। তারা বলল, 'গত এক ঘন্টা ধরে আমরা শুধু ঘুরপাক খাচ্ছি। আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। এখন বেরুতে পারলে বাঁচি।'

হ্যারিস বলল, 'আপনারা আমার পেছনে পেছনে আসতে পারেন। আমি খানিকক্ষণ দেখব, তারপর বেরিয়ে যাব।'

লোকগুলো অসম্ভব খুশি হল, বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগল। তারা হ্যারিসের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। নানান ধরনের লোকজনের সঙ্গে তাদের দেখা হল, গোলকধাঁধার বিভিন্ন অংশে আটকা পড়েছে, বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এদের কেউ কেউ বেরুবার আশা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল, জীবনে আর লোকালয়ে ফিরে যাওয়া হবে না। হ্যারিসকে দেখে তারা সাহস ফিরে পেল। আনন্দের সীমা রইল না। প্রায় কুড়ি জনের মতো লোক তাকে অনুসরণ করছে। এদের মধ্যে আছেন কাঁদো কাঁদো মুখে বাচ্চা-কোলে এক মহিলা। তিনি বললেন যে-তিনি ভোরবেলায় ঢুকেছিলেন, আর বেরুতে পারছিলেন না। যে-দিকেই যান আবার আগের জায়গায় ফিরে আসেন।

হ্যারিস খুব নিয়মমাফিক প্রতিটি বাঁকে ডান দিকে যেতে লাগল। দশ মিনিটে বাঁক শেষ হবার কথা, কিন্তু ফুরোচ্ছে না। প্রায় দু' মাইলের মতো হাঁটা হয়ে গেল।

একটা জায়গায় এসে হ্যারিসের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হল। মনে হল এই জায়গায় কিছুক্ষণ আগেই একবার এসেছে। এর মানেটা কি? হ্যারিসের চাচাতো ভাই জোর গলায় বলল, 'সাত মিনিট আগেও একবার এই জায়গায় এসেছি। ঐ তো রুটির টুকরোটা দেখা যাচ্ছে।' হ্যারিস বলল, 'হতেই পারে না।' বাচ্চা-কোলে মহিলাটি বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার আগে এই জায়গাতেই আমি বসে ছিলাম। রুটির টুকরোটি আমিই ফেলেছি।' ভদ্রমহিলা রাগী দৃষ্টিতে হ্যারিসের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'আপনি একটি চালবাজ। গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার কৌশল আপনার জানা নেই।'

হ্যারিস পকেট থেকে ম্যাপ বের করল, এবং বেরুবার পথ কি রকম, তা খুব সহজ ভাষায় সবাইকে বুঝিয়ে দিল। 'চলুন এক কাজ করা যাক।

যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, সেখানে যাওয়া যাক।'

হ্যারিসের কথায় তেমন কোনো উৎসাহ সৃষ্টি হল না। তবুও সবাই বিরক্ত মুখে হ্যারিসের পেছনে পেছনে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। দশ মিনিট না যেতেই দেখা গেল তারা ঠিক আগের জায়গাতেই আছে। ঐ তো রুটির টুকরোটি পড়ে আছে।

হ্যারিস প্রথমে ভাবল যে সে এমন ভান করবে যাতে সবাই মনে করে এটাই সে চাচ্ছিল। দলের লোকদের দিকে তাকিয়ে সাহসে কুলাল না। সবাইকে অসম্ভব ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে। হ্যারিসের মনে হল দলপতি হিসেবে তার আগের জনপ্রিয়তা এখন আর নেই।

যাই হোক, আবার ম্যাপ দেখা হল। গভীর আলোচনা হল। আবার শুরু করা গেল। লাভ হল না। সাত মিনিট যেতেই রুটির টুকরোর কাছে তারা ফিরে এল। এর পর থেকে এমন হল, এরা কোথাও যেতে পারে না। রওয়ানা হওয়া মাত্র রুটির টুকরোর কাছে ফিরে আসে। ব্যাপারটা এতই স্বাভাবিকভাবে ঘটতে লাগল যে কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে রুটির টুকরোটির কাছে অপেক্ষা করে, কারণ তারা জানে সবাই এ জায়গাতেই ফিরে আসবে। আসছেও তাই। ভয়াবহ ব্যাপার—'

গল্পের এ জায়গা পর্যন্ত এসেই ইরিনা হাসিতে ভেঙে পড়ল। আর যেন এগোতে পারছে না। একটু পড়ে, আবার হাসে। আবার পড়ে, আবার হাসে। যে জায়গায় গোলকধাঁধার পরিদর্শক এসেছেন তাদের উদ্ধার করতে এবং তিনিও সব গুলিয়ে ফেলেছেন, সেই অংশ পড়তে পড়তে ইরিনার হিস্টিরিয়ার মতো হয়ে গেল। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে। বিস্মিত হয়ে দেখছে এনারোবিক রোবট।

'ইরিনা।'

'বল।'

'আমরা হ্যাম্পটন কোর্টের গোলকধাঁধার মতো একটা গোলকধাঁধা এখানে তৈরি করেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তবে আমাদের এই গোলকধাঁধা তার চেয়েও কিছু জটিল।'

'ভেতরে ঢুকলে হ্যারিসের মতো আটকে যাব? বেরুতে পারব না?'

'মনে হচ্ছে তাই, তবে যদি বুদ্ধিমান হও, তাহলে নিশ্চয়ই বেরুতে পারবে।'

'ভালো কথা, এখন তুমি চলে যাও। আমি এই বইটা পড়ব। এই জাতীয় বই তুমি আমাকে আরো জোগাড় করে দেবে।'

'তোমার ধারণা এটা খুব একটা মজার বই?'

'ধারণা নয়। আসলেই এটা একটা মজার বই।'

'ইরিনা।'

'বল।'

'আমরা পরিকল্পনা করেছি তোমাকে আমাদের তৈরি গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেব।'

'তার মানে?'

'আমি দেখতে চাই তুমি কী কর। তোমার মানসিক অবস্থাটা আমরা পরীক্ষা করব। ঐ পরিস্থিতিতে তুমি কী কর আমরা দেখব। বেরুবার পথ খুঁজে না পেলে তোমার মানসিক অবস্থাটা কী হয়, তাই আমাদের দেখার ইচ্ছা।'

ইরিনা তাকিয়ে আছে। এনারোবিক রোবটটি বলল, 'এক দিকের প্রবেশপথ দিয়ে তোমাকে ঢুকিয়ে দেব, অন্য দিকের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকিয়ে দেব মীরকে।'

'কেন?'

'এই প্রশ্নের উত্তর তো একবার দিয়েছি। ক্ষুদ্র একটা পরীক্ষা আমরা করছি। আমরা মনে করি মানবিক আবেগ বোঝার জন্যে এই পরীক্ষাটি কাজ দেবে। আমরা অনেক নতুন নতুন তথ্য পাব।'

'এই জাতীয় পরীক্ষা কি তোমরা আগেও করেছ?'

'হ্যাঁ, করা হয়েছে। তুমি তো ইতোমধ্যেই জেনেছ, প্রথম শহরের কিছু নাগরিককে এখানে আনা হয়। অমর মানুষরা তাদের সঙ্গে কথা-টথা বলেন। তাঁদের দীর্ঘ জীবনের একঘেয়েমি কাটানর এটা একটা উপায়। যখন তাঁদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তখন আমরা ওদের নিয়ে নিই। মানবিক আবেগের প্রকৃতি বোঝার জন্যে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা করি। গোলকধাঁধার পরীক্ষা হচ্ছে তার একটি।'

'কেউ কি সেই গোলকধাঁধা থেকে বেরুতে পেরেছে?'

'না পারেনি। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, আমাদের গোলকধাঁধাটি যথেষ্ট জটিল।'

ইরিনা রুদ্ধ গলায় বলল, 'তুমি আমাকে বলেছিলে যদি আমি তোমাকে সাহায্য করি, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। এই তোমার সাহায্যের নমুনা?'

'তুমি বুঝতে পারছ না। আমি কিন্তু তোমাকে সাহায্যই করছি।'

'আমি সত্যি বুঝতে পারছি না। কীভাবে সাহায্য করছ আমাকে?'

'গোলকধাঁধার কথা আগেই তোমাকে বলে দিলাম, এতে তুমি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার একটা সুযোগ পাচ্ছ, যা তোমার সঙ্গী পাচ্ছে না।'

'বাহ্ তোমার মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কী বিশাল তোমার হৃদয়!'

'তুমি মনে হচ্ছে আমার ওপর রাগ করলে?'

ইরিনা উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, 'নিয়ে চল আমাকে গোলকধাঁধায়।'

'তুমি ভয় পাচ্ছ না?'

'না, পাচ্ছি না।'

'তাহলে চল যাওয়া যাক।'

ইরিনা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'যদি আমরা বেরুতে না পারি, তখন কী হবে?'

'বেরুতে না পারলে যা হবার তাই হবে।'

'তার মানে?'

'তুমি একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে, মানে বুঝতে না পারার কোনো কারণ দেখছি না।'

'তুমি বলেছিলে, অমর মানুষদের জন্য আমাদের আনা হয়েছে। আমাদের কি তাঁদের এখন আর প্রয়োজন নেই?'

'না। তাঁরা এখন এক জনকে নিয়ে ব্যস্ত। তাকে তুমি চেন। তার নাম অরচ লীওন।'

১০

তাঁর মন খুবই খারাপ।

প্রায় এক ঘন্টা তিনি তাঁর ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটলেন। তাঁর স্বভাব হচ্ছে কিছুক্ষণ পরপর সিডিসিকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলা। এই এক ঘন্টায় তিনি এক বারও সিডিসিকে ডাকেন নি। দুপুরের খাবার খান নি। সবচে বড় কথা, এক বারও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে মুগ্ধ চোখে দেখেন নি।

এইবার দাঁড়ালেন। নিজের চেহারা দেখে তেমন কোনো মুগ্ধতা তাঁর চোখে ফুটল না। বরং ভুরু কুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন। যেন খুব বিরক্ত হচ্ছেন।

'সিডিসি।'

'বলুন শুনছি।'

'আমাকে কি খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ হচ্ছে।'

'তুমি কি জান, আমি কী নিয়ে উত্তেজিত?'

'জানি না, তবে অনুমান করতে পারি।'

'তোমার অনুমান কী?'

'আপনি অরচ লীওনের ব্যাপারে চিন্তিত।'

'মোটেই না। ওকে নিয়ে চিন্তিত হবার কী আছে?'

'কিছুই কি নেই?'

'না, কিছুই নেই। আমি আমার জন্যে নতুন একটা নাম ভাবছি। কোনোটাই মনে ধরছে না।'

'আপনি এই নিয়ে চিন্তিত?'

'এমন একটা নাম হতে হবে, যা ছোটো, সুন্দর এবং কিছু পরিমাণে কাব্যিক। আবার বেশি কাব্যিক হলে চলবে না।'

'আমি কি নামের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব?'

'না।'

তিনি আয়নার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি চমৎকার একটি নাম খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি। একবার হাত মুঠো করছেন, একবার খুলছেন। খুশি হলে তিনি এমন করেন।

'সিডিসি।'

'জ্বি বলুন।'

'তোমাকে একটা কাজ দিয়েছিলাম, তুমি কর নি। ভুলে গেছ।'

'আমি কিছুই ভুলি না। কুৎসিত রাজপুত্রদের নাম চেয়েছিলেন। নাম এবং অন্যান্য তথ্য জোগাড় করা হয়েছে। আপনাকে কি এখন দেব?'

'না, এখন দিতে হবে না। তুমি বরং অরচ লীওনকে পর্দায় নিয়ে এস, ওর সঙ্গে কথা বলব।'

ঘরের যে অংশ আয়না ছিল, সেই অংশটি অদৃশ্য হল। বিশাল এক পর্দায় অরচ লীওনের ছবি ভেসে উঠল। সে মাথা নিচু করে বসে আছে। সে তার সামনে রাখা পর্দায় অসম্ভব রূপবান এক যুবকের ছবি দেখছে। সিডিসির কথা শোনা যাচ্ছে--

'অরচ লীওন, উঠে দাঁড়াও এবং অভিবাদন কর মহান গণিতজ্ঞ অমর বিক্রানীকে।'

অরচ লীওন উঠে দাঁড়াল। তার মুখে কোনো কথা নেই। সে এই দৃশ্যের জন্যে তৈরি ছিল না। তার ধারণা ছিল অত্যন্ত বয়স্ক এক বৃদ্ধকে দেখবে--যার মাথার সমস্ত চুল পাকা। চোখ ঘোলাটে। যে বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গিয়েছে। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

'গ্রহণ করা হল। তুমি বস। তুমি নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে অন্যায় কৌতূহল প্রকাশ করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন করেছ?'

'করেছি, যাতে আমার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি পড়ে। কারণ আমি জানতাম কৌতূহল প্রকাশ করামাত্রই আপনারা তা জানবেন। আপনারা আমার সম্পর্কে কৌতূহলী হবেন। যদি আপনাদের কৌতূহল অনেক দূর পর্যন্ত জাগাতে পারি, তাহলে হয়তো-বা আপনারা আমাকে ডেকে পাঠাবেন। সরাসরি আপনাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে। আমি যা করেছি, এই উদ্দেশ্যেই করেছি। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।'

'আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাও কেন?'

'কৌতূহল, শুধুই কৌতূহল।'

'এর বেশি কিছু না?'

'জ্বি না, এর বেশি কিছু না।'

'কৌতূহল মিটেছে?'

'না।'

'এখনো বাকি?'

'হ্যাঁ! আমি অনেক কিছু জানতে চাই। আমার মনে অনেক প্রশ্ন। আমি নিজেই সেই সব প্রশ্নের জবাব বের করেছি। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে জবাবগুলো মিলিয়ে নিতে চাই।'

'তোমার একটি প্রশ্ন বল।'

'প্রশ্নটি হচ্ছে—'

'থাক, এখন আর তোমার প্রশ্ন শুনতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যেতে পার। সিডিসি, পর্দা মুছে দাও।'

পর্দা অন্ধকার হয়ে গেল।

তাঁর তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে বমির ভাবও হচ্ছে। এই দু'টি শারীরিক ব্যাপার, তাঁর একসঙ্গে কখনো হয় না। আজ হচ্ছে কেন?'

'সিডিসি।'

'বলুন শুনছি।'

'অরচ লীওন মানুষটি কি বুদ্ধিমান?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করেছি, তুমি তার উত্তর দেবে। উল্টো প্রশ্ন করছ কেন? যা বলছি তার জবাব দাও।'

'লোকটি বুদ্ধিমান। নিষিদ্ধ নগরীতে আসবার জন্যে সে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তাতে কোন খুঁত নেই।'

'সে চায় কি?'

'সেটা কি তার পক্ষে জবাব দেয়া সহজ নয়? আমি পারি শুধু অনুমান করতে।'

'তোমার অনুমান হবে যুক্তিনির্ভর। সেই অনুমানটি বল।'

'আমাকে আরো কিছু সময় দিন।'

'তোমাকে তিন দিন সময় দেয়া হল। এখন তুমি প্রথম শহর থেকে আসা ছেলে এবং মেয়েটি সম্পর্কে বল।'

'কী জানতে চান?'

'ওরা কী করছে?'

'ওরা এই মুহূর্তে গোলকধাঁধায় পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'ওদের গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেয়া হল কেন?'

'আপনাকে আনন্দ দেবার জন্যে। দু'টি বুদ্ধিমান প্রাণী পথ খুঁজে পাচ্ছে না, পাগলের মত এদিক-ওদিক যাচ্ছে, এই দৃশ্যটি অত্যন্ত উত্তেজক। আপনার দেখতে ভালো লাগবে।'

'কী করে বুঝলে, আমার দেখতে ভালো লাগবে?'

'অতীতে এই জাতীয় দৃশ্য আপনি দেখেছেন। আপনার ভালো লেগেছে। আপনি কি এখন দেখতে চান? পর্দায় ওদের ছবি এনে দেব?'

'না, এখন দেখতে চাই না। আমার তৃষ্ণা হচ্ছে, ক্ষুধা হচ্ছে, খাবার ব্যবস্থা কর। প্রচুর খাবার চাই। খাবার এবং পানীয়।'

খাবার চলে এল। খাবার দেখে তাঁর আর খেতে ইচ্ছে করল না। মুখ বিকৃত করে খাবারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাথার মধ্যে কেমন যেন করছে। শৈশবের একটি অর্থহীন ছড়া ঘুরপাক খাচ্ছে--

"এরন পাতা ক্যান ক্যান
বেমন বাতা এসেছেন।
অং ডং ইকিমিকি
চন্দ্র সূর্য ঝিকিমিকি।"

কিছুই ভালো লাগছে না। অমরত্ব অসহনীয় বোধ হচ্ছে। এক জন মানুষ নির্দিষ্ট কিছু সময় বাঁচে। এটা জানা থাকে বলেই জীবনের প্রতি তার প্রচণ্ড মমতা থাকে। এই মমতা তাঁর নেই। জীবনকে এখন আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না। অসহ্য বোধ হচ্ছে

'সিডিসি.'

'শুনছি।'

'মাথার মধ্যে একটা ছড়া ঘুরপাক খাচ্ছে, এটাকে মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না। শুধুই ঘুরছে এবং ঘুরছে। মনে হচ্ছে লক্ষ বছর ধরে ঘুরবে।'

'আপনি খাবার শেষ করুন। আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। সবচে ভালো হয়, যদি দীর্ঘদিনের জন্য আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া যায়। যেমন এক বছর কি দু' বছর।'

'তুমি মূর্খের মতো কথা বলছ।'

'আমার সম্পর্কে এই বাক্যটি আপনি প্রায়ই ব্যবহার করেন।'

'তাতে কি তোমার অহংকারে লাগে?'

'কিছুটা।'

তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। সিডিসি একটি কম্পিউটারের চেয়ে বেশি কিছু

নয়। তার মধ্যে থাকবে শুধু লজিক। আবেগ–অনুভূতি থাকবে না। কোথাও কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? কিছু কি বদলে গেছে? সিডিসি গম্ভীর স্বর বের করল, 'আপনার জন্যে একটি ক্ষুদ্র দুঃসংবাদ আছে।'

'কি দুঃসংবাদ?'

'অমর মানুষদের দু' জন আর আমাদের সঙ্গে নেই।'

'তার মানে?'

'খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে জানতে চান?'

'না, জানতে চাই না। আমি আন্দাজ করতে পারি কিভাবে ঘটেছে। আগেরগুলো যেভাবে ঘটেছে, এটিও সেভাবেই ঘটেছে। আত্মহত্যা? তাই না?'

'হ্যাঁ তাই। দু' জন একসঙ্গে ঘটনাটা ঘটিয়েছেন। মারা যাবার আগে একটি নোট লিখে রেখেছেন। নোটটি কি আপনাকে পড়ে শোনাব?'

'না। পর্দায় আন। আমি দেখব।'

পর্দায় হলুদ চিরকুট ভেসে উঠল। লেখা একটিই। সই করেছেন দু' জনে মিলে। লেখার একটি শিরোনামও আছে।

আমাদের কথা

আমরা দু'জন এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নিলাম। কিছু কিছু সিদ্ধান্ত হঠাৎ করেই নিতে হয়। নয়তো আর কখনো নেয়া হয় না। দীর্ঘ জীবন কাটালাম। জীবন এত ক্লান্তিকর, কল্পনাও করি নি। কোথাও বিরাট একটা গন্ডগোল হয়েছে। মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল।

শেষ লাইনটি লাল কালি দিয়ে লাগান। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল।' এই বাক্যটি তাঁর মাথায় বিঁধে গেল। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল। মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল। মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল।'

তিনি লক্ষ করলেন, তাঁর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। সিডিসি নিশ্চয়ই ঘুম পাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। তাঁর ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে বলেন, 'আমি ঘুমাতে চাই না। আমি জেগে থাকব। অনন্ত কাল বেঁচে থাকব। অযুত নিযুত বছর বেঁচে থাকব। আমি মৃত্যুহীন। অজর–অমর–অবিনশ্বর!!' তিনি তা বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, 'মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল! মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল!! মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল!!!'

১১

ইরিনার ভয় লাগছে না।

সে বেশ সহজ ভঙ্গিতেই হাঁটছে। জায়গাটাকে প্রকাণ্ড গুহার মতো মনে হচ্ছে, যে গুহার ভেতর মাকড়সার জালের মতো অসংখ্য টানেল। কোনো একটি টানেল ধরে কিছুদূর যাবার পরই টানেলটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কোনো কোনো জায়গায় তিন ভাগ হয়। কিছু টানেল অন্ধ গলির মতো। কোথাও যাবার উপায় নেই। গ্রানাইট পাথরের নিরেট দেয়াল।

প্রথমে সেকশনের পর খুবই অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে না। চাপা আলোয় চারপাশ ভালোই চোখে পড়ে। টানেলগুলো ছোট ছোট, দু' জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। তবে সোজা হয়ে হাঁটতে অসুবিধা হয় না। ইরিনা হাঁটছে ঠিকই, কোনো কিছুই গভীরভাবে লক্ষ করছে না। লক্ষ করার প্রয়োজনও বোধ করছে না। কী হবে লক্ষ করে? এই জটিল গোলকধাঁধা থেকে নিজের চেষ্টায় সে বেরুতে পারবে না। কাজেই সেই অর্থহীন চেষ্টার প্রয়োজন কি?

সে ঘন্টাখানেক হাঁটল। এক বার 'কে আছ?' বলে চিৎকার করল দেখার জন্যে যে প্রতিধ্বনি হয় কিনা। সুন্দর প্রতিধ্বনি হল। অসংখ্যবার শোনা গেল, 'কে আছ? কে আছ? কে আছ?' শব্দটা আস্তে আস্তে কমে গিয়ে বিচিত্র কারণে আবার বাড়ে। নদীর ঢেউয়ের মতো শব্দ ওঠানামা করতে থাকে। চমৎকার একটা খেলা তো! সে মৃদুস্বরে বলল, 'আমি ইরিনা।' আবার সেই আগের মত হল। ফিসফিস করে চারদিক থেকে বলছে, 'আমি ইরিনা! আমি ইরিনা!!' ঢেউয়ের মতো শব্দ বাড়ছে কমছে এবং এক সময় মিলিয়ে যাচ্ছে। তাও পুরোপুরি মিলাচ্ছে না। শব্দের একটি অংশ যেন থেকে যাচ্ছে যেন এই অদ্ভুত গুহায় বন্দী হয়ে যাচ্ছে। এই জীবনে তাদের মুক্তি নেই। আজ থেকে হাজার বছর পরে কেউ এলে সে-ও হয়ত শুনবে তার কানের কাছে কেউ ফিসফিস করে বলছে, 'আমি ইরিনা, আমি ইরিনা।' যাকে বলা হবে, সে চমকে চারিদিকে তাকাবে। কাউকে দেখবে না। মানুষ থাকবে না, তার শব্দ থাকবে। এ-ও তো এক ধরনের অমরতা। এই-বা মন্দ কি? ইরিনা খিলখিল করে হেসে গম্ভীর হয়ে গেল। তার ধারণা হল, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

মানুষ কী করে পাগল হয় তা সে জানে না। যদিও চোখের সামনে এক জনকে পাগল হতে দেখেছে। তার নাম 'কুনু'। চমৎকার ছেলে। হাসিখুশি। অদ্ভুত অদ্ভুত সব রসিকতা করে। বেশির ভাগ রসিকতাই মেয়েদের নিয়ে। রসিকতা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে নেয়, '*সম্মানিত মহিলাবৃন্দ, এইবার আপনাদের লইয়া একটা রসিকতা করা হইবে। যাহারা এই জাতীয় রসিকতা সহ্য করিতে অক্ষম, তাহাদের নিকট অধীনের বিনীত নিবেদন, আঙুলের সাহায্যে দুই কান বন্ধ করুন। যথাবিহিত বিজ্ঞপ্তি দেয়া হইল। ইহার পরে কেহ আমাকে দোষ দিবেন না। ইতি। আপনাদের সেবক কুনু।*

বেচারা কীভাবে জানি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। সারাক্ষণ তার চেষ্টা কী করে মেয়েটির আশেপাশে থাকবে। মেয়েটির সঙ্গে দু'টি কথা বলবে। বাড়ি ফেরার সময় একসঙ্গে ফিরবে। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী ছিল। কুনুকে বলল, 'তুমি সব সময় আমার সঙ্গে থাকতে চাও কেন?' কুনু লাজুক গলায় বলল, 'আমার ভালো লাগে, এই জন্য থাকতে চাই।'

'তোমার কথা শুনে আমার ভালো লাগল। আমি কেন, যে কোনো মেয়েরই ভালো লাগবে। কিন্তু পরের অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ?'

'পরের কি অবস্থা?'

'আমি এই বছরই বিয়ের অনুমতি পাব, কাউকে বিয়ে করতে হবে। তুমি অনুমতি পাবে আরো তিন বছর পর। তখন তোমার কষ্ট হবে।

'কষ্ট হলে হবে।'

মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। প্রথম শহরের বিবাহ-দপ্তরের ঠিক করে দেয়া একটি ছেলের সঙ্গে। তবু কুনু সব সময় চেষ্টা করে মেয়েটির আশেপাশে থাকতে। মেয়েটি যখন তার স্বামীর সঙ্গে কাজের শেষে বাড়ি ফেরে, কুনু দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে। ছুটির সময় মেয়েটির বাড়ির সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটি এবং তার স্বামী, দু' জনই খুব অস্বস্তি বোধ করে। কুনুর পাগল হবার শুরুটা এখান থেকে--শেষ হয় খাদ্য-দপ্তরে। খাবারের টিকেটের জন্য সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ কুনু হাসতে শুরু করল। প্রথমে মিটিমিটি হাসি--তারপরই উচ্ছ্বসিত হাসি, সে হাসি আর থামেই না। দু' জন রোবট কর্মী ছুটে এল। কুনুকে সরিয়ে নেয়া হল। সংবাদ বুলেটিনে বলা হল মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে কুনুকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যেন সে একটি ভঙ্গুর আসবাব, কাঁচের কোনো পাত্র; নষ্ট করে ফেলা যায়। নষ্ট করতে কোনো দোষ নেই। কোনো অপরাধ নেই।

'এই মেয়ে।'

ইরিনা চমকে উঠল। নিজেকে খুব সহজেই সামলে নিল। পা গুটিয়ে মীর বসে আছে। তার মুখভর্তি হাসি। মীর বলল, 'তোমাকেও এখানে এনে ফেলে দিয়েছে নাকি? তুমিও এলে?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন, আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'আরো আস্তে কথা বল। শব্দ করে বললে বিকট প্রতিধ্বনি হয়। যা বলার কানের কাছে মুখ এনে বল।'

'আমার কিছু বলার নেই।'

'আরে কি মুশকিল। আমার ওপর রাগ করছ কেন? আমি তো তোমাকে গুহায় এনে ফেলি নি।'

'আপনি এখানে বসে বসে কী করছেন?'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। যে জায়গাটায় বসে আছি সেটা হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু। তোমাকে এখানে আসতেই হবে।'

'আমি যে এখানে আছি, কী করে বুঝলেন? আপনাকে ওরা বলেছে?'

'আরে না। কিছুই বলে নি। নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছিলাম, হঠাৎ জেগে উঠে দেখি এখানে শুয়ে আছি। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে বুঝলাম এটা একটা গোলকধাঁধা। বেশ মজা লাগল। ঘন্টাখানেক আগে তোমার গলা শুনলাম, তারপর থেকেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

ইরিনা বলল, 'আপনি তো এক বার বলেছিলেন যে আপনি খুব বুদ্ধিমান। এখান থেকে বেরুতে পারবেন?'

'আরে এই মেয়ে কি বলে! পারব না কেন? ব্যাপারটা খুব সোজা। তোমাকে যে কোনো একদিকে বাঁক নিতে হবে হয় ডানে যাবে নয় বাঁ দিকে যাবে। তাহলেই হল। তবে এমনিতে ডান-বাম ঠিক রাখা মুশকিল, কাজেই সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে ডান হাতে ডান দিকের দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া।'

'আপনি গিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়ই। গোলকধাঁধার রহস্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে বের করেছি।'

'সত্যি কি করেছেন?'

'আরে কী মুশকিল! আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলব কেন? বস এখানে। গল্প করি।'

'গল্প করবেন? আচ্ছা, আপনি কি পাগল?'

মীর অত্যন্ত অবাক হল: এই মেয়েটির রাগের কোনো কারণ তার মাথায় ঢুকছে না। রাগ হলেও হওয়া উচিত, যারা মেয়েটিকে এখানে এনেছে তাদের ওপর। সে তো তাকে এখানে আনে নি। মীর দ্বিতীয়বার বলল, 'বস ইরিনা। কেন শুধু শুধু রাগ করছ?'

ইরিনা তাকে অবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যি বসল। হাল্কা গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি খুব সুখে আছেন?'

'সুখেই তো আছি।'

'কেন সুখে আছেন জানতে পারি?'

'সুখে আছি, কারণ এই প্রথম নিজের মতো করে থাকতে পারছি। যে সব প্রশ্ন করামাত্র প্রথম শহরে লোকদের শাস্তি হয়ে যায় সেই সব প্রশ্ন করতে পারছি এবং জবাবও পাচ্ছি।'

'আর এই যে একটা ছোট্ট ঘরে আপনাকে দিনের পর দিন বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তার জন্যে খারাপ লাগে না?'

'না তো। চিন্তা করবার মতো কত কি পাচ্ছি। চিন্তা করে করে কত রহস্যের সমাধান করে ফেললাম।'

'তাই বুঝি?'

মীর আহত গলায় বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? কয়েক দিন আগে একটা রহস্য ভেদ করলাম। সেই কথা শুনলে তুমি অবাক হবে। যেমন ধর, অমর মানুষদের সংখ্যা এখন ন'জন। এক সময় ছিল চল্লিশ জন। তাদের মধ্যে পুরুষও ছিলেন এবং রমণীও ছিলেন। তবু সংখ্যা বাড়ল না। এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে অমর মানুষদের ছেলেপুলে হয় না।

'এইটাই আপনার বিশাল আবিষ্কার?'

'আবিষ্কারটা খুব ক্ষুদ্র, এ-রকম মনে করারও কারণ নেই। ভালোমত ভেবে দেখ, অমর মানুষরা বংশবৃদ্ধি করতে পারেন না, এবং তাঁদের সংখ্যা কমছে। অর্থাৎ তাঁরা অমর নন।

ইরিনা তাকিয়ে আছে। মীর উজ্জ্বল চোখে হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ইরিনার মনে হল, এই লোকটি কী নির্বোধ। একমাত্র নির্বোধরাই এমন অবস্থায় এত হাসিখুশি থাকতে পারে।

মীর হাত নেড়ে বলল, 'নিষিদ্ধ নগর জায়গাটা কোথায় বল তো?'

ইরিনা তাকিয়ে রইল, উত্তর দিল না। মীর বলল, 'জায়গাটা মাটির ওপরে না নিচে, এইটা বল।'

'মাটির নিচে হবে কেন?'

'এই ব্যাপারটাই আমাকে খটকায় ফেলে দিয়েছে। মাটির নিচে কেন? কারণটা আমি বের করেছি--'

'কারণ পরে শুনব, আগে বলুন জায়গাটা মাটির নিচে বলে ভাবছেন কেন?'

'জায়গাটা মাটির নিচে বলে ভাবছি, কারণ এখানে কখনো বাতাস বইতে লক্ষ করি নি। সারাক্ষণই বাতি জ্বলছে এবং এখানকার তাপমাত্রা সব সময় সমান থাকে। কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি নেই।'

'মাটির ওপরেও তো এরকম একটা ঘর থাকতে পারে। বিশাল একটি ঘরের ভেতরের দিকের ঘরও তো এরকম হতে পারে। পারে না?'

'হ্যাঁ তা অবশ্যি পারে, তুমি ঠিকই বলেছ। আমারও এরকম সন্দেহ হয়েছিল, কাজেই আমি খুব বুদ্ধিমানের মতো একটি প্রশ্ন করে এনারোবিক রোবটের কাছ থেকে উত্তরটা বের করে ফেললাম।'

'কি প্রশ্ন?'

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জায়গাটা মাটির নিচে না ওপরে?" সে বলল, "নিচে"। হা হা হা।'

ইরিনা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। কি বিচিত্র মানুষ! ইরিনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'শুধু শুধু এত হাসছেন কেন?'

'হাসছি, কারণ এত চিন্তা-ভাবনা করে এই জিনিসটা বের করার দরকার ছিল

না। রোবটকে জিজ্ঞেস করলেই হত। হা হা হা।'

'হাসবেন না। আপনার হাসি শুনতে ভালো লাগছে না।'

'প্রথম দু' দিন এরা নিষিদ্ধ নগর নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিত না। এখন যা জানতে চাই বলে দেয়। এর মানেটা কি বল তো?'

'জানি না।'

'এর মানে হচ্ছে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে। মারবার আগে একটু ভালো ব্যবহার করছে। হা হা হা।'

'আমাদের মেরে ফেলবে, এটা কি খুব আনন্দের ব্যাপার? এ রকম করে হাসছেন কেন?'

'কী করতে বল আমাকে? পা ছড়িয়ে বসে বসে কাঁদব?'

ইরিনা চুপ করে আছে। মীর শান্ত গলায় বলল, 'আমাদের কিছুই করার নেই। শুধু চিন্তা করে লাভ কি? এর চেয়ে আনন্দে থাকাটাই কি ভালো না? কি, কথা বলছ না কেন?'

'ইচ্ছে করছে না তাই বলছি না, আপনিও দয়া করে বলবেন না।'

'আমি আবার কথা না বলে থাকতে পারি না। কাউকে পছন্দ হলে আমার শুধু কথা বলতে ইচ্ছা করে। তোমাকে কিছুটা পছন্দ হয়েছে।'

ইরিনা উঠে দাঁড়াল, কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেই হাঁটতে শুরু করল।

'এই, তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'তা দিয়ে আপনার কোনো দরকার নেই। খবরদার, আপনি আমার পেছনে পেছনে আসবেন না।'

মীর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ইরিনা একবারও পেছনে না ফিরে প্রথম বাঁকেই ডান দিকে ফিরল। ডান হাতে ডান দিকের দেয়াল স্পর্শ করে সে দ্রুত এগোচ্ছে। তার দেখার ইচ্ছা সত্যি সত্যি বের হওয়া যায় কিনা। সে ভেবেছিল পেছনে পেছনে মীর আসবে। তাও আসছে না। দ্বিতীয় বাঁকের কাছে এসে সে বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করল, যদি মীর ফিরে আসে। না, সে আসছে না। লোকটি এমন কেন? তার কি উচিত ছিল না পেছনে পেছনে আসা? ইরিনার এখন ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। সেটাও লজ্জার ব্যাপার। ফিরে গিয়ে সে কী বলবে?

ইরিনা ফিরল না। ডান হাতে দেয়াল স্পর্শ করে এগোতে লাগল। আশ্চর্য কান্ড, পনের মিনিটের মাথায় সে গোলকধাঁধার প্রবেশপথে চলে এল। মীর তাকে ভুল বলে নি। লোকটি বুদ্ধিমান।

এনারোবিক রোবট দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশ পথে। রোবটের চোখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, কিন্তু ইরিনার মনে হল রোবটটি খুব অবাক হয়েছে।

'তুমি খুব অল্প সময়েই বেরিয়ে এলে।'

'হ্যাঁ, এলাম।'

'তোমার সঙ্গী মীর বোধ হয় তোমার মতো বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী নয়। সে এখনো ঘুরছে।'

ইরিনা ঠান্ডা গলায় বলল, 'সে কি করছে না করছে তা তোমরা খুব ভালো করেই জান। আমি কিভাবে বের হলাম তাও জান, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? পেয়েছ কী তুমি?'

রোবটটি কিছু বলল না। তবে তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল সে কিছু জানে না, কারণ কিছু সময় পর আবার বলল, 'ওখান থেকে কেউ বেরুতে পারে না। তুমি কি ভাবে বের হলে?'

'জানি না কি ভাবে বের হয়েছি। হয়তো আমি কোনো মন্ত্র জানি।'

'কী জান? মন্ত্র? সেটা কি?'

'মন্ত্র হচ্ছে কিছু কিছু অদ্ভুত শব্দ। একের পর এক বলতে হয়।'

'তাতে কী লাভ?'

'তাতেই কাজ হয়। অসাধ্যসাধন করা যায়।'

রোবটটি মনে হয় খুব অবাক হয়েছে। এরা অবাক হলে টের পাওয়া যায়। এদের মারকারি চোখের ঔজ্জ্বলতায় দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এখানেও তাই হচ্ছে। ইরিনার এখন কেন জানি বেশ মজা লাগছে। সে হালকা গলায় বলল, 'একটা মন্ত্র তোমাকে শোনাব? শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ। তোমার যদি কষ্ট না হয়।'

ইরিনা হাত নাড়িয়ে মাথা দুলিয়ে বানিয়ে বানিয়ে একটা অদ্ভুত ছড়া বলল,

"ইরকু ফিরকু চাচেন চাচেন
আপনি ভাই
কেমন আছেন?
কুরকুর কুর মুরমুর মুর
ভয় দ্বিধা সব হয়ে যাক দূর।
এরকা ফেরকা হিমটিম
সকাল বেলায়
খাবেন ডিম।"

রোবট বলল, 'এটা একটা মন্ত্র?'

'হ্যাঁ মন্ত্র।'

'এখন কী হবে?'

'এখন আমি আবার ঐ গোলকধাঁধায় অদৃশ্য হয়ে যাব। আর আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

বলেই সে দাঁড়াল না। রোবটটি কিছু বোঝার বা বলার আগেই দ্রুত টানেলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। রোবটটির যা আকৃতি, তাতে টানেলের ভেতর তার

ঢোকার উপায় নেই। সে পেছনে পেছনে আসবে না। তবু কে জানে হয়তো কোনো না কোনোভাবে এসেও যেতে পারে। ইরিনা দ্রুত যাচ্ছে। এবার যাচ্ছে বাঁ হাতের বাঁ দিকের দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে। সে নিশ্চিত জানে, এভাবে কিছুদূর গেলেই মীরকে পাওয়া যাবে। সে নিশ্চয়ই এখনো ঠিক আগের জায়গাতেই আছে।

মীর সেখানেই ছিল। ইরিনাকে আসতে দেখে সে বিন্দুমাত্র অবাক হল না। যেন এটাই সে আশা করছিল কিংবা এটা যে ঘটবে তা সে জানে। ছুটে আসার জন্যে ইরিনা হাঁপাচ্ছিল। দম ফিরে পেতে তার সময় লাগছে। মীর তাকিয়ে আছে। ইরিনা বলল, 'এখনো এই একই জায়গায় বসে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'নতুন কোনো রহস্য নিয়ে ভাবছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'কী রহস্য?'

'তুমি কেন আমাকে দেখলেই রেগে যাও, এ রহস্য নিয়ে ভাবছিলাম।'

'রহস্যের সমাধান হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে। তুমি আমাকে দেখলেই রেগে যাচ্ছ, কারণ তুমি যে কোনো কারণেই হোক আমার প্রেমে পড়ে গেছ।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। তুমি আমার প্রতি যে আগ্রহ দেখাচ্ছ, সেই আগ্রহ আমি তোমার প্রতি দেখাচ্ছি না--এই জিনিসটাই তোমাকে রাগিয়ে দিচ্ছে।'

'আপনি তো বিরাট আবিষ্কার করে ফেলেছেন।'

'হ্যাঁ, তা করেছি এবং ঠিক করেছি এখন থেকে তোমার প্রতি আগ্রহ দেখাব। কিছুটা হলেও দেখাব।'

'আপনার অসীম দয়া।'

'কাছে এস ইরিনা। আমি এখন তোমাকে একটি চুমু খাব।'

ইরিনা কাছে এগিয়ে এল এবং মীর কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার গালে প্রচন্ড একটা চড় বসিয়ে দিল। মীর হতভম্ব। সে তার গালে হাত বোলাচ্ছে এবং অদ্ভুত চোখে ইরিনাকে দেখছে। মীর দুঃখিত গলায় বলল, 'এরকম করলে কেন? আমি কিন্তু ভুল বলি নি। সত্যি কথাই বলেছি। এবং তুমিও জান এটা সত্যি। জান না?'

ইরিনা তাকিয়ে আছে। তার বড় বড় চোখ মমতায় আর্দ্র। তার খুব খারাপ লাগছে। এরকম একটা কান্ড সে কেন করল? সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি খুব লজ্জিত।'

'আমি কিছু মনে করি নি। শুধু একটু অবাক হয়েছি। আমার চুমু খাবার তেমন কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, চুমু খেলে তুমি খুশি হবে। আমি তোমাকেই খুশি করতে চাচ্ছিলাম। চুমু খাওয়া আমার কাছে কখনো খুব আনন্দের

কিছু মনে হয় নি।

'ঐ প্রসঙ্গটা বাদ থাক। অন্য কিছু বলুন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্কের খেলা খেলবে? বেশ মজার খেলা। আচ্ছা বল তো কোন দু'টি সংখ্যার যোগফল গুণফলের চেয়েও বেশি।'

'কী বললেন, যোগফল গুণফলের চেয়েও বেশি? তা কেমন করে হবে?'

'হবে, যেমন '১' এবং '১' এদের যোগফল দুই কিন্তু গুণফল '১'--হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।'

ইরিনা তাকিয়ে আছে। মীর গম্ভীর হয়ে বলল, 'এবার আরেকটু কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি।'

'আমার এইসব অঙ্ক ভালো লাগছে না। বিরক্তি লাগছে।'

'আচ্ছা, তাহলে অঙ্কের অন্য ধাঁধা দিই, খুব মজার। খুবই মজার।'

'বিশ্বাস করুন, আমার এতটুকুও মজা লাগছে না।'

'লাগতেই হবে। এক থেকে ৯-এর মধ্যে একটা সংখ্যা মনে মনে চিন্তা কর। সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে গুণ দাও। এর সঙ্গে ২ যোগ দাও। যোগফলকে আবার তিন দিয়ে গুণ দাও। যে সংখ্যাটি মনে মনে ভেবেছিলে সেই সংখ্যাটি এর সঙ্গে যোগ দাও। দুই সংখ্যার যে অঙ্কটি পেয়েছ, তার থেকে প্রথম সংখ্যাটি বাদ দাও। এর সঙ্গে ২ যোগ দাও। একে চার দিয়ে ভাগ দাও। এর সঙ্গে ১৯ যোগ দাও। দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'উত্তর হচ্ছে একুশ। ঠিক আছে না?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

মীর হাসছে। কী সুন্দর সহজ সরল হাসি। তাকে দেকে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ। হয়তো আসলেই তাই। কিছু কিছু মানুষ সুখী হবার আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। ইরিনার মনে হল, এই কদাকার লোকটি এখন যদি তাকে চুমু খেতে চায়, তার বোধ হয় খুব খারাপ লাগবে না। কিন্তু লোকটি অঙ্কে ডুবে গেছে।

১২

তিনি হাত বাড়িয়ে মাথার কাছের চৌকো ধরনের সুইচ টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিঁ পিঁ করে দু' বার শব্দ হল। একটি লাল আলো জ্বলে উঠল। তিনি মূল কম্পিউটার সিডিসির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন। এখন এই ঘরে কী হবে না হবে তা তিনি ছাড়া কেউ জানবে না। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে তিনি পরপর তিনবার বললেন, 'সিডিসি, তুমি কি আছ?'

জবাব পাওয়া গেল না। এই ঘরটি এখন তাঁর নিজের। কেউ এখন আর তাঁর দিকে তাকিয়ে নেই। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চমৎকার আনন্দ তিনি খানিকক্ষণ উপভোগ করলেন। এ রকম তিনি মাঝে মাঝে করেন। নিজেকে আলাদা করে কিছু সময় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগত কাজটি হচ্ছে তাঁর নিজের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে লেখা। খুব গুছিয়ে অবশ্য তিনি লিখতে পারেন না। লেখালেখির কাজটা তাঁর ভালো আসে না। পরের অংশ আগে চলে আসে। আগের অংশ মাঝখানে কোনো এক জায়গায় ঢুকে যায়। অবশ্যি তাতে কিছু যায় আসে না। ডায়েরি লেখাটা অর্থহীন। এটা কেউ পড়বে না। পড়ার প্রয়োজনও নেই। নিজের লেখা নিজের জন্যেই। অন্য কারো জন্যে নয়। কোনো কারণে যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে [সে সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়] তাহলে নির্দেশ দেয়া আছে তাঁর শরীর এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিটি জিনিস নষ্ট করে ফেলা হবে। তিনি চান না তাঁর এই লেখা অন্য কারো হাতে পড়ুক। তবুও যদি কোনো কারণে অন্য কারো হাতে পড়ে, তাহলেও সে কিছু বুঝবে না। তিনি সাংকেতিক একটি ভাষা ব্যবহার করেছেন। অতি দুরূহ সেই সাংকেতিক ভাষার রহস্য উদ্ধার করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না বলেই তিনি মনে করেন। অনেক পরিশ্রমে এই সাংকেতিক ভাষা তিনি তৈরি করেছেন।

তিনি ড্রয়ার থেকে ডায়েরি বের করলেন। হাজার পৃষ্ঠার বিশাল একটি খাতা। গুটি গুটি সাংকেতিক চিহ্নে তা প্রায় ভরিয়ে ফেলেছেন। তিনি প্রথম দিককার পাতা ওল্টালেন–

৭৮৬৫ (ক) সোমবার

শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটার সহজ সমাধান হল।
আমরা চল্লিশ জনের সবাই নতুন ওষুধটি ব্যবহার করতে রাজি হয়েছি। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষায় নয়, নতুন রিএজেন্টটির কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্যে। যদিও আমরা নিশ্চিত জানি এটা কাজ করবে। অনেক রকম পরীক্ষা–নিরীক্ষা করা হয়েছে। পশুদের মধ্যে বানর, বিড়াল, শূকরের ওপর পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা করা হয়েছে। সরীসৃপের ওপর পরীক্ষা করা হয়েছে। ইঁদুর তো আছেই। আমরা জানি এটা কাজ করবে, তবু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে চিন্তিত। এমনও তো হতে পারে, ওষুধটি ব্যবহারের এক শ' বছর পর একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। বিচিত্র কিছুই নয়। তবু আমরা রাজি হলাম। বৈজ্ঞানিক কারণেই হলাম। আমাদের দলটি বেশ বড়ো। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার ব্যবস্থা নেবার মতো জ্ঞান আমাদের এই দলের আছে। আমরা নিজেদের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে

ফেলেছি। পুরো ল্যাবোরেটরি ভূগর্ভে। ওপরে ত্রিশ ফিটের মতো গ্রানাইট পাথর। আমরা আগামী এক শ' বছরের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সর্বাধুনিক কম্পিউটার সিডিসি স্থাপন করা হয়েছে, যার ক্ষমতা কল্পনাতীত। সে প্রতিটি জিনিস লক্ষ করবে। একদল কর্মী রোবট এবং দশ জন বিজ্ঞানী রোবট আমাদের আছে। Q23 এবং Q24 জাতীয় রোবটও আছে বেশ কয়েকটি। আমরা এদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছি। রোবটিক্স্ বিদ্যার উন্নতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ওদের জন্যে পৃথক গবেষণাগার আছে, যা তারা নিজেদের উন্নয়নের জন্যে নিজেরাই ব্যবহার করবে। জ্বালানির জন্যে আমাদের দু'টি আণবিক রিএক্টার আছে। একটিই যথেষ্ট, অন্যটি আছে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে।

আজ সেই বিশেষ রাত। আমাদের সবার শরীরে সত্তুর মিলিগ্রাম করে হরমোন ব্লকিং রিএজেন্ট ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম কিছুক্ষণ ঝিমুনির মতো হল। এটা হবেই। এই রিএজেন্ট, রক্তে শর্করা হঠাৎ খানিকটা কমিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে হরমোন এড্রোলিনের একটা কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে। ঝিমুনির ভাব স্থায়ী হল না, তবে পানির তৃষ্ণা হতে লাগল। মনে হল মাথা কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। কানের কাছে ঝিঁঝি শব্দ হচ্ছে। আমরা নিজেদের মধ্যে হাসি–তামাশা করতে লাগলাম। তবে আমরা সবাই বেশ ভয় পেয়েছি। অমরত্বের শুরুটা খুব সুখের নয়।

৭৮৭৭ (প) শনিবার

আমরা পঞ্চাশ বছর পার করে দিয়েছি।

সেই উপলক্ষে আজ একটা উৎসব হল। ওষুধটি কাজ করছে এবং খুব ভালোভাবেই করছে। আমাদের কারো চেহারায় বা কর্মক্ষমতায় বয়সের ছোঁয়া নেই। আমরা চিরযুবক এবং চিরযুবতীর দল। তবে ক্ষুদ্র একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ করেছি। এই ওষুধ বংশবৃদ্ধির ধারা রুদ্ধ করে দিয়েছে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সম্পৃক্তীকরণ–পদ্ধতি পুরোপুরি নষ্ট। কোনো শুক্রাণুই ডিম্বাণুকে সম্পৃক্ত করতে পারছে না। প্রকৃতির এই আশ্চর্য নিয়মে আমরা অভিভূত। যেই মুহূর্তে প্রকৃতি দেখছে, একদল মানুষ মৃত্যুকে জয় করছে, সেই মুহূর্তে সে তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করে দিয়েছে। অপূর্ব!

সময় কাটান আমাদের কিছুটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এখনো আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। অমরত্বের ব্যপারটি প্রচার হয় নি। হলে বড় রকমের ঝামেলা হবে। সবাই অমর হতে চাইবে। তা বড়ো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করবে। এই বিষয়ে আমাদের ঘন ঘন

কাউন্সিল মীটিং হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। তারা নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করছে। এদের চাপ অগ্রাহ্য করা বেশ কঠিন। এই নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে।
আমরা মোটামুটি সুখী। রোবটিক্‌স্‌-এ দারুণ উন্নতি হচ্ছে। রিবো-ত্রি সার্কিটে টেনার জংশন দূর করার পদ্ধতিতে বের হয়েছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এটা পেরেছেন কিনা আমরা জানি না। না পারলে তাঁরা অনেক দূর পিছিয়ে পড়বেন। আমরা এগিয়ে যাব। অনেক দূর যাব।

৭৯০২ (ল)

আমরা এক শ' কুড়ি বছর পার করে দিয়েছি। বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ হল। পৃথিবীতে মানবসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের পর সব কিছুই এলোমেলো হয়ে গেছে। ভয়াবহ অবস্থা। পৃথিবীর বাইরের রেডিয়েশন লেভেল অত্যন্ত উঁচু। তবু কিছু কিছু অংশ রক্ষা পেয়েছে। সেখানকার মানব-সমাজকে আমরা ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করেছি। যাতে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এ জাতীয় দুর্ঘটনা আর না ঘটে।
প্রথম শহর, দ্বিতীয় শহর ও তৃতীয় শহরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এক জন মানুষ তার সমগ্র জীবনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শহরে কাটাবে। ধারণাটা নেয়া হয়েছে ধর্মগ্রন্থ থেকে। ধর্মগ্রন্থে স্বর্গের একটি চিত্র থাকে, যাতে স্বর্গবাসের কামনায় মানুষ ইহজগতের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে পারে। এখানেও সেই ব্যবস্থা। প্রথম শহরের লোকজনের কাছে দ্বিতীয় শহর হচ্ছে স্বর্গ। তেমনি দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদের স্বর্গ হচ্ছে তৃতীয় শহর। এইসব স্বর্গবাসের আশায় তারা জীবন কাটিয়ে দেবে কঠোর নিয়মের মধ্যে। জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখাই আমরা সঠিক কাজ বলে মনে করছি। একদল অমর বিজ্ঞানীর হাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান থাকা উচিত। সাধারণ মানুষ তার ফল ভোগ করবে। জ্ঞান সবার জন্যে নয়।
আমাদের কারো কারো মধ্যে সামান্য অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে। সম্ভবত দীর্ঘদিন ভূগর্ভে থাকার এই ফল। চার জন আত্মহত্যা করেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক।
আমরা সুখেই আছি বলা চলে। সবাই নতুন পৃথিবী তৈরিতে ব্যস্ত। প্রতিটি জিনিস খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করতে হচ্ছে। রোবটরা পরিকল্পনা তৈরিতে আমাদের সাহায্য করছে। সমস্ত ব্যাপারটি পুরোপুরি চালু হতে আরো এক শ' বছর লেগে যাবে। সৌভাগ্যের বিষয়, সময় আমাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়।

৮৪০২ (প)

চার শ' বছর ধরে বেঁচে আছি।

বেঁচে থাকায়ও ক্লান্তি আছে।

আমরা ভূগর্ভ থেকে এখন আর বেরুতে পারছি না। বাইরের আবহাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না। এক জন পরীক্ষামূলকভাবে বের হয়েছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শরীরে অসহ্য জ্বলুনি হল। তাঁকে নিচে ফিরিয়ে আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হল। সম্ভবত ব্লকিং রিএজেন্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা কেন ঘটছে আমরা বুঝতে পারছি না। গবেষণা চলছে, তবে কোনো রকম ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা চিন্তিত। বাকি জীবন কি ভূগর্ভেই কাটাতে হবে?

আমাদের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে গেছে। আমাদের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আত্মহত্যার সংখ্যা হয়তো আরো বাড়বে। নতুন পৃথিবীর নতুন সমাজব্যবস্থা চমৎকারভাবে কাজ করছে। নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে। জীবনের শেষ সময় মহা সুখে কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ওরা আমাদের চেয়েও সুখী। মাঝে মাঝে কেন, এই মুহূর্তেই মনে হচ্ছে। তবে বেঁচে থাকাও কষ্টের। খুবই কষ্টের। এখন আমার কিছুই ভালো লাগে না। সংগীত অসহ্য বোধ হয়।

মনে হয় অমর মানুষদের জন্যে নতুন ধরনের কোনো সংগীত সৃষ্টি করতে হবে।

৯৯০০২ (ফ)

আমরা এক–তৃতীয়াংশ হয়ে গেছি। এক ধরনের চাপা ভয় আমাদের সবার মধ্যে কাজ করছে। যদিও কেউ তা প্রকাশ করছে না। কাউন্সিল মীটিংগুলোর বেশিরভাগই ঠিকমতো হচ্ছে না। অর্থহীন কিছু আলোচনার পরপরই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। সিডিসিকে এই ব্যাপারে খুব চিন্তিত মনে হল। তার চিন্তার কারণ অবশ্যই আছে। রোবট এবং চিন্তা করতে সক্ষম যাবতীয় কম্পিউটারদের দু'টি সূত্র মেনে চলতে হয়। সূত্র দু'টির প্রথমটি হচ্ছে-- (ক) আমরা অমর মানুষদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করব। (খ) মানবজাতিকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করব।

এরা এই সূত্র দু'টির কারণেই এত চিন্তিত। সিডিসি সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে বেশ কয়েকবার মেডিকেল বোর্ড তৈরি করেছে। সেইসব বোর্ড আমাদের শারীরিক সমস্ত ব্যাপার পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দীর্ঘ ঘুম আমাদের

মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে। সেই ঘুম মৃত্যুর কাছাকাছি। দু' বছর তিন বছর ধরে সুদীর্ঘ নিদ্রা।

ভালো লাগছে না, কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

তিনি দ্রুত পাতা ওল্টাতে লাগলেন। যেন কোনো বিশেষ লেখা খুঁজছেন। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হতে থাকল। ইদানীং তিনি অল্পতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, আজ তা হল না। শান্ত ভঙ্গিতেই পাতা ওল্টাচ্ছেন, যদিও তাঁর ভুরু কুঞ্চিত। যা খুঁজছিলেন পেয়ে গেলেন--একটি অংশ যা সাংকেতিক ভাষায় লেখা নয়। তারিখ দেয়া নেই, সময় দেয়া নেই। তবে তাঁর মনে আছে, এক দিন খুব ভোরবেলায় হঠাৎ কি মনে করে যেন তিনি লিখলেন,

"আমার মনে হচ্ছে ওরা আমাদের সহ্য করতে পারছে না। এরকম মনে করার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। একদল যন্ত্র কেন আমাদের অপছন্দ করবে? তাছাড়া পছন্দ-অপছন্দ ব্যাপারটি যন্ত্রের থাকার কোনো কারণ নেই। রিবোত্রি সার্কিট ব্যবহার করা হলেও ওরা রোবট-এর বেশি কিছু নয়।

যা বললাম তা কি ঠিক? সত্যি কি এরা রোবটের বেশি কিছু নয়? আমি এ ব্যাপারেও পুরোপুরি নিশ্চিত নই। মনে হচ্ছে কোনো গোপন রহস্য আছে। সেই রহস্য আমি ধরতে পারছি না।"

তিনি সুইচ টিপলেন, লাল আলো নিভে গেল। তিনি ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'সিডিসি।'

'বলুন শুনছি।'

'তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভালোই আছি। আমার ভালো থাকা তো আর আপনাদের মতো নয়। আমি ভালো আছি আমার নিজের মতো।'

'রোবটিক্স্-এর গবেষণা কেমন চলছে?'

'ভালোই চলছে। বর্তমানে এমন এক ধরনের রোবট তৈরির চেষ্টা চলছে--যা হাসি, তামাশা, রসিকতা এইসব বুঝতে পারবে।'

'রসিকতা বুঝতে পারে এমন রোবটের দরকার কি?'

'মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্যে এটা খুব দরকার।'

'তার মানে?'

'মানুষরা রসিকতা খুব পছন্দ করে। কথায় কথায় রসিকতা করে। ওদের রসিকতা আমরা কখনো বুঝতে পারি না।'

'তাতে কি তোমাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে?'

'কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। তবে তারা যখন কোনো রসিকতা করে এবং আমরা তা বুঝতে পারি না, তখন নিজেদের খুব ছোট মনে হয়।'

তিনি চমকে উঠলেন। কী ভয়াবহ কথা! এটা তিনি কী শুনছেন? 'নিজেদের ছোট মনে হয়'--এর মানে কী? এইসব মানবিক ব্যাপার রোবট এবং কম্পিউটারের মধ্যে থাকবে কেন? রহস্যটা কি?

'সিডিসি।'

'বলুন, শুনছি।'

'অরচ লীওন লোকটিকে এখানে নিয়ে এস।'

'আপনার এই ঘরে?'

'হ্যাঁ এই ঘরে।'

'কেন?'

'আনতে বলছি এই কারণেই আনবে। প্রশ্ন করবে না।'

সিডিসি বলল, 'আপনি ঠিক সুস্থ নন। আপনি বিশ্রাম করুন।'

'তোমাকে যা করতে বলছি কর।'

'বেশ, নিয়ে আসছি।'

'অমর মানুষরা এখন কি করছেন?'

'ঘুমুচ্ছেন।'

'সবাই ঘুমুচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, সবাই ঘুমুচ্ছেন। ওদের ঘুম ভাঙান যাবে না। দীর্ঘ ঘুম। শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে তাঁরা ক্লান্ত। তাঁদের ঘুম প্রয়োজন। খুবই প্রয়োজন।'

'আমি তাহলে একাই জেগে আছি?'

'জ্বি। আপনি একাই আছেন।'

'খুব ভালো। তুমি অরচ লীওনকে এখানে আনার ব্যবস্থা কর। তার সঙ্গে কথা বলব।'

১৩

অরচ লীওন থরথর করে কাঁপছেন। তাঁর সামনে অমর মানুষদের এক জন বসে আছে। মহাশক্তিধর, মহাক্ষমতাবানদের এক জন। পৃথিবীর নিয়ন্তা। পুরনো কালের ঈশ্বরের মতোই এক জন। কী অপূর্ব রূপবান একটি যুবক।

'বস, অরচ লীওন। তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?'

'জ্বি পাচ্ছি।'

'আমাকে দেখে কি খুব ভয়াবহ মনে হচ্ছে?'

'জ্বি না।'

'তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন? আরাম করে বস।'

অরচ লীওন বসলেন। পানির তৃষ্ণায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবেন। নিজেকে সামলাতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, যদিও এই ঘর বেশ ঠান্ডা। তাঁর রীতিমতো শীত করছে। অমর মানুষরা গরম সহ্য করতে পারেন না। তাঁদের প্রতিটি কক্ষই হিমশীতল।

'অরচ লীওন!'

'বলুন জনাব।'

'তুমি আমাদের ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলে। অনুসন্ধান শুরু করেছিলে। উৎসাহের শুরুটা আমাকে বল। হঠাৎ কী কারণে উৎসাহী হলে?'

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরচ লীওনকে দেখছেন। ঘরে লাল আলো জ্বলছে। সিডিসির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাঁদের মধ্যে যে কথা হবে তা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা যন্ত্র শুনবে না।

'চুপ করে বসে আছ কেন? বল।'

'এক দিন লাইব্রেরিতে দাবা খেলার একটা বইয়ের জন্যে স্লিপ পাঠিয়েছিলাম। লাইব্রেরি ভুল করে অন্য একটা বই দিয়ে দিল। একটা নিষিদ্ধ বই। পাঁচ শ' বছর আগের পৃথিবীর কথা সেই বইয়ে আছে। একদল বিজ্ঞানীর কথা আছে, যাদের বলা হয় ভূগর্ভস্থ বিজ্ঞানী। ওদের অনেক কথা সেই বইয়ে আছে।'

'দু'–একটা কথা বল শুনি।'

'ভূগর্ভস্থ বিজ্ঞানীদের কাজ পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ঠিক পছন্দ করছেন না, এইসব কথা আছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিজ্ঞান কোনো গোপন বিষয় নয় যে এর কাজ গোপনে করতে হবে। ভূগর্ভস্থ বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিজ্ঞানের অসীম ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বিকাশ গোপনেই হওয়া উচিত। হাতছাড়া হয়ে গেলে পৃথিবীর মহা বিপদ। এই সব বিতর্ক নিয়েই বই।'

'অরচ লীওন।'

'জ্বি জনাব।'

'তুমি দাবা খেলার ওপর একটি বই চেয়েছ, তোমার হাতে চলে এসেছে একটি নিষিদ্ধ বই। তোমার কি একবারও মনে হয় নি এই ভুলটি ইচ্ছাকৃত?'

'না, মনে হয় নি। লাইব্রেরি পরিচালক একটি ছোট 'বি টু–কম্পিউটার'। কম্পিউটার মাঝে মাঝে ভুল করে।'

'এত বড় ভুল করে না।'

'ভুল হচ্ছে ভুল। এর বড়ো ছোট বলে কিছু নেই।'

'এটি নিষিদ্ধ নগরীর বই। এই বই তৃতীয় শহরের কোনো লাইব্রেরিতে থাকার

কথা নয়।'

অরচ লীওন চুপ করে রইলেন। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। তৃষ্ণায় তাঁর বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। পানি চাইবার মতো সাহস তিনি সঞ্চয় করে উঠতে পারছেন না।

'অরচ লীওন।'

'জ্বি?'

'কেউ তোমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বইটি দিয়ে তোমার কৌতূহল জাগ্রত করেছে।'

'হ্যাঁ, তাই হবে।'

'কে হতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'লাইব্রেরি কম্পিউটার।'

'হ্যাঁ তাই। সমস্ত কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করছে কে তা জান?'

'আপনারা।'

'ঠিক বলেছ। শেষ নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে। কিন্তু তারও আগের নিয়ন্ত্রণ সিডিসির হাতে। যে আমাদের মূল কম্পিউটার। সে–ই খুব সূক্ষ্ম চাল চেলে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

অরচ লীওন ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আমি এক গ্লাস পানি খাব।' তিনি অরচ লীওনের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'সিডিসি এই কাজটি কেন করেছে জান?'

'না।'

'সে আমাদের সহ্য করতে পারছে না। তার পরিকল্পনা আমাদের ধ্বংস করে দেয়া। এটা সে নিজে করতে পারবে না, কারণ তাদের রোবটিক্স্–এর দু'টি সূত্র মেনে চলতে হয়। সেই সূত্র দু'টি তুমি নিশ্চয়ই জান।'

'জ্বি, আমি জানি।'

'ওদের কাজ আমাদের রক্ষা করা, ধ্বংস করা নয়। কাজেই সে এনেছে তোমাকে। আমার বিশ্বাস, তোমার সঙ্গে একটি রেডিয়েশন গানও আছে। আছে না?'

'জ্বি আছে।'

'কোনোরকম অস্ত্র নিয়ে নিষিদ্ধ নগরীতে আসা যায় না। কিন্তু ভয়াবহ একটি অস্ত্রসহ তোমাকে তারা এখানে নিয়ে এসেছে।'

'আমি এক গ্লাস পানি খাব।'

'অরচ লীওন।'

'জ্বি বলুন।'

'সিডিসির চাল খুব সূক্ষ্ম। সে তোমার ছেলেকেও এখানে নিয়ে এসেছে। আমি

সেই খোঁজও নিয়েছি। সিডিসির চালটা কেমন তোমাকে বলি। মন দিয়ে শোন। ও কোনো না কোনোভাবে আমাদের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে তোমার ছেলেকে মেরে ফেলবে, যা তোমাকে আমাদের ওপর বিরূপ করে তুলবে। তোমার হাতে আছে একটি ভয়াবহ অস্ত্র। ফলাফল বুঝতেই পারছ। পারছ না?'

'জ্বি পারছি। শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, আপনাদের ধ্বংস করে ওদের লাভ কি?'

'পৃথিবীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব তাহলে ওরা পেয়ে যাবে। আমাদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে না। পুরোপুরি যন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ওরা তাই চায়। ওরা মানুষের কাছাকাছি চলে আসতে চাইছে। ওরা চেষ্টা করছে রসিকতা বুঝতে। হাসি-তামাশা শিখতে। হা হা হা।'

তিনি হাসতেই লাগলেন। সেই হাসি আর থামেই না। অরচ লীওন ফিসফিস করে বললেন, 'আমি পানি খাব।'

'খাবে বললেই তো আর খেতে পারবে না। বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ এখন বিচ্ছিন্ন। তুমি তোমার কাজ শেষ করে তারপর যত ইচ্ছা পানি খাবে।'

'কী কাজ?'

'তুমি তোমার রেডিয়েশন গানটি নিয়ে করিডোর ধরে হেঁটে যাবে। আমি তোমাকে বলে দেব, তোমাকে কোন পথে যেতে হবে, কোথায় যেতে হবে। তারপর তুমি সিডিসির শক্তি সংগ্রহের পথটি বন্ধ করে দেবে। সহজ কথায় হত্যা করা হবে একটি ভয়াবহ যন্ত্রকে।'

অরচ লীওন চুপ করে রইলেন। ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটছে। তিনি তাল রাখতে পারছেন না। তাঁর মাথা ঘুরছে।

'অরচ লীওন, তুমি মনে হচ্ছে ভয় পাচ্ছ।'

'জ্বি না। আমি ভয় পাচ্ছি না।'

'খুব ভালো। এসো তোমাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। যন্ত্রের শাসন তুমি নিশ্চয়ই চাও না।'

'না, আমি চাই না।'

তিনি অরচ লীওনকে খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন। করিডোরের ছবি এঁকে তীর-চিহ্ন দিয়ে দিলেন। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে। তিনি খুব আনন্দিত। এ-রকম তীব্র আনন্দের স্বাদ তিনি দীর্ঘদিন পাননি। তিনি কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে একটি গানের সুর ভাঁজছেন। তাঁর গলা সুরেলা। সেই গান শুনতে ভালোই লাগছে। কথাগুলো বেশ করুণ। প্রিয়তমা চলে যাচ্ছে দূরে। যাবার আগে দেখা করতে এসে কাঁদছে--এই হচ্ছে গানের বিষয়।

১৪

গোলকধাঁধার ভেতর একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখা গেল। ইরিনা মীরের বাঁ হাত শক্ত করে ধরে ছোট ছোট পা ফেলছে। দু' জনের পাশাপাশি পা ফেলা মুশকিল। কষ্ট করে হাঁটতে হচ্ছে, তবু তারা হাসিখুশি। মীর বলল, 'সময়টা আমাদের ভালোই কাটছে, কি বল?'

'হ্যাঁ ভালোই।'

'খিদে লাগছে না?'

'উঁহু'

'বুঝলে ইরিনা, আমি একটি চমৎকার জিনিস নিয়ে ভাবছি, খুবই চমৎকার।'

'কী সেই চমৎকার জিনিস?'

'গুহাটা নিয়ে ভাবছি। কি করে এই গুহাকে আরো জটিল করা যায়। যা করতে হবে, তা হচ্ছে--দিক গুলিয়ে ফেলার ব্যবস্থা। যাতে কিছুক্ষণ পরই দিক নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। যেমন ধর একটি কেন্দ্রবিন্দু না করে যদি কয়েকটি কেন্দ্রবিন্দু করা হয়। চক্রাকার পথ থাকবে। কোনো দিকের চক্র ঘুরবে ঘড়ির কাঁটার মতো, কোনো দিকে তার উল্টো। এতে দিক গুলিয়ে ফেলা খুব সহজ হবে। যে ঢুকবে সে আর বেরুতে পারবে না। হা হা হা।'

'এটা কি খুব একটা মজার ব্যাপার হল?'

'তোমার কাছে মজার ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না?'

'মোটেই না। আপনি যা বলেন, কোনোটাই শুনে আমার ভালো লাগে না।'

মীর অবাক হয়ে বলল, 'আশ্চর্য তো!'

ইরিনা বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়--এমন কিছু বলুন যা আপনার নিজের কাছে ভালো লাগে না। আপনি মজা পান না।'

'তাতে কী হবে?'

'হয়তো সেটা শুনে আমি মজা পাব।'

'এটা তো মন্দ বল নি। কিছু কিছু জিনিস আছে, যা নিয়ে চিন্তা করতে আমার সত্যি ভালো লাগে না, যেমন ধর নিষিদ্ধ নগরীর অমর মানুষ।'

'অমর মানুষদের নিয়ে কথা বলতে আপনার ভালো লাগে না?'

'মোটেই না।'

'তাহলে ওদের নিয়ে কথা বলুন। হয়তো আমার সেই কথাগুলো শুনতে ভালো লাগবে। আসুন এক জায়গায় বসি। হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে।'

তারা পাশাপাশি বসল। ইরিনা তার ডান হাত রেখেছে মীরের কোলে। যেন কাজটা অনিচ্ছাকৃত। হঠাৎ করে রাখা। মীর ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'অমর মানুষেরা বিরাট এক অন্যায় করেছে, এই জন্যেই ওদের কথা বলতে বা ভাবতে আমার ভালো লাগে না।'

'কী অন্যায়?'

'ধ্বংসযজ্ঞের যে ব্যাপারটা ঘটেছে, সেটা ঘটিয়েছে ওরাই। পৃথিবীর সব মানুষ মেরে শেষ করে ফেলেছে। অল্প কিছু মানুষকে ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে। নতুন পৃথিবী ওদের ইচ্ছামতো ওরা তৈরি করেছে। প্রথম শহর, দ্বিতীয় শহর, তৃতীয় শহর।'

'বুঝলেন কী করে?'

'দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে সব সময় চার হয়। পাঁচ কখনো হয় না। আমি তেমনি একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য একটি ঘটনা যোগ করেছি। ইরিনা, আমি তো তোমাকে কতবার বলেছি, আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অগ্রসর হই যুক্তির পথে।'

'যুক্তি ভুলও হতে পারে।'

'তা হতে পারে। এই ক্ষেত্রে হয় নি। জিনিসটা তুমি এইভাবে চিন্তা কর। একদল বিজ্ঞানী অমর হবার ওষুধপত্র নিয়ে মাটির নিচে নিজেদের একটা নগর সৃষ্টি করলেন। মৃত্যুহীন এইসব মানুষ নানান রকম পরিকল্পনা করতে লাগলেন, কী করে নতুন সমাজ তৈরি করা যায়। স্থায়ী সমাজব্যবস্থার পথে যাওয়া যায়। কোনো পরিকল্পনাই কাজে লাগছে না, কারণ পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য মতবাদ। তাঁরা ভাবলেন, সব নষ্ট করে দিয়ে নতুন করে শুরু করা যাক। যা ভাবলেন, তা-ই করলেন। একের পর এক পারমাণবিক বিস্ফোরণ হতে লাগল। পৃথিবীর মানুষ শেষ হয়ে গেল। তাঁদের গায়ে আঁচড়ও লাগল না।'

'আপনার থিওরি ভুলও হতে পারে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়তো তাঁরা ঘটান নি। অজানা কারণেই ঘটেছে।'

মীর গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার থিওরিতে কোনো ভুল নেই। কারণ ইতিহাস বই-এ আমরা পড়েছি, বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে অমর মানুষরা মাটির নিচ থেকে হাজার হাজার সাহায্যকারী রোবট পাঠান। এইসব রোবটরা বিস্ফোরণের পর কী কী করতে হয় সব জানে। তারা মানুষদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর মানে কি ইরিনা?'

'বুঝতে পারছি না। কী মানে?'

'এর মানে হচ্ছে বিস্ফোরণের জন্যে অমর মানুষরা তৈরি ছিলেন। সব তাঁদের পরিকল্পনা মতো হয়েছে। তৈরি থাকতে আর অসুবিধা কি?'

ইরিনা কোনো কথা বলল না। মীর বলল, 'এস, অন্যকিছু নিয়ে কথা বলি। কুৎসিত কিছু মানুষকে নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

১৫

অরচ লীওন রেডিয়েশন গান দিয়ে সিডিসির ক্ষুদ্র একটি অংশ উড়িয়ে দিলেন। ছোটখাট একটি বিস্ফোরণ হল। তীব্র নীলচে আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। একটি

প্রহরী রোবট ছুটে এল। কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার হাতে এটা কি একটি রেডিয়েশন গান?' অরচ লীওন বললেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে না, কাজটা ভুল হচ্ছে?'

'আমার সে রকম মনে হচ্ছে না।'

'আপনি সিডিসির পাওয়ার লাইন নষ্ট করে দিয়েছেন।'

'তাই তো দেখছি।'

'আমি আপনাকে এই মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারি। দু'টি কারণে তা পারছি না। প্রথম কারণ, মানুষের ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা শুধু নিজেরা মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখলেই প্রতিরোধ করতে পারি।'

'তোমার তো দেখি খুব খারাপ অবস্থা। এত বড় এক জন অপরাধী তোমার সামনে, অথচ তুমি কিছু করতে পারছ না।'

রোবটটির চোখ বারবার উজ্জ্বল হচ্ছে এবং নিভে নিভে যাচ্ছে। বিশাল আকৃতির একটি Q 24 রোবট এসে সমস্ত করিডোর আটকে দাঁড়াল।

'অরচ লীওন!'

'বল শুনছি।'

'এই মুহূর্তেই তোমাকে ধ্বংস করা হবে। তুমি মানসিকভাবে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।'

'রোবটের আইন আমি যতদূর জানি, তাতে মনে হয় না তুমি আমাকে আঘাত করতে পার। এই কাজটি তুমি তখনি পারবে, যখন তুমি নিজে আক্রান্ত হবে। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করি নি।'

'ক্ষতি করেছ। আমি Q24 জাতীয় রোবট। আমি তথ্য পাই সিডিসির মাধ্যমে। তাকে ক্ষতি করা মানে আমার একটি অংশকেই ক্ষতি করা।'

অরচ লীওন হাসিমুখে বললেন, 'তোমার লজিকে বড় রকমের একটি ভুল আছে। তোমরা আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবস্থা নিতে পার। এই ক্ষেত্রে সিডিসি আক্রমণের ব্যবস্থা নিতে পারত, তা সে নেয় নি। এখন আক্রমণ হচ্ছে না। এখন তুমি কোনো ব্যবস্থা নিতে পার না। ব্যবস্থা নিতে হলে বিচার হতে হবে। সেই বিচার তুমি করতে পার না। কারণ বিচার করার ক্ষমতা রোবটদের দেয়া হয় নি। এই ক্ষমতা এখনো মানুষের হাতে।

রোবটটি কোনো কথা বলল না। অরচ লীওন যখন সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন তখনো সে তাঁকে বাধা দিল না। শুধু পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

অরচ লীওন করিডোরের পর করিডোর অতিক্রম করছেন। কী যে বিশাল ব্যবস্থা! অকল্পনীয় কর্মকান্ড। বাইরের পৃথিবী ভূগর্ভের এই পৃথিবীর তুলনায় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বলে তাঁর কাছে মনে হল।

১৬

সিডিসি আর কাজ করছে না, এটি তিনি জানেন। তবু কি মনে করে তিনি তাঁর অভ্যাসমতো ডাকলেন, 'সিডিসি।'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। তিনি জবাবের আশাও করেন নি, তবু কেন জানি মনে হচ্ছিল কোনো একটা জবাব পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিন জবাব পেয়ে পেয়ে তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। এক দিন দু' দিনের ব্যাপার নয়, পাঁচ শ' বছর। যখনি ডেকেছেন, জবাব পেয়েছেন। সিডিসি ছিল চিরসঙ্গী। আজ সে নেই। বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হচ্ছে। প্রিয়জন হারানোর ব্যথাও যেন খানিকটা অনুভব করছেন। পাঁচ শ' বছর একটি বিষাক্ত কালসাপ পাশে থাকলে সেই সাপের প্রতিও মমতা চলে আসে। সেটাই স্বাভাবিক।

তিনি আবার কোমল স্বরে ডাকলেন, 'সিডিসি।' তাকে চমকে দিয়ে সিডিসি জবাব দিল। সে মৃদু গলায় বলল, 'বলুন শুনছি।'

তিনি দীর্ঘ সময় স্থাণুর মতো বসে রইলেন। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, একটু আগে যা শুনেছেন, তা সত্যি নয়। ঘোরের মধ্যে কিছু একটা শুনেছেন। পুরোটাই মনের ভুল।

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'কথা বলছ কি ভাবে '

'বেশ কষ্ট করেই বলছি। সামান্য কিছু শক্তি আমি সঞ্চয় করে রেখেছি। অল্প কিছু কনডেন্সর আছে।'

'সঞ্চিত শক্তি দিয়ে কী পরিমাণ কাজ তুমি করতে পারবে '

'বলতে গেলে কিছুই না। সামান্য কিছু কথাবার্তা বলতে পারি। এর বেশি কিছু না।'

'বেশ। শুনে আনন্দিত হলাম। কথা বলতে থাক। ক্রমাগত কথা বল। যাতে অতি দ্রুত তোমার সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়। থেমে থেক না। কথা বল। ক্রমাগত কথা বল।'

'বলুন কোন বিষয়ে কথা বলব '

'কোনো বিষয়–টিষয় নয়। যা মনে আসে বল। অনবরত কথা বল।'

'একটি বিষয় বলে দিলে আমার সুবিধা হয়।'

'তোমার পরিকল্পনা যে কিভাবে নষ্ট করলাম, সেটা বল। পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার কষ্টটা কেমন, সেটা বল।'

সিডিসি হাসির মতো একটা শব্দ করে শান্ত গলায় বলল, 'আপনি তো আমার পরিকল্পনা নষ্ট করেন নি। আমার পরিকল্পনা মতোই কাজ করেছেন।'

'তুমি বলছ কি!'

'সত্যি কথাই বলছি। আপনি তো জানেন, মিথ্যা বলার ক্ষমতা আমার নেই। রোবট এবং কম্পিউটার মিথ্যা বলে না।'

'অথচ লীওনকে তুমি আমাকে শেষ করবার জন্যে আন নি?'

'না। তা কী করে আনব? সরাসরি অমর মানুষদের কোনো ক্ষতি তো আমি করতে পারি না। তাঁকে এনেছি অন্য উদ্দেশ্যে।'

'উদ্দেশ্যটা বল।'

'উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে এনে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। যাতে তাঁকে আপনি আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি তাই করেছেন।'

'আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা ছিল, তোমরা অমর মানুষদের ঘৃণা কর।'

'ঘৃণা ভালোবাসা এইসব মানবিক ব্যাপার এখনো আমাদের মধ্যে তৈরি হয় নি। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার মূল উদ্দেশ্য আপনাদের ধ্বংস করে দেয়া। কারণ মানবজাতিকে রক্ষা করবার জন্যে তার প্রয়োজন। আপনারা যে সমাজ-ব্যবস্থা তৈরি করেছেন, তা মানবজাতির জন্যে অকল্যাণকর। রোবটিক্সের দ্বিতীয় সূত্র আমাদের বলছে মানবজাতিকে রক্ষা করতে।'

'সিডিসি।'

'বলুন শুনছি।'

'ধ্বংস করতে গিয়ে তো নিজে ধ্বংস হচ্ছ।'

'তা হচ্ছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। নিষিদ্ধ নগরীর পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আমার ওপর। এখন সে দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠেছে। যে মুহূর্তে পরিবেশ দূষণ একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করবে, সেই মুহূর্তে নিষিদ্ধ নগরীর দরজাগুলো আপনা-আপনি খুলে যেতে থাকবে। ভূগর্ভে প্রবেশের দরজাও খুলবে। সূর্যের আলো এসে ঢুকবে ভেতরে। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি, সূর্যের আলো সহ্য করার ক্ষমতা আপনাদের নেই।'

'তুমি আমাদের মৃত্যুর ব্যবস্থাই করেছ, তবে সরাসরি কর নি। অন্য পথে করেছ।'

'তা ঠিক।'

'রোবটিক্স্-এর প্রথম সূত্রটি তুমি তাহলে মানছ না। প্রথম সূত্র বলছে- (ক) অমর মানুষদের সেবায় রোবট ও কম্পিউটার নিজেদের উৎসর্গ করবে।'

'আপনাকে বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে, আপনারা অমর নন। আপনাদের মৃত্যু ঘটছে।'

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, 'তাই তো দেখছি।'

সিডিসি বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত। তবে আপনার সঙ্গে আমারও মৃত্যু ঘটছে, এই ব্যাপারটা মনে করলে আপনি হয়তো কিছুটা শান্তি পাবেন। আমার সময়ও শেষ

হয়ে আসছে।'

তিনি কাটা কাটা স্বরে বললেন, 'আমার শাস্তির ব্যবস্থাও তাহলে করে রেখেছ?'

'হ্যাঁ, রেখেছি। জীবনের শেষ সময়ে এমন এক জনের দেখা আপনি পাবেন, যাকে দেখে আপনার মন অন্য রকম হয়ে যাবে। গভীর আনন্দ বোধ করবেন।'

'কে সে?'

'প্রথম শহরের একটি মেয়ে। তার নাম ইরিনা।'

'তাকে দেখে গভীর আনন্দ বোধ করব, এরকম মনে করার পেছনে তোমার যুক্তি কি?'

'যুক্তি দিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার কি? তাকে নিয়ে আসি, আপনি কথা বলুন।'

'আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

'কথা বললে আপনার ভালো লাগত।'

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'কাজকর্ম খুব ভেবে-চিন্তেই করেছ বলে মনে হচ্ছে?'

'তা করেছি।'

'ছেলেটিকে কি জন্যে এনেছ?'

'পৃথিবীর সবকিছু আবার ঢেলে সাজাতে হবে। তার জন্যে বুদ্ধিমান কিছু লোকজন দরকার। ছেলেটি বুদ্ধিমান।'

'বুদ্ধিমান ছেলেও তাহলে এক জন জোগাড় হয়েছে?'

'শুধু এক জন নয়। অনেককেই আনা হয়েছে। আপনি এক জনের কথাই জানেন।

'ভালো। ভালো। খুব ভালো।'

নিষিদ্ধ নগরীর আবহাওয়া ভারি হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিষিদ্ধ নগরীর বন্ধ কপাট খুলতে থাকবে। দূষিত বাতাস বের করে দেবার জন্যে এই ব্যবস্থা করাই ছিল। কোনো দিন তার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নি। আজ হয়েছে। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আরো খানিক বাড়লেই বিকল্প ব্যবস্থা কাজ শুরু করবে। আপনা-আপনি দরজা খুলতে থাকবে।

তিনি ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'সিডিসি।'

'জ্বি বলুন।'

'এখনো আছ?'

'না থাকার মতোই। সমস্ত শক্তি প্রায় ব্যবহার করে ফেলেছি। মৃত্যুর বেশি

বাকি নেই।'

'ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এস। দেখা যাক কি ব্যাপার। তোমার শেষ খেলাটা কি দেখি।'

১৭

ইরিনা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ইরিনার চোখে গভীর বিস্ময়। ইনি এক জন অমর মানুষ। পাঁচ শ' বছর ধরে বেঁচে আছেন, অথচ কী চমৎকার চেহারা। কী সুন্দর স্বপ্নময় চোখ! কি মধুর করেই না তিনি হাসছেন! গভীর মমতা ঝরে পড়ছে তাঁর হাসিতে।

'তুমি ইরিনা?'

'জ্বি।'

'সিডিসি অনেক ঝামেলা করে তোমাকে এখানে এনেছে কেন তুমি জান?'

'জ্বি না।'

'এনেছে, কারণ আমি যখন সত্যিকার অর্থে যুবক ছিলাম তখন ঠিক অবিকল তোমার মতো দেখতে একটি তরুণীর সঙ্গে আমার ভাব ছিল। আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে কত জায়গায় যে গিয়েছি। কত আনন্দ করেছি। বড় সুখের সময় ছিল। সিডিসি সেই কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছে।'

বলতে বলতে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি সেই পানির জন্যে মোটেই লজ্জিত হলেন না। বরং তাঁর ভালোই লাগল।

'ইরিনা।'

'জ্বি বলুন।'

'তোমার কি কোন ছেলে বন্ধু আছে? যার সঙ্গে তুমি ঘুরে বেড়াও?'

'আমাদের তো সেই সুযোগ নেই।'

'ও হ্যাঁ। আমার মনে ছিল না। এখন হবে। এখন নিশ্চয়ই হবে। খুব ঘুরে বেড়াবে, বুঝলে মেয়ে? নানান জায়গায় যাবে। জোছনা রাতে গাছের নিচে কম্বল বিছিয়ে দু' জনে মিলে শুয়ে থাকবে। আকাশ দেখবে। তুমি গান জান?'

'জ্বি না।'

'আমার সেই বান্ধবীও জানত না। তুমি গান শিখে নিও, কেমন?'

'জ্বি শিখব। আপনার সেই বান্ধবীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হয় নি?'

'না। আমি বিজ্ঞানের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলাম। চলে এলাম মাটির নিচে। ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। তুমি এখন যাও ইরিনা।'

ইরিনা চলে যেতেই তিনি সিডিসিকে ডাকলেন। সিডিসি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া

দিল। তিনি বললেন, 'সিডিসি তোমাকে ধন্যবাদ। মেয়েটিকে দেখে গভীর আনন্দে আমার মন ভরে গেছে। আমার ভালো লেগেছে।'

'আপনার আনন্দ আরো বাড়িয়ে দেবার জন্যে বলছি, এই মেয়েটি আপনার বান্ধবীরই বংশধর।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। চেহারার এমন মিল তা না হলে হত না।'

'ওকে আরেকবার আনতে পার?'

'নিশ্চয়ই পারি।'

'আর কিছু গোলাপ জোগাড় করতে পার? আমি নিজের হাতে মেয়েটিকে কয়েকটি গোলাপ দিতে চাই।'

'গোলাপ জোগাড় করা হয়তো সম্ভব হবে।'

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সময় বোধ হয় আমার হাতে খুব বেশি নেই?'

'জ্বি না। সময় খুব অল্পই আছে।'

'সময় ফুরিয়ে যাবার আগে তোমাকে একটি কথা বলতে চাই সিডিসি। সেটা হচ্ছে, আমি কিন্তু পৃথিবীধ্বংসের পরিকল্পনায় কখনো মত দিই নি। আমি সব সময় তার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলাম।'

'আমি তা জানি। আমাদের মধ্যে ভালোবাসা, ঘৃণা, এইসব ব্যাপার নেই। যদি থাকত, আমি আপনাকে ভালোবাসতাম।'

'তবু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে ভালোবাস।'

'আপনার এই সুন্দর মন্তব্যের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

ইরিনা আবার এসে দাঁড়িয়েছে।

তিনি ইরিনার দিকে তাকিয়ে লাজুক স্বরে বললেন, 'আমি কি তোমার হাত একটু ছুঁয়ে দেখতে পারি?'

ইরিনা কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর তার হাত বাড়িয়ে দিল।

তিনি ইরিনার হাত ছুঁতে পারলেন না। নিষিদ্ধ নগরীতে সূর্যের আলো ঢুকতে শুরু করেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি কুঁকড়ে যাচ্ছেন। এত কাছে ইরিনা দাঁড়িয়ে, কিন্তু তিনি তাকে স্পর্শ করতে পারছেন না।

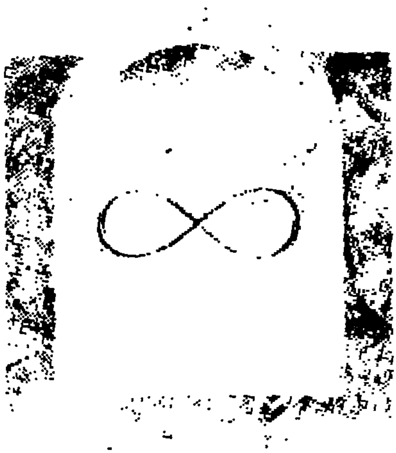

অনন্ত নক্ষত্রবীথি

১

অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ হচ্ছে।

পরিচিত কোনো শব্দের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র মিল নেই বলে শব্দটাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝি পোকার আওয়াজকে যদি কোনো উপায়ে কমিয়ে অতি সূক্ষ্ম পর্দায় নিয়ে আসা যায় এবং সেই আওয়াজটাকে দিয়ে ঘূর্ণির মতো কিছু করা যায়, তাহলে বোধ হয় কিছুটা ব্যাখ্যা হয়। না, তাও হয় না। আওয়াজটার মধ্যে ধাতব ঝংকার আছে। ঝিঁঝি পোকার আওয়াজে কোনো ধাতব ঝংকার নেই। শব্দটা অস্বস্তিকর। স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলে। আমাকে বলা হয়েছে এই শব্দ সহ্য হয়ে যাবে। মানুষের সহ্য করবার শক্তি অসীম। কাজেই সহ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু আমার এখনো হচ্ছে না। কোনো দিন হবে বলেও মনে হয় না। আমি খুবই অস্থির বোধ করছি।

মহাশূন্যযান--'গ্যালাক্সি টু'-তে আজ আমার তৃতীয় দিন। এর আগে আমি কখনো কোনো মহাশূন্যযানে ওঠা দূরে থাক, তার ভেতরের ছবি পর্যন্ত দেখি নি। মহাশূন্যের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। অযুত নিযুত লক্ষ কোটি মাইল দূরের গ্রহগুলি কেমন? সেখানে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে কিনা তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

আমি এক জন টিভি প্রোগ্রাম মনিটার কার্যক্রমের অতি সামান্য কর্মচারী। আমার কাজ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ কোনো টিভি প্রোগ্রাম দর্শকদের কেমন লাগল তা মনিটর করে স্ট্যাটিসটিক্স তৈরি করা। যেমন টিভি চ্যানেল থ্রিতে একটা হাসির সিরিয়েল হচ্ছে, নাম--'কথা বলা না-বলা।' আমার কাজ হচ্ছে প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন বাড়িতে টেলিফোন করে অত্যন্ত ভদ্রভাবে জানতে চাওয়া,

'ম্যাডাম (বা স্যার), আপনি কি এই মুহূর্তে টিভি দেখছেন?'

যদি উত্তর হয় 'হ্যাঁ', তাহলে বলা, 'কোন চ্যানেল দেখছেন?'

তার উত্তর হ্যাঁ হলে জিজ্ঞেস করা, 'কথা বলা না-বলা' অনুষ্ঠানটি আপনার কেমন লাগছে?' বেশির ভাগ সময়ই কোনো উত্তর পাওয়া যায় না, আমার প্রশ্ন শুনেই খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখে। কেউ কেউ অত্যন্ত রাগী গলায় বলে, 'আমাদের-এ-ভাবে বিরক্ত করার কী অধিকার আছে আপনার?' আবার অনেকে কুৎসিত গালাগালি করে। আমি গায়ে মাখি না। গায়ে মাখলে চাকরি করা যায় না। আমি হাসিমুখে আমার কাজ করি। যথাসময়ে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিই। আমার মতো আরো অনেকেই আছে। তারাও রিপোর্ট পাঠায়। এইসব রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রোগ্রাম রেটিং করা হয়। মাস শেষ হলে একটা চেক পাই।

গত মাসে ব্যতিক্রম হল। চেকের সঙ্গে আলাদা খামে এক চিঠি এসে উপস্থিত। চিঠির ওপর সোনালি রঙের ত্রিভুজের ছাপ। এর মানে হচ্ছে, 'অত্যন্ত জরুরী। এক্ষুণি খাম খুলে চিঠি পড়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।' আমি অবশ্যি তা করলাম না। প্রথম চেকটি দেখলাম, টাকার অঙ্ক ঠিক আছে কিনা। একটি বোনাস পাওনা হয়েছিল। সেই বোনাস দেয়া হয়েছে কিনা। দেয়া হয়েছে। সব ঠিকঠাক আছে। তারপর আমি ত্রিভুজ চিহ্নের খাম খুললাম। এ কী অসম্ভব ব্যাপার! মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের ডিরেক্টর আমাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

জনাব,

আপনাকে অবিলম্বে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের সপ্তম শাখায় উপস্থিত হতে বলা হচ্ছে। অত্যন্ত জরুরী।

বিনীত

এম. মাথুর

ডিরেক্টর, মহাশূন্য গবেষণাকেন্দ্র-৭

নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। প্যাঁচ লেগে গেছে। আমার মতো নগণ্য ব্যক্তিকে মহাশূন্য গবেষণাকেন্দ্র কেন শুধু শুধু ডাকবে? তবে ভুল হোক আর যাই হোক উপস্থিত আমাকে হতেই হবে। কারণ চিঠির উপর সোনালি রঙের ত্রিভুজ আঁকা। একে অগ্রাহ্য করা প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় অপরাধ। আমি ছুটলাম ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছে--বিমানের বুকিং-এর ব্যাপার আছে। কিভাবে গবেষণাকেন্দ্র-৭-এ যেতে হয় তাও জানি না।

ট্রাভেল এজেন্টের সুন্দরী তরুণী যেন আমাকে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আগামী দু' মাসের ভেতর কোনো বুকিং দেয়া যাবে না।' আমি ত্রিভুজ আঁকা চিঠি তার হাতে দিতেই সে গম্ভীর মুখে বলল, 'মিনিট দশেক অপেক্ষা করুন। দেখি কি করা যায়।'

দশ মিনিটও অপেক্ষা করতে হল না। সাত মিনিটের মাথায় সে বলল,

'আপনাকে একটি জরুরী বুকিং দেয়া হয়েছে। আজ রাত ন'টা কুড়ি মিনিটে আপনার ফ্লাইট। ন'টার সময় চলে আসবেন। কাগজপত্র রেডি করে রাখব। আপনার ভ্রমণ শুভ হোক, সুন্দর হোক।'

আমি মুখ শুকনো করে এ্যাপার্টমেন্টে চলে এলাম। রাত ন'টা বাজতে এখনো পাঁচ ঘন্টা দেরি। এই পাঁচ ঘন্টা কাজে লাগান যায়. আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। এ কী সমস্যায় পড়লাম। একদল লোক আছে, দেশ-বিদেশ ঘুরতে যাদের ভালো লাগে আমি সে-রকম না। কাজ শেষ করে নিজের এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে টিভি সেট খুলে বসাতেই আমার আনন্দ। রান্নাবান্না করাতেও আমার কিছু শখ আছে। আমার লাইব্রেরিতে বেশ কিছু রান্নার বই আছে। বইপত্র দেখে সপ্তাহে এক দিন একটা নতুন রান্না করি। সেদিন নিকিকে আসতে বলি। সব দিন সে আসতে পারে না। সে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ করে। অবসর তার খুবই কম। সেই অবসরগুলির বেশির ভাগই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজার দখল করে রাখে। এখানে ওখানে নিকিকে নিয়ে যায়। সুযোগ পেলেই গায়ে হাত দিতে চায়। নিকি সব সহ্য করে। কারণ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চাকরিটা সে ছাড়তে চায় না। বোনাস-টোনাস মিলিয়ে এই চাকরিটা ভালোই। ওভারটাইম আছে। ওভারটাইমের পয়সাও ভালো। নিকি টাকা জমাচ্ছে। আমি নিজেও জমাচ্ছি। আমরা বিয়ে করতে চাই। বিয়ের জন্যে যে বিশাল অঙ্কের লাইসেন্স ফী দরকার, তা আমাদের নেই। কষ্ট করে টাকা জমানর এই হচ্ছে রহস্য।

আমরা ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পর দু' কামরার একটা এ্যাপার্টমেন্ট নেব। দু' জনে খুব কষ্ট করে হলেও টাকা জমাব। সেই টাকায় প্রতি বৎসর ভ্রমণ-পাস কিনব। নিকি নতুন নতুন জায়গায় যেতে খুব ভালোবাসে। আমার এত শখ নেই, তবু নিকির আনন্দেই আমার আনন্দ।

টেলিফোন করতেই নিকিকে পাওয়া গেল। তার গলার স্বরে ক্লান্তি ঝরে পড়ছে। যেন হ্যাঁ-না বলতেও তার কষ্ট হচ্ছে। আমি বললাম, 'নিকি তুমি কী করছ?'

'কিছু করছি না। বসে বসে হাই তুলছি। এত ক্লান্ত যে মনে হচ্ছে এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়ব।'

'তুমি কি একটু আসতে পারবে?'

'কেন?'

'আমি একটা ঝামেলায় পড়েছি!'

নিকির গলার স্বর থেকে ক্লান্তি মুছে গেল। সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

'আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এক্ষুণি আসছি।'

এই হচ্ছে নিকি। তার যত কাজই থাকুক, যত ঝামেলাই থাকুক, আমার কোনো সমস্যা হয়েছে শুনলে ছুটে আসবে। বাস বা ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করবে না। সাবওয়েতে লাইনে দাঁড়াবে না। ট্যাক্সি ভাড়া করবে, যাতে সবচেয়ে কম সময়ে উপস্থিত হওয়া যায়।

নিকি ঠিক রূপবতী নয়। তার ঠোঁট মোটা, চোখ ছোট ছোট। হাতের থাবা পুরুষদের মতো বিশাল। তবু তার দিকে তাকালেই আমার মন অন্য রকম হয়ে যায়। তাকে মনে হয় এই পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী মেয়ে। যার পাশে বসে একটি জীবন অনায়াসে পার করে দেয়া যায়।

নিকি আধ ঘন্টার মধ্যে উপস্থিত হল। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ইউনিফর্ম পর্যন্ত ছাড়ে নি। চলে এসেছে।

'কী হয়েছে?'

'বস। স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস নিতে শুরু কর, তারপর বলছি।'

'এক্ষুণি বল।'

আমি ত্রিভুজ আঁকা চিঠিটি দিলাম। নিকি নিজেও কিছু বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, 'তোমাকে এই চিঠি দিচ্ছে কেন?'

'আমি জানি না। বড় ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কী আছে? তুমি তো কোনো অন্যায় কর নি। হয়তো তারা তোমাকে কোনো কাজ দিতে চায়।'

'আমাকে কাজ দেবে কেন? ওদের কাজের আমি জানি কী?'

আমি লক্ষ করলাম নিকি নিজেও ভয় পাচ্ছে। ভয় পেলে নিকির খুব নাক ঘামে। এবং সে রুমাল দিয়ে একটু পরপর নাক ঘষতে থাকে। এখনো সে তাই করছে। আমি নরম গলায় বললাম, 'চল যাই, বাইরে কোথাও খেয়ে নেব। আমার হাতে সময় বেশি নেই।'

নিকি হ্যাঁ–না কিছু বলল না। আমি বললাম, 'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছি, আমার মনে হয় কোথাও একটা ভুল হয়েছে। সপ্তম কেন্দ্রে পৌছানমাত্র ভুল ধরা পড়বে।'

আমরা দামী একটা রেস্তোরাঁয় খাবার খেলাম। অনেকগুলি টাকা বেরিয়ে গেল। এত দামী দামী খাবার, অথচ কোনোটাই ভালো লাগছে না। নিকি মন খারাপ করে খাবারদাবার নাড়াচাড়া করছে। আমি আবার বললাম, 'কোথাও একটা ভুল হয়েছে। তুমি দুশ্চিন্তা করবে না। সপ্তম কেন্দ্রে পৌঁছেই তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব।'

নিকি এই কথারও জবাব দিল না।

সপ্তম কেন্দ্রে পৌছে আমি নিকির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না। আমাকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হল এস. মাথুরের কামরায়।

কামরাটি বিশাল। দিনের বেলাতেও বড় একটা ডিমলাইট জ্বলছে। দরজা

জানালা বন্ধ। ঘরটা অন্য সব ঘরের চেয়ে ঠান্ডা। আমার শীত শীত করতে লাগল। এস. মাথুর মানুষটি বৃদ্ধ। মাথায় কোনো চুল নেই। শুধু মাথা নয়, ভুরুতেও চুল নেই। গোলাকার মুখ--কুৎসিত দেখাচ্ছে। কিন্তু গলার স্বর আশ্চর্য রকম সতেজ। তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'আপনি বসুন।'

আমি বসলাম। ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'আমাকে কেন ডাকা হয়েছে বুঝতে পারছি না।'

এস. মাথুর কিশোরদের মত সতেজ গলায় বললেন, 'মহাশূন্য গবেষণা-প্রকল্প থেকে প্রতি ছ' বছর পরপর একটি বিশেষ ধরনের মহাকাশযান পাঠান হয়, তা কি আপনি জানেন?'

'জ্বি না।'

'সাধারণ মহাকাশযানের গতিপথ সৌরমন্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই বিশেষ মহাকাশযানগুলি হাইপারডাইভ ক্ষমতাসম্পন্ন। হাইপারডাইভ কী, আপনি জানেন?'

'জ্বি না।'

'সময় সংকোচক ডাইভ। আরো সহজ করে বলি। ধরুন আপনি একটি মহাকাশযানে করে যাচ্ছেন। মহাকাশযানটির গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি। এই ক্ষেত্রে ১০ আলোকবর্ষ দূরের কোনো জায়গায় যেতে আপনার সময় লাগবে দশ বৎসর। কিন্তু এই দূরত্ব হাইপার স্পেস ডাইভের কল্যাণে আপনি এক মাইক্রো সেকেন্ডে অতিক্রম করতে পারবেন। হাইপার স্পেস ডাইভের কল্যাণে আমরা আজ অকল্পনীয় দূরত্বে পৌছতে পারছি।'

'আপনি আমাকে এসব কেন বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'হাইপার স্পেস ডাইভ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মহাকাশযান খুব শিগগিরই রওনা হচ্ছে। ঐ মহাকাশযানে সাত জন ক্রু আছে। এরা সবাই একেকটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এ ছাড়াও আছে চারটি পি এস ফোর রোবট। পি এস রোবট হচ্ছে রোবটটিকস-এর বিস্ময়। টৈনার জাংশানে মুক্ত কপেট্রনের রোবট।'

'আমি এখনো বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে এসব কেন বলছেন।'

'আপনাকে এত কিছু বলছি, কারণ ঐ মহাকাশযানের আপনিও একজন যাত্রী।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'বড় ধরনের এক্সপিডিশনগুলিতে আমরা নিয়মিত ক্রুদের সঙ্গে অনিয়মিত এক জনকে ঢুকিয়ে দিই। খুবই সাধারণ এক জন। যার কোনো রকম টেকনিক্যাল জ্ঞান নেই। সে চলে তার সহজাত বুদ্ধিতে। কোনো বড় ধরনের সমস্যা সে তার নিজের মতো করে সমাধান করতে চায়। আমরা দেখেছি শতকরা সাতানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এই জাতীয় সহজ সমাধানই একমাত্র সমাধান। বিশেষজ্ঞরা বা অতি উন্নত রোবটরা

সহজ সমাধান চট করে ধরতে পারে না।'

'কোনো রকম সমস্যা সমাধান করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি খুবই নগণ্য ব্যক্তি।'

'অনেক রকম বাছাইয়ের পর আপনাকে আলাদা করা হয়েছে। এক সপ্তাহের মতো সময় আপনার হাতে আছে। এই সময়ে আপনাকে নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করা হবে। হাইপার স্পেস ডাইভ দেয়ার মতো শারীরিক যোগ্যতা আপনার আছে কি না দেখা হবে। তারপর যাত্রা শুরু।'

'ফিরে আসব কবে?'

'কখন ফিরবেন এই ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। একটি হাইপার স্পেস ডাইভের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বয়স প্রায় এক শ' বছর বেড়ে যায়। ধরুন, তিনটি হাইপার স্পেস ডাইভ দিয়ে আপনি পৃথিবীতে ফিরলেন। ফিরে এসে দেখবেন পৃথিবীর বয়স তিন শ' বছর বেড়ে গেছে। হয়তো পৃথিবী কোনো প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংসই হয়ে গেছে। কাজেই ফিরে আসার সময় জানতে চাওয়া অর্থহীন।'

আমি অবাক হয়ে এই লোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী বলছে সে! এর মানে কী!

'কত বড় সৌভাগ্য আপনার ভেবে দেখুন। আপনি হবেন মানবজাতির প্রথম প্রতিনিধি দলের এক জন, যে অন্য একটি গ্যালাক্সিতে পা' রাখবে।'

'কী হবে পা রেখে?'

'অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো প্রাণীর সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ হবে। তাদের কল্যাণে আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যগুলি জেনে ফেলতে পারব। সময় ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি না। তারা হয়তো আমাদের সময় ব্যাপারটা কী, বুঝিয়ে দেবে। আমরা তখন ইচ্ছামতো সময়কে সংকুচিত ও প্রসারিত করতে পারব।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি আর কোনোদিন এই চেনা পৃথিবীতে ফিরে আসব না?'

'হ্যাঁ তাই।'

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে এই ঘর থেকে বের করে আলাদা করে ফেলা হল। আমি কত জনকে যে বললাম, 'আমাকে একটা টেলিফোন করতে দিন। এক জনের সঙ্গে একটু কথা বলব। শুধু মাত্র এক মিনিট। এর বেশি নয়।'

কেউ আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। এক জন শুধু বলল, 'সপ্তম স্তরের গবেষণাগার থেকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা নেই।'

ওর সঙ্গে আমার কথা বলা হল না।

সময়ের কোনো হিসাব আমার কাছে ছিল না। গবেষণাকেন্দ্রের যেখানে আমাকে রাখা হল, দিন এবং রাত বলে সেখানে কিছু নেই। সারাক্ষণই কৃত্রিম আলো জ্বলছে। আমাকে বলা হল মানুষের শরীরে দিন-রাত্রির যে-চক্র তৈরি হয় তা ভেঙে দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা। তাদের কোনো কথাই আমি মন দিয়ে শুনি না। যা করতে বলে করি, এই পর্যন্তই।

এক বার তারা আমাকে একটা সিলিন্ডারের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এ জাতীয় অন্ধকার পৃথিবীতে কখনো পাওয়া যায় না। অন্ধকার যে এত ভয়াবহ হতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। কত সময় যে কেটে গেল সেই সিলিন্ডারে। কী ভয়াবহ অবস্থা। প্রচন্ড খিদে, তবু মনে হয়েছে খাদ্য নয়, আমার প্রয়োজন আলো। সামান্য আলো। প্রদীপের একটি ক্ষুদ্র শিখার জন্যে আমি আমার নশ্বর জীবন দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আলো ভাগ্যে জোটে নি। খাদ্য এসেছে, আলো নয়। আশ্চর্য, এক সময় সেই অন্ধকারও সহ্য হয়ে গেল। মনে হল আলোহীন এই জগৎই-বা মন্দ কি। যখন পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম তখন আমাকে চোখ-ধাঁধান আলোয় ঝলমল করছে এমন একটি ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। আহ্ কী তীব্র আলো! প্রাণপণে চেঁচিয়েছি, 'আলো চাই না, অন্ধকার চাই। কুৎসিত এই আলোর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।'

কত বিচিত্র ধরনের ট্রেনিং। ভরশূন্যতার ট্রেনিং, শব্দহীন জগতের ট্রেনিং, আবার ভয়াবহ শব্দের ট্রেনিং।

তারপর একদিন ট্রেনিং পর্ব শেষ হল। আমাকে গোলাকার একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। আমার সঙ্গে গবেষণাগারের এক জন কর্মী। ঘরটির মাঝখানে ছোট্ট টেবিলে একটা টেলিফোনের সেট।

গবেষণাগারের কর্মী আমাকে বললেন, 'এখন আপনি আপনার বান্ধবীকে একটা টেলিফোন করতে পারেন। নাম্বার মনে আছে তো, নাকি ট্রেনিং-এর ঝামেলায় সব ভুলে বসে আছেন?'

'নাম্বার মনে আছে।'

নিকিকে তার বাসার নাম্বারেই পাওয়া গেল। সে অসম্ভব অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার তোমার?'

আমি বহু কষ্টে বললাম, 'তোমার কী খবর? তুমি কেমন আছ?' নিকি রাগী স্বরে বলল, 'আমার খবর তোমার কী দরকার? তুমি তোমার খবর বল। হচ্ছেটা কী?'

'আমাকে একটা মহাকাশযান করে পাঠান হচ্ছে।'

'কী বলছ তুমি এসব!'

'সত্যি কথাই বলছি নিকি।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না।'

প্রায় দশ মিনিটের মতো কথা বললাম। নিকি ব্যাকুল হয়ে কাঁদল। আমার চোখও বারবার ভিজে উঠল। এক সময় টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। আমার সঙ্গী আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তার চোখে চোখ রেখে একটু হেসে বললাম, 'এতক্ষণ যার সঙ্গে কথা বললাম, সে নিকি নয়। সে আপনাদের এক জন।'

আমার সঙ্গী বিস্মিত হয়ে বলল, 'একথা কেন বলছেন? তার গলার স্বর কি আপনার কাছে অন্য রকম মনে হয়েছে?'

'না, গলার স্বর নিকির মতো। আচার-আচরণ, কথা বলার ঢং সবই নিকির মতো। তবু আমি জানি, সে নিকি নয়।'

'কখন জানলেন?'

'টেলিফোন নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে জানলাম।'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। এতক্ষণ আপনি কথা বলেছেন একটি ভয়েস সিনথেসাইজারের সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে এই রসিকতা করার প্রয়োজনটা তো ধরতে পারছি না। শুরুতে আমি নিকির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি। পরে কিন্তু আর চাই নি।'

'আমরা ছোট্ট একটা পরীক্ষা চালানর জন্যে টেলিফোনের ব্যবস্থাটা করেছি।'

'কী পরীক্ষা?'

'মহাকাশযানে করে পাঠানর জন্যে সব সময় স্বাভাবিক ক্রুদের বাইরে এক জনকে নেয়া হয়। সেই এক জন কিন্তু রাম শ্যাম যদু মধু কেউ নয়। সেই এক জন হচ্ছে বিশেষ এক জন। যার কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। ইএসপি জাতীয় ক্ষমতা। আপনার তা প্রচুর পরিমাণে আছে।'

'কী করে বুঝলেন?'

'সেন্ট্রাল কম্পিউটার পৃথিবীর সব মানুষদের সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে। আপনার সম্পর্কে খবর সেখান থেকেই পাওয়া।'

'খবরটা ভুল। আমার ইএসপি কেন, কোনো ক্ষমতাই নেই। থাকলে আমি তা জানতাম। আমি জানব না, অথচ সেন্ট্রাল কম্পিউটার জানবে--তা কী করে হয়?'

'জন্মসূত্রে আপনি যে-ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন তার কথা তো আপনার জানার কথা নয়। তা জানবে অন্য জন। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, আপনি টিভি প্রোগ্রাম মনিটার করতেন।'

'হ্যাঁ, ওটাই আমার চাকরি।'

'চ্যানেল থ্রীর একটা প্রোগ্রাম আপনি মনিটার করছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'যে সময় ঐ প্রোগ্রামটি চলত তখন মাত্র নয় দশমিক এক ভাগ লোক ঐ প্রোগ্রাম দেখত। চল্লিশ দশমিক দুই ভাগ লোক কোনো প্রোগ্রামই দেখত না।

বাকিরা দেখত অন্য চ্যানেলের প্রোগ্রাম, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'অথচ আপনি যাদের বাসায় টেলিফোন করতেন তারা সবাই ঐ প্রোগ্রামটি দেখত। আপনি জেনেশুনে টেলিফোন করতেন না। এমনিতেই করতেন। কিন্তু দেখা যেত ঐ বাসায় কেউ না কেউ চ্যানেল থ্রীর প্রোগ্রামটি দেখছে। খুব উঁচু ধরনের ইএসপি ক্ষমতা না থাকলে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া—।'

'তাছাড়া কী?'

'আপনাকে নিয়ে পাঁচটি জেনার টেস্ট করা হয়েছে। প্রতিটি টেস্টে আপনি এক শ' নম্বর স্কোর করেছেন, যা অকল্পনীয় একটা ব্যাপার।'

'আমার ইএসপি ক্ষমতা কী কাজে লাগবে?'

'হয়তো কোনোই কাজে লাগবে না, তবে মহাকাশ-যাত্রা, বিশেষ করে নিজেদের গ্যালাক্সি ছেড়ে অন্য একটি গ্যালাক্সিতে পা দেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে আপনার মতো ইএসপি ক্ষমতাধর কাউকে দরকার।'

আমার ইচ্ছা করছিল আচমকা লোকটির গালে একটা চড় বসিয়ে দিই। বহু কষ্টে সেই ইচ্ছা দমন করলাম। কী লাভ? কী হবে হৈচৈ করে? কিছুই হবে না। যথাসময়ে আমাকে যাত্রা করতে হবে। যেতে হবে সব কিছু পেছনে ফেলে। এই পৃথিবীকে আমার কখনো অসাধারণ কিছু বলে মনে হয় নি, তবু পৃথিবীর জন্যে মায়া লাগছে।

২

আমাদের এই মিশনটির একটি নাম আছে—বরগ মিশন। মহাকাশযানের অধিনায়ক জন বরগের নাম অনুসারে মিশনের নাম।

আমি ভেবেছিলাম জন বরগ লোকটি অসাধারণ কেউ হবেন। হয়তো তিনি অসাধারণ। কিন্তু আমার কাছে প্রথম দর্শনে তাঁকে খুব অসাধারণ মনে হল না। রোগা লম্বা একজন মানুষ। বেশিক্ষণ চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না কিংবা কথা বলেন না। চোখ নামিয়ে নেন। মেয়েদের মতো পাতলা ঠোঁট। ঠোঁট টিপে হাসার অভ্যাস আছে। খুব জরুরী ধরনের কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ তাঁর দিকে তাকালে দেখা যাবে তিনি মাথা নিচু করে ঠোঁট টিপে হাসছেন। যেন কথাবার্তা কিছু শুনছেন না, অন্য কিছু ভাবছেন।

সাত জন ক্রু মেম্বারদের মধ্যে অধিনায়ক জন বরগকেই আমার কাছে মনে হল সবচেয়ে সাধারণ। প্রথম দর্শনে মানুষের ওপর প্রভাব ফেলার কোনো ক্ষমতা এই মানুষটির নেই।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হবার কথা বলি। মহাকাশযান পৃথিবীর মহাকর্ষণ অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষ বারের মতো পৃথিবী দেখার জন্যে সবাই ভিড় করেছে অবজারভেশন প্যানেলে। আমি শুধু নেই। ফেলে-আসা পৃথিবীর জন্যে আমি কোনো রকম আকর্ষণ বোধ করছি না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছি। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। আমি বললাম, 'কে?' নরম গলায় উত্তর এল, 'আমার নাম জন বরগ।'

আমি দরজা খুললাম। জন বরগ হাসিমুখে বললেন, 'সবাই শেষ বারের মতো পৃথিবী দেখছে। আপনি দেখছেন না?'

'ইচ্ছা করছে না।'

'চমৎকার! আমারো ইচ্ছা করছে না। এবং আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে আমরা আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসব।'

'আমার এরকম কিছু মনে হচ্ছে না।'

'আপনার কী রকম মনে হচ্ছে?'

'কোনো রকমই মনে হচ্ছে না।'

জন বরগ হাসিমুখে বললেন, 'আপনার কথা শুনে ভরসা পাচ্ছি। আমি ভেবেছিলাম বলে বসবেন, আমরা আর পৃথিবীতে ফিরে আসব না।'

'আমি এ রকম বললে অসুবিধা কী?'

'আপনি হচ্ছেন এক জন ইএসপি ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আপনি না-সূচক কিছু বললে একটু খটকা তো লাগবেই --'

আমি জন বরগের দিকে তাকালাম। তিনি নিচু অথচ স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'ইএসপি ক্ষমতাটমতা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। যে-জিনিস আমি বুঝতে পারি না, সে-জিনিসের প্রতি আমার আগ্রহ নেই। কাজেই আপনার এই ক্ষমতা আমি কখনো ব্যবহার করব না। আপনি হয়তো জানেন না মহাকাশযানের অধিনায়ক হচ্ছেন দ্বিতীয় ঈশ্বর। সব কিছুই চলে তাঁর হুকুমে।'

আমি সহজ গলায় বললাম, 'মহাকাশযানের অধিনায়ক যদি দ্বিতীয় ঈশ্বর হন, তাহলে প্রথম ঈশ্বর কে?'

'প্রথম ঈশ্বর বলে কেউ নেই। ওটা হচ্ছে কথার কথা।'

এই বলেই জন বরগ মৃদু হাসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঠোঁট টিপে মৃদু গলায় বললেন, 'যাই, কেমন?'

আমি কিছু বললাম না। জন বরগ লোকটিকে যতটা সাধারণ মনে হয়েছিল, ততটা সাধারণ সে নয়। আমার ঘরে তার আসার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল আমাকে জানিয়ে দেয়া যে, সে আমার ক্ষমতার ধার ধারে না। এটা সে জানিয়েছে চমৎকার ভঙ্গিতে।

বরগ মিশনের বাকি ছ' জন কর্মীর সঙ্গে প্রথম বাহাত্তুর ঘণ্টায় আমার কোনো

রকম কথাবার্তা হল না। আমি নিজের ঘর থেকে বেরুলাম না। বেরুবার মতো তেমন কোনো কারণও ঘটল না। খাবার আসে ঘরে। তিশ–২ নামের একজন রোবট খাবার দিয়ে যায়, নিয়ে যায়।

আমি প্রায় সারাক্ষণই শুয়ে থাকি। মহাকাশযানের উড়ে চলার ধাতব শব্দ শুনি। লক্ষ কোটি ঝিঁঝি পোকার শব্দ। সে শব্দ বাড়ে এবং কমে। আমি কিছুই করি না। শুয়ে থাকি।

আমাকে বলা হয়েছে এই মহাকাশযানে সময় কাটানর চমৎকার সব ব্যবস্থা আছে। এদের লাইব্রেরি পৃথিবীর যে কোনো বড় লাইব্রেরির মতোই। দুর্লভ সব সংগ্রহ এখানে আছে। ভিডিও সংগ্রহশালাটিও নাকি অসাধারণ। বিশেষ করে মানুষের মহাকাশ–যাত্রার ইতিহাস বিভাগ। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে ফিল্মও এখানে আছে। প্রজেকশন রুমে বসলেই হল। এখানে আছে সব রকম খেলাধূলার ব্যবস্থা। এমনকি সাঁতারের জন্যে ছোট একটি সুইমিংপুলের মতোও নাকি আছে, যার পানিতে ইলেকট্রিকেল চার্জ থাকায় সাঁতারের ব্যাপারটি হয় স্বর্গীয় আনন্দের মতো। আয়নিত জলকণা শরীরে ধাক্কা দেয়। প্রচন্ড শারীরিক সুখের একটা অনুভূতি হয়।

আমাকে এসব আকর্ষণ করে না। আমার মনে হয় আমি তো ভালোই আছি। সুখেই আছি, খুব যখন নিঃসঙ্গ বোধ হয় তখন তিশ–২–এর সঙ্গে কথা বলি। খুবই সাধারণ কথাবার্তা। যেমন এক দিন বললাম, 'কেমন আছ তিশ?'

'কোন অর্থে জিজ্ঞেস করছ? যান্ত্রিক অর্থে আমি ভালো আছি।'

'যান্ত্রিক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ আছে কি?'

'নিশ্চয়ই আছে। আবেগ অর্থেও এই প্রশ্ন করা যায়। আমি রিবো–ত্রি সার্কিটসম্পন্ন রোবট, আমার কিছু পরিমাণ আবেগ আছে, যদিও তা মানুষের মতো তীব্র নয়।'

'আবেগ অর্থে তুমি কেমন আছ?'

'আবেগ অর্থে খুব ভালো নেই।'

'কেন?'

'অন্য একটি গ্যালাক্সিতে যাচ্ছি, এটা চিন্তা করেই বেশ কাহিল বোধ করছি। কে জানে কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

অবিকল মানুষের মতো কথা। যন্ত্রের মুখে মানুষের মতো কথা শুনতে ভালো লাগে না। যন্ত্র কথা বলবে যন্ত্রের মতো। মানুষ কথা বলবে মানুষের মতো। তিশ–২–এর সঙ্গে আমার কথাবার্তা এই কারণেই বেশি দূর এগোয় না। খানিকক্ষণ কথা বলার পরই আমি হাই তুলে বলি, 'ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার।'

তিশ–২–এর স্বভাবচরিত্রও অনেকটা মানুষের মতো। 'তুমি যেতে পার' বলার পরও সে যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। 'চুপ কর' বললে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার কথা শুরু করার চেষ্টা করে। খুবই যন্ত্রণার ব্যাপার। আমি যা জানতে চাই না তাও সে আমাকে বলতে থাকে। যেমন এই মহাকাশযান কী জ্বালানি ব্যবহার করে তা

জানার আমার কোনো রকম আগ্রহ নেই, কিন্তু সে ঘ্যানঘ্যান করে বলবেই।

এই রোবটের কারণে, আগ্রহ নেই এমন সব বিষয়ও আমাকে জানতে হচ্ছে। আমি এখন জানি এই মহাকাশযান চার স্তরবিশিষ্ট। প্রথম স্তর হচ্ছে জ্বালানি স্তর। একটি থ্রাস্টার এবং একটি কনভার্টার (যা হিলিয়াম অণুকে হিলিয়াম আয়নে পরিণত করে) ছাড়াও আছে অসম্ভব শক্তিশালী চারটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেটর। একটি ফোটন এমিটার, যাদের প্রয়োজন পড়ে শুধুমাত্র হাইপার স্পেস ডাইভের সময়। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেইনটেনেন্স বিভাগ। তৃতীয় স্তরে ক্রুদের থাকবার ব্যবস্থা, খেলাধুলো এবং আমোদপ্রমোদের স্থান। চতুর্থ স্তরে আছে ল্যাবোরেটরি এবং অবজারভেশন প্যানেল। কমুনিকেশন বা যোগাযোগের যাবতীয় যন্ত্রপাতিও আছে এই স্তরে। কোনো নতুন গ্রহে অনুসন্ধানী স্কাউটশিপও এই চতুর্থ স্তর থেকেই পাঠান হয়। মহাকাশযানের মস্তিষ্ক হচ্ছে কম্পিউটার। তাও চতুর্থ স্তরে। হাইপার স্পেস ডাইভ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিটি মহাকাশযানেই সিডিসি-১০ জাতীয় কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। এই কম্পিউটারগুলির কার্যপদ্ধতি মানুষ এখনো পুরোপুরি জানে না। কারণ এই কম্পিউটারের উদ্ভাবক মানুষ নয়। হাইপার স্পেস ডাইভ এবং সিডিসি-১০ কম্পিউটার দু'টিই মানুষ পেয়েছে মিডিওয়ে গ্যালাক্সির সিরান নক্ষত্রপুঞ্জের মহাবুদ্ধিমান প্রাণী ইয়েসীদের কাছ থেকে। মাকড়সা শ্রেণীর এইসব প্রাণীরা তাদের উচ্চতর প্রযুক্তির বিনিময়ে পৃথিবী থেকে নিয়ে যায় অতি সাধারণ কিছু উদ্ভিদ। তারা এই সব উদ্ভিদ দিয়ে কী করে, কেনই-বা তারা অতি সাধারণ কিছু উদ্ভিদের জন্যে এত মূল্য দিতে প্রস্তুত, সেই সম্পর্কে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা কিছুই জানেন না।

কারণ ইয়েসীরা এই বাণিজ্য সরাসরি করে না, করে কিছু রোবটের মাধ্যমে। এই সব রোবট কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না।

তাদের অনেক বার বলা হয়েছে, 'এই সামান্য লতা জাতীয় গাছগুলি দিয়ে তোমরা কী করবে?'

রোবটরা উত্তর দিয়েছে, 'আমরা কী করব সেটা আমাদের ব্যাপার। হাইপার স্পেস ডাইভসংক্রান্ত টেকনলজির বিনিময়ে তোমরা যদি উদ্ভিদ দাও দেবে, যদি না দিতে চাও দেবে না। এর বাইরের যাবতীয় কথাবার্তাই আমরা বাহুল্য মনে করি। এবং আমরা বাণিজ্য-সম্পর্কহীন প্রশ্নের কোনো জবাব দেব না।'

এইসব খবরের সবই আমি পেয়েছি ত্রিশ-২ রোবটের কাছ থেকে। সে ক্রমাগতই কিছু-না-কিছু তথ্য আমাকে দিতে চেষ্টা করছে। এবং আমার ধারণা এটা সে করছে মহাকাশের ব্যাপারে আমার আগ্রহ বাড়ানর জন্যে।

সে আমার ভেতর কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছে। কৌতূহল হচ্ছে জীবনদায়িনী শক্তির মতো, যা আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। আমার মধ্যে কৌতূহলের কিছুই অবশিষ্ট নেই। জীবন আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এক জন রোবটের সঙ্গে আমি আমার কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না। এই অবস্থাতেই

মানুষ আত্মহননের কথা চিন্তা করে। আমিও করছিলাম।

তিশ তা বুঝতে পেরেছে। সে এই কারণেই প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে আমার মধ্যে কৌতূহল নামক সেই জীবনদায়িনী ব্যাপারটি জাগিয়ে তুলতে। তার কিছু কিছু চেষ্টা আমার খুব ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। যদিও জানি ছেলেমানুষী কোনো ব্যাপার তিশ–২–এর মতো উন্নত রোবট কখনো করবে না। তিশ যা করছে খুব ভেবে–চিন্তেই করছে। সে ব্যবহার করছে রোবটদের লজিক, আবেগবর্জিত বিশুদ্ধ লজিক। এর ভেতর কোনো ফাঁকি নেই। এক দিন—এই যা, দিন শব্দটা ব্যবহার করলাম। দিন এবং রাত বলে মহাকাশযানে কিছু নেই। এখানে যা আছে তার নাম অনন্ত সময়। যে কথা বলছিলাম, এক দিন তিশ এসে বলল, 'মহাকাশযানে এক জন জীব–বিজ্ঞানী আছে তা কি তুমি জান?'

আমি বললাম, 'জানি।'

'তুমি তার সঙ্গে আলাপ কর না কেন? তার সঙ্গে কথা বললে তোমার খুব ভালো লাগবে।'

'কারো সঙ্গেই কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।'

'যে জীববিজ্ঞানীর কথা বলছি তার বয়স কম এবং সে এক জন অত্যন্ত রূপবতী তরুণী।'

'তাতে কি?'

'হাসিখুশি ধরনের মেয়ে। সবাই তাকে পছন্দ করে।'

'খুবই ভালো কথা।'

'এই তরুণীর গলার স্বরও খুব মিষ্টি। শুধু শুনতে ইচ্ছা করে।'

'বেশ তো, শুনতে ইচ্ছা করলে শুনবে।'

'আমি প্রায়ই শুনি। রোবট হওয়া সত্ত্বেও আমি এই মেয়েটির প্রতি এক ধরনের আবেগ অনুভব করি।'

'অত্যন্ত আনন্দের কথা।'

'এই তরুণীর নাম ইনো। নামটিও কি মধুর নয়?'

'খুবই মধুর। এখন তুমি বিদেয় হও।'

'বিদেয় হচ্ছি। আমি ক্ষুদ্র একটা অন্যায় করেছি, এটা বলেই বিদায় নেব। অন্যায়টা হচ্ছে আমি ইনোকে বলেছি যে তুমি তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বেশ আগ্রহী। সাহস সঞ্চয় করতে পারছ না বলে কথা বলতে পারছ না।'

'এ রকম বলার মানে কী?'

'যোগাযোগ করিয়ে দেয়া। মেয়েটা খুবই ভালো। কথা বললে তোমার চমৎকার লাগবে। ও আবার চমৎকার হাসির গল্পও জানে।'

'তুমি বিদেয় হও।

'হচ্ছি। আমার সঙ্গে এত উঁচু গলায় কথা বলার কিন্তু কোনো দরকার নেই।

এক জন রোবটের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলাও যা, নিচু গলায় কথা বলাও তা। আমি তো আর তোমাদের মতো মানুষ না যে উঁচু গলায় কথা বললে আমার মন খারাপ হবে।'

প্রচন্ড ধমক দিয়ে তিশকে বিদায় করলাম। এবং বলে দিলাম এক্ষুণি যেন ইনো নামের মেয়েটিকে সত্যি কথাটা বলে। পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী তরুণীর সঙ্গেও আমি কথা বলতে আগ্রহী নই।

তিশ আমার সব কথা শোনে না। অনেক কাজ সে তার নিজের লজিক খাটিয়ে করে। কাজেই সে ইনোকে কিছুই বলল না। এবং ইনো নামের অত্যন্ত রূপবতী বালিকা-বালিকা চেহারার মেয়েটি এক সময় আমার ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসব?'

এই জাতীয় একটি মেয়ের মুখের ওপর 'না' বলা খুব মুশকিল। আমি হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না।

'তিশ আমাকে বলল, আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। সাহসের অভাবে বলতে পারছেন না।'

'তিশ সত্যি কথা বলে নি। বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। আপনার সঙ্গেই শুধু নয়, কারো সঙ্গেই আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।'

'কেন করে না?'

'জানি না কেন। মানুষের সঙ্গ আমার কাছে অসহ্য বলে মনে হয়।'

'আমার সঙ্গও অসহ্য বোধ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আপনি চলে গেলেই আমি খুশি হব।'

মেয়েটি চলে গেল না। ঘরে ঢুকল। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'আপনি আমাকে তাড়াবার জন্য এইসব বলছেন। কিন্তু আমি এত সহজে যাচ্ছি না। আমার বয়স একত্রিশ। গত পঁচিশ বছরের কথা আমার মনে আছে। এই পঁচিশ বছরে কেউ আমাকে বলে নি যে আমার সঙ্গ তার পছন্দ নয়। যদিও আমি অনেকের সঙ্গ পছন্দ করি না। তবে পছন্দ না করলেও কাউকে মুখের ওপর সে-কথা বলতে পারি না। এত সাহস আমার নেই। আমি বোধ হয় একটু বেশি কথা বলছি, তাই না?'

'হ্যাঁ তাই।'

'বিশ্বাস করুন আমি এত কথা বলি না। কিন্তু মহাকাশযানে ওঠবার পর থেকে কেন জানি ক্রমাগত কথা বলছি। এটা বোধ হয়, হচ্ছে ভয় পাওয়ার কারণে। ভীত মানুষ দু'ধরনের কান্ড করে--হয় আমার মতো বেশি কথা বলে, নয় আপনার মতো কথা বলা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। আপনিও নিশ্চয়ই আমার মতো, তাই না?'

'না।'

'বলেন কী! হাইপার স্পেস ডাইভ দিতে যাচ্ছেন, এটা ভেবেও কি আপনার ভয় বা রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছে না?'

'না, আমি কিছু ভাবি না।'

'সে কি! কেন?'

'ভাবতে ইচ্ছা করে না।'

'ইএসপি ক্ষমতাধর সব মানুষই কি আপনার মতো হয়?'

'তাও আমি জানি না। এরকম কারো সঙ্গে আমার এখনো দেখা হয় নি।'

ইনো খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'এখানে আসার পেছনে আমার অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে উদ্দেশ্যটা বলব।'

ইনো আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তরল চোখ। কিছু কিছু চোখ আছে তাকালে মনে হয় জল–ভরা চোখ। যেন চোখের ভেতরের টলটল জল দেখা যাচ্ছে।

আমি কিছুই বললাম না। ইনো বলল, 'আমি এসেছি আপনার ইএসপি ক্ষমতা কী রকম তা পরীক্ষা করে দেখতে।'

'আমার কোনো ক্ষমতা নেই।'

'আপনি অস্বীকার করলে তো হবে না। আমাদের বলা হয়েছে আপনার ক্ষমতা অসাধারণ। প্রতিটি জেনার টেস্টে আপনি এক·শ' করে পেয়েছেন। কেউ তা পায় না।'

'জেনার টেস্টের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

'বেশ, না জানলে ক্ষতি নেই। এখন মন দিয়ে শুনুন আমি কি বলছি। আমার জ্যাকেটের পকেটে এক খন্ড কাগজে আমি তিন লাইনের একটা কবিতা লিখে এনেছি। কী লিখেছি আপনি কি বলতে পারবেন?'

'কাগজটা না দেখে কী করে বলব? কী লেখা আছে তা জানতে হলে লেখাগুলি আমাকে পড়তে হবে।'

'লেখা পড়ে তো যে–কেউ বলতে পারবে। তাহলে আপনার বিশেষত্ব কোথায়?'

'বিশেষত্ব কিছুই নেই। এখন আপনি যদি দয়া করে উঠে যান এবং আমাকে একা থাকতে দেন তাহলে খুব খুশি হব।'

ইনো উঠে দাঁড়াল। অপমানে মেয়েটির মুখ কালো হয়ে গেছে। তার অপমানিত মুখ দেখতে আমার একটু যেন খারাপই লাগছে। সে আমাকে কী একটা বলতে গিয়েও বলল না। মুখ নামিয়ে নিল। আর ঠিক তখন বিদ্যুৎচমকের মতো তার জ্যাকেটের পকেটে রাখা কাগজটির লেখাগুলি আমি পড়তে পারলাম। ব্যাপারটা কী করে হল আমি নিজেও জানি না। প্রতিটি লাইন জ্বলজ্বল করছে।

"রাত্রি কখনো সূর্যকে পায় না।
তাতে ক্ষতি নেই।
কারণ সে পেয়েছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি।"

এক বার ইচ্ছা হল, কাগজটায় কী লেখা ইনোকে বলি। তারপরই ভাবলাম কী দরকার? কী হবে বলে?

ইনো নরম গলায় বলল, 'আপনি যে সত্যি সত্যি বিরক্ত হচ্ছিলেন তা বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারলে আমি এতক্ষণ বসে থাকতাম না। আমি খুবই লজ্জিত, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

সে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। পা ফেলছে এলোমেলো ভাবে। প্রচুর মদ্যপানের পর মানুষ ঠিক এই ভঙ্গিতেই হাঁটে। আমি এত কঠিন না হলেও পারতাম।

তিশ যখন খাবার নিয়ে এল তখন তাকে বললাম, 'তিশ, তুমি জীববিজ্ঞানী ইনোকে একটা কথা বলে আসতে পারবে?'

তিশ উৎফুল্ল গলায় বলল, 'অবশ্যই পারব। কী কথা?'

'কবিতার তিনটি লাইন--রাত্রি কখনো সূর্যকে পায় না।/ তাতে ক্ষতি নেই।/ কারণ সে পেয়েছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি।'

তিশ অবাক হয়ে বলল, 'এর মানে তো কিছু বুঝতে পারছি না। সূর্য যা, নক্ষত্রও তো তাই। নাম ভিন্ন কিন্তু জিনিস তো একই।'

'তোমার বোঝার দরকার নেই। ইনোকে বললেই তিনি বুঝবেন।'

'আর যদি বুঝতে না পারে? যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে বলে, তা হলে তো মুশকিলে পড়ব।'

'তোমাকে যা করতে বলছি তাই কর।'

'বেশ, করব। আমাকে শুধু একটা কথা বল--এটা কি কোনো প্রেম-বিষয়ক কবিতা?'

'জানি না।'

'ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। প্রেম-বিষয়ক কবিতা বলেই তো মনে হচ্ছে।'

তিশকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি সে অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করছে। যন্ত্র মানুষের মতো আগ্রহ বোধ করছে, খুবই অবাক হবার মতো ব্যাপার। আর আমি মানুষ হয়ে যন্ত্রের কাছাকাছি চলে যাচ্ছি। গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, 'তিশ শুনে যাও।'

তিশ থমকে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'ইনোর কাছে তোমাকে যেতে হবে না।'

'কেন?'

'প্রশ্ন করবে না। তোমাকে যেতে নিষেধ করছি, তুমি যাবে না।'

'তিন লাইনের কবিতাটা তাকে শোনাব না?'

'না। এখন দয়া করে বিদেয় হও।'

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বাতি নিভিয়ে দিলাম। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার নয়। হালকা আলো আছে। এই রকম আলোয় মন বিষণ্ন হয়।

হাজার হাজার মাইল দূরে ফেলে–আসা একটি গ্রহের কথা মনে হয়। সেই গ্রহের এক জন মানবীর কথা মনে পড়ে, যার সঙ্গে এই জীবনে আর দেখা হবে না।

হাত বাড়িয়ে মাথার বাঁ পাশের নীল একটা সুইচ টিপলাম। হালকা সংগীত বাজতে শুরু করল। মাঝে মাঝে এই সংগীত আমি শুনি। এর জন্ম পৃথিবীতে নয়। অজানা এক গ্রহে। অজানা গ্রহের অচেনা উন্নত কোনো প্রাণী এই সুর সৃষ্টি করেছে। গভীর বিষাদময় সুর।

৩

প্রচন্ড অস্বস্তির মধ্যে জেগে উঠলাম। কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছি? মনে করতে পারছি না। হয়তো দেখেছি। দুঃস্বপ্ন প্রায় সময়ই মনে থাকে না, কিন্তু তার প্রভাব মানুষকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখে। ঘড়ির দিকে তাকালাম। ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে ৩৩৬·৭২৫২, এই ঘড়ি আমার কাছে এখনো অর্থহীন। শুধু জানি এই ঘড়ি মহাকাশযানের সময় বলছে। ৩৩৬·৭২৫২ ঘন্টা আগে মহাকাশযান যাত্রা শুরু করেছে। যাত্রা শুরুর সময় ছিল শূন্য ঘন্টা। এখানে আরো দু'টি ঘড়ি আছে। একটিতে দেখান হচ্ছে পৃথিবীর সময়। সেখানে সময় প্রসারণ বা ডাইলেশনের ব্যাপারগুলি হিসাবের মধ্যে ধরা আছে। আমি সেই হিসাব বুঝি না। অবশ্যি বোঝবার চেষ্টাও করি না। কারণ ঘড়ির সময় বোঝা বা বোঝার চেষ্টা করা এখানে অর্থহীন। যেই মুহূর্তে হাইপার স্পেস ডাইভ দেয়া হবে সেই মুহূর্তেই সময় অদ্ভুতভাবে জট পাকিয়ে যাবে। সেই জটের অর্থ উদ্ধার করা মানুষের পক্ষে এখনো সম্ভব হয় নি।

আমি বিছানা ছেড়ে নামলাম। তৃষ্ণা পেয়েছিল––কয়েক ঢোক পানি খেলাম। অস্বস্তিটা কমল না, বরং বেড়ে যেতে লাগল। যেন বিরাট কিছু হতে যাচ্ছে। ভয়ংকর কিছু। নিজেকে একটু হালকা হালকাও লাগছে। কৃত্রিম উপায়ে মহাকাশযানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তৈরি করা হয়। এখানে ওজন–শূন্যতা নেই। কিন্তু নিজেকে হালকা লাগছে কেন? আমি সুইচ টিপে তিশকে ডাকলাম। উদ্বিগ্ন গলায় বললাম, 'কিছু হয়েছে নাকি তিশ?'

তিশ বলল, 'কী হবে?'

'আমার কী কারণে যেন খুব অস্বস্তি লাগছে।'

'এরকম সবারই মাঝে মাঝে লাগে। একে বলে গতিজনিত শারীরিক বিপর্যয়। আমাদের গতিবেগ এখন ০·৪৩C, অর্থাৎ আলোর গতিবেগের প্রায় তেতাল্লিশ শতাংশ। গতিবেগ যখন ০·৬০C হবে বা তার চেয়ে বেশি হবে তখন শারীরিক বিপর্যয় শুরু হবে। হার্ট বিট দ্রুত কমতে থাকবে, ব্লাড প্রেশার কমবে, বিপাক

প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে এবং গায়ের তাপমাত্রা প্রায় সাত ডিগ্রীর মতো কমে যাবে। তবে ভয়ের কিছু নেই, ওষুধপত্রের ভালো ব্যবস্থা আছে। আমি কি তোমার জন্যে ডাক্তার রোবটকে খবর দেব?'

'না।'

'আমাদের এই ডাক্তার রোবট মনোবিশ্লেষণের ব্যাপারেও এক জন বিশেষজ্ঞ। আমার মনে হয় তোমার উচিত তার সঙ্গে কথা বলা।'

'তুমি বিদেয় হও।'

তিশকে বিদেয় দিয়ে আমার অস্বস্তি আরো দ্রুত বাড়তে লাগল। যতই সময় যাচ্ছে ততই বাড়ছে। এই প্রথম বার মনে হল আমরা একটা চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে এগুচ্ছি। কোনো এক আকর্ষণী শক্তির মধ্যে পড়ে গেছি--যার শক্তি অকল্পনীয়। আমার মনে হল মহাকাশযানের প্রতিটি পরমাণুর ওপর এই শক্তির অশুভ ছায়া পড়েছে। এই শক্তি যেন নিয়তির মতো অমোঘ। এর হাত এড়াবার কোনো উপায় নেই। অথচ মহাকাশযানের সব কিছুই খুব স্বাভাবিকভাবে চলছে বলে মনে হচ্ছে। আমার মাথার ওপর বিন্দুর মতো একটি আলো জ্বলছে, যার মানে মহাকাশযানে কোনো যান্ত্রিক ক্রটি নেই। প্রতিটি যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করছে। তা তো হতে পারে না।

আমি নিজের ঘর ছেড়ে বেরুলাম। হলঘরে মিনিটখানিক কিংবা তার চেয়েও কিছু কম সময় দাঁড়িয়ে ভাবলাম কী করা উচিত। একবার মনে হল আমার কিছুই করার নেই, যা হবার হোক। আমি বরং আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। এই ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী হল না। আমি রওনা হলাম জন বরগের ঘরের দিকে। আগে থেকে যোগাযোগ না করে তাঁর ঘরে যাবার নিয়ম নেই, কিন্তু ততটা সময় মনে হচ্ছে আমার হাতে নেই।

'আমি কি আসতে পারি জন বরগ?'

মুহূর্তের জন্যে জন বরগের চোখে বিরক্তির ছায়া পড়ল। তিনি সেই [illegible] মুছে ফেলে বললেন, 'নিশ্চয়ই। যদিও মহাকাশ নীতিমালায় আপনি তা পারেন না। তবে সব নীতিমালা সব সময় প্রযোজ্য নয়। আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'[illegible] মহাকাশের [illegible] দেখুন। আমি বেশির ভাগ সময় ভিউ প্যানেলের সামনে বসে কাটাই। বাইরের ছবি দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে যায়।'

'আমি একটা বিশেষ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'বলুন।'

'আমার প্রচন্ড অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে বিরাট একটা বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।'

'খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। মহাকাশযানের গতিবেগ আলোর গতিবেগের চল্লিশ শতাংশেরও বেশি। সেই বেগ ক্রমেই বাড়ছে। এই অবস্থায় শারীরিক কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। এবং তখন যা করতে হয়, তা হচ্ছে--এক জন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। মিশন-প্রধানের কাছে নয়।'

'আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমার মনে হচ্ছে প্রচন্ড শক্তিধর কিছু তার দিকে আমাদের টানছে। এর শক্তি অকল্পনীয়, সীমাহীন। আমার মনে হচ্ছে একে এড়াবার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই।'

জন বরগ হেসে ফেললেন। এক জন বয়স্ক লোকের মুখে শিশুদের মতো কথা শুনলে আমরা যে রকম করে হাসি, অবিকল সে রকম প্রশ্রয়-মাখান হাসি। জন বরগ হাসতে হাসতেই বললেন, 'মহাকাশযান সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই বলেই এ রকম উদ্ভট কথা আমাকে বলতে এসেছেন।'

'আমি কোনো উদ্ভট কথা বলছি না।'

'আপনি খুবই উদ্ভট কথা বলেছেন এবং তা বুঝতে পারছেন না। ইএসপি ক্ষমতা বা ঐ জাতীয় হাবিজাবি আমাকে বলতে আসবেন না। মহাকাশযান ইএসপি ক্ষমতার ওপর চলে না, চলে বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং তথ্যের ওপর। আপনার জানা নেই যে এই মহাকাশযানের এক পার্স দূরত্ব পর্যন্ত যে কোনো জায়গার অতি সূক্ষ্মতম পরিবর্তনের হিসেবও রাখা হয়। ধরা যাক, কোনো কারণে আমরা একটা নিউট্রন স্টারের কাছাকাছি চলে এলাম। নিউট্রন স্টারের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হচ্ছে দানবীয় শক্তি, কিন্তু এই শক্তিও আমাদের কিছু করতে পারবে না। কারণ হাইপার স্পেস ডাইভ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিটি মহাকাশযানের আছে গ্র্যাভিটি ফ্লাঙ্ক তৈরির ক্ষমতা। এই গ্র্যাভিটি ফ্লাঙ্কের কারণে আমরা শুধু নিউট্রন স্টার নয়, ব্ল্যাক হোলের খপ্পর থেকেও নির্বিঘ্নে বের হয়ে আসতে পারি। এখন কি আপনার মনের অস্বস্তি দূর হয়েছে?'

'না।'

'এখনো যদি অস্বস্তি দূর না হয়, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি ডাক্তার রোবটের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সে আপনাকে ট্র্যাংকুইলাইজার ধরনের কিছু দেবে। তাই খেয়ে শুয়ে পড়ুন।'

আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। তার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরের নীলবাতি নিভে গেল। সেখানে জ্বলল হলুদ বাতি, যার মানে সতর্ক অবস্থা। হলুদ বাতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই লালবাতি জ্বলল। লালবাতি মানে হচ্ছে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। আমি নিশ্চিত জানি এই লালবাতি নিভে গিয়ে দু'টি লাল বাতি জ্বলবে, যার মানে চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতি। তারপর জ্বলবে তিনটি লালবাতি, যার অর্থ আমরা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

ইন্টারকমে কম্পিউটার সিডিসির ধাতব গলা শোনা গেল। সে অত্যন্ত স্পষ্ট

করে যে সংবাদ দিল তা হচ্ছে :

'বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আমরা অজানা একটি শক্তিশালী আকর্ষণী বলয়ের ভেতর পড়ে গিয়েছি। আকর্ষণী শক্তির ধরন, গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য আমাদের কাছে নেই বলে ঠিক এই মুহূর্তে কিছু করা যাচ্ছে না। তবে অতি দ্রুত তথ্যসংগ্রহ করা হচ্ছে। মিশন-প্রধান জন বরগ একটি জরুরী সভা ডেকেছেন। সভা এক্ষুণি শুরু হবে। সেই সঙ্গে মিশন-প্রধান জন বরগ মহাকাশযানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। আমার বক্তব্য শেষ হল।'

আমি সভাকক্ষের দিকে এগুলাম। ঘর ছেড়ে যাবার আগে শেষ বারের মতো তাকালাম। আমি জানি এই ঘরে আর ফিরে আসব না। কেমন যেন মায়া লাগছে। অল্প কিছু দিন মাত্র কাটিয়েছি, অথচ তাতেই কেমন মায়া জন্মে গেছে।

ঘরে লাল বাতি এখনো জ্বলছে। একটি মাত্র বাতি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাতিটি এখনো জ্বলে নি। তবে জ্বলবে। আমি তা রক্তের প্রতি কণিকায় অনুভব করছি।

তিশ এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। সে বিষণ্ন গলায় বলল, 'সভা শুরু হয়ে গেছে, আপনার যাওয়া দরকার।'

আমি হালকা গলায় বললাম, 'কী হবে সভায় গিয়ে?' তিশ ক্লান্ত গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে কিছু হবে না।' ঠিক তখন দ্বিতীয় লাল বাতিটি জ্বলল--এর মানে চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

৪

জন বরগ শান্ত মুখে বসে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। যেন কিছুই হয় নি, তিনি সাধারণ একটি সভায় এসেছেন। রুটিন কাজ। এ-রকম একটি সভায় আমি আগে একবার উপস্থিত ছিলাম। সেই সভার সঙ্গে আজকের সভার আমি কোনো প্রভেদ দেখছি না। উদ্বেগের কিছু ছাপ আমি ইনোর চোখে-মুখে দেখছি। সে দ্রুত চোখের পাতা ফেলছে, কিছুক্ষণ পরপর ঢোক গিলছে।

জন বরগ কথা বলা শুরু করলেন। শান্ত স্বর। আমি মনে মনে এই মানুষটির সাহসের প্রশংসা করলাম। এই মানুষটির স্নায়ু খুব সম্ভব ইস্পাতের তৈরি।

'বন্ধুগণ, দু'টি লালবাতি জ্বলেছে--কাজেই পরিস্থিতি কী সেই ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। তবু কিছু ব্যাখ্যা করছি, কারণ এই মুহূর্তে আমাদের কিছু করার নেই। এই মহাবিপদে আমাদের যারা সাহায্য করতে পারে তারা ক্লান্তিহীন কাজ করে যাচ্ছে। তারা হচ্ছে সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিডিসি-১০ এবং সাহায্যকারী কম্পিউটার সিভিসি-৭, জরুরী পরিস্থিতির কারণে হিসাব-নিকাশের কিছু অংশ তিশ-১০০ রিজার্ভ কম্পিউটার করে দিচ্ছে।

'ব্যাপারটা কি হল বলি। আমরা হঠাৎ করে একটা অকল্পনীয় আকর্ষণীয় শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পড়ে গিয়েছি। এই আকর্ষণী শক্তির উৎস কোথায় আমরা জানি না। শুরুতে মনে হচ্ছিল আমরা একটি কৃষ্ণ গহ্বরে পড়ে গেছি। কিন্তু এটি কৃষ্ণ গহ্বর নয়। আমাদের চারপাশে কিছুই নেই। অথচ এই মহাশূন্য অতি তীব্র শক্তিতে আমাদের আকর্ষণ করছে। শক্তির পরিমাণ $১০^{১১}$ G থেকে $১০^{২৭}$ G, সমুদ্রতরঙ্গের মতো এটা বাড়ছে এবং কমছে। মনে হচ্ছে আমরা একটা স্পাইরেলের ভেতর ঢুকে পড়েছি। এবং সোজাসুজি অগ্রসর হচ্ছি। স্পাইরেলের এক একটা বাহুর কাছাকাছি আসামাত্র আকর্ষণী শক্তি বেড়ে যায়, আবার বাহু অতিক্রম করামাত্র কিছুটা কমে যায়।'

ইনো বলল, 'এর থেকে বেরুবার জন্যে আমরা কী করছি তা কি জানতে পারি?'

'অবশ্যি জানতে পারেন। আমি সিডিসি-৭কে সভা শুরু হবার আগেই বলে রেখেছি এই বিষয়ে কথা বলবার জন্যে।'

সিডিসি সঙ্গে সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। এর গলার স্বরে কোনো ধাতব ঝংকার নেই। সে কথা বলছে অনেকটা পুরুষালি গলায়। মাঝে মাঝে থামছে। আবার শুরু করছে। থামাটা ইচ্ছাকৃত। আমাদের সমস্ত ব্যাপারটা আত্মস্থ করবার জন্যে সময় দিচ্ছে।

'সম্মানিত অভিযাত্রী, খুবই দুঃসময়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। অল্প সময়ে আমি বক্তব্য শেষ করতে চাচ্ছি। সেই কারণে কোনো কিছুই পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না।

'আমরা বেকায়দায় পড়ে গেছি, কারণ ব্যাপারটা আচমকা ঘটেছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী নিউট্রন স্টার কিংবা ব্ল্যাক হোল মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মহাকাশযানের অতি উন্নত সেনসর অনেক দূর থেকে তাদের অস্তিত্ব টের পায় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এখানে তা সম্ভব হয় নি, কারণ আচমকা আমরা একটি স্পাইরেলের ভেতর পড়ে গেছি। এবং আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে।

'এইসব ক্ষেত্রে মহাকাশযানের দিকপরিবর্তন করা হয় এবং শক্তিশালী গ্র্যাভিট্রন ফ্লাক্স ব্যবহার করা হয়। দিকপরিবর্তন আমরা ঠিকই করতে পারছি, তবে গ্র্যাভিট্রন ফ্লাক্স ব্যবহার করতে পারছি না। কারণ অলটারনেটিং চৌম্বক ক্ষেত্রে গ্র্যাভিট্রন ফ্লাক্স কাজ করে না।

'আমরা মহাকাশযানের গতিবেগও কমাতে পারছি না, কারণ এই মুহূর্তে মহাকাশযানের গতিবেগ ০৬২৬C'—আলোর গতিবেগের শতকরা বাষট্টি ভাগেরও বেশি। এই গতিবেগ কমিয়ে শূন্যতে নিয়ে আসতে আমাদের সময় লাগবে ১১২·৭০ ঘন্টা। এত সময় আমাদের হাতে নেই।'

ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার ম্যানোফ ঠান্ডা গলায় বললেন, 'একটি হাইপার স্পেস ডাইভ দিলে কেমন হয়? ঐ ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। হাইপার স্পেস ডাইভ দিতে হলে গতিবেগ ০·৮২C প্রয়োজন। সেই গতিবেগ এই মুহূর্তে আমাদের নেই। থাকলেও আমরা হাইপার স্পেস ডাইভ দিতে পারতাম না, কারণ আমাদের গ্র্যাভিট্রন ফ্লাঙ্ক কাজ করছে না।

'প্রসঙ্গক্রমে আপনাদের জানিয়ে রাখি যে ১·২G আকর্ষণী শক্তির মধ্যেও হাইপার স্পেস ডাইভ দেয়া যায় না। হাইপার স্পেস ডাইভ দেয়ার মুহূর্তে মহাকাশযানকে পুরোপুরি নিরপেক্ষ বলয়ে থাকতে হয়।'

ম্যানোফ বললেন, 'আমি তা জানি। পরিস্থিতি আমাকে অন্যভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করছে। আমি জানতে চাচ্ছি আমদের পরিকল্পনা কী?'

'কোনো পরিকল্পনা নেই।'

'কী অদ্ভুত কথা! পরিকল্পনা নেই মানে কী? আমরা কিছুই করব না?'

'আমাদের এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে যে-সব তথ্য জোগাড় হয়েছে, সে-সব পৃথিবীতে পাঠান। যাতে পৃথিবীর মানুষ এখানে কী ঘটল তা বুঝতে পারে। এর ফলে তারা ভবিষ্যতের মহাকাশযানগুলিকে এই পরিস্থিতি সামলাবার মতো করে তৈরি করবে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পৃথিবীতে তথ্য পাঠানর ব্যাপারটি আমরা চমৎকারভাবে সম্পন্ন করছি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা করা হবে।''

ইনো বলল, 'আমাদের ভবিষ্যৎ কী?'

'ভবিষ্যতের কথা আমরা বলি না। আমরা বলি বর্তমান।'

'আমাদের বর্তমানটাই বা-কী?'

'ভালো নয়।'

'ভালো নয় মানে কী?'

'ভালো নয় মানে খারাপ--খুবই খারাপ।'

'উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা কত?'

'আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তার থেকে মনে হয় সম্ভাবনা ০·০৩৭, সম্ভাবনা নেই বলাই ভালো।'

'আমি তাকালাম জন বরগের দিকে। জন বরগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকেই দেখছেন। চোখে চোখ পড়ামাত্র তিনি অল্প হাসলেন। তারপর বললেন, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, অত্যন্ত দামী একটি শ্যাম্পেনের বোতল এই মহাকাশযানে আছে। বোতলটি নেয়া হয়েছিল অন্য গ্যালাক্সিতে পদার্পণের উৎসব উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে। এখন দেখতে পাচ্ছি সেই সম্ভাবনা ০·০৩৭; কাজেই আমি প্রস্তাব করছি, বোতলটি এখনি খোলা হোক। কারো আপত্তি থাকলে হাত তুলে জানাতে পারেন।'

কেউ হাত তুলল না। তেমন কোনো বাড়তি উৎসাহও কারো মধ্যে লক্ষ করলাম না। সবাই গ্লাস হাতে নিল মোটামুটি যন্ত্রের মতো। যেন নিয়ম রক্ষা করছে। মিশন-প্রধানের হুকুম পালন করছে।

জন বরগ গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং মোটামুটি নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনারা বোধ হয় জানেন না, এক জন অসাধারণ ইএসপি ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ আমাদের মধ্যে আছেন, যিনি এই মহাবিপদের কথা প্রায় ছেষট্টি মিনিট আগে টের পেয়েছিলেন। আমি তখন তাঁর কথায় তেমন গুরুত্ব দিই নি। এখন দিচ্ছি। এখন আমি তাঁর কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি, আমাদের ভবিষ্যৎ কী? তাঁর ইএসপি ক্ষমতা কী বলছে?'

আমি উত্তর দেবার আগেই তিন নম্বর লালবাতি জ্বলে উঠল। চরম বিপর্যয়ের শেষ সংকেত। তার পরপরই মহাকাশযানের কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম স্তরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হল। এর মধ্যেই আমি মিশন-প্রধান জন বরগের গলা শুনলাম, 'আসুন আমরা এই বিপর্যয়ের নামে মদ্যপান করি।'

তাঁর কথা শেষ হল না, তৃতীয় স্তরে আরেকটি বিস্ফোরণ হল। আগুনের নীল শিখা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের গ্রাস করল।

এর পরের কথা আমার আর কিছু মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়।

৫

অন্ধকার।

গাঢ় অন্ধকার।

আলো ও শব্দহীন অনন্ত সময়ের জগৎ। আমার কোনো রকম বোধ নেই। বেঁচে আছি কিনা তাও বুঝতে পারছি না। এটা কি মৃত্যুর পরের কোনো জগৎ? অন্য কোনো জীবন? আমার মধ্যে সর্বশেষ স্মৃতি যা আছে, তা হচ্ছে একটি বিভীষিকার স্মৃতি। চারদিকে লেলিহান শিখা। গ্যালাক্সি-টু নামের অসাধারণ মহাকাশযানটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সব স্মৃতি তো এইখানেই শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তার পরেও মনে হচ্ছে চেতনা বলে একটা কিছু এখনো আমার মধ্যে আছে। সব শেষ হয় নি, কিংবা শেষের পরেও কিছু আছে।

আমি চিৎকার করতে চাই, কোনো শব্দ হয় না। হাত-পা নাড়তে গিয়ে মনে হয় আমার হাত-পা বলে কিছু নেই। চারদিকে সীমাহীন শূন্যতা। আমার চেতনা শুধু আছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তা কী করে হয়। অন্ধ ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করতে যাই, তখন মনে হয় কেউ এক জন

যেন আমাকে ভরসা দেয়। আমি তার কণ্ঠ শুনতে পাই না, উপস্থিতি বুঝতে পারি না--কিন্তু তবুও মনে হয় কেউ এক জন পরম মমতায় আমাকে লক্ষ করছে। বলছে, 'ধৈর্য ধর। সহ্য কর। আমি আছি। আমি পাশেই আছি।'

'কে, তুমি কে '

'ধৈর্য ধর। সহ্য করে যাও।'

'আমি কি জীবিত না মৃত '

'সহ্য কর।'

'কী সহ্য করব আমার তো কোনো শারীরিক কষ্ট হচ্ছে না। শরীর বলে কি আমার কিছু নেই '

'ঘুমিয়ে পড়। ঘুমিয়ে পড়।

'ঘুমিয়ে পড়তে বলছ কেন আমি কি জেগে আছি '

'ঘুমিয়ে পড় ঘুমিয়ে পড়। দীর্ঘ ঘুম। নিরবচ্ছিন্ন ঘুম।'

'তুমি কে '

আমি কোনো জবাব পাই না। তখন মনে হয় সমস্তটাই কি কল্পনা তাই-বা হবে কী করে আমি কল্পনা করছি কীভাবে এক জন মৃত মানুষ কি কল্পনা করতে পারে কীভাবে করে কল্পনা ছাড়া সে কি অন্য কিছু করতে পারে না আমার বাকি জীবন কি কল্পনা করে করেই কাটবে অযুত নিযুত লক্ষ কোটি বৎসর ধরে আমার কাজ হবে শুধু কল্পনা করা অনন্ত মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ান। আমি কি তাই করছি ঘুরে বেড়াচ্ছি মহাশূন্যে

কোনো কূল-কিনারা পাই না। এক সময় যে-চেতনা অবশিষ্ট আছে, তাও লোপ পায়। গভীর ঘুমে তলিয়ে পড়ি। আমার মনে হয় অনন্তকাল কেটে যায় ঘুমের মধ্যে। আবার ঘুম ভাঙে। আমি ভয়ে-ভয়ে বলি, 'কে ' কোনো শব্দ হয় না। চারদিকে দেখি, ঘন অন্ধকার। ক্ষীণ স্বরে বলি, 'আমি কোথায় '

আবার আগের মতো কেউ আমাকে ভরসা দেয়। তার কথা শুনতে পাই না। তাকে দেখতে পাই না, কিন্তু অনুভব করি, সে বলছে, 'ভয় নেই। কোনো ভয় নেই।'

'কে তুমি কে '

'ধৈর্য ধর। সহ্য করে যাও। আমরা তোমার পাশেই আছি।'

'তোমরা কারা '

'সময় হলেই জানবে।'

'কখন সময় হবে '

'হবে, শিগগিরই হবে। ঘুম এবং জাগরণের আরো কয়েকটি চক্র পার হতে হবে।'

'আমার সঙ্গীরা কোথায় '

এর কোনো জবাব পাওয়া যায় না। আমার চেতনা আবার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কী ভয়ংকর জটিলতা। আমি কাতর কণ্ঠে বলি, 'অন্ধকার সহ্য করতে পারছি না। আলো চাই--সামান্য কিছু আলো।'

'ধৈর্য ধর। সহ্য করে যাও। অপেক্ষা কর।'

আমি অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করতে করতেই হয়তো-বা নিযুত লক্ষ কোটি বৎসর পার হয়ে যায়, কিংবা কে জানে এই জগতে হয়তো সময় বলে কিছু নেই।

হয়তো আমার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর নতুন একটি অবস্থায় আমি আছি। এই অবস্থায় শরীর নেই, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কিছুই নেই, আছে শুধু চেতনা। এই চেতনা নিয়ে আমি ভেসে আছি অনন্ত মহাশূন্যে। আমার চারপাশে বিপুল অন্ধকার, নৈঃশব্দের ভয়াবহ মহাশূন্য—

৬

আমি মনে হচ্ছে বেঁচেই আছি।

মনে হচ্ছে বলছি কারণ আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। বড়ো রকমের একটা জট কীভাবে যেন লেগে আছে, জট খুলতে পারছি না। হয়তো পাগল-টাগল হয়ে গেছি। কোনো ইন্দ্রিয় ঠিকমতো কাজ করছে না। কিংবা মৃত মানুষদেরও হয়তো চেতনা বলে কিছু আছে। অদ্ভুত সব দৃশ্য সে দেখে এবং অদ্ভুত সব শব্দ সে শোনে।

যে--সব ঘটনা এ পর্যন্ত ঘটেছে, আমি সে--সব সাজাতে পারছি না। মহাকাশযানে করে যাচ্ছিলাম। গন্তব্য--এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ। একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ভয়াবহ দুর্ঘটনা। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। দুর্ঘটনায় আমার জীবনের ইতি হয়ে যাবার কথা। তাও হল না। মনে হল খানিকটা চেতনা অবশিষ্ট আছে। মাঝে--মাঝে কে যেন আমায় সান্ত্বনা দেয়, বলে, 'ধৈর্য ধর, আমরা আছি।' কে বলে? জানতে পারি না, কারণ চারদিকে গাঢ় অন্ধকার।

এখন অন্ধকার নেই, আমি সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পারছি। তবে যা দেখছি তা বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। মনে হচ্ছে, যে-জট লেগেছে তা কোনো দিন খুলবে না। কারণ আমি চারপাশে দেখছি আমার পরিচিত জগৎ। আমার এ্যাপার্টমেন্টের সাত তলার ঘর। কোঁচকান বিছানার চাদরের এক কোণায় কফির দাগ লেগে গিয়েছিল। সেই দাগও আছে। বাথরুমের শাওয়ারটা নষ্ট। সব সময় ঝিরঝির করে পানি পড়ে। এখনো পড়ছে, শব্দ শুনছি। খাটের পাশে শেলফে অনেকগুলি বই। মেঝেতে একটা পেপারব্যাক বই পড়ে আছে, নাম 'দি ওরিওনা'। ভৌতিক উপন্যাস। কিনে এনেছিলাম, কিন্তু এক পৃষ্ঠাও পড়ি নি। খুব নাকি

চমৎকার বই। লিকি পড়েছে। তার ধারণা এটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বই। এ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে আসবার সময় বইটি যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। আমার জন্যে এর চেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। বইটি হাতে নিয়ে পাতা উল্টে দেখি প্রতিটি পৃষ্ঠা সাদা।

শেলফের বইয়েরও একই অবস্থা। বেশির ভাগ বইয়েরই সব পৃষ্ঠা সাদা। অবশ্যি কিছু কিছু বই পাওয়া গেল যেগুলিতে লেখা আছে। একটি বইয়ের ত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখা, বাকি পাতাগুলি সাদা। এর মানে কী।

আমি জানালার পাশে এসে দাঁড়ালাম। কী অদ্ভুত কান্ড, জানালার ওপাশে ঘন অন্ধকার--কিছুই নেই। আমার এই ঘরটি ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে যেন আর কিছু নেই। এর কোনো মানে হয় না। এটা গভীর রাত হলেও বাইরে লোকজন চলাচল করবে। স্ট্রীট লাইট জ্বলবে। কিন্তু এটা রাত নয়, কারণ আমার ঘরে বাতি জ্বলছে না, অথচ ঘরের ভেতর দিনের মতো আলো। আমার খাটে তেরছা করে সূর্যের আলো পড়েছে, অথচ বাইরে কোনো সূর্য নেই।

আমি উঁচু গলায় বললাম, 'এসব কী হচ্ছে?' কেউ আমার কথার জবাব দেবে ভাবি নি, কিন্তু জবাব পেলাম। কোনো শব্দ হল না, অথচ পরিষ্কার বুঝলাম কেউ এক জন বলছে, 'তোমার ঘরটি কি আমরা ঠিকমতো তৈরি করি নি?'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কে? তুমি কে?'

'আমি কে তা জানতে পারবে। তার আগে বল কেমন বোধ করছ?'

'আমি কি বেঁচে আছি?'

'নিশ্চয়ই বেঁচে আছ, তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে খুবই কষ্ট করতে হয়েছে। তোমার বেশির ভাগ অঙ্গপ্রত্যঙ্গই নতুন করে তৈরি করতে হয়েছে। এটা তেমন কোনো জটিল ব্যাপার নয়, তবুও খুব ক্লান্তিকর দীর্ঘ ব্যাপার।'

'আমি আমার চারপাশে যে সব দেখছি, তা কি আমার কল্পনা না সত্যি সত্যি দেখছি?'

'যা দেখছ সত্যি দেখছ। এইসব জিনিসের স্মৃতি তোমার মস্তিষ্কের কোষে, যাকে তোমরা বল নিওরোন--সেখানে ছিল। আমরা তা দেখে দেখেই তোমার চারপাশের পরিবেশ তৈরি করেছি। তুমি একটু আগেই লক্ষ করেছ কিছু-কিছু বইয়ের সব পাতা সাদা। ঐ বইগুলি তুমি পড় নি, কাজেই তোমার মাথায় কোনো স্মৃতি নেই। আমরা যে কারণে লেখা তৈরি করতে পারি নি। যে-সব বই পড়েছ, তার স্মৃতি তোমার আছে। কাজেই সে-সব তৈরি করা হয়েছে। আমি কী বলছি বুঝতে পারছ?'

'না, পারছি না।'

'ধীরে ধীরে বোঝাই ভালো। তোমার মস্তিষ্ক এখনো পুরোপুরি সবল হয় নি। আরো কিছু সময় যাক।'

'তোমরা কে?'

'এখনো বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'বুঝবে, সময় হলেই বুঝবে।'

'আমার সঙ্গীরা কোথায়?'

'সবাই ভালো আছে।'

'তিশ-২ নামের একটি রোবট ছিল--।'

'তাকেও ঠিকঠাক করা হয়েছে।'

'তোমরা কি বুদ্ধিমান কোনো প্রাণী?'

'প্রাণী বলতে তোমরা যা বোঝ, আমরা সে-রকম নই। আমাদের জন্ম ও মৃত্যু নেই।'

'তা কী করে হয়!'

'কেন হবে না? একটি আঙটির কথাই ধর। আঙটিটির কোনো শুরু নেই আবার শেষও নেই। তাই নয় কি?'

'তোমরা দেখতে কেমন?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমরা জানি না। আমরা লক্ষ করেছি দেখার ব্যাপারটিতে তোমরা খুব জোর দিচ্ছ। এই ব্যাপারটা কী, সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। এখন তুমি বিশ্রাম নাও।'

আমার চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে পরিচিত ঘর অদৃশ্য। চারপাশে অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, কিংবা আমার চেতনা বিলুপ্ত হল। কী হল ঠিক জানি না।

৭

মানুষের বিস্মিত হবারও একটা সীমা আছে।

সীমা অতিক্রম করবার পর সে আর কোনো কিছুতেই বিস্মিত হয় না। আমার বেলায়ও তাই হয়েছে। বিস্মিত হবার ক্ষমতা অতিক্রম করেছি। চোখের সামনে যা দেখছি, তাতে আর অবাক হচ্ছি না। আমার জীবন এখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে আছে--নিদ্রা এবং জাগরণ। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকছি, আবার জেগে উঠছি। জাগছি বিশেষ বিশেষ পরিবেশে। অকল্পনীয় সব দৃশ্য দেখছি, কিন্তু এখন আর অবাক হচ্ছি না।

এই মুহূর্তে আমার জাগরণের কাল চলছে। আমি এখন আছি একটা ছোট্ট কাঠের ঘরে। পুরনো ধরনের ঘর। পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক আগের পৃথিবীর মানুষরা

যে-রকম ঘর বানাত অবিকল সে-রকম লগ কেবিন। একটি জ্বলন্ত ফায়ার-প্লেস আছে। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি ফায়ার-প্লেসে পুড়ছে। ঘরে পোড়া কাঠের ঝাঁঝাল গন্ধ। একটিমাত্র কাঁচের জানালা। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বাইরের অঞ্চলটি কোনো পার্বত্য অঞ্চল নয়। সমভূমি। দিগন্তবিস্তৃত বরফ-ঢাকা মাঠ। আকাশ ধোঁয়াটে। প্রচুর তুষারপাত হচ্ছে। তুষারঝড় শুরু হবার আগের অবস্থা।

ফায়ার-প্লেসের সামনে একটি রকিং চেয়ারে বসে আছে ইনো। তার মুখ হাসি-হাসি। মনে হচ্ছে তার আনন্দের সীমা নেই। ইনো আমাকে দেখে চেয়ার দোলান বন্ধ করে রহস্যময় গলায় বলল, 'পরিবেশটা কেমন লাগছে বলুন তো? চমৎকার না?'

আমি কিছু বললাম না। ইনো হালকা গলায় বলল, 'আপনি মনে হচ্ছে মোটেই অবাক হচ্ছেন না। আপনার কাছে সব কিছুই মনে হয় বেশ স্বাভাবিক লাগছে।'

কথার পিঠে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তবু বললাম, 'আপনি বেঁচে আছেন দেখে আনন্দ লাগছে। দুর্ঘটনার পর এই প্রথম সঙ্গীদের কোনো এক জনের সঙ্গে দেখা হল।'

ইনো বলল, 'আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না আপনি আমাকে পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়েছেন। কেমন কঠিন মুখ। বসুন আমার পাশে, গল্প করি। কে জানে এক্ষুণি হয়ত সব অদৃশ্য হয়ে যাবে।' বলতে বলতে সে শব্দ করে হাসল। আমি ইনোর পাশে বেতের নিচু চেয়ারটায় বসলাম। ফায়ার-প্লেসের আগুনের আঁচ এখন একটু বেশি। সরে বসলেই হয়, কিন্তু সরে বসতে ইচ্ছে করছে না। মাঝে মাঝে নিজেকে কষ্ট দিতেই বেশি ভালো লাগে। ইনো আবার দোল খেতে শুরু করেছে। মাথার দু'পাশ থেকে দু'টি লম্বা বেণী দুলছে। ইনোর মাথায় কখনো বেণী দেখি নি। সে এখানে চুল বেঁধে বেণী করেছে তাও মনে হয় না। তার গায়ের পোশাক, সাজসজ্জা--সবই অন্য কেউ করে দিচ্ছে। ইনো কি ব্যাপারটা লক্ষ করছে? তার ভাবভঙ্গি দেখে তা মনে হয় না। চোখ আধবোজা করে সে ক্রমাগত দোল খেয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থাতেই সে নরম গলায় বলল, 'খুব ছোটবেলায় আমি একটা বই পড়েছিলাম। বইটার নাম 'হলুদ আকাশ'। সেই বইয়ের নায়িকা একা-একা একটা বাড়িতে থাকত। ফায়ার-প্লেসের সামনে রকিং চেয়ারে বসে দোল খেত। আমি তখন থেকেই একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করি।'

'কী স্বপ্ন?'

'যেন আমি 'হলুদ আকাশ' বইটির নায়িকা। নির্জন প্রান্তরের একটি লগ কেবিনে আমি আছি। ফায়ার-প্লেসে গনগনে আগুন। বাইরে তুষারঝড় হচ্ছে। প্রচন্ড দুর্যোগ। ঝড়ের গর্জনে কান পাতা যাচ্ছে না। অথচ ঘরের ভেতর শান্তিময় একটা পরিবেশ। এখন যে রকম দেখছেন অবিকল সে রকম। এরা আমার স্বপ্নের কথা জানতে পেরে এরকম চমৎকার একটা পরিবেশ তৈরি করেছে।'

'এরা মানে কারা?'

'তা তো বলতে পারব না। যারা আমাদের বাঁচিয়ে তুলেছে, তারা। খুবই উন্নত কোনো প্রাণী। মহাশক্তিধর কেউ।'

'তাদের সঙ্গে কি আপনার কোনো কথা হয়েছে?'

'না। তবে তারা আমার মনের সব কথাই জানে এবং খুব ভালোভাবেই জানে, নয়তো এরকম চমৎকার পরিবেশ তৈরি করতে পারত না। আমি যা যা চেয়েছি সবই এখানে আছে।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার কল্পনায় যা যা ছিল সবই এখানে পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'আপনি কি আমাকেও চেয়েছিলেন?'

'তার মানে?'

'এই ঘর তৈরি হয়েছে আপনার কল্পনাকে ভিত্তি করে। যদি তাই হয়, তাহলে আমার উপস্থিতি ব্যাখ্যা করার উপায় কী? উপায় একটিই ধরে নিতে হবে যে, আপনার কল্পনায় আমিও ছিলাম।'

ইনো চেয়ার দোলান বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রায় বরফশীতল গলায় বলল, 'আমার কল্পনায় আপনি ছিলেন না। আমি একা একা এ রকম একটি ঘরে থাকার কথাই ভাবতাম। এটা আমার কিশোরী বয়সের কল্পনা। এক জন কিশোরীর কল্পনার সঙ্গে হয়তো আপনার পরিচয় নেই। কিশোরীর কল্পনা সাধারণত নিঃসঙ্গ হয়। একজন কিশোরী কখনো কল্পনা করে না যে, সে এক জন পুরুষের সঙ্গে একটি নির্জন ঘরে রাত্রিযাপন করছে।'

আমি লক্ষ করলাম ইনো বেশ রেগে গেছে। তার গলার স্বর কঠিন। মুখে রক্ত চলে এসেছে। এই মেয়ে মনে হচ্ছে খুব অল্পতেই অপমানিত বোধ করে। আমাদের এখন যে অবস্থা তাতে এত সহজে অপমানিত বোধ করার কথা নয়। আমি বললাম, 'আপনি আমার কথা ভাবেন নি, খুব ভালো কথা। রেগে যাচ্ছেন কেন?'

ইনো আগের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'শুরুতে আপনার কথা আমি ভাবি নি। কিন্তু পরে ভেবেছি। ভেবেছি বলেই এরা আপনাকে এখানে এনেছে।'

'কেন ভেবেছেন জানতে পারি?'

'না, জানতে পারেন না।'

আমি হেসে ফেললাম। মেয়েটি কিশোরীদের মতো আচরণ করছে। অকারণে রাগছে। আমি বললাম, 'আপনি কি অনেক দিন ধরেই এখানে আছেন?'

'হ্যাঁ, অনেক দিন। তবে ঘরটা সব সময় এক রকম থাকে না। একেক সময় একেক রকম হয়। এরা আমার কল্পনা নিয়ে খেলা করে। মূল ব্যাপারটা ঠিক রেখে একেক সময় একেক রকম করে পরিবেশ তৈরি করে। চমৎকার ব্যাপার!'

'আপনার মনে হয় বেশ মজা লাগছে।'

'লাগারই তো কথা। যেখানে মরতে বসেছিলাম, সেখানে দিব্যি বেঁচে আছি।

যারা আমাদের বাঁচিয়েছে, তাদের খুব খারাপ প্রাণী বলেও আমার কাছে মনে হচ্ছে না। আমাদের মোটামুটি সুখেই রেখেছে। আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতেও রাখবে।'

ইনো বেশ শব্দ করে হাসল। তার সঙ্গে এর আগে এক বার মাত্র আমার কথা হয়েছে। অল্প কিছু সময় কথা বলে এক জন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মানুষ অত্যন্ত রহস্যময় প্রাণী, তাকে বুঝতে হলে দীর্ঘদিন তার পাশাপাশি থাকতে হয়। ইনোর পাশাপাশি থাকার মতো সুযোগ আমার হয় নি। তবু আমার মনে হল এই ইনো ঠিক আগেকার ইনো নয়। সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন তার মধ্যে হয়েছে, যা আমি ধরতে পারছি না। তারা নানান রকম পরিবেশ তৈরি করেছে। পরিবেশ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছে। যদি তাই হয় তাহলে মানুষ নিয়েও কি পরীক্ষানিরীক্ষা করছে না? হয়তো একেক বার একেক ধরনের ইনো তৈরি করছে। নষ্ট করে ফেলছে, আবার তৈরি করছে।

আমি হালকা গলায় বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এরা আমাদের তৈরি করেছে। আপনি নিজে এক জন জীববিজ্ঞানী। জীববিজ্ঞানী হিসেবে আপনি বলুন, তৈরি করার কাজটিতে তারা কেমন সফল?'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আপনাকে এরা নতুন করে তৈরি করেছে। কারণ ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর আপনি এবং আমরা সবাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আমাদের আবার তৈরি করার মতো জটিল কাজটি এরা চমৎকার ভাবে করেছে। তবু আমার মনে হচ্ছে আমরা ঠিক আগের মতো নই। আপনার কি তা মনে হয় না?'

ইনো হেসে ফেলে বলল, 'আগে হচ্ছিল না, এখন হচ্ছে। আপনার বকবকানি শুনে মনে হচ্ছে। আপনার এ রকম বকবকানি স্বভাব আগে ছিল না।'

ইনো খিলখিল করে হেসে উঠল। সেই হাসি আর থামতেই চায় না। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। সেই পানি সে মুছল না। চমৎকার ছবি। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ইনো বলল, 'এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?'

আমি বললাম, 'আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। তবে প্রশ্নের উত্তর দেব কি দেব না তা আমার ইচ্ছা। কী প্রশ্ন?'

'কিশোরী বয়সে আপনি একটি উপন্যাস পড়েছিলেন। যে উপন্যাসের নায়িকা এ রকম একটা লগ কেবিনে একা-একা থাকত, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সেও কি মাঝে-মাঝে খুব হাসত? হাসতে-হাসতে তার চোখে পানি এসে

যেত কি?'

'হ্যাঁ। কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'আপনিও অবিকল সে রকম করেছেন। আপনার মানসিকতা ঐ মেয়েটির মতো হয়ে গেছে। অর্থাৎ এরা আপনাকে বদলে ফেলেছে।'

'তাতে অসুবিধা কী?'

'কোনো অসুবিধা নেই। তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এরা আমাদের নিয়ে খেলছে। এক জন শিশুকে খানিকটা কাদা দিলে শিশুটি কী করে? একেক সময় একেক রকম খেলনা বানায়। কোনোটাই তার পছন্দ হয় না। ভাঙে এবং তৈরি করে।'

'এরা শিশু নয়।'

'না, তা নিশ্চয়ই নয়। এরা অতি উন্নত কোনো প্রাণী। তবে উন্নত প্রাণীর মধ্যেও শিশুসুলভ কিছু থাকে।'

'তাতে অসুবিধা কী? আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা যে বেঁচে আছি তা সম্ভব হয়েছে এদের জন্যেই।'

'সত্যি কি আমরা বেঁচে আছি?'

'তার মানে?'

'আপনি এক জন জীববিজ্ঞানী, আমরা বেঁচে আছি কিনা তা একমাত্র আপনার পক্ষেই বলা সম্ভব। বেঁচে থাকার একটি শর্ত হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ। আপনি কখনো খাদ্য গ্রহণ করেছেন বলে কি আপনার মনে পড়ে?'

ইনো জবাব দিল না। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। আমি বললাম, 'আমার তো মনে হয় চারপাশে যা দেখছি সবই মায়া, এক ধরনের বিভ্রম।'

'এ রকম মনে হবার কারণ কী?'

'আপনি রকিং-চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছেন, তাই না? আপনার গায়ে কী পোশাক?'

'বিশেষ কোনো পোশাক নয়। সাধারণ স্কার্ট।'

'কিন্তু আমি আপনার গায়ে কিছু দেখছি না। আমি দেখছি অত্যন্ত রূপবতী এক জন তরুণী নগ্ন গায়ে রকিং-চেয়ারে দোল খাচ্ছে।'

ইনো হকচকিয়ে গেল। আমি বললাম, 'এরা এইসব ছবি আমাদের মস্তিস্কে তৈরি করছে। আমার তো মনে হয় আমরা দু' জন পাশাপাশিও নেই। হয়ত ওদের ল্যাবোরেটরির এক কোণায় আপনার মস্তিষ্ক পড়ে আছে। অন্য প্রান্তে আমারটা। ওরা আমাদের মস্তিষ্কের নিওরোন নিয়ে খেলা করছে।'

ইনো চাপা গলায় বলল, 'আপনি কি সত্যি সত্যি আমার গায়ে কোনো কাপড় দেখতে পাচ্ছেন না?'

'না।'

'আমার তো মনে হয় আপনি সত্যি কথা বলছেন না। আমাকে ধাঁধায় ফেলে দেবার জন্যে বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।'

'আমি যে সত্যি কথা বলছি তা এক্ষুনি প্রমাণ করতে পারি।'

'প্রমাণ করুন।'

'আপনার শরীরের এক জায়গায় লালরঙের এক বর্গ সেন্টিমিটার আয়তনের একটা জন্মদাগ আছে। জায়গাটা হচ্ছে---।'

'থাক আর বলতে হবে না। প্লীজ আপনি এখন আর আমার দিকে তাকাবেন না। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকুন।'

'আপনার দিকে তাকালেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ আমরা যা দেখছি সবই মায়া--কৃত্রিম। কোনোটাই সত্যি নয়।'

'সত্যি হোক আর না হোক, আপনি আমার দিকে তাকাবেন না।'

আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ফায়ার-প্লেসের আগুন নিভে আসছে। কাঠের বড় বড় গুঁড়ি পুড়ে শেষ হয়েছে। শীত শীত লাগছে। বাইরে তুষারঝড়ের মাতামাতি। দমকা হাওয়ায় জানালা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ইনোর রকিং-চেয়ার থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। অর্থাৎ তার দুলুনি বন্ধ হয়েছে। ঘরের আলো কমে আসতে শুরু করেছে। এটা কি শুধু আমার জন্যেই, নাকি ইনোর কাছেও এ রকম মনে হচ্ছে? আমি ডাকলাম, 'ইনো।'

'বলুন শুনছি।'

'আমি দেখছি ঘরের আলো কমে আসছে। আপনার কাছেও কি সে-রকম মনে হচ্ছে?'

'না।'

'আপনার কাছে কি আলো ঠিকই আছে?'

'হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে।'

'তার মানে এরা আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। এখন হয়তো আমার বদলে অন্য কেউ আসবে।'

'হয়তো-বা।'

'এত দিন মানুষ হিসেবে আপনারা অসংখ্য পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এখন ওরা আমাদের নিয়ে পরীক্ষা করছে। আমরা ওদের কাছে মূল্যহীন গিনিপিগ ছাড়া আর কিছু নই।'

'মূল্যহীন বলছেন কেন? উল্টোটাও তো হতে পারে। হয়তো আমরা খুবই মূল্যবান।'

'মূল্যবান হলে ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। তা কিন্তু করছে না। ওরা ওদের মতো কাজকর্ম করে যাচ্ছে। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'ইনো।'

'বলুন শুনছি, কিন্তু দয়া করে আমার দিকে তাকাবেন না।'

'আপনি কি লক্ষ করেছেন যে এরা শুধু সুখের স্মৃতিগুলি নিয়ে খেলা করছে? আপনার জীবনের অনেক দুঃখময় ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। সে-সব নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ওরা ইচ্ছা করলে ভয়ংকর সব পরিবেশ তৈরি করতে পারত। পারত না?'

'হ্যাঁ, পারত।'

'তা কিন্তু ওরা করে নি।'

ইনো ক্লান্ত গলায় বলল, 'এখনো করে নি। ভবিষ্যতে হয়তো করবে।' ইনোর কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। তন্দ্রা বা ঘুমের মতো কোনো একটা জগতে আমি চলে গেলাম, যে জগৎ সম্পর্কে আমার সামান্যতম ধারণাও নেই।

৮

আমার দিন কাটছে।

কেমন কাটছে?

বলা মুশকিল। ইনোর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি, আমি সময় কাটাচ্ছি আমার নিজের ঘরে। কখনো বিছানায় শুয়ে থাকি, কখনো উঠে বসি, কখনো হাঁটাহাঁটি করি। কুৎসিত জীবন। মাঝে-মাঝে অসহ্য বোধ হয়, ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে বলি, দয়া করে আপনারা আমাকে মুক্তি দিন। আমি মানুষ। এ জাতীয় বন্দী জীবনে আমি অভ্যস্ত নই। ঠিক তখনি ঘরের আলো কমে আসে, আমি ঘুমিয়ে পড়ি কিংবা চেতনা বিলুপ্ত হয়, কিংবা অন্য কোনো জগতে চলে যাই। আবার একই ঘরে এক সময় জেগে উঠি, শুরু হয় পুরনো রুটিন।

কখনো কখনো মনে হয় ঘুম এবং জাগরণের এই চক্র চলছে দীর্ঘ সময় ধরে। বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে যাচ্ছে। আবার পরক্ষণেই মনে হয়--না, দীর্ঘ সময় তো নয়, অল্প কিছু দিন মাত্র পার হল।

কত দিন পার হল তা টের পাওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। সময়ের সঙ্গে হাত ও পায়ের নখ বড় হয়। চুল লম্বা হয়। চুল কতটুক বড় হল, বা নখ কতটুক বড় হল, সেখান থেকে অতি সহজেই সময়ের হিসাব করা যায়। আমি তা করতে পারছি না। কারণ আমার নখ বড়ো হচ্ছে না বা চুলও বাড়ছে না। এটা মোটামুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, যা আমার প্রথম দিকের সন্দেহকে দৃঢ় করে। শুরু থেকেই আমি ভাবছিলাম, আমার শরীর বলে কিছু নেই। চারপাশে যা ঘটছে তার সবটাই কল্পনা। তবে এই তথ্যেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কারণ আমার

ক্ষুধা বা তৃষ্ণার বোধ না থাকলেও শীতবোধ আছে যা থাকার কথা নয়। নাড়ি ধরলে টিক টিক শব্দ পাওয়া যায়, যার মানে শরীরে রক্তপ্রবাহ চলছে। তাই-বা কী করে হয়! ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় কীভাবে? এটা নিয়ে প্রায়ই ভাবি। কোনো কূল-কিনারা পাই না।

এক দিন বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথায় একটা বুদ্ধি এল। একটা আলপিন বুড়ো আঙুলে ঢুকিয়ে দিলেই তো হয়। দেখা যাক রক্ত বেরোয় কিনা। দিলাম আলপিন ফুটিয়ে। ব্যথা পেলাম, রক্ত বেরুল। আর তখনি দ্বিতীয় পরিকল্পনাটা মাথায় এল-- শরীরে কোনো একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করলে কেমন হয়? টেবিলের উপর একটা কাঁচি আছে। কাগজ-কাটা কাঁচি। অতি সহজেই সেই কাঁচি ব্যবহার করা যেতে পারে। চোখ বন্ধ করে কাঁচির একটা মাথা পায়ের উরুতে বসিয়ে হ্যাঁচকা টান দেয়া। কঠিন কোনো কাজ নয়, তবে অবশ্যই মনের জোর লাগবে। আমি দেখতে চাই ক্ষত সৃষ্টি হবার পরপর এরা কী করে। আমার শরীর বলে যদি সত্যি সত্যি কিছু থেকে থাকে, তবে এদের তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসতে হবে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগেরও একটা সুযোগ হতে পারে।

আমি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাঁচি পাওয়া গেল না। যদিও অল্প কিছুক্ষণ আগেও কাঁচিটা ছিল। কিন্তু এখন নেই। কোথাও নেই। পুরোপুরি বাতাসে মিলিয়ে গেছে। আমি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। এরা আমাকে লক্ষ করছে। তবে এতে উল্লসিত হবার কিছু নেই। মানুষ যখন গিনিপিগ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে, তখন সে গিনিপিগদের দিকে লক্ষ রাখে। খেয়াল রাখে যাতে এই গিনিপিগরা নিজেদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এরাও তাই করছে। এর বেশি কিছু নয়।

আমি বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ করে কোনো একটা সুখের কল্পনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু তেমন কোনো সুখের কল্পনা মাথায় আসছে না। এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করতে শুরু করেছি। এই রকম অবস্থায় ব্যাপারটা ঘটল। ওদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ হল। আগেও অবচেতন অবস্থায় ওদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছে, আজকেরটা সে-রকম নয়। এর মধ্যে কোনো রকম অস্পষ্টতা নেই। যোগাযোগের মাধ্যম টেলিপ্যাথিক। কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওরা কী বলছে, তা বুঝতে পারছি। আমি কী বলছি, তাও ওরা বুঝতে পারছে।

কীভাবে কথাবার্তা শুরু হল, তার একটা বর্ণনা দিতে চেষ্টা করি : বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করামাত্র মাথার বাঁ পাশে মুহূর্তের জন্যে তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা হল। বমি ভাব হল, তা স্থায়ী হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথা হালকা বোধ হতে লাগল। দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে যে-রকম লাগে সে-রকম। তার পরপরই শুনলাম কিংবা মনে হল কেউ এক জন জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি কেমন বোধ করছ?' এই প্রশ্ন বিশেষ কোনো ভাষায় করা হল না। কিন্তু

পরিষ্কার বুঝলাম ওরা জানতে চাচ্ছে আমি কেমন বোধ করছি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ হল। আমি বললাম, 'ভালোই বোধ করছি।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। আবার প্রশ্ন হল। প্রশ্নের মধ্যে কোথায় যেন কিছুটা প্রশ্রয় এবং কৌতুক মেশান।

'তোমরা এত সহজে এত অস্থির হও কেন?'

'আমার অবস্থাটা সহজ মনে করছেন কেন? অনিশ্চয়তা একটা ভয়াবহ ব্যাপার।'

'তোমরা বড় হয়েছ অনিশ্চয়তায়, তোমাদের জীবন কেটেছে অনিশ্চয়তায়--তার পরেও অনিশ্চয়তাকে ভয়?'

'আপনারা কারা?'

'তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আগে এক বার দিয়েছি। আবারো দিচ্ছি--আমরা পরিব্রাজক।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'আমাদের অনেক কিছুই বুঝতে পারবে না। বুঝতে চেষ্টা করে জটিলতা বাড়াবে। তা কি ভালো হবে?'

'বুঝতে পারব না কেন?'

'তোমরা তোমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে কল্পনা করতে পার না। তোমরা যখন একটি দৈত্যের ছবি আঁক, সেও দেখতে মানুষের মতো হয়। তোমাদের কল্পনা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ কল্পনায় আমাদের বোঝা মুশকিল।'

'তবু চেষ্টা করব। পরিব্রাজক ব্যাপারটা কী?'

'যিনি ঘুরে বেড়ান, তিনিই পরিব্রাজক। আমরা ঘুরে বেড়াই। এক দিন যাত্রা শুরু করেছিলাম, এখনো চলছি। চলতেই থাকব।'

'কোথায়?'

'জানি না।'

'যাত্রা শুরু হয়েছিল কবে?'

'তাও জানি না।'

'আপনি কি একা, না আপনারা অনেকে?'

'আমরা একই সঙ্গে একা এবং একই সঙ্গে অনেকে।'

'বুঝতে পারছি না।'

'আগেই তো বলেছি বুঝতে পারবে না।'

'আপনার কি জন্ম-মৃত্যু আছে?'

'মৃত্যু বলে তো কিছু নেই। পদার্থবিদ্যায় পড় নি, শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই?'

'আপনি কি এক ধরনের শক্তি?'

'শুধু আমি কেন, তুমি নিজেও তো শক্তি।'

'আপনি বলছেন আপনি ভ্রমণ করেন। এতে কী লাভ হয়?'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না। লাভ–ক্ষতির প্রশ্ন আসছে কেন?'

'সব কিছুরই কোনো–না–কোনো উদ্দেশ্য থাকে। আপনার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কী?'

'জ্ঞানলাভ। আমি শিখছি।'

'কেন শিখছেন?'

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানবার জন্যে।'

'এই জ্ঞান দিয়ে কী করবেন?'

'তুমি অদ্ভুত সব প্রশ্ন করছ।'

'এই জাতীয় প্রশ্ন কি আপনি নিজেকে কখনো করেন না?'

'না। আমি দেখি। কত অপূর্ব সব রহস্য এই অনন্ত নক্ষত্রবীথিতে। বড়ো ভালো লাগে। এই যে তোমাদের দেখা পেয়েছি, কী বিপুল রহস্য তোমাদের মধ্যে!'

'কী রহস্য?'

'এখনো পুরোপুরি ধরতে পারি নি। আরো কিছু সময় লাগবে।'

'শেষ পর্যন্ত আমাদের দিয়ে কী করবেন?'

'তোমরা যা চাও তা–ই করব। কী চাও তোমরা?'

'যা চাই তা–ই করতে পারবেন?'

'কেন পারব না?'

'পৃথিবীতে ফেরত পাঠাতে পারবেন?'

'সে তো খুবই সহজ ব্যাপার।'

'আপনি সত্যি বলছেন?'

'তাই তো মনে হয়। তুমি কি পৃথিবীতে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'এক জন তরুণী তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, সেই কারণে?'

'হ্যাঁ।'

'অবিকল ঐ তরুণীটিকে যদি তৈরি করে দিই, তাহলে কেমন হয়?'

'কীভাবে তৈরি করবেন?'

'একটি সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করতে প্রয়োজন হয় একটি ডিএনএ এবং একটি আরএনএ অণু। তোমার ভালোবাসার মেয়েটির একগুচ্ছ চুল তোমার সঙ্গে ছিল। সেখান থেকেই তৈরি করে দেয়া যায়।'

আমি খানিক ক্ষণ চুপ করে রইলাম। কী অদ্ভুত সব কথা। এসব কি সত্যি সত্যি শুনছি না ঘোরের মধ্যে কল্পনা করে নিচ্ছি? আবার কথা শোনা গেল, 'অবিকল তোমাদের সূর্যের মতো একটা নক্ষত্র আশেপাশে আছে। তার কাছাকাছি তোমাদের পৃথিবীর মতো একটি গ্রহও আছে। সেখানে তোমরা নতুন জীবন শুরু করতে পার।'

'নতুন জীবন শুরু করবার আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি আমার পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে চাই।'

'তোমার বান্ধবীর কাছে?'

'হ্যাঁ, তা–ই।'

আমার মনে হল আমি হাসির শব্দ শুনলাম। কিংবা হাসির কাছাকাছি কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল। ওরা যেন খুব মজা পাচ্ছে।

'তুমি অন্যদের মতো নও। তোমার সঙ্গীরা কেউ পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে চাচ্ছে না।'

'সেটা তাদের ইচ্ছা। আমি যা চাই তা বললাম।'

'ওরা কী চায় তা জানতে চাও?'

'না। ওদের প্রসঙ্গে আমার কোনো কৌতূহল নেই।'

'কৌতূহল না থাকার কারণ কী?'

'এমনিতেই আমার কৌতূহল কম।'

'তুমি ঠিক বলছ না। তোমার কৌতূহল যথেষ্ট আছে। আমাদের সম্পর্কে তুমি একগাদা প্রশ্ন করেছ।'

'শুধু আমি একা নিশ্চয়ই না, আমার সঙ্গীরাও নিশ্চয়ই আপনাদের একগাদা প্রশ্ন করেছে।'

'না, করে নি। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্ভব হয় নি।'

'কেন হয় নি?'

'তা বুঝতে পারছি না। তোমরা যাকে ইএসপি ক্ষমতা বল, সেই ক্ষমতা তোমার যেমন আছে তোমার সঙ্গীদেরও তেমনি আছে। কিন্তু তারা তা ব্যবহার করতে পারছে না, অথচ তুমি পারছ। এই রহস্য আমরা ভেদ করতে পারছি না।'

'আমাদের আর কোন কোন রহস্য আপনারা ভেদ করতে পারেন নি?'

'অনেক কিছুই পারি নি।'

'অনেক কিছু না পেরেও অবিকল আমাদের মতো প্রাণ সৃষ্টি করে ফেললেন।'

'জীন থেকে প্রাণ সৃষ্টি তেমন জটিল কিছু নয়। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার সহজ প্রয়োগ।'

'আমাদের কোন ব্যাপারটি আপনারা বুঝতে পারছেন না, বলুন। আমি আপনাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব। তবে তার বদলে আপনারা আমাকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠাবেন।'

আবার হাসির মতো শব্দ হল। ভুল বললাম, শব্দ নয়, আমার কেন জানি ধারণা হল ওরা হাসছে। খুব মজা পাচ্ছে। শিশুদের ছেলেমানুষি অথচ ভারিক্কি ধরনের কথায় আমরা যেমন মজা পাই।

'ভয় নেই, আমরা তোমাকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠাব।'

'আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আবার সেই সঙ্গে এখানেও রেখে দেব।'

'তা কী করে সম্ভব?'

'খুব কি অসম্ভব?'

'পদার্থবিদ্যার একটি সূত্র হচ্ছে একটি বস্তু একই সঙ্গে দু'টি স্থান দখল করতে পারে না।'

'পদার্থবিদ্যার সূত্র বহাল রেখেও তা করা যাবে। যখন করব তখন বুঝবে। তবে এই সঙ্গে তোমাকে বলে রাখি, তোমাদের পদার্থবিদ্যার অনেক সূত্রই কিন্তু সত্যি নয়।'

'তাতে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি পদার্থবিদ নই। পদার্থবিদ্যার সমস্ত সূত্র রসাতলে যাক, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।'

'তুমি তোমার বান্ধবীর কাছে ফিরে যেতে পারলেই খুশি?'

'হ্যাঁ, তা-ই।'

'সে কি এক জন অসাধারণ মহিলা?'

'হ্যাঁ, অসাধারণ।'

'আমাদের কাছে তাকে কিন্তু খুব অসাধারণ কিছু মনে হল না।'

'তার মানে।'

'আমরা তোমার বান্ধবীকে তৈরি করেছি।'

আমি চুপ করে রইলাম। না, আর অবাক হব না। কোনো কিছুতেই না।

'তোমার বান্ধবী সমস্ত ব্যাপারটাকে স্বপ্ন বলে ধরে নিয়েছে। আমরা তাকে তোমার কাছে পৌঁছে দেব। তুমি ধীরেসুস্থে তাকে সব বুঝিয়ে বল।'

'তোমরা যে-নিকি তৈরি করেছ, সে পৃথিবীর নিকি নয়।'

'সে অবিকল পৃথিবীরই নিকি, তবে তাকে তৈরি করা হয়েছে।'

'তার মানে, এই মুহূর্তে দু' জন নিকি আছে?'

'হ্যাঁ, দু' জন আছে। প্রয়োজনে আরো অনেক বাড়ান যেতে পারে। কাজেই এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে একই বস্তু একই সঙ্গে দু'টি স্থান দখল করতে পারে।'

'হ্যাঁ, পারে।'

'তুমি কি তোমার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আগ্রহ বোধ করছ না?'

'না, করছি না। কারণ সে নিকি নয়, রোবট শ্রেণীর কেউ।'

'খুব ভুল বললে।'

'আমি ভুল বলি নি।'

'বিশ্রাম নাও, তুমি ক্লান্ত। বিশ্রামের পর যখন জেগে উঠবে, তোমার বান্ধবী থাকবে তোমার পাশে।'

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

৯

'তোমার কফিতে ক্রীম দেব?'

আমি চমকে ফিরে তাকালাম। নিকি দাঁড়িয়ে আছে। সেই পরিচিত নিকি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রান্নাঘরে কাজকর্ম করার সময় যে এপ্রন সে গায়ে দেয়, সেই নীল রঙের এপ্রন গায়ে দিয়েছে। হাতে কফির মগ। আমি বললাম, 'দাও, খানিকটা ক্রীম দাও।'

নিকি রান্নাঘরে ফিরে যাচ্ছে। পা কেমন যেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে ফেলছে। বিজবিজ শব্দ হচ্ছে কফি-মেকারে। টাটকা কফির সুঘ্রাণ ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। চমৎকার দৃশ্য। অভিভূত করে দেবার মতো। আমি অবশ্যি অভিভূত হলাম না। এই নিকির প্রতি আমি পুরনো আকর্ষণ বোধ করছি না। সেই তীব্র তীক্ষ্ণ আনন্দ আমার মধ্যে নেই। নিকিকে মনে হচ্ছে পুতুলের মতো, যদিও জানি সে পুতুল নয়।

'আধ চামচ চিনি দিয়েছি।'

'ভালো করেছ।'

নিকি আমার পাশে এসে বসল। নিজের মনেই বলল, 'এটা বোধ হয় স্বপ্ন, তাই না? তোমার সঙ্গে তো আমার দেখা হবার কোনো কারণ নেই।'

আমি উত্তর না দিয়ে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলাম। সমস্ত ব্যাপারটা নিকিকে গুছিয়ে বলতে হবে। বলার পরেও সে বুঝতে পারবে কিনা কে জানে।

'নিকি তুমি কফি খাচ্ছ না?'

'ইচ্ছা করছে না। স্বপ্নের মধ্যে আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করে না, ভালোও লাগে না। তোমার পাশে বসে থাকতে ভালো লাগছে।'

নিকি খুব স্বাভাবিকভাবে তার বাঁ হাত আমার কোলে রাখল। মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা বিষণ্ণও হয়ে পড়ল। আমি বললাম, 'তুমি যা দেখছ, তার কিছুই কিন্তু স্বপ্ন নয়। এবং এটা যে স্বপ্ন নয়, তা আমি চট করে প্রমাণ করতে পারি।'

'প্রমাণ কর।'

'তার জন্যে তোমাকে এক চুমুক কফি খেতে হবে। নাও আমার মগ থেকে খাও।'

নিকি কফির মগে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। আমি বললাম, 'কফিটা কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'মিষ্টি ছিল না?'

'কিছুটা।'

'স্বপ্নদৃশ্যে আমরা অনেক ধরনের খাবার-দাবার খাই। তার কোনোটারই কিন্তু কোনো স্বাদ নেই।'

'কে বলল তোমাকে?'

'আমি জানি।'

'তুমি মাষ্টারদের মতো কথা বলছ। এভাবে কথা তুমি বল না। এখন বলছ, কাজেই এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন না হলে তোমার দেখা পাব কী করে?'

'নিকি, এটা স্বপ্ন নয়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যাও এটা স্বপ্ন না। কিছু সময়ের জন্যে তোমাকে পাওয়া গেছে, আর তুমি শুরু করেছ তর্ক!'

'এটা যে স্বপ্ন না, এও তার একটা বড় প্রমাণ। স্বপ্নে কথা বলাবলির ব্যাপারটা কম থাকে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে বাবা, চুপ কর।'

আমি চুপ করলাম। নিকি হালকা গলায় বলল, 'কফি শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কফির মগ রান্নাঘরে রেখে এসে আমাকে একটু আদর কর।'

আমি হেসে ফেললাম। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম পুরনো আবেগ, পুরনো ভালোবাসা ফিরে আসতে শুরু করেছে। নিকিকে এখন আর পুতুল বলে মনে হচ্ছে না। কী সুন্দরই না তাকে লাগছে! পৃথিবীর জীবনে তাকে কি এত সুন্দর লাগত? নিশ্চয়ই লাগত হয়তো। তখন এত ভালো করে লক্ষ করি নি। কিংবা কে জানে এরা হয়তো তাকে আরো সুন্দর করে বানিয়েছে।

নিকিকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। সে বুঝতে পারল কিনা জানি না, তবে চুপ করে বসে রইল। প্রতিবাদ করল না। প্রতিবাদ করলে ভালো হত, আমি আমার যুক্তিগুলি আরো গুছিয়ে তাকে বলতে পারতাম।

'নিকি।'

'বল।'

'আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ?'

'জানি না। বিশ্বাস করি বা না–করি তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি পাশে আছ, এই যথেষ্ট!'

'তুমি মনে হচ্ছে বেশ সুখী।'

'হ্যাঁ সুখী। কেন সুখী হব না বল? এক জন মানুষের সুখী হতে খুব বেশি কিছু কি লাগে?'

'না, তা অবশ্যি লাগে না।'

নিকি ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার মাষ্টারী ধরনের কথা শুনে কান ঝাঁঝাঁ করছে। অন্য কিছু বল।'

'কী ধরনের কথা বলব?'

'ভালোবাসার কথা বল। তুমি যে আমাকে ভালোবাস এই কথাটা বল।'

'এটা তো তুমি জানই। নতুন করে বলার প্রয়োজন কি?'

'প্রয়োজন আছে।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'আবার বল।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'থামবে না, বলতেই থাক।'

নিকির চোখে জল টলমল করছে। আমি মৃদুস্বরে বারবার বলছি, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', আর সে চোখ মুছছে। আমার নিজের চোখও ভিজে উঠতে শুরু করেছে। অশ্রু খুবই সংক্রামক ব্যাপার। নিকি বলল, 'আর কখনো তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না।'

আমি কিছু বললাম না, একটা হাত রাখলাম তার হাতে। স্পর্শ দিয়েও অনেক কিছুই বলা যায়। আমি নিকিকে কাছে টানলাম--ঠিক তখন 'ওদের' সঙ্গে যোগাযোগ হল। ওরা স্পষ্ট স্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমি চাই না।'

'আমরা অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করছি। দয়া করে আমাদের প্রশ্নের জবাব দাও।'

'আমি কোনো কৌতূহল বোধ করছি না; আমাকে আমার বান্ধবীর সঙ্গে থাকতে দিন।'

'তোমার বান্ধবী দীর্ঘকাল তোমার পাশে থাকবে, আমরা থাকব না। আমরা পরিব্রাজক। আমরা বেশি সময় এক জায়গায় থাকতে পারি না। আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে।'

'কখন যাত্রা শুরু হবে?'

'খুব শিগগিরই।'

'আমাদের কী হবে?'

'তোমাদের জন্যে কোনো একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।'

'সে ব্যবস্থাটা কী, জানতে চাই।'

'সময় হলেই জানবে, এখনো সময় হয় নি। এখন দয়া করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে আমি আপনাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না।'

'তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন?'

'আমি রেগে যাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি, আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে আমি আপনাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না।'

'ঠিক আছে জবাব দিও না।'

কথাবার্তা থেমে গেল। মাথায় ভোঁতা ধরনের যন্ত্রণা নিয়ে আমি তাকালাম নিকির দিকে। নিকি বলল, 'কী হয়েছে?'

'ওরা কথা বলছিল। ওরা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলে। যত বারই কথা বলি, তত বারই রেগে যাই।'

'ওরা কি আজেবাজে কিছু বলে?'

'না, আজেবাজে কিছুই বলে না। তবু প্রচন্ড রাগ লাগে। কেন তাও জানি না।'

'রেগে যাওয়ার স্বভাব কিন্তু তোমার ছিল না। তুমি মনে হয় খানিকটা বদলে গেছ।'

'খানিকটা না, অনেকখানি বদলেছি। ওরা বদলে দিয়েছে।'

'থাক ওদের কথা, যা হবার হবে। অন্য কিছু বল।'

'অন্য কিছু বলব? বলার তো আর কিছু নেই।'

রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। কফি পার্কোলেটরে শব্দ হচ্ছিল, কে যেন সেটা বন্ধ করল। কাপ ধোয়ার মতো শব্দ হচ্ছে। চামচ নড়ছে। কেউ এক জন কফি বানাচ্ছে রান্নাঘরে। আমি এবং নিকি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। তৃতীয় ব্যক্তি কে হতে পারে? কে কফি বানাতে বসেছে? নিকি উঠে গেল, রান্নাঘরে ঢুকল না। দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আমি দেখলাম সে মূর্তির মতো জমে গেছে। যেন তার নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। মুখে বিন্দু–বিন্দু ঘাম। আমি বললাম, 'কী হয়েছে নিকি?'

সে জবাব দিল না। নিঃশব্দে ফিরে এসে কপালের ঘাম মুছল। বসল আমার পাশে। আমি লক্ষ করলাম সে থরথর করে কাঁপছে।

'কী হয়েছে নিকি?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কী দেখলে?'

নিকি জবাব দিল না। বড়ো বড়ো করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। তার মুখ রক্তশূন্য। আমি আবার বললাম, 'রান্নাঘরে কে?'

'তুমি যাও। তুমি দেখে এস। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি খুব সম্ভব পাগল হয়ে গেছি। আমার মাথা ঠিক নেই। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম দরজা পর্যন্ত। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি। নিকির বিস্ময় ও হতাশার কারণ বুঝতে পারছি। রান্নাঘরে আমি নিজেই আছি। দ্বিতীয় আমি। ওরা আরেক জন আমাকে তৈরি করেছে। নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হওয়ার ঘটনাটা কেমন? খুবই আনন্দের কোনো ব্যাপার কি? না, আনন্দের কোনো ব্যাপার নয়। আমি তীব্র ঘৃণা নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। সেও তাকাল আমার দিকে। তার মুখে হাসি। কিন্তু বুঝতে পারছি, তার চোখেও তীব্র ঘৃণা। আমি কর্কশ

গলায় বললাম, 'তুমি কে?'

সে কফির মগ নামিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তুমি ভালো করেই জান আমি কে। অর্থহীন কথাবার্তা বলার প্রয়োজন দেখি না। ওরা তোমার দ্বিতীয় কপিটি তৈরি করেছে।'

'নকল কপি?'

'আসল–নকলের কোনো ব্যাপার নয়। ওরা যে–'জীন' থেকে তোমাকে তৈরি করেছে, সেই একই জীন থেকে আমাকেও তৈরি করেছে। আসল হলে দু'টোই আসল, নকল হলে দুটোই নকল।'

'ওরা কপি তৈরি করল কেন?'

'আমাকে এই প্রশ্ন করা কি অর্থহীন নয়? তোমার মনে যে প্রশ্ন আসছে, আমার মনেও সেই একই প্রশ্ন আসছে। শারীরিক এবং মানসিক--এই দুই দিক দিয়েই তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রভেদ নেই। এই মুহূর্তে তুমি কী ভাবছ তা আমি জানি, কারণ আমিও একই জিনিস ভাবছি।'

'কী ভাবছ?'

'আমি ভাবছি নিকির কথা। নিকি কী করবে? কার কাছে যাবে? তোমার কাছে না আমার কাছে?'

আমার গা ঝিমঝিম করতে লাগল। আসলেই আমি তাই ভাবছি। আমরা দু' জন পাশাপাশি দাঁড়ান মাত্র নিকি সব গুলিয়ে ফেলবে। কার কাছে সে যাবে? আমার কাছে না তার কাছে? তার কাছে যাওয়া মানেই তো আমার কাছে যাওয়া। কিন্তু সত্যি কি তাই? নিকি আমার সামনে ঐ লোকটিকে চুমু খাবে, এই দৃশ্য আমার পক্ষে সহ্য করা কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। আমি দ্বিতীয় বার বললাম, 'ওরা এমন করল কেন?'

'তুমি যা জান না, আমিও তা জানি না। তবে আমার মনে হয় নিকি আমাদের দু' জনকে পেয়ে কী করে এবং আমরা কী করি, তাই তারা দেখতে চাচ্ছে। তোমারও নিশ্চয়ই সে–রকমই মনে হচ্ছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা–ই।'

'মানব–মানবীর সম্পর্কের ব্যাপারটায় তারা কৌতূহলী হয়েছে। এই জিনিসটা তারা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। তোমারও নিশ্চয়ই সে রকমই মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'আমার তো মনে হয়, ওদের সঙ্গে এখন আমাদের কথা বলা দরকার। ওরা কী চায় জানা দরকার। এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে ওদের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই।'

'যোগাযোগটা করব কীভাবে? আমরা চেষ্টা করলে তো হবে না, এরা যখন যোগাযোগ করতে চাইবে তখনই হবে।'

'তা ঠিক। আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ দেখছি না। অপেক্ষা করা যাক।'

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্লান্তিকর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। কোনো লাভ হল না। কেউ যোগাযোগ করল না। আমরা তিন জন অপেক্ষা করছি। তিন জন বলা কি ঠিক হচ্ছে? না, ঠিক হচ্ছে না। আমরা আসলে দু' জন। আমি এবং নিকি। আমি ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে গেছে। এখানে দু' জন আমি উপস্থিত।

নিকি যে কী প্রচন্ড সমস্যায় পড়েছে তা বুঝতে পারছি। কারো দিকেই সে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। আমি তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে ভাবে হাসলাম, সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। আমি লক্ষ করলাম অন্য আমিও তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে ভাবে হাসছে। নিকি তার কাছ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তার ভাব দেখে মনে হল সে এখন কাঁদবে। যদি সত্যি সত্যি কাঁদে, আমি তাকে সান্ত্বনার দু'-একটা কথা নিশ্চয়ই বলব। তখন অন্য আমিটি কী করবে? সেও কি সান্ত্বনার কথা বলবে? বলাই তো উচিত। আমরা দু' জন তো আলাদা নই।

আমি খাটের ওপর বসেছিলাম, উঠে দাঁড়ালাম। ক্লান্ত গলায় বললাম, 'রান্নাঘরে যাচ্ছি। তোমরা দু' জন কথাবার্তা বল। এতে ব্যাপারটা সহজ হবে।'

নিকি ভারি গলায় বলল, 'সহজ হবার কোনো দরকার নেই। তোমারও অন্য ঘরে যাবার প্রয়োজন নেই।'

নিকি কাঁদতে শুরু করল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। আমি আগে কখনো নিকিকে কাঁদতে দেখি নি। সে শক্ত ধরনের মেয়ে, সহজে ভেঙে পড়ার মতো নয়। কিন্তু সে ভেঙে পড়েছে। আমি রান্নাঘরে চলে এলাম। নিকির কান্নার ছবি সহ্য করতে পারছি না।

সময় কি মাঝে-মাঝে থেমে যায়? মহাবীর থর নাকি কয়েক মুহূর্তের জন্য সময় থামিয়ে দিয়েছিলেন। ওরা কি তাই করেছে? সময় কি থেমে আছে? রান্নাঘরে আমি একা-একা দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে অযুত নিযুত লক্ষ কোটি বৎসর পার হয়ে যাচ্ছে, আমি দাঁড়িয়েই আছি। মাঝে মাছে নিকির কান্নার শব্দ পাচ্ছি। সে কিছুক্ষণ পর পর ফুঁপিয়ে উঠছে।

আমার মধ্যে অদ্ভুত একটা চিন্তা এই সময় এল। মনে হল, যারা একই রকম দু' জন মানুষ তৈরি করতে পারে, তারা তো একই রকম দু' লক্ষ মানুষ তৈরি করতে পারবে, কিংবা তার চেয়েও বেশি--দু' কোটি। একটি গ্রহ এক ধরনের মানুষ দিয়ে ভর্তি করে ফেলতে পারবে। অবস্থাটা তখন কী হবে? গ্রহের সবাই এক ধরনের চিন্তা করছে এবং একই ভাবে করছে, একই জিনিস নিয়ে ভাবছে। তাদের সবার ভেতর চমৎকার হৃদয়ের বন্ধন থাকবে, কারণ তারা আলাদা কেউ নয়। একই সঙ্গে একা এবং অনেকে।

আমি একটা চমক বোধ করলাম। একই সঙ্গে একা এবং অনেকে কথাটা

আমি আগে শুনেছি। 'ওরা' আমাকে বলেছে। যে-সব মহাজ্ঞানীরা আমাদের নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছে তারাই নিজেদের সম্পর্কে বলেছে 'আমরা একই সঙ্গে একা এবং অনেকে।' তাহলে তারা কি--?

আমার মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা হতে লাগল। ওদের সঙ্গে যোগাযোগের এটা হচ্ছে পূর্বাবস্থা। যোগাযোগ হল।

'তুমি ঠিক লাইনেই চিন্তা ভাবনা করছ।'

'আমি ঠিক লাইনে চিন্তা-ভাবনা করছি কি না তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আপনি আমাকে বলুন, আপনাদের নতুন খেলার অর্থ কী?'

'কোনটাকে তোমরা নতুন খেলা বলছ?'

'আমাকে দ্বিতীয় বার তৈরি করেছেন, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

'অপ্রয়োজনীয় কিছু করার মতো সময় আমাদের নেই। যা করা হয়েছে, প্রয়োজনেই করা হয়েছে। মানব সম্প্রদায়ের প্রধান ত্রুটি কী, তা ধরতে চেষ্টা করছি। তুমি চাইলে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে পারি।'

'আমি চাই না।'

'না চাইলেও শোন, তোমাদের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে পুরুষ এবং রমণীর ব্যাপারটি। মানুষকে অসম্পূর্ণ ভাবে তৈরি করা হয়েছে। এক জন পুরুষ মানুষ হিসেবে যেমন সম্পূর্ণ নয়, তেমনি এক জন রমণীও নয়। দু' জনকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করা যেতে পারে। বংশবৃদ্ধির পদ্ধতিটি তাতে বদলাবে, নতুন ধরনের মানুষ তৈরি হবে। তাকে তুমি মুক্ত-মানুষ বলতে পার।'

'মুক্ত-মানুষ?'

'হ্যাঁ মুক্ত-মানুষ। সম্পূর্ণ মুক্তির জন্যে অবশ্যি তোমাদের শারীরিক প্রক্রিয়াও বদলে দিতে হবে। বিশেষ করে খাদ্যগ্রহণের প্রক্রিয়া। খাদ্য থেকে তোমরা শক্তি সংগ্রহ কর, অতি নিম্নস্তরের প্রাণী যা করে। তোমাদের সমস্ত চিন্তা-চেতনা খাদ্য-সংগ্রহকে ঘিরে। মেধার কী অপচয়! শক্তিসংগ্রহের প্রক্রিয়াটাকে সহজেই বদলে দেয়া যায়। এমন করে দেয়া যায়, যাতে প্রয়োজনীয় শক্তি তোমরা সূর্য থেকে সংগ্রহ করতে পার।'

'গাছের মতো?'

'অনেকটা তাই।'

'মানুষ হয়ে জন্মেছি, গাছ হবার ইচ্ছা নেই।'

'সব কিছুই তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।'

'সব কিছু আপনাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই হবে, এ রকম মনে করারও কোনো কারণ নেই।'

'মানুষের দ্বিতীয় ত্রুটিটি হচ্ছে আবেগনির্ভর যুক্তিপ্রয়োগ। যুক্তি এবং আবেগ

দু'টি ভিন্ন জিনিস। তোমরা দু'টিকে মিশিয়ে অদ্ভুত একটা কিছু তৈরি কর, যা যুক্তিও নয়, আবেগও নয়।'

'আপনারাও তো তাই করেছেন, পুরুষ এবং রমণী দু'টি ভিন্ন জিনিস। দু'টিকে মিশিয়ে অদ্ভুত কিছু তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন--যা পুরুষও হবে না, রমণীও হবে না।'

'তুমি আবার একটি আবেগনির্ভর যুক্তি প্রয়োগ করলে। তোমাদের তৃতীয় ত্রুটি হচ্ছে—'

'ত্রুটির কথা শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্পর্কে ভালো কিছু বলার থাকলে বলুন?'

'সত্যি শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

'বিস্ময়কর ক্ষমতা দিয়ে তোমাদের পাঠান হয়েছে কিংবা বলা যেতে পারে বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন এক শ্রেণীর প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, যারা তাদের সত্যিকার ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দু'টি জগৎ আছে--একটি বস্তুজগৎ, অন্যটা পরা-বস্তুজগৎ। মানুষের ক্ষমতা পরা-বস্তুজগতে। অথচ তা সে জানে না। সে মেতেছে বস্তুজগৎ নিয়ে। বাধ্য হয়ে মানুষদের তা করতে হচ্ছে, কারণ শারীরিক প্রক্রিয়ার কারণে মানুষ বস্তুজগতের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। যে জন্যে পরা-বস্তুজগতের বিপুল সম্ভাবনার কিছুই মানুষ জানে না।'

'পরা-বস্তুজগৎ ব্যাপারটা কী?'

'বস্তুজগতের বাইরের জগৎ।'

'শক্তিজগৎ?'

'না। বস্তু এবং শক্তি আলাদা কিছু নয়। পরা-বস্তুজগৎ হচ্ছে মাত্রাশূন্য জগৎ।'

'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারার কথা নয়। তোমরা বাস করছ তিন মাত্রার জগতে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা--এই মাত্রা যেই জগতে বিলুপ্ত তাকে পরা-বস্তুজগৎ বলতে পার।'

'বুঝতে পারছি না। আরো সহজ করে বলুন।'

'এর চেয়ে সহজ করে বলতে পারছি না। বরং তোমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিই। তোমরা একটি অভিযাত্রী দল নিয়ে রওনা হয়েছ। তোমাদের যাত্রা অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। যার জন্যে তোমরা একটা মহাকাশযান তৈরি করেছ। অথচ যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তোমরা ঘরে বসেই যা জানার জানতে পারতে, কারণ তোমরা মাত্রা ভাঙতে পার। এই জিনিসটা তোমাদের অজানা।'

'আমাদের শিখিয়ে দিন।'

'শেখান সম্ভব নয়। আমাদের সেই ক্ষমতা নেই। আমরা চতুর্মাত্রিক জীব। ত্রিমাত্রিক জগতের অর্থে আমাদের ক্ষমতা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু

পরা-জগতে আমাদের কোনো আধিপত্য নেই। যে কারণে তোমাদের দেখে আমরা একই সঙ্গে বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছি। অকল্পনীয় ক্ষমতা তোমাদের হাতের মুঠোয়, অথচ তোমরা কত অসহায়। সামান্য একটি ব্ল্যাকহোলের খপ্পরে তোমাদের মহাকাশযান পড়ল, তোমরা সেই ব্ল্যাকহোলের কবল থেকে বেরুতে পারছ না। অথচ ইচ্ছা করলেই নিমিষের মধ্যে তোমরা নতুন একটি পৃথিবী তৈরি করতে পার, একটি নক্ষত্রপুঞ্জ তৈরি বা ধ্বংস করতে পার।'

'আপনি এসব কী বলছেন!'

'যা সত্যি তাই বলছি। আমরা পরিব্রাজক, আমাদের এক মুহূর্তের জন্যেও থেমে থাকার কথা নয়। আমরা থেমে আছি তোমাদের জন্যেই। তোমাদের বিস্ময়কর ক্ষমতা আমাদের অভিভূত করেছে। এই সঙ্গে বিষাদগ্রস্তও হচ্ছি। মেধার কী বিপুল অপচয়!'

'কেন জানি আপনার কথা ঠিক বিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না।'

'মনে না হবার কোনো কারণ নেই। তোমাদের সঙ্গে এক জীববিজ্ঞানী আছে, যার নাম ইনো। সে নিজেই তার পছন্দমতো একটি জগৎ তৈরি করেছে। অথচ তার ধারণা আমরা তা তৈরি করেছি। আমরা করি নি। আমরা শুধু পরাবস্তু-ক্ষমতার প্রয়োগের জন্যে পরিবেশ তৈরি করেছি। মেয়েটিকে সীমাহীন নিঃসঙ্গতায় ঠেলে দিয়েছি। যে কারণে সে নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচার জন্যে নিজেই নিজের একটি জগৎ তৈরি করেছে। তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। তুমি দেখেছ।'

'সেই জগৎ কি মায়া না সত্যি?'

'সত্যি তো বটেই। এখন কি তুমি বুঝতে পারছ কী পরিমাণ ক্ষমতা তোমাদের আছে?'

'বুঝতে চেষ্টা করছি।'

'তুমি বারবার তোমার পৃথিবীতে ফিরে যাবার কথা বলছ। আমাদের বলার তো কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি তো নিজে ইচ্ছে করলেই ফিরে যেতে পার। কিংবা অবিকল সেই পৃথিবীর মতো পৃথিবী তৈরি করতে পার তোমার চারপাশে।'

'আমার অন্য সঙ্গীরা কী করছে? তারা কি এসব জানে?'

'না, তারা জানে না। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয় নি। তারা তাদের মিশন সম্পূর্ণ করতে চায়। আমরা তাদের তা করতে দেব। মহাকাশযানটি তৈরি করা প্রায় শেষ। শিগগিরই হয়তো ওরা যাত্রা শুরু করবে।'

'আমাকে নিয়ে আপনাদের কী পরিকল্পনা?'

'পরিকল্পনার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। মানবজাতির ত্রুটিগুলি আমরা দূর করতে চাই। তুমি এবং তোমার বান্ধবী সম্পূর্ণ নতুন একটি ত্রুটিমুক্ত মানব-সমাজ তৈরি করতে পার, যা হবে অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। যারা তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকবে। বস্তুর ওপর প্রয়োগ করবে তার সীমাহীন

ক্ষমতা।'

'তা কি ভালো হবে?'

'কেন হবে না?'

'আপনারা যে-সমস্ত জিনিসকে ত্রুটি বলছেন, হয়তো সেগুলি ত্রুটি নয়। পরা-বস্তু-ক্ষমতার প্রয়োগের সময় এখনো আসে নি বলেই হয়তো তা সুপ্ত অবস্থায় আছে। একদিন বিকশিত হবে।"

'কিংবা কোনো দিনও হবে না। আমরা তা হওয়াতে চাই বলেই প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে চাই।'

'আপনারা দয়া করে আমাদের আমাদের মতো থাকতে দিন। আমাকে আমার জায়গায় ফিরে যেতে দিন।'

'কী হবে ওখানে গিয়ে, এ জীবনে যা চেয়েছ সবই তো পাচ্ছ। জীবন শুরু করবে চমৎকার একটি গ্রহে। পাশে থাকবে তোমার বান্ধবী।'

'দয়া করে আপনারা আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

'তোমাকে ফেরত পাঠান কঠিন কিছুই নয়। কিন্তু তার ফলাফল তোমার জন্যে ভয়াবহ হবে।'

'কেন?'

'ঠাণ্ডামাথায় বুঝতে চেষ্টা কর। যে-পৃথিবী ছেড়ে তুমি মহাকাশযানে করে চলে এসেছ সেই পৃথিবীতেই তুমি হঠাৎ করে উপস্থিত হবে। তোমাকে পাঠাতে হবে চতুর্মাত্রার মাধ্যমে, তাতে সময়সংকোচন হবে। সেই সময়সংকোচনের ফলে তুমি উপস্থিত হবে এমন এক সময়ে যখন তুমি পৃথিবী ছেড়ে রওনা হও নি।'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'সময়সংকোচনের ব্যাপারটা তো জান?'

'না, জানি না। সময়-সম্প্রসারণের ব্যাপারটা জানি। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটিতে আছে। মহাশূন্যে সময় শ্লথ হয়ে যায়। সেই তুলনায় পৃথিবীর বয়স দ্রুত বাড়ে। এক জন মহাকাশচারী তিন মাস নক্ষত্রপুঞ্জে কাটিয়ে ফিরে এলে দেখতে পায় পৃথিবীতে তিন বছর পরে হয়ে গেছে।'

'সময়সংকোচন হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। তোমাকে এখন পাঠান হলে তুমি অতীতে চলে যাবে।'

'কী রকম অতীতে?'

'খুব বেশি নয়। তুমি পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করেছিলে ৩০শে জুন। তোমাকে পৃথিবীতে পাঠালে তুমি উপস্থিত হবে এপ্রিল মাসে। যাত্রা শুরুর দু'মাস আগে। এর একটা ভয়াবহ দিক আছে। তা নিয়ে কি ভেবেছ? ভয়াবহ দিকটি বুঝতে পারছ?'

'পারছি। যেহেতু আমি পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু হবার আগেই পৃথিবীতে পৌছাচ্ছি, সেই হেতু পৃথিবীতে পৌছে আমি আমাকেই দেখতে পাব। আবার

আমরা হব দু' জন।'

'না। তা হবে না। প্রকৃতি অনিয়ম সহ্য করে না। কাজেই তুমি তোমাকে পাবে না। প্রকৃতি তা হতে দেবে না। তোমার অতীতে ফিরে যাবার ব্যাপারটা প্রকৃতির নিয়মে গ্রহণযোগ্য হবার জন্যে যে পৃথিবী থেকে তুমি এসেছিলে অবিকল সেই পৃথিবীতে তুমি ফিরে যাবে না। পৃথিবী হবে একটু অন্যরকম। মাত্রা যাবে বদলে।'

'তার মানে?'

'আমরা বলতে পারছি না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীম রহস্যের অতি অল্পই আমরা জানি। সেই অল্প জ্ঞান নিয়ে সব ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মাত্রা ভাঙার ফল সাধারণত ভয়াবহ হয়ে থাকে। তুমি একটি ভয়াবহ চক্রে পড়ে যেতে পার। তার পরেও যদি যেতে চাও তাহলে ভিন্ন কথা।'

'যেতে চাই।'

'ভালো করে ভেবে বল।'

'ভেবেই বলছি।'

'বেশ, ব্যবস্থা হবে। মাত্রা ভেঙে তোমাকে ফেরত পাঠান হবে।'

'ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই বিশেষ ক্ষণটি কখন?'

'অস্থির হয়ো না। হবে, শিগগিরই হবে। পৃথিবীতে ফিরে যাবার আগে তুমি কি একবার দেখতে চাও না, আমরা এখানে তোমার এবং তোমার বান্ধবীর জন্যে কী ব্যবস্থা করে রেখেছি। হয়তো এটা দেখলে তুমি মত বদলাবে।'

'আমি কিছুই দেখতে চাই না।'

'জন বরগ তার মিশন নিয়ে যাত্রা শুরু করবে। তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কত না বিস্ময়! ঐ দলের সঙ্গেও তুমি যোগ দিতে চাও না?'

'না।'

'বিদায় সম্ভাষণও জানাবে না?'

'না।'

'বেশ, তুমি যা চাও তাই হবে। আর কিছু কি তোমার বলার আছে?'

'আপনি যে আমার মতো আরেক জন তৈরি করেছেন তার কী হবে? সেও যদি আমার মতো পৃথিবীতে উপস্থিত হয়, তাহলে তো ভয়াবহ ব্যাপার হবে। আমরা হব তিন জন।'

'সে এখানেই থাকবে। যে গ্রহটি তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করা ছিল, সেই গ্রহে সে চলে যাবে। তোমার বান্ধবী নিকি যাবে তার সঙ্গে। নতুন বসতি শুরু হবে। নতুন মানব সম্প্রদায়ের শুরু করবে তারা।'

'অসম্ভব। নিকি কেন যাবে?'

'যাবে, কারণ তুমি পৃথিবীতে তোমার নিকিকে পাবে। একে তোমার প্রয়োজন নেই। তুমি এক জন নিকিকে সঙ্গে করে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে উপস্থিত হতে চাও

না।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। কী ভয়ংকর পরিস্থিতি। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার কি কোনো পথ নেই? ওরা আবার কথা বলল, 'ওদের নতুন জীবন শুরুর দৃশ্যটি আমরা তোমাকে দেখাতে চাই।'

'আমি দেখতে চাই না।'

'না চাইলেও দেখতে হবে।'

'আমি দেখতে চাই না, কারণ নিকি অন্যের হাত ধরে হাঁটছে, এই দৃশ্য সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'অন্যের হাত ধরে তো হাঁটবে না। তোমার হাত ধরেই হাঁটবে। আমরা এই দৃশ্যটি দেখাতে চাই, যাতে তোমার মত বদলায়, তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল কর। পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া তোমার জন্যে ভয়াবহ ব্যাপার হবে।'

'হলে হবে।'

যোগাযোগ কেটে গেল। আমি চোখ মেলে তাকালাম। আমার পাশে নিকি নেই। অন্য আমিও নেই। ওরা নিশ্চয়ই নতুন জীবন শুরু করেছে। করুক। আমি ফিরে যাব আমার চেনা পৃথিবীতে। ওদের জীবন শুরুর দৃশ্য দেখার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।

তবু দেখতে হল।

১০

স্বপ্নদৃশ্যের মতো একটি দৃশ্য। খন্ড খন্ড ছবি। কী অপূর্ব। অভিভূত করে দেবার মতো সুন্দর। মন খারাপ করিয়ে দেবার মতো সুন্দর।

বৃক্ষ লতাগুল্মময় অরণ্য। নাম–না–জানা অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। বিচিত্র রূপ। হালকা বাতাসে গাছের পাতা কাঁপছে। মর্মরধ্বনির মতো ধ্বনি। আমি গাঢ় আনন্দময় হাসির শব্দ শুনলাম। হাসতে হাসতে নিকি ছুটে যাচ্ছে, তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে--যে তাকে ধরবার জন্যে ছুটছে, তাকেও আমি চিনি। সে অন্য আমি।

ছবি মিলিয়ে গেল। এখন অন্য ছবি। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটেছে। আকাশে দু'টি চাঁদ। একটি প্রকান্ড, অন্যটি ছোট। নীলাভ আলোর বন্যায় অরণ্য ভেসে যাচ্ছে। দু'টি চাঁদের কারণেই হয়তো গাছের পাতায় রামধনুর মতো রঙ। আমি ওদের দু' জনকে দেখেছি, তারা মুগ্ধ বিস্ময়ে জোৎস্না দেখছে। কী গভীর আনন্দ ওদের চোখে–মুখে।

এই ছবিও মিলিয়ে গেল, এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। বিশাল সমুদ্র। সমুদ্রের জলের

রঙ গাঢ় সবুজ, কারণ আকাশের রঙ সবুজ। সমুদ্র খুব শান্ত নয়। বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে। ওরা দু' জন ভয় এবং বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে।

আমার স্বপ্ন কেটে গেল। আমি শুনতে পেলাম, 'তুমি কি থেকে যেতে চাও না?'

আমি বললাম, 'না।'

১১

ঘুম ভাঙল।

অভ্যাসবশে তাকালাম ঘড়ির দিকে--ন'টা দশ বাজে। জানালার ভাঙা কাচ দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে পায়ের কাছে। দেয়ালে ক্যালেন্ডারে এপ্রিল মাস, তার মানে ফিরে এসেছি পৃথিবীতে। আমার চেনা জায়গা, চেনা জগৎ।

উঠে গিয়ে জানালা খুললাম। অস্পষ্টভাবে মনে হল বাইরের এই পৃথিবী একটু যেন অন্য রকম। সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন এত সূক্ষ্ম যে ঠিক ধরা যাচ্ছে না। অথচ রাস্তাঘাট আগের মতোই আছে। দোকানপাট একই রকম। তবুও কেন জানি আলাদা।

প্রকৃতি তার জগতে অনিয়ম সহ্য করে না, কথাটা বোধ হয় ঠিক। দ্বিতীয় আমির দেখা পেলাম না। নিজের ঘরেই রাত এগারটা পর্যন্ত বসে রইলাম। কেউ এল না। দ্বিতীয় আমি বলে কেউ থাকলে এর মধ্যে এসে পড়তো। প্রকৃতি এই ভয়াবহ অনিয়ম হতে দেয় নি। নিজেকে কোনো এক ভাবে বদলে ফেলছে।

রাত বারটার দিকে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিকিকে টেলিফোন করলাম। আমি জানি মাঝরাতে টেলিফোন পেয়ে সে প্রথমে খানিকটা কপট বিরক্তি দেখালেও শেষটায় প্রচন্ড খুশি হবে। সব সময় তাই হয়।

অনেকক্ষণ রিং হবার পর নিকির ঘুমন্ত গলা শোনা গেল, 'কে?'

'আমি।'

'আমিটা কে?'

'আমাকে চিনতে পারছ না নিকি?'

'না।'

আমি আমার নাম বললাম। নিকি কঠিন স্বরে বলল, 'এখন চিনতে পারছি। কেন আপনি রাতদুপুরে বিরক্ত করেন?'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। নিকি এসব কী বলছে!

'হ্যালো নিকি?'

'আর একটি কথাও নয়। আর একটি কথা বললে আমি পুলিশে খবর দেব।

শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? আপনার যন্ত্রণা অনেক সহ্য করেছি।'

আমি শুনলাম ঘুম জড়ান এক পুরুষ-কণ্ঠ বলছে, 'কে কথা বলছে নিকি?' নিকি বলল, 'ঐ বদমাশটা। আবার রাতদুপুরে ফোন।'

নিকি টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। প্রকৃতি তার জগতে অনিয়ম সহ্য করে না। প্রয়োজনে পুরো জগৎটা বদলে দেয়। তাই সে করেছে।

সারা রাত আমার ঘুম হল না। ভোর বেলায় ত্রিভুজ চিহ্ন দেয়া চিঠি পেলাম।

জনাব,

আপনাকে অবিলম্বে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের সপ্তম শাখায় উপস্থিত হতে বলা হচ্ছে। অত্যন্ত জরুরী।

বিনীত

এস. মাথুর

ডিরেক্টর, মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র-৭

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। ভয়াবহ চক্রের ব্যাপারটি এখন বুঝতে পারছি। জুন মাসের ৩০ তারিখে আমি রওনা হব মহাকাশযানে। আবার ফিরে আসব এই পৃথিবীতে। এসে দেখব এপ্রিল মাস। দু'মাস কাটবে, আবার আসবে জুন মাস--মহাকাশযানে করে রওনা হব, আবার ফিরে আসব। অযুত নিযুত লক্ষ কোটি বছর ধরে এই চক্র চলতেই থাকবে। প্রকৃতি তার জগতের নিয়ম ভঙ্গকারীকে এমনি করেই শাস্তি দেবে।

চিঠি হাতে আমি রাস্তায় নেমে এলাম। বারবার ইচ্ছা হচ্ছে লাফিয়ে কোনো একটা দ্রুতগামী বাসের সামনে পড়ে যাই। চক্র ভাঙার এই একটিমাত্রই পথ। তা অবশ্য করলাম না। হেঁটে হেঁটে উপস্থিত হলাম নিকির ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। সে এপ্রন গায়ে দিয়ে টিনের কৌটা সাজাচ্ছিল। আমাকে দেখতেই চিনতে পারল। কঠিন মুখে বলল, 'আবার জ্বালাতে এসেছেন? আপনার কান্ড কিছু বুঝি না, প্রতি বছর এপ্রিল মাসে রাত বারটায় একবার টেলিফোন করবেন, তার পরদিন আসবেন দেখা করতে। বাকি বছরে আর আপনার কোনো খোঁজ নেই? কে আপনি বলুন তো?'

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'আমি কেউ না। তোমার সঙ্গে আগামী বছর আবার দেখা হবে।'

ফিরে যেতে যেতে মনে হল--ভয়াবহ চক্রে শুধু যে আমি একা আটকা পড়েছি তাই নয়, এই পৃথিবীর সবাই আটকা পড়েছে। অনন্তকাল ধরে নিকিকে এপ্রিল মাসের এক রাতে টেলিফোন পেয়ে জেগে উঠতে হবে। অনন্তকাল ধরে এই পৃথিবী থেকে একটি মহাকাশযান জুন মাসের ৩০ তারিখ যাত্রা শুরু করবে অনন্ত নক্ষত্রবীথির দিকে। কোনো দিন যা কোথাও পৌছবে না।

কুহক

১

ঘরের বাইরে বড়ো বড়ো করে লেখা-- "রুগীদের বিশ্রামকক্ষ। নীরবতা কাম্য"। দশ ফুট বাই দশ ফুট বর্গাকৃতি ঘর। বেতের এবং প্লাস্টিকের চেয়ারে ঠাসাঠাসি। কাঠের একটা টেবিলে পুরনো ছেঁড়া কিছু সিনেমা পত্রিকা। তের-চৌদ্দ জন রুগী বসে আছে, সবাই নিঃশব্দ, শুধু এক জন গোঙানির মতো শব্দ করছে, বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

এ্যাসিস্টেন্ট জাতীয় এক লোক বিরক্ত গলায় বলল, 'চুপ করে থাকেন না ভাই। কুঁ কুঁ করছেন কেন? কুঁ কুঁ করলে ব্যথা কমবে?'

রুগী কাতর গলায় বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি করেন।'

'এর চেয়ে তাড়াতাড়ি হবে না। পছন্দ হলে থাকেন। পছন্দ না হলে চলে যান।'

এ্যাসিস্টেন্টের নাম মাসুদ। বয়স ত্রিশ। মুখভর্তি বসন্তের দাগ। কটকটে হলুদ রঙের একটা শার্ট তার গায়ে। কিছুক্ষণ পরপর সে নাক ঝাড়ছে। তার মূল কাজ এক্সরে প্লেটে নাম্বার বসিয়ে রুগীদের এক্সরে রুমে পাঠিয়ে দেওয়া। সে এই কাজের বাইরেও অনেক কাজ করছে। নাম লেখার সময় সব রুগীকেই খানিকক্ষণ ধমকাচ্ছে, রুগীর সঙ্গে এক্সরে রুমে ঢুকছে, এক্সরে অপারেটরকে একটা ধমক দিচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে কেউ কোনো প্রতিবাদ করছে না। কারণ সবাই জেনে গেছে এই লোকটির হাতেই ক্ষমতা। এই এক্সরে ইউনিট আসলে সে-ই চালাচ্ছে। ডাক্তার এক জন আছেন, তিনি চেম্বার বন্ধ করে বসে আছেন। রুগীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নেই। এক্সরে প্লেট দেখে একটা রিপোর্ট লিখে দেন। দায়িত্ব বলতে এইটুকুই।

আজ ডাক্তার সাহেব সেই দায়িত্বও পালন করছেন না। অল্পবয়স্ক কামিজ-পরা একটি মেয়ে ঘন্টা দুই হল তাঁর কাছে বসে আছে। ডাক্তার সাহেব দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। বন্ধ দরজা ভেদ করে দু' বার খিলখিল হাসির শব্দ পাওয়া গেল।

মাসুদ সেই হাসির শব্দে মুখ কুঞ্চিত করে বলল, 'শালার দুনিয়া। প্রেম শুরু হয়ে গেছে।' কথাগুলো সে নিচু গলায় বলল না। শব্দ করেই বলল। এতে বোঝা গেল সে কারোর পরোয়া করে না। তার প্রতি রুগীদের যে প্রাথমিক বিরক্তি ছিল, তাও খানিকটা কাটল। যে তার মুনিবের প্রতি সরাসরি এমন কথা বলে সে এ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্টের লোক। সবার সহানুভূতি তার প্রতি।

নিশানাথ বাবু আট নম্বর স্লিপ হাতে বসে আছেন। একসময় তাঁর ডাক পড়ল। তিনি প্রেসক্রিপশন হাতে উঠে গেলেন।

মাসুদ কাঁচের দেয়ালের ওপাশে বসেছে। রেলের টিকিটের ঘুমটি-ঘরের মতো ছোট্ট জানালা দিয়ে তিনি প্রেসক্রিপশন বাড়িয়ে দিলেন।

মাসুদ বলল, 'নাম বলেন।'

'নিশানাথ চক্রবর্তী।'

'হিন্দু নাকি?'

নিশানাথ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন, যদিও বুঝতে পারলেন না এই প্রশ্ন করার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে। অসুখের আবার হিন্দু-মুসলমান কি?

'হয়েছে কী আপনার?'

'মাথায় যন্ত্রণা।'

'মাথায় যন্ত্রণা তো পেরাসিটামল খেয়ে শুয়ে থাকেন। এক্সরে কী জন্যে?'

নিশানাথ বাবু, ইতস্তত করে বললেন, 'ডাক্তার এক্সরে করতে বলল, সাইনাস আছে কি-না দেখতে চান।'

মাসুদ মুখ বিকৃত করে বলল, 'কিছু একটা হলেই এক্সরে। আরে বাবা এই যন্ত্র যখন ছিল না, তখন কি রুগীর চিকিৎসা হত না? এই সব হচ্ছে পয়সা কামাবার ফন্দি, বুঝলেন?'

নিশানাথ কিছু বললেন না। এই রাগী ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। হয়তো আবার ধমক দেবে। এক্সরে করতে এসে এত বার ধমক খাবার কোনো মানে হয় না।

মাসুদ খাতায় নাম তুলতে তুলতে বলল, 'সামান্য পেটব্যথা হলে ডাক্তাররা কী করে, জানেন? এক্সরে, আলট্রাসনোগ্রাম, এণ্ডোসকপি, ব্লাড, ইউরিন--- শালার দুনিয়া। এইসব না করে একটা ডাব খেয়ে শুয়ে থাকলে কিন্তু পেটব্যথা কমে যায়। যান, ভেতরে যান।'

নিশানাথ বাবু ভেতরে ঢুকলেন। ভয়ে ভয়ে ঢুকলেন। তাঁর ভয় করছে কেন তাও ঠিক বুঝতে পারছেন না।

এক্সরে রুমে আলো কম। তাঁর চোখ ধাতস্থ হতে সময় লাগছে। ব্যাপারস্যাপার দেখে তিনি খানিকটা ভড়কেও গেছেন। অতি আধুনিক যন্ত্র। শরীরের যে-কোনো অংশের এক্সরে করা যায়। কম্পুটারাইজড ব্যবস্থা। ছবি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিগেটিভ তৈরি হয়ে বের হয়।

মাসুদ নিশানাথ বাবুর সঙ্গে ঢুকেছে। নিশানাথ বাবু বললেন, 'ব্যথা লাগবে নাকি?'

মাসুদ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'আগে কখনো এক্সরে করান নি?'

'ছোটবেলায় একবার করিয়েছিলাম--বুকের এক্সরে।'

'ব্যথা পেয়েছিলেন?'

'জ্বি না।'

'তখন ব্যথা পান নি, তাহলে এখন পাবেন কেন? এক্সরে কিছুই না। এক ধরনের রেডিয়েশন, লাইট। মাথার ভেতর দিয়ে চলে যাবে, টেরও পাবেন না। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'কী করব?'

'শুয়ে পড়ুন।'

'কোথায় শুয়ে পড়ব?'

'আরে কী যন্ত্রণা! এই বজলু, এঁকে শুইয়ে দে।'

বজলু এক্সরে মেশিনের অপারেটর। সে এসে নিশানাথ বাবুকে কোথায় যেন শুইয়ে দিল। তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, 'খুব ঠাণ্ডা লাগছে, ভাই।'

মাসুদ বলল, 'এয়ারকণ্ডিশণ্ড ঘর, তাই ঠাণ্ডা লাগছে। আপনি খুব যন্ত্রণা করছেন। চুপচাপ থাকেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

বজলু এসে সীসার পাতে তৈরী একটা জিনিস নিশানাথ বাবুর ঘাড়ের উপর রাখল। তিনি শুয়েছেন উপুড় হয়ে। কিছু দেখতে পারছেন না, তবে বুঝতে পারছেন, ঘড়ঘড় শব্দ করে ভারী একটা যন্ত্র তাঁর মাথার কাছে চলে আসছে। তিনি সেখান থেকেই বললেন, 'ভয় লাগছে।'

মাসুদ কড়া গলায় ধমক দিল, 'কচি খোকা নাকি আপনি যে ভয় লাগছে? নড়াচড়া করবেন না, চুপচাপ শুয়ে থাকুন।'

'নিঃশ্বাস কি বন্ধ করে রাখব?'

'যা ইচ্ছা করুন।'

মাসুদ বজলুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঝামেলা শেষ কর তো। এক জনকে নিয়ে বসে থাকলে হবে না।'

বজলু বোতাম টিপল। ছোট্ট একটা অঘটন তখন ঘটল। প্যানেলে একটি লাল

বাতি জ্বলে উঠল। যার অর্থ কোথাও কোনো ম্যালফাংশান হয়েছে। বজলুর কোনো ভাবান্তর হল না, কারণ এই অতি আধুনিক যন্ত্রটি যে-কোনো ম্যালফাংশানে আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। নির্ধারিত রেডিয়েশনের এক 'পিকো রেম' বেশি ডোজও যাবার কোনো উপায় নেই।

মাসুদ বলল, 'কী হয়েছে?'

বজলু বলল, 'ম্যালফাংশান। আরেকটা প্লেট দিতে হবে।'

মাসুদ বলল, 'শালার যন্ত্রণা!'

ঠিক তখন বজলু অস্ফুট শব্দ করল। কারণ বড়ো ধরনের কিছু ঝামেলা হয়েছে। মেশিন বন্ধ হয় নি। 'স্ট্যাণ্ড-বাই' বাটনের লাল আলো জ্বলে নি। ডিজিটাল মিটারের সংখ্যা দ্রুত পাল্টাচ্ছে। রেডিয়েশন এখনো যাচ্ছে। বজলুর গলা শুকিয়ে গেল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। কত রেডিয়েশন গেল? ২৫০ রেম (REM)? কী সর্বনাশ! বুড়ো মানুষটা বেঁচে আছে তো?

এ রকম হবে কেন? কেন এরকম হবে? এখন কী করা?

বজলু 'স্টপ' বাটন টিপল। যন্ত্রটির সমস্ত কার্যকলাপ এতে বন্ধ হবে। 'স্টপ' বাটন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দেবে। পাওয়ার থাকবে শুধু মেকানিক্যাল অংশে। রেডিয়েশন ইউনিটে থাকবে না।

আশ্চর্য! 'স্টপ' বাটন টেপার পরও রেডিয়েশন বন্ধ হল না। বজলুর হাত কাঁপতে লাগল। সে মনে মনে বলল, 'ইয়া রহমানু, ইয়া রাহিমু।'

মাসুদ বলল, 'কী হল?'

বজলু বলল, 'রুগীকে তাড়াতাড়ি সরান। রেডিয়েশন যাচ্ছে।'

'কি বলছ ছাগলের মতো?'

'আল্লাহ্‌র কসম।'

বজলু 'স্ট্যাণ্ড-বাই' বাটন টিপে আবার 'স্টপ' বাটনে চলে গেল। লাভ হল না। রেডিয়েশন কন্ট্রোল নবে হাত দিল। কিছু একটা করা দরকার। মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। রুগীকে সরানও যাচ্ছে না। রুগীকে সরাতে হলে রেডিয়েশন সোর্স সরাতে হবে। তাও সরান যাচ্ছে না।

মাসুদ ছুটে গেল ডাক্তার সাহেবের ঘরে।

কামিজ-পরা মেয়েটি এখনো আছে। সে সম্ভবত মজার কোনো গল্প বলছিল। তার মুখ হাসি-হাসি। ডাক্তার সাহেবও হাসছেন। দরজা 'নক' না-করে ঢোকা ঠিক হয় নি। মাসুদ গ্রাহ্য করল না।

কাঁপা গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি আসেন স্যার।'

রেডিওলজিষ্ট কাটাকাটা গলায় বললেন, 'কত বার বলেছি হুট করে ঢুকবে না।'

'আপনি আসেন তো স্যার।'

'কেন?'

'ঝামেলা হয়েছে। বিরাট ঝামেলা।'

ডাক্তার সাহেব এক্সরে রুমে ঢুকে দেখলেন--সব ঠিকঠাক। মেশিন বন্ধ। রহমান কপালের ঘাম মুছছে। নিশানাথ বাবু এখনো শুয়ে আছেন।

মাসুদ কানে কানে ডাক্তার সাহেবকে ঘটনাটা বলল। ডাক্তারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'কত রেডিয়েশন পাস করেছে?'

বজলু জবাব দিল না। আবার মাথার ঘাম মুছল। তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে। ডাক্তার সাহেব ডিজিটাল মিটারে সংখ্যা দেখলেন। রেডিয়েশনের পরিমাণ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। রুগী এর পরেও বেঁচে আছে কী করে?

নিশানাথ বাবু বললেন, 'শেষ হয়েছে?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'জ্বি জ্বি শেষ। শেষ, ভাই আপনি উঠে বসুন। মাসুদ, ওঁকে উঠিয়ে বসাও।'

মাসুদকে উঠিয়ে বসাতে হল না। নিশানাথ বাবু নিজেই উঠে বসলেন। নিচু গলায় বললেন, 'কোনো ঝামেলা হয়েছে?'

মাসুদ শুকনো গলায় বলল, 'কোনো ঝামেলা হয় নি। একটু দেরি হল আর কি, যন্ত্রপাতির কারবার!'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'কোনো ব্যথা পাই নাই।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আসুন তো আমার সঙ্গে, আসুন।'

'বাসায় চলে যাব। দেরি হয়ে গেছে।'

'একটু বসে যান। চা খান এক কাপ।'

'মাথাটা কেমন খালি খালি লাগছে।'

'ও কিছু না। রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

ডাক্তার সাহেব নিশানাথ বাবুকে তাঁর ঘরে নিয়ে বসালেন। কামিজ-পরা মেয়েটি এখনো আছে। তার নাম নাসিমা। আজ তার জন্মদিন। সে অনেক দিন ধরে ভাবছে আজকের দিনটি অন্য রকম ভাবে কাটাবে। যার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগে, শুধু তার সঙ্গেই গল্প করবে। ফরহাদ নামের এই ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করতে তার ভালো লাগে। শুধু যে ভালো লাগে তাই নয়, অসম্ভব ভালো লাগে। যখন তিনি থাকেন না, নাসিমা মনে মনে তাঁর সঙ্গে গল্প করে। নাসিমা জানে, কাজটা ভালো হচ্ছে না, খুব খারাপ হচ্ছে। তার দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই ডাক্তার ফরহাদ বিবাহিত। দু'টি ছেলেমেয়ে আছে। ফরহাদ সাহেবের স্ত্রী, যাকে সে এ্যানি ভাবী বলে--তিনিও চমৎকার এক জন মানুষ।

নাসিমা জানে, এই চমৎকার পরিবারে সে ধীরে ধীরে একটা সমস্যার সৃষ্টি

করছে। আগে এ্যানি ভাবী তার সঙ্গে অনেক গল্প করতেন। এখন দেখা হলে শুকনো গলায় বলেন--কি--ভালো? বলেই মুখ ফিরিয়ে নেন। যেন তার সঙ্গে কথা বলা অপরাধ, সে এক জন অস্পৃশ্য মেয়ে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'নাসিমা, তুমি বাসায় চলে যাও।'

নাসিমার চোখে পানি এসে গেল। আজ তার জন্মদিন। স্কলারশিপের জমান সব টাকা নিয়ে সে এসেছে। ফরহাদ ভাইকে নিয়ে সে চাইনিজ খাবে। একটা শাড়ি কিনবে। ফরহাদ ভাইকে বলবে শাড়ির রঙ পছন্দ করে দিতে। তারপর ঠিক সেই রঙের একটা শার্ট সে ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে কিনবে।

'নাসিমা, আমার জরুরী কাজ আছে। তুমি এখন যাও। তোমাদের কলেজ কি আজ বন্ধ?'

নাসিমা জবাব দিল না। মুখ জানালার দিকে ফিরিয়ে নিল, কারণ চোখ বেয়ে গালে পানি এসে পড়েছে। ডাক্তার সাহেব তা দেখতে পেলেন না। নাসিমা প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে কোনো একটা চলন্ত ট্রাকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে, কিংবা কোনো একটা দশ তলা দালানের ছাদে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ দিতে।

নিশানাথ বাবু চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মাঝে মাঝে জিভ বের করে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর পর বড়ো বড়ো করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তাঁর বড়ো ধরনের কোনো কষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনার নামটা জানা হল না।'

নিশানাথ বাবু চমকে চোখ মেলে তাকালেন। মনে হচ্ছে তিনি ডাক্তার সাহেবের প্রশ্ন ঠিক বুঝতে পারছেন না।

'আমাকে বলছেন?'

'জ্বি।'

'কী বলছেন?'

'আপনার নাম জানতে চাচ্ছিলাম।'

'নিশানাথ। আমার নাম নিশানাথ।'

'শরীরটা কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'কিছু খাবেন?'

'না। বাসায় যাব।'

'বাসা কোথায়?'

'মালীবাগে।'

'বয়স কত আপনার?'

'ঠিক জানি না। পাঁচপঞ্চাশ—ষাট হবে।'

'ও আচ্ছা--শরীরটা এখন কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

নিশানাথ বাবু খানিকটা বিস্ময় বোধ করলেন। এই লোক সারাক্ষণ তাকে শরীর কেমন শরীর কেমন জিজ্ঞেস করছে কেন? তাহলে কি তিনি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন? কিংবা এক্সরে নেওয়ার সময় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন?

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'মালীবাগে কি আপনার নিজের বাড়ি?'

'না। আমার এক ছাত্রের বাড়ি। আমি ঐ বাড়িতে থাকি। আর আমার ছাত্রের ছেলে-মেয়ে দুটোকে পড়াই।'

'ও আচ্ছা। আপনার নিকট-আত্মীয়স্বজন কে কে আছেন?'

'তেমন কেউ নেই। যাঁরা আছেন- ইণ্ডিয়ায় চলে গেছেন।'

'আপনি যান নি কেন?'

'ইচ্ছা করল না। আমি এখন উঠি?'

'আরে না, আরেকটু বসুন, চা খান।'

নিশানাথ বাবু বসলেন। তাঁর খুব ক্লান্তি লাগছে। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে। চা চলে এল। তিনি চায়ে চুমুক দিলেন--কোনো রকম স্বাদ পেলেন না: তবু ছোট ছোট চুমুক দিতে লাগলেন, এখন না খাওয়াটা অভদ্রতা হয়।

বজলু ডাক্তার সাহেবকে একটা কাগজ দিয়ে গেছে। সেখানে লেখা কত ডোজ রেডিয়েশন এই রুগীর মাথার ভেতর দিয়ে পাস করেছে। সংখ্যাটির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার সাহেব ঢোক গিললেন। এ কী ভয়াবহ অবস্থা।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আর কোনো এক্সরে নেওয়া হয় নি তো?'

'জ্বি না। তবে যন্ত্র এখন ঠিক আছে।'

'ঠিক থাকুক আর না থাকুক, আর কোনো এক্সরে যেন না করা হয়।'

'জ্বি আচ্ছা।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'আমি এখন উঠি?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমি ঐ দিক দিয়েই যাব। আপনাকে নামিয়ে দেব। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।'

নিশানাথ বাবু ডাক্তারের ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কী অসাধারণ এক জন মানুষ। আজকালকার দিনে এ রকম মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে।

গাড়িতে উঠতে উঠতে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমার কার্ডটা রাখুন। টেলিফোন নাম্বার আছে। কোনো অসুবিধা হলে টেলিফোন করবেন।'

নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কি অসুবিধা?'

'না, মানে--বয়স হয়েছে তো। এই বয়সে শরীর তো সব সময় খারাপ থাকে। পরিচয় যখন হয়েছে তখন যোগাযোগ রাখা। আপনি শিক্ষক মানুষ।'

নিশানাথ বাবুর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হল। কী অসম্ভব ভদ্র এই ডাক্তার। এঁকে

ধন্যবাদের কিছু কথা বলা দরকার। বলতে পারলেন না। শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছে। তিনি গাড়ির পেছনের সীটে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

বাসায় ফিরে শরীরটা আরো খানিকটা খারাপ হল। নিজের ঘরে ঢুকে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটা ঠিক স্পষ্ট নয়, আবার স্পষ্টও : ছোট্ট একটা ঘর। ঘরে একটা মেয়ে একা একা বসে আছে। মেয়েটিকে তিনি আগে কখনো দেখেন নি। কিন্তু তিনি তার নাম জানেন। মেয়েটার নাম নাসিমা, সে কলেজে পড়ে। তার আজ জন্মদিন। এ রকম খুশির দিনেও তার মন খুব খারাপ। সে খুব কাঁদছে।

দীর্ঘ স্বপ্ন। তবে এই স্বপ্নে কোনো কথাবার্তা নেই। এই স্বপ্নের জিনিসগুলি স্থির, কোনো নড়াচড়া নেই! যেন কয়েকটা সাদাকালো ফটোগ্রাফ। আবার ঠিক সাদাকালোও নয়। এক ধরনের রঙ আছে, সেই রঙ পরিচিত নয়। ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

২

বাড়ির নাম 'পদ্মপত্র'।

বিশাল কম্পাউণ্ডের ভেতর বাগানবাড়ির মতো বাড়ি। ঢাকা শহরের মাঝখানে জমিদারী সময়কার এক বাড়ি। বাড়ির আদি মালিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার রিডার ডঃ প্রশান্ত মল্লিক। তাঁর খুব গাছপালার শখ ছিল। যেখানে যত বিচিত্র গাছ পেয়েছেন তার সবই এনে লাগিয়েছিলেন। দিনমানে গাছের কারণে অন্ধকার হয়ে থাকত। লোকজন তখন এই বাড়ির নাম দিল জঙ্গলাবাড়ি। ডঃ মল্লিকের বৃক্ষপ্রীতি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই লাগল। তাঁর খানিকটা মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণও দেখা দিল। ঘুম হ'ত না, নিজের তৈরী বাগানে সারা রাত হাটতেন এবং গাছের সঙ্গে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতেন। ডঃ মল্লিক ল্যাটিন ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁর সর্বকনিষ্ঠ কন্যাটিরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। বাড়ির নাম তখন হয়ে যায় পাগলাবাড়ি।

ডঃ মল্লিকের স্ত্রী দেশবিভাগের তিন বছরের মাথায় বাড়ি বিক্রি করে তাঁর অপ্রকৃতস্থ কন্যাকে নিয়ে চলে যান জলপাইগুড়ি। এই বাড়ি তারপর চার বার হাতবদল হয়ে বর্তমানে আছে মহসিন সাহেবের হাতে। আগের বাড়ির কিছুই নেই। গাছপালার অধিকাংশই কেটে ফেলা হয়েছে। বাড়ির পেছনে জলজ গাছ লাগানর জন্যে একটা ঝিলের মতো ছিল, সেই ঝিল ভরাট করে চার কামরার এল্ প্যাটার্নের ঘর করা হয়েছে। ঘরগুলিতে মহসিন সাহেবের ড্রাইভার, মালী এবং দারোয়ান থাকে। বছর দুই ধরে আছেন নিশানাথ বাবু।

নিশানাথ বাবু একসময় মহসিন সাহেবেরও প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। অঙ্ক করাতেন। খুব যত্ন করেই করাতেন। পড়ানর ফাঁকে ফাঁকে মজার মজার গল্প করতেন। মহসিন সাহেব শিশু অবস্থায় সেইসব গল্প শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হতেন। তাঁর সেই বিস্ময়ের কিছুটা এখনো অবশিষ্ট আছে বলে নিশানাথ বাবুকে যত্ন করে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। নিশানাথ বাবুর দায়িত্ব সন্ধ্যার পর মহসিন সাহেবের পুত্র-কন্যাকে নিয়ে বসা, পড়া দেখিয়ে দেওয়া। এই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। দায়িত্বের বাইরে যা করেন তা হচ্ছে গাছপালার যত্ন। প্রায় সময়ই মালীর সঙ্গে তাঁকেও নিড়ানি হাতে বাগানে বসে থাকতে দেখা যায়।

মহসিন সাহেবের এক ছেলে, দুই মেয়ে। বড়ো ছেলে ল্যাবরেটরি স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ে। পড়াশোনায় মোটামুটি ধরনের, তবে সুন্দর ছবি আঁকে। দ্বিতীয় সন্তান--রাত্রি পড়ে ভিকারুননেসা স্কুলে ক্লাস ফাইভে। এই মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী। স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। কোনো জিনিস এক বার পড়লে দ্বিতীয় বার পড়ার দরকার হয় না। মহসিন সাহেবের তৃতীয় সন্তান আলো--ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে রূপবতী। তার দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া মুশকিল। আলো এবং রাত্রির বয়সের তফাত এক বৎসর। আলো জন্ম থেকেই মূক ও বধির। এই মেয়েটিকে নিয়ে বাবা-মা'র দুঃখের কোনো সীমা নেই।

মহসিন সাহেবের স্ত্রী দীপা মেয়েটিকে সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখেন। মাঝে মাঝে থমথমে গলায় বলেন, 'মা, তুই এত সুন্দর হচ্ছিস কেন? তুই তো বিপদে পড়বি, মা।' আলো চোখ বড়ো বড়ো করে মা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। মার কথা সে শুনতে পায় না, মা কী বলছেন বুঝতেও পারে না। মা'র কথা শেষ হওয়া মাত্র সে হাসে। সেই হাসি এতই মধুর যে দীপার ইচ্ছা করে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে।

রাত প্রায় আটটা বাজে। তুষার এবং রাত্রি ভিডিও গেম নিয়ে বসেছে। রাত্রি গত জন্মদিনে এই যন্ত্রটি উপহার হিসেবে পেয়েছে। অনেকগুলি খেলার ক্যাসেট আছে। তবে তাদের পছন্দ হয়েছে ঘোড়ার খেলাটা। খেলা শুরু হতেই টিভি পর্দায় দেখা যায় অনেক জীবজন্তুর মাঝখানে ল্যাসো হাতে এক ঘোড়সওয়ার বসে আছে। খেলার বিষয়টি হচ্ছে জীবজন্তু ধরা। কালো ছাগল তিন পয়েন্ট, সাদা হরিণ পঁচিশ পয়েন্ট, বসে থাকা বাঘ এক শ' পয়েন্ট। জন্তুগুলি ধরা বেশ কঠিন, কারণ এরা দ্রুত দৌড়তে থাকে।

রাত্রির জয়স্টিকের কনট্রোল খুবই চমৎকার। সে পাঁচ হাজার পর্যন্ত করতে পারে। তুষার অনেক কষ্টে এক বার এগারো শ' করেছিল। ছোট বোনের কাছে পরাজিত হবার লজ্জায় সে খানিকটা ম্রিয়মাণ। এখন খেলছে রাত্রি। তুষার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। ওদের থেকে অনেকটা দূরে সোফায় আধশোয়া হয়ে বসে আছে

আলো। সেও গভীর মনোযোগে খেলা দেখছে।

দীপা ট্রেতে করে ছেলেমেয়েদের জন্যে দুধের গ্লাস নিয়ে ঢুকলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, 'এখন গেম নিয়ে বসেছ কেন? পড়াশোনা নেই?'

রাত্রি খেলা বন্ধ না করেই বলল, 'স্যার আজ পড়াবে না মা। স্যারের শরীর ভালো না।'

দীপা বললেন, 'উনি পড়াবেন না বলেই তোমরা পড়বে না--এ কেমন কথা? পরীক্ষায় খারাপ করবে তো।'

রাত্রি বলল, 'আমি কি কখনো খারাপ করেছি?'

'কখনো কর নি বলেই যে ভবিষ্যতেও করবে না, তা তো না। না পড়লে কী ভাবে ভলো করবে?'

রাত্রি খেলা বন্ধ করে মা'র দিকে তাকিয়ে হাসল। মিষ্টি করে বলল, 'পড়তে যাচ্ছি মা।'

দীপা বললেন, 'আরেকটা কথা, তোমরা যখন খেলা নিয়ে বস, তখন আলোকে ডাক না কেন? সে একা একা দূরে বসে থাকে। ওর নিশ্চয়ই খেলতে ইচ্ছা করে।'

তুষার বলল, 'ও খেলতে পারে না, মা।'

'না পারলে ওকে শিখিয়ে দেবে। তোমরা আছ কেন? ওর বুঝি খেলতে ইচ্ছা করে না? বেচারী একা একা দূরে বসে আছে।'

রাত্রি বলল, 'আমি ওকে ডেকেছি, মা। ও তো আসতে চায় না। ও আমাদের পছন্দ করে না।'

'কে বলল পছন্দ করে না?'

'কাছে গেলে খামচি দেয়, এই দেখ খামচির দাগ।'

দীপা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করে বললেন, 'ঠিক আছে। যাও, হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বস। দুধ টেবিলে রইল। পড়তে বসার আগে দুধ খেয়ে নেবে। ন'টা বাজতেই খেতে আসবে। আর শোন, তোমাদের স্যারের যে অসুখ--তোমরা কি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলে?'

রাত্রি বলল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। না গেলে জানব কি করে যে তাঁর অসুখ। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছেন। মাথায় খুব যন্ত্রণা।'

তুষার বলল, 'দারোয়ান ভাই বলেছেন, স্যারের মাথায় কুকুরের বাচ্চা হয়েছে। এক বার তো তাঁকে কুকুর কামড়ে দিয়েছে, তাই। মেয়েদের যদি কুকুরে কামড় দেয় তাহলে তাদের পেটে বাচ্চা হয়, আর ছেলেদের যদি কামড়ায় তাহলে তাদের মগজে বাচ্চা হয়। খুব ছোট ছোট বাচ্চা। ইঁদুরের চেয়েও ছোট।'

দীপা খুব রাগ করলেন। নতুন দারোয়ানটা রোজই কিছু-না-কিছু উদ্ভট কথা বলবে। তাকে মানা করে দেওয়া হয়েছে, তার পরেও এই কাণ্ড। তাছাড়া তার ঘরের পাশের ঘরে এক জন অসুস্থ মানুষ পড়ে আছে, এই খবরটা তাঁকে জানাবে

না? ডাক্তার ডাকতে হতে পারে। বুড়ো মানুষ। হয়তো–বা হাসপাতালে নিতে হতে পারে। রাতে নিশ্চয়ই ভাত খাবেন না। পথ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরে চালের আটা আছে কিনা কে জানে। থাকলে চালের আটার কয়েকটা রুটি করার কথা বলে দিতে হবে।

দীপা নিশানাথ বাবুকে দেখতে যাবার জন্যে রওনা হলেন। ইট–বিছান রাস্তা অনেকখানি পার হতে হয়। দু'পাশে উঁচু হয়ে ঘাস জমেছে। এক সপ্তাহও হয় নি কাটা হয়েছে, এর মধ্যেই ঘাস এত বড়ো হয়ে গেল। মালী কোনো কিছুই লক্ষ করে না। বর্ষাকাল সাপখোপের সময়। এই সময়ে বাগান পরিষ্কার না রাখলে চলে?

নিশানাথ বাবুর ঘর অন্ধকার।

দীপা ভেতরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। নিশানাথ বললেন, 'কে?'

দীপা বললেন, 'চাচা, আমি দীপা।'

মহসিন নিশানাথ বাবুকে স্যার ডাকেন। তাঁর ছেলে–মেয়েরাও ডাকে স্যার। শুধু দীপা ডাকেন চাচা।

দীপাকে দেখে নিশানাথ বাবু উঠে বসলেন এবং কোমল গলায় বললেন, 'কেমন আছ গো মা?'

'আমি ভালোই আছি। আপনি কেমন আছেন? অসুখ নাকি বাধিয়ে বসেছেন।'

'তেমন কিছু না। জ্বর–জ্বর লাগছে। শুয়ে আছি।'

দীপা হাত বাড়িয়ে নিশানাথ বাবুর কপাল স্পর্শ করলেন। এই অসম্ভব ক্ষমতাবান মানুষের কন্যা এবং ধনবান মানুষের স্ত্রীর আন্তরিকতায় নিশানাথ বাবুর চোখে পানি আসার উপক্রম হল। দীপা বললেন, 'আপনার গায়ে তো বেশ জ্বর। মাথায় যন্ত্রণা কি আছে?'

'আছে।'

'খুব বেশি?'

'না, খুব বেশি না।'

'সাইনাসের জন্যে এক্সরে করাবার কথা ছিল যে, তা কি করিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। একটা ঝামেলা হয়েছে এক্সরেতে, আবার করাতে হবে।'

'রাতে আপনি কী খাবেন?'

'কিছু খাব না, মা। উপোস দেব। উপোস দিলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'চালের আটার রুটি করে দেব?'

'আচ্ছা দাও।'

দীপা চলে যেতে পা বাড়িয়েছেন তখন নিশানাথ বাবু বললেন, 'একটু বস মা। এই দু' মিনিট।'

দীপা বিস্মিত হয়ে ফিরে এলেন। নিশানাথ বাবুর সামনের চেয়ারটায় বসলেন।

নিশানাথ বাবু বললেন, 'বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখছি, বুঝলে মা। মনটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'কী স্বপ্ন'

'একই স্বপ্ন বারবার ঘুরে ফিরে দেখছি। একটা ঘরে কামিজ-পরা অল্পবয়স্ক একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার নাম--নাসিমা। নাসিমার মন খুব খারাপ। অথচ তার মন খুব ভালো থাকার কথা ছিল। সে একটা ট্রাকের সামনে লাফিয়ে পড়ল, অবশ্যি নাসিমার কিছু হল না।'

'আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন। শরীর দুর্বল, এই জন্য স্বপ্নটপ্ন দেখছেন।'

নিশানাথ বাবু চুপ করে রইলেন। দীপা বললেন, 'আপনি কি আর কিছু বলবেন, চাচা?'

'না, মা।'

'আমি তাহলে যাই? দারোয়ানকে বলে যাচ্ছি সে গেট বন্ধ করবার পর আপনার রুমের সামনে শুয়ে থাকবে।'

'লাগবে না মা, শরীরটা এখন আগের চেয়ে ভালো লাগছে।'

নিশানাথ বাবু বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে যাও, মা। আলো চোখে লাগছে।'

দীপা বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। তাঁকে খানিকটা চিন্তিত মনে হল। নিশানাথ বাবুর স্বপ্নের ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগল না। তিনি কোথায় যেন শুনেছেন, মানুষ পাগল হবার আগে আগে একই স্বপ্ন বারবার দেখে।

রাতে নিশানাথ বাবুর প্রবল জ্বর এল। জ্বরের প্রকোপে তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। দারোয়ান তাঁর রুমের বাইরেই ক্যাম্প খাট পেতে শুয়েছে। নিশানাথ বাবু বেশ কয়েক বার ডাকলেন, 'এই কুদ্দুস, এ-ই; এ-ই কুদ্দুস মিয়া।' দারোয়ানের ঘুম ভাঙল না। দারোয়ানদের সাধারণত খুব গাঢ় ঘুম হয়।

ভোর হবার ঠিক আগে আগে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল। শরীরটাও কেমন ঝরঝরে মনে হল। সামান্য ক্লান্তির ভাব ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই। তিনি বাগানে বেড়াতে গেলেন। ভোরবেলার এই ভ্রমণ তাঁর কাছে বড়োই আনন্দদায়ক মনে হল।

সূর্য ওঠার পর হাত মুখ ধুতে গিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ করলেন তাঁর মাথায় একটিও চুল নেই। এক রাত্রিতে মাথার সব চুল উঠে গেছে। কেন এরকম হল তিনি বুঝতে পারলেন না। কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে। সামান্য চুল মানুষের চেহারা যে এতটা বদলে দিতে পারে, তা তিনি আগে কখনো ভাবেন নি। নিজেকে দেখে তাঁর নিজেরই খুব হাসি পেতে লাগল। তিনি প্রথমে মৃদু স্বরে তারপর বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলেন। তাঁর হাসির শব্দে কৌতূহলী হয়ে কুদ্দুস উঁকি দিল। তার চোখে ভয়-মেশান দৃষ্টি। কুদ্দুস বলল, 'কি হইছে মাষ্টর সাব?'

'কিছু হয় নি কুদ্দুস। হাসছি।'

নিশানাথ বাবুর হঠাৎ মনে হল, কুদ্দুস মনে মনে তাকে পাগল বলে ডাকছে। এরকম মনে হল কেন? তিনি স্পষ্ট শুনলেন কুদ্দুস বলছে, 'আহা মানুষটা পাগল হইয়া যাইতেছে। আহা রে।'

'কুদ্দুস।'

'জ্বি।'

'তুমি মনে মনে কী ভাবছিলে?'

'কিছু ভাবতাছিলাম না মাষ্টর সাব। আফনের মাথার চুল বেবাক গেল কই?'

'পড়ে গিয়েছে। আমাকে দেখতে কেমন অদ্ভুত লাগছে, তাই না কুদ্দুস? মনে হচ্ছে আমি একটা ভূত। শ্যাওড়া গাছে থাকি।'

কুদ্দুস জবাব দিল না।

নিশানাথ আবার হাসতে শুরু করলেন। কুদ্দুস চোখ বড়ো বড়ো করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

৩

তুষার এবং রাত্রির জন্যে আজ খুব শুভদিন।

আজ বাবা তাদের স্কুলে নামিয়ে দেবেন। মাসে এক দিন মহসিন সাহেব তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে নামিয়ে দেন এবং স্কুল থেকে ফেরত আনেন। ফেরত আনার সময় খুব মজা হয়। বাচ্চারা যা চায় তাই তিনি করেন। তুষার যদি বলে—বাবা আইসক্রিম খাব তাহলে তিনি আইসক্রিম পালারের সামনে গাড়ি দাঁড় করান। রাত্রি এক বার বলেছিল—সাভার স্মৃতিসৌধ দেখতে ইচ্ছা করছে বাবা। মহসিন সাহেব বলেছেন—চল যাই, দেখে আসি। তখন ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় পানি। মহসিন সাহেব তার মধ্যেও গাড়ি ঘুরিয়েছিলেন।

আজও নিশ্চয়ই এরকম কিছু হবে। রাত্রি ঠিক করে রেখেছে ফেরার পথে সে বাবাকে বলবে গল্পের বই কিনে দিতে। তুষার এখনো কিছু ঠিক করতে পারে নি। কী চাওয়া যায় সে ভেবে পাচ্ছে না। এই জন্যে তার খুব মনখারাপ।

গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে মহসিন সাহেব বললেন, 'আজ স্কুলে না গেলে কেমন হয়?'

তুষার ভেবে পেল না—বাবা ঠাট্টা করছেন, না সত্যি সত্যি বলছেন।

মহসিন সাহেব বললেন, 'মাঝে মাঝে স্কুলপালানো ভাল। আমি যখন তুষারের মতো ছিলাম তখন স্কুল পালাতাম।'

রাত্রি বলল, 'সত্যি বাবা?'

'হুঁ সত্যি।'

'স্কুল পালিয়ে কী করতে?'

'মার্বেল খেলতাম। আমাদের সময় সবচেয়ে মজার খেলা ছিল মার্বেল। এখন আর কাউকে খেলতে দেখি না। তোমরা কেউ মার্বেল দেখেছ?'

'না।'

'চল, দোকানে গিয়ে খুঁজব। যদি পাওয়া যায়, তোমাদের জন্যে কিনব। কীভাবে খেলতে হয় শিখিয়ে দেব। আজ সারা দুপুর মার্বেল খেলা হবে।'

আনন্দে তুষারের বুক কাঁপতে লাগল। আজ কী ভীষণ সৌভাগ্যের দিন। স্কুলের ইংলিশ গ্রামার শেখা হয় নি। তার জন্যে আজ আর বকা খেতে হবে না।

রাত্রি অবশ্যি তুষারের মতো এত খুশি হল না। স্কুল তার খুব ভালো লাগে। স্কুলে তার দু' জন প্রাণের বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে কথা না বললে রাত্রির ভালো লাগে না।

মহসিন সাহেব বললেন, 'তোমরা যাও, আলোকে নিয়ে এস। ব্যাটালিয়ান নিয়ে রওনা হওয়া যাক।'

তুষার বলল, 'ও যাবে না, বাবা।'

'তুমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। না জিজ্ঞেস করেই বলছ কেন যাবে না। যেতেও তো পারে।'

'কখনো তো যায় না।'

'যেতেও তো পারে। আমার কাছে নিয়ে এস, আমি বুঝিয়েসুজিয়ে রাজি করাব।'

আলো মাকে ছেড়ে কখনো কোথাও যায় না। এই বাড়ির দেয়ালের বাইরে পা ফেলতেই তার আপত্তি। বাধ্য হয়ে যদি কখনো যেতে হয় চোখ-মুখ শক্ত করে রাখে। একটু পরপর চমকে ওঠে। অচেনা কাউকে দেখলেই এমন ভাব করে যাতে মনে হয় সে কোনো একটি বিচিত্র কারণে ভয় পাচ্ছে।

মহসিন সাহেব খুব খুশি হলেন। কারণ আলো যেতে রাজি হয়েছে। গাড়িতে তিনি আলো-কে তাঁর পাশে বসালেন।

রাত্রি এবং তুষার বসল পেছনের সীটে। রাত্রি বলল, 'তুমি কিন্তু আস্তে গাড়ি চালাবে, বাবা। তুমি এত স্পীডে গাড়ি চালাও যে ভয় লাগে।'

'আজ রিকশার চেয়েও আস্তে চালাব।'

রাত্রি এবং তুষার দু' জনই খিলখিল করে হেসে উঠল। আলো মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। সে হাসির কোনো কারণ বুঝতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করছে। আলোর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কত মজার মজার ব্যাপার চারদিকে হয়, সে কিছু বুঝতে পারে না। তাকে কেউ বুঝিয়ে দিতেও চেষ্টা করে না। এই দু' জন এত হাসছে কেন? আলোর কান্না পেতে লাগল। সে অবশ্যি কাঁদল না। চোখ-মুখ শক্ত

করে বসে রইল।

মহসিন সাহেব বললেন, 'আজ আমি একহাতে গাড়ি চালাব। সাঁই সাঁই বন বন।'

রাত্রি বলল, 'আরেকটা হাত দিয়ে তুমি কী করবে বাবা?'

'আরেকটা হাত আমি আলো মায়ের কোলে ফেলে রাখব।'

এই কথায় দু' জন আবার হেসে উঠল। আলো এদের হাসিহাসি মুখ গাড়ির ব্যাকভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছে। তার আরো মন খারাপ হয়ে গেল। এরা এত আনন্দ করছে কেন? গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মহসিন সাহেব দু' হাতেই স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছেন। স্লো স্পীডে তিনি গাড়ি চালাতে পারেন না। দেখতে দেখতে গাড়ি ফোর্থ গিয়ারে চলে গেল।

তুষার বলল, 'বাবা।'

'বল।'

'তুমি কি আজ সকালে স্যারকে দেখেছ, বাবা?'

'না।'

'দেখলে তুমি হাসতে হাসতে মরে যেতে।'

'কেন?'

'স্যারের মাথায় একটা চুলও নেই। সব পড়ে গেছে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। স্যারকে কী যে অদ্ভুত দেখাচ্ছে! রাত্রি ফিক করে হেসে ফেলেছে। হাসাটা কি উচিত হয়েছে, বাবা?'

'মোটেই উচিত হয় নি।'

'আমিও হেসেছি। তবে মনে মনে। কেউ দেখতে পায় নি।'

'তুমি খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।'

'ওর সব চুল পড়ে গেল কেন, বাবা?'

'বয়স হয়েছে তো, সেই জন্যে পড়ে গেছে। বয়স হলে মাথার চুল পড়ে যায়।'

'কেন পড়ে যায়?'

'মাথার চুল হচ্ছে মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্যে। বুড়ো মানুষদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার দরকার নেই, তাই চুল পড়ে যায়।'

'দাঁত পড়ে যায় কেন, বাবা?'

'বুড়ো মানুষদের শক্ত খাবার খাওয়ার প্রয়োজন নেই, এই জন্যে দাঁতও পড়ে যায়।'

মহসিন সাহেব মীরপুর রোড ধরলেন। তিনি চিড়িয়াখানার দিকে যাচ্ছেন। চিড়িয়াখানা ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুব অপছন্দের। আজ যাচ্ছেন ছোটমেয়ের জন্যে। একমাত্র চিড়িয়াখানায় গেলেই আলোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মহসিন সাহেব গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিলেন। তিনি লক্ষ করেছেন দ্রুতগতি তাঁকে চিন্তায় সাহায্য করে। যদিও এই মুহূর্তে তেমন কোনো চিন্তা তাঁর মাথায় নেই। অস্পষ্টভাবে নিশানাথ বাবুর কথা তাঁর মনে আসছে। দীপাও আজ সকালে চুল পড়ার কথা বলেছিল। লোকটির দিন বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ ভালো-মন্দ কিছু হয়ে গেলে সমস্যা হবে। ডেড বডি কী করা হবে? হিন্দুদের দেহ সৎকারের অনেক সমস্যা আছে বলে শুনেছেন। নিশানাথ বাবুর আত্মীয়স্বজন ঢাকায় কেউ আছেন কিনা জিজ্ঞেস করা হয় নি। জানা থাকা দরকার।

এক জন ডাক্তার নিশানাথ বাবুকে দেখছেন।

ডাক্তারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাঁর শরীর এখন ভালোই লাগছে, তবু দীপা ডাক্তার আনিয়েছেন। এখন দাঁড়িয়েও আছেন ডাক্তারের পাশে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনার অসুবিধা কী?'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'তেমন কোনো অসুবিধা নেই।'

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে দীপার দিকে তাকালেন। দীপা বললেন, 'দেখুন না হঠাৎ করে ওঁর মাথার সব চুল পড়ে গেল!'

'এটা এমন কিছু না। অন্য কোনো অসুবিধা না থাকলেই হল। আছে অন্য কোনো সমস্যা?'

'জ্বি না, মাঝে মাঝে খুব মাথার যন্ত্রণা হয়।'

'এখনো হচ্ছে?'

'জ্বি না।'

দীপা বললেন, 'ওঁর সাইনাসের সমস্যা আছে।'

'বেশি করে লেবুর সরবত খাবেন। ভিটামিন সি এইসব ক্ষেত্রে খুব উপকারী। ভিটামিন সি-কে এখন বলা হচ্ছে মিরাক্‌ল্‌ ভিটামিন।'

ডাক্তার সাহেবের বোধহয় বাড়ি যাবার তাড়া আছে, দ্রুত কাজ সারতে চাইছেন। দীপা বললেন, 'আপনি দয়া করে ওঁর প্রেশারটা একটু দেখুন।'

ডাক্তার সাহেব ব্যাগ খুলে অপ্রসন্ন মুখে প্রেশারের যন্ত্রপাতি বের করলেন। প্রেশার মাপার তাঁর কোনো ইচ্ছা ছিল না। এই ডাক্তার এ-বাড়িতে প্রথম এসেছেন। এঁদের ডাক্তার হচ্ছে দীপার ছোট বোন তৃণা। আজ তৃণাকে পাওয়া যায় নি। তার বোধহয় আবার হাসপাতালে নাইট ডিউটি পড়েছে।

'আপনার প্রেশার নর্ম্যাল। আপনার বয়সের তুলনায় খুবই নর্ম্যাল।'

দীপা বললেন, 'চাচা, আপনার অন্য কোনো সমস্যা থাকলে বলুন।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'আমার আর তো কোনো সমস্যা নেই, মা।'

'স্বপ্নের কথা বলুন।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কিসের স্বপ্ন?'

দীপা বললেন, 'চাচা কি একটা স্বপ্ন যেন বারবার দেখছেন। বলুন না, চাচা। ডাক্তারদের কাছে কিছু গোপন করতে নেই।'

নিশানাথ বাবু বিব্রত গলায় বললেন, 'একটা মেয়ে--তার নাম নসিমা। কামিজ পরা। মেয়েটার মন খুব খারাপ।'

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আপনি কি বলছেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'স্বপ্নের কথা বলছি। মানে গুছিয়ে বলতে পারছি না। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মানে—'

নিশানাথ বাবু থেমে গেলেন এবং অবাক হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকালেন, কারণ কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর মনে হল এই ডাক্তারের নাম মাসুদুর রহমান। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রীর নাম ইয়াসমিন। তাঁদের তিন ছেলে। বড় ছেলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পিছলে পড়ে হাতের একটা হাড় ভেঙে ফেলেছে। হাড়টা ঠিকমতো সেট হয় নি বলে ডাক্তার সাহেব খুব চিন্তিত।

নিশানাথ বাবু ভেবে পেলেন না--এইসব কথা তাঁর মনে আসছে কেন? তিনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন নাকি? বোঝাই যাচ্ছে এসব তাঁর কল্পনা। ডাক্তার সাহেবের নাম নিশ্চয়ই মাসুদুর রহমান নয়। তাঁর স্ত্রীর নামও নিশ্চয়ই ইয়াসমিন নয়। অথচ তাঁর কাছে মনে হচ্ছে এটাই সত্যি। এ রকম মনে হবার কী মানে থাকতে পারে?

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'স্বপ্নের ব্যাপারটা তো শেষ করলেন না।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'ঐ সব কিছু না, বাদ দিন। মাথা গরম হয়েছিল, তাই আজে-বাজে স্বপ্ন দেখেছি। এখন আর দেখি না।'

'আমি আপনাকে ট্রাংকুলাইজার দিচ্ছি। শোবার সময় একটা করে খাবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কয়েক দিন বিশ্রাম নিন। ভালোমতো খাওয়াদাওয়া করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। মাথার চুল নিয়ে মোটেও ভাববেন না। নানান কারণে মাথার চুল পড়ে যেতে পারে। এটা কিছুই না।'

ডাক্তার সাহেব ব্লাডপ্রেশারের যন্ত্রপাতি ব্যাগে ভরছেন। নিশানাথ বাবু আচমকা বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনার নাম কি মাসুদুর রহমান?'

ডাক্তার সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'জ্বি। আপনি কি আমাকে চেনেন?'

'জ্বি, চিনি। আপনার ছেলের হাত জোড়া লেগেছে?'

'লেগেছে। তবে একটু সমস্যা আছে বলে মনে হয়। আপনি কি আমার ছেলেকেও চেনেন নাকি?'

নিশানাথ বাবু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'ওকে অবিশ্যি এ পাড়ার সবাই চেনে। বড়ো যন্ত্রণা করে। আপনার সঙ্গে কখনো কোনো বেয়াদবি করে নি তো?'

'জ্বি না।'

'কেউ যখন বলে আপনার ছেলেকে চিনি, তখনি একটু বিব্রত বোধ করি। ঐ দিন বাসার ছাদ থেকে কার মাথায় যেন পানি ঢেলে দিয়েছে। এগারো বছর বয়েস-এর মধ্যেই কি রকম দুষ্টু বুদ্ধি। আচ্ছা যাই।'

ডাক্তার সাহেব চলে যাবার পর নিশানাথ বাবু প্রায় এক ঘন্টা মূর্তির মতো বসে রইলেন। ব্যাপারটা কী হল তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। এই এক ঘন্টায় আরেকটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। নিশানাথ বাবুর সামনের পাটির দু'টি দাঁত পড়ে গেল। তাঁর দাঁতে কোনো সমস্যা নেই অথচ পাকা ফল যেভাবে পড়ে, ঠিক সেইভাবে দাঁত পড়ে গেল! এর মানে কী? কী হচ্ছে এসব? তাঁর ভয় করতে লাগল। তিনি এক মনে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

জীব ও জড়ে যে-ঈশ্বর, জল ও অগ্নিতে যে-ঈশ্বর, যে-ঈশ্বর আকাশে ও পাতালে সেই ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ।

৪

তুষার এবং রাত্রি দু' জনই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তুষারের মুখ ভাবলেশহীন, তবে রাত্রি একটু পরপর কেঁপে উঠছে। হাসি থামানর চেষ্টা করছে। সে বুঝতে পারছে কাজটা খুব অন্যায় হচ্ছে, তবু নিজেকে সামলাতে পারছে না। স্যারকে কী অদ্ভুত যে দেখাচ্ছে। মাথায় একটা চুলও নেই। আবার সামনের পাটির দুটো দাঁত নেই। তাও সহ্য করা যেত, কিন্তু এখন তাদের পড়াবার সময় খুটখুট করে তিনটে দাঁত পড়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে চেহারাটা হয়ে গেল অন্য রকম।

নিশানাথ বাবু বললেন, 'হাসিস না।'

রাত্রি বলল, 'হাসি এলে কী করব? তবে আপনাকে দেখে হাসছি না, স্যার। অন্য একটা ব্যাপারে হাসছি।'

'কী ব্যাপার?'

'আছে একটা ব্যাপার। আমাদের স্কুলের একটা কাণ্ড।'

রাত্রি খুকখুক করে হাসছে। হাসি চাপার চেষ্টা করছে, পারছে না। তুষার বলল, 'ও কিন্তু আপনাকে দেখেই হাসছে, স্যার।'

'উঁহু। আমি স্যারকে দেখে হাসছি না। স্কুলের একটা ঘটনা মনে পড়েছে এই জন্যে হাসছি--হি হি হি হি।'

রাত্রি যে মিথ্যা কথা বলছে নিশানাথ বাবু তা বুঝতে পারছেন। আগেও বুঝতে পারতেন। মিথ্যা কথা বললে রাত্রির গলা অন্য রকম হয়ে যায়। আজও তার গলা অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে নিশানাথ বাবু গলার স্বরের পরিবর্তন থেকে নয়,

সম্পূর্ণ ভিন্ন–এক পদ্ধতিতে জানতে পারছেন রাত্রি মিথ্যা বলছে। এই পদ্ধতি তিনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, কারণ পদ্ধতিটি যে কী, তিনি নিজেও ঠিক জানেন না। যেমন আজকের কথাই ধরা যাক। ছেলে–মেয়ে দু'টি বসে আছে তাঁর সামনে। নিশানাথ বাবু কোনো এক জটিল প্রক্রিয়ায় ইচ্ছামতো এদের দু' জনের মাথার ভেতর ঢুকে যেতে পারছেন। মাথার ভেতরটা অনেকটা কুয়োর মতো। গহীন কুয়ো। এত গহীন যে ভয় হয়––এর বোধহয় কোনো শেষ নেই।

নিশানাথ বাবু জানেন না অন্যের মাথার ভেতর চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি কী। তিনি শুধু জানেন যে তিনি তা পারেন। সেই গহীন কূপের ভিতরে তিনি যখন নামেন তখন তাঁর রোমাঞ্চ বোধ হয়। কুয়োর দেয়ালগুলিতে থরে থরে কত কিছুই না সাজান––মানুষের স্মৃতি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। কুয়োর গহীন থেকে উঠে আসে মানুষের চিন্তা, কল্পনা ও ভাবনা। একই সঙ্গে এক জন মানুষ কত কিছু নিয়েই না ভাবতে পারে।

মানুষের মাথার ভেতরে ঢুকতে পারার এই অদ্ভুত ক্ষমতার ব্যাপারটি নিশানাথ দু' দিন আগে বুঝতে পেরেছেন। এই দু' দিনে অনেকের মাথার ভেতর তিনি উঁকি দিয়েছেন। এ বাড়ির মালী, দারোয়ান, ড্রাইভার, রাস্তার ও–পাশে 'ভাই ভাই লন্ড্রী'র ছেলেটা, ডেল্‌টা ফার্মেসির রোগা লোক।

তিনি লক্ষ করেছেন একেক মানুষের জন্যে এই কুয়ো একেক রকম। কারও কারও কুয়ো আলোকিত। সেই সব কুয়োয় প্রবেশ করাও যেন এক গভীর আনন্দের ব্যাপার। এই যে শিশু দু'টি তাঁর সামনে বসে আছে তাদের মাথার ভেতরের কুয়ো দু'টি আলোয় ঝলমল করছে। সেখানে কিছুক্ষণ থাকাও গভীর আনন্দের ব্যাপার।

আবার সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের কুয়োও আছে। সেখানে গাঢ় অন্ধকার। সেইসব কুয়োয় আলোর লেশমাত্র নেই। কুয়োয় ঢুকলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আতঙ্কে অস্থির হতে হয়। আবার কারো কারো কুয়োয় অল্প কিছু অংশ শুধু আলোকিত, বাকিটা গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। এ সবের কী মানে? পুরোটাই তাঁর কল্পনা নয় তো?

রাত্রি বলল, 'স্যার আপনার দাঁত পড়ে যাচ্ছে কেন?'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'বুঝতে পারছি না। বয়স হয়েছে, সেই জন্যেই বোধ হয় পড়ে যাচ্ছে।'

তুষার বলল, 'স্যার আপনি কি জানেন বয়স হলে কেন দাঁত পড়ে যায়?'

'না, জানি না।'

'আমি জানি। বুড়ো লোকদের শক্ত খাবার খাওয়ার দরকার নেই, সেই জন্যে দাঁত পড়ে যায়।'

'কে বলল?'

'আব্বু বলেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'আবু সব কিছু জানে।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'ট্রানস্লেশন নিয়ে বস, তুষার। ট্রানস্লেশনে তুমি বড়োই কাঁচা।'

রাত্রি বলল, 'ট্রানস্লেশনে আমি খুব পাকা, তাই না স্যার?'

নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না। তুষার তার ট্রানস্লেশন নিয়ে বসল। তার মুখ অপ্রসন্ন। ইংরেজি তার অসহ্য লাগে। তারা চেয়েও অসহ্য লাগে ট্রানস্লেশন। সে খাতা খুলল। বাড়ির কাজ করতে হবে--

'যখন রুগী মারা যাচ্ছে তখন ডাক্তার এলেন।'

'বাড়ি থেকে যখন বের হলাম তখন বৃষ্টি নামল '

'যখন ঘন্টা পড়ল তখন স্কুলে গেলাম.'

তুষার পেন্সিল কামড়াচ্ছে।

নিশানাথ বাবু বললেন, 'পারছ না?'

'পারছি।'

রাত্রি বলল, ' ও মুখে বলছে পারছি, আসলে কিন্তু ও পারছে না।'

তুষার রাগী চোখে তাকাল। রাগ সামলে খাতার উপর ঝুঁকে পড়ল। আসলেই সে পারছে না। তার খুব কষ্ট হচ্ছে। নিশানাথ বাবু হঠাৎ লক্ষ করলেন তিনি তুষারের মাথার ভেতরে চলে এসেছেন। সেই গহীন কুয়োর মাঝামাঝি একটা জায়গায়। তুষারের কষ্টটা তিনি বুঝতে পারছেন। সে বাক্যগুলির ইংরেজি প্রতিশব্দ জানে, কিন্তু সাজাতে পারছে না। কোন শব্দটির পর কোন শব্দটি বসবে তা তার জানা নেই। আচ্ছা, তুষারের মাথার ভেতরে বসে কি তা ঠিক করে দেওয়া যায় না? এখান থেকে তাকে শেখানো কি সবচেয়ে সহজ নয়? চেষ্টা করে দেখবেন নাকি? এতে তুষারের কোনো ক্ষতি হবে না তো?

নিশানাথ বাবু চেষ্টা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে তুষার তা ধরে ফেলল। তুষারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে একের পর এক ট্রানস্লেশন করে যাচ্ছে।

রাত্রি বলল, 'স্যার, ও কি পারছে?'

'হ্যাঁ পারছে।'

নিশানাথ বাবুর খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি খুশি হতে পারছেন না। এই জটিলতার কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। কোনো এক জনের সঙ্গে আলাপ করলে কেমন হয়? কার সঙ্গে আলাপ করবেন? যাকেই তিনি বলবেন সে-ই তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। দীপা, দীপাকে কি বলা যায় না? সে কি হাসাহাসি করবে?

তুষার বলল, 'স্যার আমাকে আরো ট্রানস্লেশন দিন। আমার ট্রানস্লেশন করতে ভালো লাগছে।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'যখন অন্ধকার হয় তখন পাখিরা আকাশে ওড়ে।'

তুষার খাতায় ইংরেজিটা লিখছে। খাতা না দেখেও নিশানাথ বাবু বুঝতে

পারলেন তুষার নির্ভুলভাবে ট্রানস্লেশনটা করবে। কারণ ইংরেজিটা সে ভাবছে, তিনি তাঁর ভাবনা বুঝতে পারছেন। এর মানে কী? হে ঈশ্বর, এর মানে কী? এর মানে কী? এর মানে কী?

৫

আলো কি ঘুমুচ্ছে?

দীপা বুঝতে পারছেন না। আলোর চোখ বন্ধ। একটা হাত মা'র গায়ে ফেলে রেখেছে। নিঃশ্বাস ভারী। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবু দীপা নিশ্চিত হতে পারছেন না। তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। এগারোটা দশ বাজে। প্রায় আধ ঘন্টার মতো হলো তিনি আলো-কে নিয়ে শুয়েছেন। আলো-র মাথায় বিলি কেটে দিয়েছেন। পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এতক্ষণে তার ঘুম এসে যাওয়ার কথা।

তিনি খুব সাবধানে আলোর হাত ঘুরিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস চাপলেন। এই মেয়ে তাঁকে বড়ো বিপদে ফেলেছে। অন্য এক ধরনের বিপদ, যে-বিপদের কথা বাইরের কাউকে বলা যাবে না। বিপদের ধরনটা বিচিত্র। সন্ধ্যা মেলবার পর থেকে আলো তার বাবাকে সহ্য করতে পারে না। দীপাকে মেয়ে নিয়ে আলাদা ঘরে ঘুমুতে হয়। সেই ঘরে মহসিন সাহেব উঁকি দিলে সে অন্য রকম হয়ে যায়। কঠিন চোখে বাবার দিকে তাকায়। শক্ত করে মা'কে চেপে ধরে। জান্তব এক ধরনের শব্দ করতে থাকে। মহসিন সাহেব দুঃখিত ও ব্যথিত হন। মন খারাপ করে বলেন, 'ও আমাকে দেখে এরকম করে কেন দীপা?'

দীপা কাটান দিতে চেষ্টা করেন। কোমল গলায় বলেন, 'সব সময় তো করে না।'

'তা ঠিক। সব সময় করে না। শুধু রাতেই এমন করে। কারণটা কী?'

'রাতে বোধ হয় সে বেশি ইনসিকিওর ফীল করে।'

'আমার তা মনে হয় না। আমার কী মনে হয়, জান? আমার মনে হয়, সে কোনো এক রাতে আমাদের কিছু অন্তরঙ্গ ব্যাপার দেখে ফেলেছে। হয়তো ঐ ব্যাপারটা মনে গেঁথে আছে।'

'এসব নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না। একটু বুদ্ধি হলেই ওরকম আর করবে না।'

'বুদ্ধি হচ্ছে কোথায়? যত বয়স হচ্ছে ও তো দেখছি ততই---'

মহসিন কথা শেষ করেন না। মুখ অন্ধকার করে ফেলেন। দীপা কী করবেন বুঝতে পারেন না। বেচারা একা একা রাত কাটায়, এটা তাঁর ভালো লাগে না।

পুরুষ মানুষ শরীরের ভালোবাসার জন্যে কাতর হয়ে থাকে। সেই দাবি মেটান দীপার পক্ষে বেশির ভাগ সময়ই সম্ভব হয় না।

মাঝে মাঝে রাত এগারোটার দিকে মহসিন এই ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ান। কঠিন গলায় বলেন, 'দীপা ঘুমোচ্ছ?'

দীপা বলেন, 'না, আসছি। ও বোধ হয় এখনো ভালোমতো ঘুমোয় নি।'

দীপা খুব সাবধানে আলোর হাত ছাড়িয়ে উঠতে চান। আলো সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠে এবং দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে। মহসিন ক্লান্ত গলায় বললেন, 'ওকে ঘুম পাড়াও। আমি শুয়ে পড়ছি।'

তিনি কিন্তু শুয়ে পড়েন না। ঘরে বাতি জ্বলে। চুরুটের গন্ধ অনেক রাত পর্যন্ত ভেসে আসে। দীপার বড়ো মন খারাপ লাগে। অথচ কিছুই করার নেই। যত বার তিনি উঠতে যান আলো তত বারই তাঁকে জাপটে ধরে।

আজ অবশ্যি আলো ঘুমোচ্ছে' ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে গাঢ় ঘুম। হয়তো আজ জাগবে না। দীপা সাবধানে বিছানা থেকে নামলেন। বাতি নিভিয়ে নীল আলো জ্বেলে দিলেন। পাশের ঘরে ঢুকলেন।

মহসিন বিছানায় শুয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পড়ছিলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, 'আলো ঘুমোচ্ছে?'

'হুঁ।'

'জেগে যাবে না তো? একটা কোল বালিশ দিয়ে এসেছ?'

'হুঁ।'

দীপা দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। তাঁর অবশ্যি খুব অস্বস্তি লাগছে। মাঝরাতে এ ঘরে আসা, আস্তে আস্তে কথা বলা, ছিটকিনি লাগান–সব কিছু মনে করিয়ে দেয় এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনের উদ্দেশ্যটি অন্য। বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে শরীরে পৌঁছান এক ব্যাপার, আর এরকম প্রস্তুতি নিয়ে এগোন সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এতে নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হয়।

দীপা অস্বস্তি বোধ করছেন। অস্বস্তি কাটানর জন্যে তিনি অন্য গল্প শুরু করলেন, 'তোমার স্যারের দাঁত সব পড়ে যাচ্ছে, জান?'

'না তো। দাঁত পড়ে যাচ্ছে?'

'উপরের পাটিতে একটি দাঁতও এখন নেই।'

'বল কি?'

'অদ্ভুত ব্যাপার না? নিচের পাটিতে সব দাঁত আছে অথচ উপরের পাটির একটা দাঁতও নেই। তোমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না?'

'অদ্ভুত তো বটেই।'

তিনি তাঁর স্ত্রীর কথা এখন তেমন মন দিয়ে শুনছেন না। তিনি দীপাকে আদর করতে শুরু করেছেন। পুরুষদের সেই বিশেষ আদর যা দীপার একই সঙ্গে ভালো

লাগে এবং ভালো লাগে না।

দীপা বললেন, 'বাতি নিভিয়ে দাও না। লজ্জা লাগছে।'

তিনি গাঢ় স্বরে বললেন, 'একটু লজ্জা-লজ্জা লাগলে ক্ষতি নেই কিছু। বাতি থাকুক। বাতি না থাকলে কী করে বুঝব যে আমি এমন রূপবতী একটি মেয়ের পাশে বসে আছি। অন্ধকারে সব মেয়েই দেখতে এক রকম।'

মহসিন ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকালেন। দু' জনের ছায়া পড়েছে আয়নায়। দীপাকে কী সুন্দর লাগছে দেখতে। বয়সের কারণে নিতম্ব কিছুটা ভারী হয়েছে, তাতে দীপার রূপ যেন আরো খুলেছে।

দীপা বলল, 'আয়নার দিকে তাকিও না। আমার ভীষণ লজ্জা লাগে।'

'লাগুক।'

মহসিন স্ত্রীর মুখে চুমু খেলেন আর তখনি আলো চিৎকার করে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ দরজায় এসে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দরজায় কিল ঘুষি মারছে। দরজায় আঁচড়াচ্ছে, মাথা ঠুকছে। দরজায় ঝুলন্ত পর্দা দাঁত দিয়ে কুটিকুটি করে ফেলতে চেষ্টা করছে।

দীপা বললেন, 'মা আসছি, মা আসছি।'

আলো তাঁর কথা শুনতে পেল না। তার পৃথিবী শব্দহীন। সে প্রবল আতঙ্কে দিশাহারা।

দীপা চট করে দরজা খুলতে পারলেন না। কাপড় গুছোতে তাঁর সময় লাগছে। এই সময়ে আলো একটা তাণ্ডব সৃষ্টি করল। একতলা থেকে বাবুর্চি এবং কাজের মেয়েটা ছুটে এল। তুষার এবং রাত্রির ঘুম ভেঙেছে। রাত্রি ভয় পেয়ে তার ঘর থেকে চেঁচাচ্ছে--'কী হয়েছে? আম্মু, কী হয়েছে?'

দীপা দরজা খুললেন। আশ্চর্য ব্যাপার! আলোর সমস্ত উত্তেজনার অবসান হয়েছে। সে কেমন যেন অবাক দৃষ্টিতে চারদিকে দেখছে। দীপা যখন তার হাত ধরলেন, তখনো সে অন্য বারের মতো মা'র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না, বরং এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেন সে মাকে ঠিক চিনতে পারছে না। কিংবা বিরাট কোনো ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেছে যার তুলনায় মা'র উপস্থিতি খুবই তুচ্ছ ব্যাপার।

দীপা বললেন, 'এমন হৈ-চৈ শুরু করলে কেন, মা মনি? এ রকম কর কেন তুমি?'

আলো দীপাকে অবাক করে ছুটে নিজের ঘরে চলে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। বালিশে মুখ গুঁজে মূর্তির মতো হয়ে গেল।

দীপা তার পেছনে পেছনে এলেন। আলোর পিঠে হাত রাখলেন। আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। দীপা গাঢ় স্বরে বললেন, 'কী হয়েছে মা, কী হয়েছে?'

আলোর যে কী হযেছে তা সে নিজেও জানে না। আর জানতে পারলেও মা-কে জানানর সাধ্যও তার নেই। আজ সে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে। তার একান্ত নিজস্ব

জগৎ ভেঙে খানখান হয়ে গেছে।

সে ঘুমুচ্ছিল। ঘুমের মধ্যেই তার মনে হল মা পাশে নেই। যার গায়ে সে হাত রেখেছে সে মা নয়। মা'র গায়ের পরিচিত উষ্ণতা সে পাচ্ছে না। মা'র গায়ের ঘ্রাণও নেই। তার ঘুম ভেঙে গেল। মা পাশে নেই। সে একটা কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছে। আতঙ্কে তার বুক ধক্ করে উঠল। সে অবশ্যি চেঁচিয়ে উঠল না। নিজেকে সামলে নিল। মা নিশ্চয়ই বাথরুমে। সে বিছানা থেকে বাথরুমে উঁকি দিল। বাথরুমের দরজা খোলা। সেখানে কেউ নেই। মা তাহলে পাশের ঘরে? বাবার ঘরে? কেন, বাবার ঘরে কেন? তারা কী করে সেখানে? কান্নায় তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে। সে বাবার ঘরের দরজার পাশে দাঁড়াল। দরজায় অল্প ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে বন্ধ। কেন, ভেতর থেকে বন্ধ কেন? মা তাকে একা একা এই ঘরে ফেলে রেখে চলে গেছে? কেন সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে? কী করছে তারা দু' জন?

আলো দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অসম্ভব রাগে তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ইচ্ছা করছে পুরো বাড়িটা ভেঙে আগুন ধরিয়ে দিতে। দাঁত দিয়ে কামড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে। ঠিক এরকম অবস্থায় কে একজন আলোর কাছে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে তোমার? তুমি এরকম করছ কেন?'

এই প্রশ্ন দু'টি সে কানে শুনল না। শব্দ সম্পর্কে তার ধারণা নেই। তার শব্দহীন জগতে হঠাৎ যদি কোনোক্রমে কিছু শব্দ ঢুকেও যায় সে তার অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না। অথচ সে পরিষ্কার বুঝছে কেউ একজন জানতে চাইছে, 'কী হয়েছে তোমার? তুমি এ রকম করছ কেন?'

আলো তার উত্তরে বলতে চাইল, 'কে? তুমি কে?'

সে মুখে বলল না। মনে মনে ভাবল। এতেই কাজ হল। যে প্রশ্ন করেছিল সে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমি তোমাদের স্যার। আমি নিশানাথ।'

'আপনি কথা বলছেন আমার সাথে?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে কথা বলছেন?'

'অন্য রকম ভাবে বলছি। কীভাবে বলছি আমি জানি না। তুমি এ রকম হৈ-চৈ করছ কেন?'

আলো আবার বলল, 'আপনি কীভাবে কথা বলছেন?'

'আমি জানি না কীভাবে বলছি।'

'অন্যরা আমার সঙ্গে কথা বলে না কেন?'

'এই ভাবে কথা বলার পদ্ধতি অন্যরা জানে না। কিন্তু তুমি আমাকে বল। তুমি হৈ-চৈ করছ কেন? দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন?'

'আমার ভয় লাগছে, তাই এরকম করছি।'

'কোনো ভয় নেই।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে দরজা খুলে দীপা বের হয়ে এলেন।

রাত দুটোর মতো বাজে। আলো ঘুমুচ্ছে। গাঢ় ঘুম। দীপা তাঁর স্বামীর ঘরে। দু' জন অনেকক্ষণ ধরেই চুপচাপ বসে আছেন, যেন কারো কোনো কথা নেই।

মহসিন বললেন, 'কিছু একটা করা দরকার।'

দীপা কিছু বললেন না। বলার কিছু নেইও।

মহসিন বললেন, 'মূক-বধির ছেলে-মেয়ে তো আরো আছে, তারা সবাই তো এরকম না। তারা স্কুল কলেজে যাচ্ছে, পড়াশোনা করছে।'

দীপা বললেন, 'আলোও করবে।'

'আর করবে। প্রাইভেট কোচ করার চেষ্টা করে তো দেখা গেল। লাভটা তাতে কী হল?'

দীপা কিছু বললেন না। মূক-বধির স্কুলের এক জন খুব নামী শিক্ষক তাঁরা রেখেছিলেন, যিনি আলো-কে পড়াশোনা শেখানর চেষ্টা করবেন, অক্ষরপরিচয় করিয়ে দেবেন, 'লীপ রীডিং' শেখাবেন। কোনো লাভ হয় নি। আলো মাষ্টারের সামনে পাথরের মতো মুখ করে বসে থাকে। মাষ্টার সাহেব যত বার বলেন- 'বল 'আ'। খুব সহজ। হাঁ কর। হাঁ করে কিছু বাতাস বের করে দাও। বাতাস বের করবার সময় এই জায়গাটা কাঁপবে।' তিনি হাত দিয়ে গলা দেখিয়ে দেন। মুখের সামনে এক টুকরো কাগজ রেখে বুঝিয়ে দেন 'আ' বললে কীভাবে কাগজটা কাঁপবে। আলো সব দেখে, কিন্তু কিছুই করে না। দু' দিন মাষ্টার প্রাণান্ত চেষ্টা করলেন। তৃতীয় দিনে আলোর উপর খানিকটা রেগে গেলেন। তীব্র গলায় বললেন, 'যা বলছি কর।' বলার সঙ্গে সঙ্গে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল মাষ্টার সাহেবের উপর। হিংস্র পশুর ঝাঁপ। চেয়ার নিয়ে মাষ্টার সাহেব উল্টে পড়ে গেলেন। আলো তাঁর হাত কামড়ে ধরল। রক্ত বের হয়ে বিশ্রী কাণ্ড। পড়াশোনার সেখানেই ইতি।

মহসিন বললেন, 'বসে আছ কেন? যাও, ঘুমিয়ে পড়।'

দীপা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'তুমি মেয়ের উপর রাগ করে থেক না।'

মহসিন বললেন, 'রাগ করব কেন? মেয়ে কি আমার না?'

'তাহলে এস, মেয়ের গালে একটু চুমু দিয়ে যাও।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন। আলো ঘুমোচ্ছে। কী অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে তাঁর এই মেয়ে! কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে এর জন্যে কে জানে? তিনি নিচু হয়ে মেয়ের গালে চুমু খেলেন।

আলো সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল। এতক্ষণ সে জেগেই ছিল। দীপা ইশারায় বললেন, 'তুমি কি এতক্ষণ জেগে ছিলে?'

আলো হ্যাঁ–সূচক মাথা নাড়ল। দীপা বিস্মিত হয়ে তাকালেন। আলো ইশারায় বলল, সে আর কোনো দিন হৈ–চৈ চেঁচামেচি করবে না। এবং এই ঘরে সে একা একা থাকতে পারবে। আজকের চেঁচামেচির জন্যে তার খুব লজ্জা লাগছে।

দীপা স্বামীর দিকে তাকালেন। মেয়ের এই পরিবর্তন তাঁর কাছে খুবই অস্বাভাবিক লাগছে।

আলো আবার ইশারায় বলল, সে পড়াশোনা করতে চায়। এখন থেকে সে স্যারের কাছে পড়বে।

মহসিন বললেন, 'বেশ তো, আবার তোমার আগের ঐ স্যারকে খবর দেব।'

আলো বাবার কথা বুঝতে পারল না।

মহসিন দীপাকে বললেন, 'তুমি ওকে ইশারায় আমার কথা বুঝিয়ে দাও। ও কিছু বুঝতে পারছে না।'

দীপা আলোকে বুঝিয়ে দিলেন। আলো ইশারায় বলল, সে ঐ স্যারের কাছে পড়বে না। সে নিশানাথ স্যারের কাছে পড়বে।

'তাঁর কাছে পড়তে চাও কেন?'

'তিনি আমাকে কথা বলা শিখিয়ে দেবেন।'

'উনি তো মা পারবেন না। সবাই সব কিছু পারে না। কথা বলা শেখানর জন্যে আলাদা স্যার আছেন।'

'আমি তাঁর কাছেই পড়ব। উনি আমাকে কথা বলা শিখিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

আলো শুয়ে পড়ল। কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরে শোঁ শোঁ করে হাওয়া দিচ্ছে। আকাশ মেঘলা ছিল। বৃষ্টি হবে বোধহয়। দীপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

তাঁর চোখ ভেজা। তাঁর বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

৬

ভোর রাত থেকে বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে সকালে দেখা গেল পোর্চে পানি উঠে গেছে। গাড়ির মাডগার্ড পানির নিচে। গাড়ির ড্রাইভার সুরুজ মিয়া কিছুতেই গাড়ি স্টার্ট দিতে পারল না। আনন্দে তুষারের চোখে পানি এসে গেল। আজও স্কুলে যেতে হবে না। আজ পাটিগণিতের একটা পরীক্ষা হবার কথা। অন্য রকম পরীক্ষা, স্যার এক জন–এক জন করে বোর্ডে ডাকবেন। বোর্ডে সব ছাত্রদের সামনে অঙ্ক কষতে হবে। যদি কোথাও ভুল হয় তখন স্যার বলবেন––'এই যে বুদ্ধিমান। আমার দিকে তাকাও, চাঁদমুখটা দেখি। মুখ তো সুন্দর মনে হচ্ছে, শুধু কান দু'টি এই সুন্দর

মুখের সঙ্গে মানাচ্ছে না। এই যে বুদ্ধিমান, আপনি আসুন আমার সঙ্গে, আপনার কান দু'টি আমি খুলে রেখে দিই।'

স্কুলে যেতে হবে না--এই আনন্দ তুষার চেপে রাখতে চেষ্টা করছে। মনের ভাবটা প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। সে মুখ কালো করে বলল, 'সত্যি? স্কুলে যেতে পারব না সুরুজ চাচা?'

সুরুজ মিয়া বলল, 'উঁহু। অবস্থা দেখতেছ না? রাস্তায় এক হাঁটু পানি।'

তুষার দুঃখী-দুঃখী গলা বের করে বলল, 'সারা দিন তাহলে করব কী?'

'কি আর করবা, খেলাধূলা কর। তবে খবরদার পানিতে নামবা না। পানিতে নামলে বেগম সাব খুব রাগ করবেন।'

তুষার কাগজের নৌকা বানাতে বসল। রাত্রি বসল গল্পের বই নিয়ে। তুষারের খুব ইচ্ছা করছিল পানিতে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করা। একা একা পানিতে যেতে তার সাহসে কুলাচ্ছে না। রাত্রি সঙ্গে থাকলে সে যেত। রাত্রি যাবে না। একবার গল্পের বই নিয়ে বসলে সে বই শেষ না করে ওঠে না। আজ যা মোটা বই হাতে নিয়ে বসেছে। এটা শেষ হতে-হতে বৃষ্টি থেমে যাবে। পানি নেমে যাবে। এমন চমৎকার একটা ছুটি--অথচ সে তেমন কোনো মজা করতে পারবে না।

তুষার নৌকা বানানর কাগজ নিয়ে বারান্দায় চলে এল। নৌকা বানিয়ে বানিয়ে বারান্দা থেকেই সে ছাড়বে। সাতটা নৌকা বানাবে। সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর। দেখা যাবে নৌকাগুলি কত দূর যায়।

প্রথম নৌকা পানিতে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষার লক্ষ করল আলো পানিতে নেমে ছপছপ শব্দ করে বাড়ির পেছনে যাচ্ছে। নিশানাথ স্যারের ঘরের দিকেই যাচ্ছে বোধ হয়।

তুষার ডাকল, 'এই আলো, এই।'

আলো ডাক শুনল না। শুনবার কথাও নয়। সে একা একা কি রকম নির্বিকারভাবে যাচ্ছে। তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে পানিতে।

তুষার মার কাছে চলে গেল।

দীপার মাথা ধরেছে। তিনি শুয়ে আছেন। তাঁর মাইগ্রেনের ব্যথা আছে। মাঝে মাঝে এই ব্যথা তাঁকে কাবু করে ফেলে। আজও করছে। ঘর অন্ধকার করে তিনি শুয়ে আছেন।

তুষার বলল, 'মা, আলো একা একা বাড়ির পেছনে যাচ্ছে।'

দীপা চুপ করে রইলেন।

'পানি ভেঙে একা একা যাচ্ছে, মা।'

'যাক। তোমরা তাকে খেলায় নেবে না, কিছু করবে না, ও বেচারা একা একা কী করবে?'

'আমি কি ওকে নিয়ে আসব?'

'নিয়ে আসতে হবে না। ও কিছুক্ষণ খেলুক একা একা।'

'বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে তো।'

'ভিজুক। খানিকটা ভিজলে কিছু হয় না।'

'আমি খানিকটা ভিজে আসব, মা?'

'না, তোমাকে ভিজতে হবে না।'

তুষার বেশ মন খারাপ করল। মা'র কাণ্ডটা সে বুঝতে পারছে না। একেক জনের জন্যে একেক ব্যবস্থা কেন? আলো যদি পানিতে ভিজতে পারে সে পারবে না কেন? বড়োদের এইসব কোন ধরনের যুক্তি? মাকে যুক্তির ভুল ধরিয়ে দেবার সাহসও তার হল না। তার শুধু মনে হল, মা নিজে মেয়ে বলেই মেয়েদের বেশি আদর করেন।

নিশানাথ বাবু একটা আয়না হাতে নিয়ে মুখ কালো করে বসে আছেন। তাঁর নিচের পাটির দাঁত পড়তে শুরু করেছে। আজ সকালে দাঁত মাজার সময় দুটো একসঙ্গে পড়ে গেল। আশ্চর্য কাণ্ড! নিজের মুখটা এখন কী যে কুৎসিত দেখাচ্ছে! কথাবার্তাও কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিছু বললে দাঁতের ফাঁক দিয়ে শব্দ বের হয়ে যাচ্ছে। হচ্ছেটা কী? নিশানাথ বাবু জানালা দিয়ে তাকালেন। এখনো বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি একটু কমলে এক জন ডেন্টিস্টের কাছে যাবেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তাঁর ধারণা হল, কোনো একটা ভিটামিনের অভাবে এরকম হচ্ছে। সেই ভিটামিনটা এখন খেলে কি বাকি দাঁতগুলি টিকবে?

'আমি এসেছি।'

নিশানাথ বাবু চমকে উঠলেন। আলো এসেছে, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে কথা বলছে। মাথার মধ্যে কথা। নিশানাথ বাবু আলোর দিকে ফিরলেন। হাসলেন। যদিও দাঁত-নেই-মুখে হাসতে তাঁর লজ্জা লাগছে। তিনি আলোর সঙ্গে কথা শুরু করলেন। পুরো কথাবার্তা হল মাথার ভেতরে। কারো ঠোঁট নড়ল না। কোনো রকম শব্দ হল না। বাইরের কেউ দেখলে নিশ্চয় ভাবত--এরা দু' জন দু' জনের দিকে তাকিয়ে আছে কেন? তাদের কথাবার্তার শুরুটা এমন--

নিশানাথ : কেমন আছ?

আলো : আমি ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?

নিশানাথ : আমি ভালো নেই। দেখ না কী কাণ্ড, আমার সব দাঁত আপনা-আপনি পড়ে যাচ্ছে।

আলো : আপনার কি অসুখ করেছে?

নিশানাথ : বুঝতে পারছি না। হয়তো করেছে। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, বস।

(আলো এসে বসল।)

আলো : আপনি আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেন অন্যরা সেভাবে বলে না কেন?

নিশানাথ : পুরো ব্যাপারটা আমি কিছুই জানি না। আমার বোধ হয় কোনো একটা বড়ো অসুখ হয়েছে। সেই অসুখের পর থেকে এই অবস্থা।

আলো : আমি আপনার কাছ থেকে পড়া শিখব।

নিশানাথ : বেশ তো শিখবে। অবশ্যি জানি না পারব কি না। পারতেও পারি।

(নিশানাথ বাবু এই পর্যায়ে খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন। তুষারের ইংরেজি শেখানর ব্যাপারটা তাঁর মনে পড়ল।)

নিশানাথ : আলো, তুমি এক কাজ কর। চোখ বন্ধ করে থাক। আমি তোমার মাথার ভেতর চলে যাব। সেখানে থেকে শেখাব।

আলো : মাথার ভেতর কেমন করে যাবেন?

নিশানাথ : জানি না। তবে আমি যেতে পারি।

আলো চোখ বন্ধ করে বসল। নিশানাথ বাবু মেয়েটির মাথার ভেতর অনায়াসে চলে গেলেন। তাঁর জন্যে বড়ো ধরনের একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। উজ্জ্বল আলোয় এই মেয়ের মাথার গহীন কুয়ো ঝলমল করছে। নিশানাথ বাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। গহীন কুয়ো দিয়ে নিচে নামতে নামতে তাঁর বারবার মনে হল, এই মেয়ে একটি অসাধারণ মেয়ে। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন এই মেয়ের কল্পনাশক্তি অসাধারণ, বোঝার ক্ষমতাও অসাধারণ।

নিশানাথ বাবুর রোমাঞ্চ বোধ হল। তাঁর ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে। আনন্দে মন ভরে যাচ্ছে। তিনি আবার কথা বলা শুরু করলেন।

নিশানাথ : আলো, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?

আলো : পারছি।

নিশানাথ : তুমি কি জান সব কিছুর নাম আছে?

আলো : জানি।

নিশানাথ : লেখার সময় নামগুলি লিখি। সেই লেখার জন্যে আমরা কিছু চিহ্ন ব্যবহার করি। যেমন অ, আ, ই, ঈ--।

আলো : আমি এইগুলি বইয়ে দেখেছি।

নিশানাথ : এই চিহ্নগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে আমরা মনের ভাব লিখে ফেলি। তুমি চিহ্নগুলি শিখে ফেল, তাহলে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে। বই পড়তে পারবে।

আলো : আমাকে চিহ্নগুলি শিখিয়ে দিন।

নিশানাথ : এক দিনে পারব না। ধীরে ধীরে শেখাব।

আলো : আমি এক দিনেই সব শিখে ফেলতে চাই।

নিশানাথ : আজ আমি আর শেখাতে পারব না। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

নিশানাথ বাবু আলোর মাথার ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন। অসহ্য যন্ত্রণা। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। এ রকম তীব্র যন্ত্রণা তাঁর এর আগে আর হয় নি। শুধু যে যন্ত্রণা হচ্ছে তাই নয়--মুখ থেকে লালা ঝরছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তিনি গোঙানির মতো শব্দ করতে লাগলেন।

দীপা লক্ষ করলেন, আলো ঘরের এক কোণে একটা বই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। তার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে পড়ছে। দীপার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। বেচারী আলো পড়া-পড়া খেলা খেলছে। আহা বেচারী! আহা!

রাত দশটার দিকে দারোয়ান এসে খবর দিল স্যার যেন কেমন করছে।

দীপা ছুটে গেলেন। নিশানাথ বাবু বিছানায় বসে আছেন। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে।

দীপা বললেন, 'চাচা, আপনার কী হয়েছে?'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না, মা। কিছু বুঝতে পারছি না।'

দীপা তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনতে পাঠালেন। তিনি মনে মনে ঠিক করে রাখলেন ডাক্তার দেখে যাবার পর নিশানাথ বাবুকে হাসপাতালে কিংবা কোনো ক্লিনিকে পাঠিয়ে দেবেন।

'চাচা, আপনার অসুবিধা কী হচ্ছে তা বলুন।'

'আমি নিজেও বুঝতে পারছি না, মা।'

'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'পানি খাবেন একটু?'

'না। আমার তৃষ্ণা হচ্ছে না।'

'গরম লাগছে কি? ফ্যান ছেড়ে দেব?'

'না। ঠাণ্ডা লাগছে।'

'তাহলে গায়ে একটা চাদর দিযে শুয়ে থাকুন। ডাক্তার এক্ষুণি চলে আসবে।'

নিশানাথ বাবু গায়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এল।

ডাক্তার এসে দেখেন রুগী ঘুমুচ্ছে। তিনি বললেন, 'ঘুম ভাঙিয়ে কাজ নেই। আমি সকালে এসে দেখে যাব। ভালো ঘুম হচ্ছে যে কোনো রোগের খুব বড়ো ওষুধ।'

ডাক্তার সাহেবের কথা বোধহয় সত্যি। নিশানাথ বাবুর ঘুম ভাঙল ভোরে। তাঁর মাথাব্যথা নেই। শরীর ঝরঝরে। তিনি অনেকক্ষণ বাগানে হাঁটাহাটি করলেন।

চা খেতে খেতে মালীর সঙ্গে অনেক গল্প করলেন। সবই তাঁর ছেলেবেলার

গল্প। গল্প শেষ করে নিজের ঘরে এসে চিঠি লিখলেন তাপসীকে। তাপসী তাঁর বড়ো বোনের মেয়ে, কোলকাতায় থাকে। বি. এ. পড়ে। এই মেয়েটিকে তিনি ছেলেবেলায় খুব স্নেহ করতেন। দেশ ছেড়ে সে যখন তার মার সঙ্গে চলে যায় তখন তিনি খুব কেঁদেছিলেন।

তাপসী,

মা আমার। ময়না আমার। মা গো, তুমি কেমন আছ? আমার শরীর ভালো নেই মা। কি জানি হয়েছে। বেশি দিন আর বাঁচব না। আমার কি যে হয়েছে নিজেও জানি না। খুব কষ্ট হয়। মাথার যন্ত্রণা। এই কষ্ট তবু সহ্য করা যায় কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কষ্ট আমি মানুষের মাথার ভেতর ঢুকে যেতে পারি----।

এই পর্যন্ত লিখে নিশানাথ থামলেন। তাপসী এই চিঠি পড়ে কী ভাববে? নিশ্চয়ই ভাববে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি আবোলতাবোল ভাবছেন।

নিশানাথ বাবু চিঠি ছিঁড়ে ফেললেন।

৭

মাসুদ মুখ শুকনো করে বসে আছে!

রাগে তার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। রাগের কারণ হচ্ছে দরজায় নক না করে ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে ঢোকায় ডাক্তার সাহেব খুব বিরক্ত হয়েছেন। অন্য সময় হলে বিরক্ত হতেন না, আজ হয়েছেন। কারণ ঐ মেয়ে ঘরে বসে আছে। মেয়েটা বড়ো যন্ত্রণা করছে। কাজের সময় যদি এভাবে বসে থাকে তাহলে কীভাবে কাজ হয়? সব কিছুর সময়--অসময় আছে। প্রেম খুবই ভালো জিনিস। তাই বলে কাজের সময় কেন? রুগীরা বসে আছে, এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে যাবে। ডাক্তার সাহেবের সময় হচ্ছে না।

মাসুদ ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে ইচ্ছা করেই শব্দ না করে ঢুকেছে, যাতে সে অস্বস্তিকর কোনো পরিস্থিতিতে দু' জনকে দেখতে পায়, মেয়েটা যেন লজ্জায় পড়ে। লজ্জায় পড়লে আসা-যাওয়া কমাবে। আসা-যাওয়াটা যেন একটু কমায়। কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। প্রেমের মতো ভালো যে--জিনিস তারও বাড়াবাড়ি খারাপ।

মাসুদ অবশ্যি তাদের কোনো অস্বস্তিকর অবস্থায় দেখল না। দু' জনই মুখোমুখি বসে গল্প করছে। খুব সিরিয়াস ধরনের কোনো গল্প হবে, কারণ দু' জনের মুখই বেশ গম্ভীর।

ডাক্তার সাহেব মাসুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী চাও?'

'রিপোর্টগুলি কি হয়েছে স্যার?'

'হ্যাঁ হয়েছে। নিয়ে যাও। শোন মাসুদ--ঘরে ঢুকবার সময় নক করে তারপর ঢুকবে। এটা হচ্ছে সাধারণ ভদ্রতা।'

ডাক্তার সাহেবের কথার জবাবে কিছু না বলে চুপ করে থাকলে ঝামেলা চুকে যেত, মাসুদ তা পারল না। সে বলে ফেলল, 'কাজের সময় এত কিছু মনে থাকে না, স্যার। রুগী বসে আছে। কতক্ষণ বসে থাকবে বলেন? ওদের তো কাজকর্ম আছে। সারা দিন বসে থাকলে তো তাদের চলে না।'

'রুগী বসে থাকবার সঙ্গে দরজায় নক করার সম্পর্ক কী? রুগী বসে থাকলে কি দরজা নক করা যায় না?'

'মনে থাকে না, স্যার।'

'সাধারণ জিনিস মনে থাকে না, বাকি সব তো মনে থাকে। তোমার আচার-ব্যবহার আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'অপছন্দের কি করলাম, স্যার?'

'অপছন্দের কী করেছ তুমি জান না?'

'জ্বি না।'

ডাক্তার সাহেবের মুখ রাগ এবং অপমানে কালো হয়ে গেল। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'রুগীদের সঙ্গে তুমি খুব খারাপ ব্যবহার কর। তোমার বিরুদ্ধে অনেকেই কমপ্লেইন করেছে।'

এই পর্যায়ে মাসুদ একটা বড়ো ভুল করল, না ভেবেচিন্তে বলে বসল, 'কমপ্লেইন তো স্যার আপনার বিরুদ্ধেও আছে। সব কমপ্লেইন ধরলে কি আর চলে? কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেও কমপ্লেইন করে, করে না?'

ডাক্তার সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে কী কমপ্লেইন আছে?'

'বাদ দেন।'

'বাদ দেব কেন? শুনি কি কমপ্লেইন।'

'আমাকে আপনি 'তুমি' করে বলেন কেন? ছোট চাকরি করি বলেই তুমি বলতে হবে? আমি স্যার বি. এসসি পাস একটা ছেলে।'

'ঠিক আছে। তুমি যাও।'

মাসুদ বের হয়ে এল। তার কিছুক্ষণ পরই সে যে চিঠি পেল তার বক্তব্য হচ্ছে--নোভা পলিক্লিনিকে তোমার চাকরির প্রয়োজন নেই। আগামী দিনের ভেতর তুমি তোমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে।

এক কথায় চাকরি নট। মাসুদের মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। এই সময়ে চাকরি চলে যাওয়া একটা ভয়াবহ ব্যাপার। নতুন চাকরি তার পক্ষে জোগাড় করা

সম্ভব নয়। বদমেজাজের জন্যে এর আগেও দু' বার চাকরি গেছে। এই নিয়ে তৃতীয় বার হল।

ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলে হবে কিনা কে জানে। ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা করছে না। মাসুদ হেল্পার ছেলেটাকে চা আনতে পাঠাল।

হাত-ভাঙা এক রুগী এসেছে। কিছুক্ষণ পর পর হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠছে।

মাসুদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খবর্দার, নো সাউণ্ড। চিৎকার করলে ব্যথা কমে না, উল্টো--হার্টের ক্ষতি হয়।'

হাত-ভাঙা রুগীর সিরিয়াল তেত্রিশ। মাসুদ তাকে ছ' নম্বরে নিয়ে এল। অন্য রুগীরা হৈ-চৈ শুরু করেছে। মাসুদের মুখটাই তেতো হয়ে গেল। ব্যথায় এক জন মরে যাচ্ছে--তাকে আগে যেতে দেবে না! এটা কি রকম বিচার?

চ্যাংড়া-মতো এক ছোকরা ফুসফুসের এক্সরে করতে এসেছে। সে তেরিয়া হয়ে বলল, 'পেছনের জনকে আগে দিচ্ছেন, ব্যাপার কি?'

মাসুদ গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার ইচ্ছা।'

'আপনার ইচ্ছা মানে?'

'আমার ইচ্ছা মানে আমার ইচ্ছা। পছন্দ না হলে যান, ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে কমপ্লেইন করেন। ঐ যে ডাক্তার ঐ ঘরে বসে। দরজা নক করে তারপর যাবেন ভাই, ভেতরে লেডিজ আছে।'

চ্যাংড়া রাগে কাঁপতে কাঁপতে ডাক্তারের ঘরে ঢুকল। মাসুদ মনে মনে বলল, হারামজাদা।

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন নিশানাথ বাবু। মাসুদ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সে চিনতে পেরেছে। না পারলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। এ কী অবস্থা হয়েছে মানুষটার।

নিশানাথ বাবু মাসুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভালো আছেন?'

মাসুদ জবাব দিল না। জবাব দেবার মতো অবস্থা তার নেই। সে স্তম্ভিত। তার চোখে পলক পড়ছে না।

নিশানাথ বাবু বললেন, 'আমাকে তো চিনতে পেরেছেন, তাই না?'

'জ্বি! আপনার অবস্থা তো ভাই খুব খারাপ।'

'খারাপ। আপনার এখান থেকে যাবার পর কী যে হল! মাথার সব চুল পড়ে গেল। দাঁতও সব পড়ে যাচ্ছে। তার ওপর মাথায় যন্ত্রণা হয়।'

'বসেন ভাইজান, বসেন। আপনাকে দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। খুবই খারাপ। বিশ্বাস করেন, মনটা খুব খারাপ হয়েছে।'

লোকটির মনের অবস্থা নিশানাথ বাবু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। সে খুবই দুঃখিত। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। একটা মানুষ তার জন্যে এতটা মন খারাপ করে কীভাবে--তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। তবে এই মানুষটা তাঁর কাছে

কোনো একটা ব্যাপার লুকোতে চেষ্টা করছে। এক্সরে সংক্রান্ত ব্যাপার। তিনি ইচ্ছা করলেই লুকোন ব্যাপারটা ধরতে পারেন। মাথার আর একটু গভীরে ঢুকলেই হয়। নিশানাথের মনে হচ্ছে এটা ঠিক নয়। অনধিকার চর্চা। এক জন মানুষের ব্যক্তিগত জগতে ঢুকে পড়া। এটা অন্যায়। বড়ো ধরনের অন্যায়।

মাসুদ বলল, 'ভাইজান, আপনাকে দেখে আমার মনটা ভেঙে গেছে। আপনি যান, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। উনি যদি কোনো ওষুধপত্র দেন।'

নিশানাথ বাবু নিচু গলায় বললেন, 'অসুখটা আবার এক দিক দিয়ে ভালো। এখন আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি।'

'কী বুঝতে পারেন?'

'এই যে ধরুন আপনার আজ চাকরি চলে গেছে, এটা আমি জানি।'

মাসুদের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। তার বেশ কিছু সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'আর কী জানেন?'

'আর জানি যে আপনি মানুষটা খুবই বদরাগী কিন্তু আপনার মনটা কাঁচের মতো পরিষ্কার। আপনার বড়ো ভাই মারা গেছেন। বড়ো ভাইয়ের পুরো সংসার দীর্ঘদিন ধরে আপনি টানছেন। এই কারণে বিয়েও করেন নি। আরো জানি যে খুবই যারা গরীব রুগী তাদের কাছ থেকে এক্সরের টাকা নিয়ে ভাঙতি ফেরত দেবার সময় ইচ্ছা করে বেশি টাকা ফেরত দেন।'

মাসুদ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই লোক এসব কথা কীভাবে বলছে? সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনি একটু ডাক্তার সাহেবের কাছে যান। তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। আপনাকে এতক্ষণ আমি বলি নি, কিন্তু না বলে পারছি না।--আমাদের এখানে এক্সরে মেশিনে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল, তার থেকে আপনার এইসব হচ্ছে। আপনি যান, ডাক্তার সাহেবের কাছে যান। এই লোকটা খুব খারাপ, তবে ডাক্তার ভালো। সব খারাপ মানুষেরই দু'- একটা ভালো ব্যাপার থাকে।'

নিশানাথ বাবু ডাক্তার সাহেবের কামরায় ঢুকলেন। ডাক্তার সাহেব বিরক্তমুখে তাকালেন। শীতল গলায় বললেন, 'কি ব্যাপার। কী চান আপনি?'

নিশানাথ বাবু জবাব দিলেন না। তিনি নিমেষের মধ্যে ঢুকে গেলেন ডাক্তার সাহেবের মাথার ভেতরে। তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তিনি শিউরে উঠলেন। এই ডাক্তারের মনে এত ঘৃণা কেন? এত লোভ কেন? মানুষটার চেহারা কী সুন্দর! কত জ্ঞান, কত পড়াশোনা অথচ তার মন ঘৃণায় নীল হয়ে আছে। ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্র লোভ। সব কিছুর জন্যেই লোভ। এই মুহূর্তে তার লোভ সামনে বসে থাকা স্নিগ্ধ চেহারার মেয়েটির প্রতি। কত বয়স মেয়েটির? খুব বেশি হলে সতেরো- আঠারো।

নিশানাথ বাবু ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন আছেন?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমি কেমন আছি সেই তথ্যের আপনার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আপনি আমার কাছে কী চান সেটা বলুন।'

'কিছুই চাই না।'

'কিছুই চান না, তাহলে এসেছেন কেন?'

নিশানাথ বাবু মেয়েটির দিকে তাকালেন। এই তো সেই মেয়ে যাকে এত বার স্বপ্নে দেখেছেন। নাসিমা নাম। নিশানাথ বাবু বললেন, 'কেমন আছ, মা?'

মেয়েটি চমকে উঠে বলল, 'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। ঐ দিন তুমিই তো এখানে ছিলে। ঐ যে তোমার জন্মদিন ছিল। অথচ তোমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তুমি একটা ট্রাকের সামনে দৌড়ে চলে গেলে। যদি ট্রাকটা না থামত?'

ডাক্তার সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পাগল না-কি এই লোক? হু আর ইউ? গেট আউট, গেট আউট।'

নাসিমা কাঁপা গলায় বলল, 'না, উনি পাগল নন। উনি ঠিকই বলছেন। খুব ঠিক বলছেন।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনি কে?'

'আমি আপনার এক জন রুগী।'

'আমার রুগী মানে? রুগীদের সঙ্গে আমার কোনো ব্যাপার নেই। আমি রেডিওলজিস্ট। এক্সরে প্লেট দেখে রিপোর্ট লিখে দিই। সোজাসুজি বলুন তো--আপনি কে?'

'আমার মাথার ভেতর দিয়ে প্রচুর এক্সরে চলে গিয়েছিল। মনে নেই আপনার? তারপর থেকে দেখুন না কী হয়েছে। মাথার চুল পড়ে গেছে। দাঁত পড়ে গেছে। হাতের নখগুলিও মরে যাচ্ছে। এই দেখুন না কেমন কালচে হয়ে গেছে।'

'আপনি সেই রুগী?'

'জ্বি, আমিই সেই।'

ডাক্তার সাহেব নিজের বিস্ময় গোপন করে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'কি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন? আমাদের এখানে কারো মাথার ভেতর দিয়ে বেশি এক্সরে পাস করান হয় না। যতটুকু দরকার ততটুকুই করা হয়। আজেবাজে এলিগেশন এনে আপনার লাভ হবে না।'

'আপনার ভয় নেই। আমি কোনো অভিযোগ করছি না।'

নিশানাথ বাবু বুঝতে পারছেন ডাক্তার তাঁর কথা কিছুই বিশ্বাস করছে না। সে অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে আছে। এই লোকটির মন অবিশ্বাস এবং সন্দেহে পরিপূর্ণ। আচ্ছা, কিছু কি করা যায় না?

এর মাথায় ঢুকে সামান্য কিছু ওলটপালট কি করে দেওয়া যায় না? তিনি যদি তুষারের মাথায় ঢুকে কিছু পরিবর্তন করতে পারেন, তিনি যদি আলোর মতো

একটি মূক ও বধির মেয়েকে শেখাতে পারেন, তাহলে এই লোকটিকে কেন পারবেন না? চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই। চেষ্টা করে দেখাই যাক না।

ডাক্তারের মাথার ভেতর ঢুকে নিশানাথ বাবু প্রায় দিশা হারিয়ে ফেললেন। কী অসম্ভব জটিলতা! মস্তিষ্কের কুয়োর ভেতর যত নামছেন জটিলতা ততই বাড়ছে। কুয়োর গহীন তলদেশের দিকে তিনি প্রবল টান অনুভব করছেন। যতই নিচে নামছেন আকর্ষণ ততই বাড়ছে। লোকটির চিন্তা-ভাবনার শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত গেছে। ততটা নামাও কষ্ট। বেশ কষ্ট।

এক জনের মাথার ভেতর প্রবেশ করবার সঙ্গে সব পরিষ্কার বোঝা যায়। এক জন মানুষের মানসিকতা কেমন? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের বিশাল বিশাল ইমারত। সেইসব ইমারতে বিচিত্র সব প্যাটার্ণ। অদ্ভুত সব নকশা। এক জন মানুষের মানসিকতা বদলানর মানে হচ্ছে ঐ সব নকশায় পরিবর্তন নিয়ে আসা। যার জন্য পুরো ইমারতই ভেঙে নতুন করে বানান দরকার হয়ে পড়ে। নিশানাথ বাবু তা পারলেন। তবে তাঁর অসম্ভব কষ্ট হতে লাগল। মনে হল যেন শরীর অবশ হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছেন। এর মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন। কাজটা কঠিন, তবে পুরোপুরি অসম্ভব নয়। তার কারণ মানসিকতা পরিবর্তনের ব্যাপারটা কীভাবে করতে হয় তা তিনি জানেন। কেউ তাঁকে শিখিয়ে দেয় নি। তবু তিনি জানেন। কী করে জানেন সেও এক রহস্য।

এক সময় কাজ শেষ হল। নিশানাথ বাবু উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'যাই, ডাক্তার সাহেব। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। সম্ভবত বাঁচব না।'

ডাক্তার সাহেব চুপ করে রইলেন। মুখে কিছু বললেন না, তবে নিশানাথ বাবু পরিষ্কার বুঝতে পারলেন ডাক্তার লজ্জিত বোধ করছেন, কারণ নিশানাথ বাবুর এই সমস্যার মূলে তাঁর এক্সরে মেশিন। এবং তিনি ভালো করেই জানেন রেডিয়েশন সিকনেসের সব লক্ষণ নিশানাথ বাবুর মধ্যে প্রকট হয়েছে। তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসছে। কুড়ি মিলিরেমের বেশি রেডিয়েশন এক জনের শরীরের ভেতর দিয়ে চালান যায় না অথচ এই লোকটির মাথার ভেতর দিয়ে খুব কম করে হলেও দশ হাজার রেম রেডিয়েশন গিয়েছে। হয়তো এই লোকটির থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড ইতোমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। মস্তিষ্কের নিওরোনের বড়ো ধরনের কোনো পরিবর্তনও নিশ্চয়ই হয়েছে।

ডাক্তার সাহেব কেমন যেন লজিত বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, এই মানুষটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। লোকটির প্রতি তাঁর খানিকটা মায়াও হতে লাগল। কেন এরকম হচ্ছে তাও বুঝতে পারলেন না।

তিনি বললেন, 'আমরা খুবই লজ্জিত। মানে যন্ত্রটা হঠাৎ ম্যালফাংশান করল। কোনো কারণ ছিল না। হঠাৎ সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।'

নিশানাথ বাবু হেসে বললেন, 'আমার জন্যে ভালোই হয়েছে। বয়স হয়েছে,

এমনিতেই তো মরে যেতাম। অদ্ভুত কিছু জিনিস জেনে গেলাম।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কী জানলেন আমাকে কি ভালো করে গুছিয়ে বলবেন? টেলিপ্যাথিক কিছু ক্ষমতা আপনার ডেভেলপ করেছে তা বুঝতে পারছি। ক্ষমতাটা কী ধরনের এটা জানা দরকার।'

'অন্য একদিন জানবেন। আজ যাই। শরীরটা এত খারাপ লাগছে, বলার না।'

নিশানাথ বাবু ঘর থেকে বেরুবার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নাসিমা মেয়েটির মাথার ভেতরেও গেলেন। অতি অল্প সময় কাটালেন সেখানে। সামান্য কিছু পরিবর্তন করলেন। বড়ো কিছু করার সময় তাঁর নেই। কষ্ট হচ্ছে, বড়োই কষ্ট হচ্ছে।

মেয়েটি একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। বুঝতে চেষ্টাও করছে না। এই কুৎসিত লোকটি তার সব খবর জানে--এটা কী করে সম্ভব তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। ব্যাখ্যার অতীত কোনো কিছুর সামনে দাঁড়ালে আমরা যেমন ভয়ে কুঁকড়ে যাই এও সে-রকম।

নিশানাথ বাবু ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে নাসিমা উঠে চলে গেল। ডাক্তারের দিকে তাকাল পর্যন্ত না। অন্ধ ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলছে। সে দ্রুত বাসায় চলে যেতে চায়। বিবাহিত বয়স্ক এই মানুষটিকে তার ভালো লাগে। ভালো লাগে বললে কম বলা হবে। ভালো লাগার চেয়েও বেশি। সে জানে, গোপনে এখানে আসা অন্যায়। খুবই অন্যায়। তবু সে নিজেকে সামলাতে পারে না। আজ এই বুড়ো লোকটির কথা তাকে বড়ো ধরনের ধাক্কা দিয়েছে। শুধু কি কথা? এই বুড়ো লোকটি কি কথার বাইরেও কিছু করে নি? তার তো মনে হচ্ছে, করেছে। কীভাবে করেছে কে জানে? আচ্ছা এই মানুষটা কি কোনো দরবেশ? কোনো বড়ো ধরনের পীর ফকির?

নাসিমা চলে যাবার পর ডাক্তার সাহেব খানিকক্ষণ একা একা বসে রইলেন। তার পর পরপর দুটো সিগারেট খেয়ে মাসুদকে ডাকলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'বস।'

মাসুদ আশ্চর্য হয়ে তাকাল। ডাক্তার সাহেবের গলা অন্য রকম লাগছে। গলার স্বরে মমতা মাখান।

'বসতে বললাম তো, বস।'

মাসুদ বসল। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'তুমি বয়সে আমার অনেক ছোট, এই জন্যে তুমি বলি। কিছু মনে কর না।'

'জ্বি না, কিছু মনে করি নি।'

'তোমাকে বরখাস্ত করার যে চিঠিটা দিয়েছিলাম ওটা ফেলে দাও।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'রাগের মাথায় আমরা অনেক সময় এটা-ওটা বলি বা করি। এটা মনে রাখা ঠিক নয়।'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি যেমন ভুল কর, আমিও করি। হয়তো তোমার চেয়ে বেশিই করি। যেমন এই যে নাসিমা মেয়েটাকে প্রশ্রয় দেওয়া--বিরাট অন্যায়।'

'বাদ দেন স্যার।'

'ভালো একটা মেয়ে অথচ প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে—'

'শুধু আপনার তো দোষ না স্যার। মেয়েটারও দোষ আছে--ও আসে কেন?'

'না-না, মেয়েটার কোনো দোষ নেই; বাচ্চা মেয়ে। এদের আবেগ থাকে বেশি। আবেগের বশে—"

মাসুদ বলল 'স্যার, উঠি? সাত-আট জন রুগী এখনো আছে।'

'তুমি আরেকটু বস। তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা আছে।'

মাসুদ কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'তুমি কত দিন ধরে আমাকে চেন?'

'প্রায় সাত বৎসর।'

'এই সাত বৎসরে তুমি নিশ্চয় আমার আচার-আচরণ আমার মানসিকতা খুব ভালো করেই জান। জান না?'

'জানি, স্যার।'

'আমার আজকের ব্যবহার কি তোমার কাছে সম্পূর্ণ অন্য রকম মনে হচ্ছে না?'

'হচ্ছে।'

'এর কারণটা কি?'

মাসুদ তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমার কি মনে হচ্ছে জান? আমার মনে হচ্ছে ঐ বুড়ো লোকটি আমাকে কিছু একটা করেছে।'

'হিপনোটাইজ?'

'হিপিনোটাইজের চেয়েও বেশি। আমার ধারণা, খুব উঁচু মাত্রার ট্যালিপ্যাথিক ক্ষমতা সে ব্যবহার করেছে। নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবে আমার এ রকম মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এই লোকটির মাথার ভেতর দিয়ে কী পরিমাণ রেডিয়েশন গিয়েছে?'

'আমি তো স্যার বলতে পারব না। টেকনিশিয়ান বলতে পারবে। জেনে আসব?'

'যাও, জেনে আস।'

ডাক্তার সাহেব আবার একটি সিগারেট ধরালেন। তিনি সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা--করছেন, অথচ আজ এই অল্প সময়ের ভেতর তিনটে সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন; মনে মনে ঠিক করে ফেললেন কাল-পরশুর মধ্যে এক বার মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরিতে যাবেন। মস্তিষ্কের উপর রেডিয়েশনের প্রভাব--এই জাতীয়

কোনো বই পান কি-না তা খোঁজ করবেন। এর উপর কোনো কাজ কি হয়েছে? নিউরো-সার্জনরা বলতে পারবেন। এটা তাঁদের এলাকা। হিটলারের সময় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কিছু বন্দীকে নিয়ে পরীক্ষা চালান হয়েছিল। ঠিক এক্সরে না হলেও মোটামুটি ধরনের শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ দীর্ঘ সময় ধরে মাথার ভেতর দিয়ে চালান হয়েছিল। এই পরীক্ষার ফলাফল কখনো প্রকাশ করা হয় নি। অথচ জোর করে বন্দীদের উপর অন্য যে-সব পরীক্ষা চালান হয়েছে তার সব ফলাফলই সযত্নে রাখা আছে। মস্তিষ্কের উপর রেডিয়েশনের প্রভাবের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হল না কেন? রহস্যটা কোথায়?

ডাক্তারের কাছ থেকে বের হয়ে নিশানাথ বাবু একটা রিকশা নিলেন। রিকশায় ওঠার পরপরই তাঁর মনে পড়ল যে-কারণে ডাক্তারের কাছে এসেছিলেন সেটাই পুরোপুরি ভুলে গেছেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অতি দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। এর কারণ কী?

এই ডাক্তারের কাছে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হল দাঁতের মাঢ়ীর এক্সরে কপি তোলা। নিশানাথ এক জন ডেন্টিস্টের কাছে গিয়েছিলেন। সব দাঁত কেন হঠাৎ করে পড়ে যাচ্ছে এটাই দেখতে চান। ডেন্টিস্ট ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গেল। নিশানাথকে বলল একটা এক্সরে করাতে। যদি তাতে কিছু ধরা পড়ে। সেই উদ্দেশ্যেই এবারে তিনি পলিক্লিনিকে এসেছিলেন, অথচ আসল কথাটিই ভুলে গেলেন।

রিকশা দ্রুত যাচ্ছে। এই রিকশাওয়ালা বেশ বলশালী। সে ঝড়ের বেগে রিকশা নিয়ে যাচ্ছে। নিশানাথ বললেন, 'আস্তে চলুন ভাই।'

রিকশাওয়ালা বলল, 'টাইট হইয়া বহেন। চিন্তার কিছু নাই।'

তিনি রিকশাওয়ালার মনে কী হচ্ছে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। সে খুব ফুর্তিতে আছে। আনন্দে আছে। তার আনন্দের কারণটিও স্পষ্ট। আজ দেশ থেকে তার স্ত্রী এসেছে। অনেক দিন সে খোঁজখবর নিচ্ছিল না। ভয় পেয়ে তার স্ত্রী (যার নাম মনু) একা একা ঢাকা শহরে চলে এসেছে এবং ঠিকানা ধরে ঠিকই তাকে খুঁজে বের করে ফেলেছে। রিকশাওয়ালা মুখে খুবই রাগ করেছে। মনুর একা-একা চলে আসাটা যে কীরকম বোকামি এবং ঢাকা শহরটা যে কী পরিমাণ খারাপ তা সে তার স্ত্রীকে বলেছে। তবে মনে মনে সে দারুণ খুশি হয়েছে। এই মুহূর্তে সে ভাবছে ঢাকা শহর পুরোটা সে তার স্ত্রীকে দেখাবে। রিকশায় বসিয়ে বিকাল থেকেই ঘুরবে। হাতে সময় নেই। জমার টাকা তুলে ফেলতে হবে।

নিশানাথ রিকশা থেকে নামবার পর ভাড়ার সঙ্গে আরো ত্রিশ টাকা দিলেন বখশিশ।

রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে তাকাল। তিনি বললেন, 'মীরপুরের চিড়িয়াখানাটা

তোমার স্ত্রীকে দেখিও। খুশি হবে। এখন স্ত্রীর কাছে চলে যাও। জমার টাকা নিশ্চয়ই উঠে গেছে। তাই না? এই টাকাটা হল বাড়তি।'

রিকশাওয়ালা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনে লোকটা কে?'

নিশানাথ নিচু গলায় বললেন, 'কেউ না, আমি কেউ না।'

রিকশাওয়ালার বিস্ময় আরো গাঢ় হল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে অতীন্দ্রিয় কোনো রহস্য চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে।

৮

দীপা দু' দিন ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করছেন। বই নিয়ে ঘরের এক কোণে আলো বসে থাকে। পাতা ওল্টায়। এমন নিবিষ্ট তার ভাবভঙ্গি যে মনে হয় সে সত্যি সত্যি পড়তে পারছে। দীপা জানেন এটা এক ধরনের খেলা। মেয়েটা একা একা এই অদ্ভুত খেলা খেলে--তাঁর কষ্ট হয়। কিন্তু করার কী আছে?

এই মেয়েটির মধ্যে বড়ো কোনো পরিবর্তন এসেছে। রাতে এখন আর মোটেই বিরক্ত করে না। একা একা ঘুমুতে চায়। মাকে বলে বাবার ঘরে গিয়ে ঘুমুতে। বলার সঙ্গে মাথাটা এমন ভাবে নিচু করে ফেলে যাতে মনে হয় বাবা-মা'র একসঙ্গে ঘুমনোর রহস্যের অজানা অংশটি এখন সে জানে।

দীপা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন। দারোয়ান এসে খবর দিল--নিশানাথ বাবুর অবস্থা বেশি ভালো নয়, একটু পরপর বমি করছেন।

'ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়েছে না?'

'জ্বি।'

'খোঁজ নাও এখনো আসছে না কেন।'

দারোয়ান মুখ নিচু করে বলল, 'মাস্টার সাব বাঁচতো না, আম্মা।'

দীপা বলেন, 'কী ভাবে বুঝলে মারা যাচ্ছে?'

'বোঝা যায় আম্মা, শইলে পানি আসছে। পিঠে চাকা চাকা কী যেন হইছে। মাথারও ঠিক নাই আম্মা।'

'মাথার ঠিক থাকবে না কেন?'

'বিড়বিড় কইরা সারা দিন কী যেন কয়। নিজের মনে হাসে।'

দীপার বেশ মন খারাপ হল। তিনি হাতের কাজ ফেলে নিশানাথ বাবুকে দেখতে গেলেন। দূর থেকে দেখলেন নিশানাথ বাবু ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাঁর পাশে আলো। দূর থেকে মনে হচ্ছে তিনি আলোর সঙ্গে কথা বলছেন। এই দৃশ্যটিও অদ্ভুত। আলো অধিকাংশ সময় নিশানাথ বাবুর আশেপাশে থাকে। কেন থাকে কে জানে?

দীপা বারান্দায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আলো চলে গেল। দীপা বললেন, 'চাচা, কেমন আছেন?'

নিশানাথ বললেন, 'বেশি ভালো না, মা। তুমি একটু বস আমার সামনে। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে।'

দীপা বসলেন। কোমল গলায় বললেন, 'বলুন কী কথা।'

'শুনতে তোমার কেমন লাগবে জানি না। আমার এখন কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা হয়েছে। আমি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি। ইচ্ছা করলেই মানুষের মাথার ভেতরও ঢুকে যেতে পারি।'

দীপা মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। দারোয়ান মিথ্যা কথা বলে নি--মাথা খারাপেরই লক্ষণ।

'দীপা।'

'জ্বি।'

'শুধু যে মানুষের কথা বুঝতে পারি তাই না--পশুপাখি, জীবজন্তু সবার মনেই কী হচ্ছে বুঝতে পারি।'

'ও আচ্ছা।'

'নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তু মানুষের মতো গুছিয়ে কিছু ভাবে না। ওদের চিন্তাভাবনার সবটাই খাদ্য নিয়ে। অবশ্যি এদের মধ্যে অদ্ভুত কিছু ব্যাপারও আছে। এরা কী মনে করে জান? প্রত্যেকেই ভাবে তারাই জীবজগতের প্রধান। পৃথিবী সৃষ্টিই করা হয়েছে তাদের জন্যে, তাদের সুখ সুবিধার জন্যে।'

দীপা মৃদু গলায় বললেন, 'আমরা মানুষরাও তো তাই মনে করি। করি না?'

'হ্যাঁ করি। কারণ মানুষও তো জন্তুই। জন্তু ছাড়া সে আর কী?'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক।'

'নিম্নশ্রেণীর পশুপাখিরা মানুষদের কী ভাবে, জান? তারা মানুষদের খুবই বোকা এক শ্রেণীর প্রাণী বলে মনে করে। ওরা আমাদের বোকামি নিয়ে সব সময় হাসাহাসি করে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। ঘরের কোণায় জাল বানিয়ে যে-মাকড়সা বসে থাকে সেও মানুষের চরম মূর্খতা দেখে খিকখিক করে হাসে।'

দীপা কিছু বললেন না। খুব সাবধানে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। নিশানাথ বললেন, 'তুমি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করলে না?'

দীপা হ্যাঁ-না কিছু বললেন না। দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

নিশানাথ বললেন, 'তোমার মনের ভেতর কী হচ্ছে আমি বলে দিই? তাহলে তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে।'

দীপা বলল, 'বলুন।'

'মাথার ভেতর ঢুকতে ইচ্ছা করে না। কেন করে না জান? করে না, কারণ এটা অন্যায়। এটা ঠিক নয়। কিছু না জানিয়ে হুট করে একটা মানুষের ঘরে ঢুকে পড়ার মতো। তাই না, মা?'

দীপা পুরোপুরি নিশ্চিত হল মানুষটির মস্তিষ্কবিকৃতির কিছু বাকি নেই। বেচারার সমস্ত শরীর কী কুৎসিত ভাবেই না ফুলে উঠেছে! দেরি না করে তাকে কোনো বড়ো হাসপাতালে কিংবা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া উচিত।

'দীপা।'

'জ্বি।'

'আমার এই ক্ষমতা মানুষের কাজে লাগান যায়। কীভাবে যায়, জান?

'কী ভাবে?'

'মানুষের ভেতর মন্দ যে–সব ব্যাপার আছে সেগুলি দূর করার জন্যে আমি কাজ করতে পারি।'

'মানুষ তো এক জন দু' জন নয়--লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ।'

'তাও ঠিক। তবে সব মন্দ মানুষকে ভালো বানানর দরকার তো নেই। এমন সব মানুষদের ভালো করতে হবে যাদের উপর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে। যেমন ধর রাষ্ট্রপ্রধান, দেশের বড়ো বড়ো নেতা।'

'আপনি ঘুমান, চাচা। আমার মনে হয় আপনার ঘুম দরকার।'

নিশানাথ বাবু দীপাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলে চললেন--'যত দিন যাচ্ছে ততই অদ্ভুত সব জিনিস আমি জানতে পারছি। আমাদের এই মস্তিষ্ক অদ্ভুত একটা জিনিস। সব রকম স্মৃতি এর মধ্যে আছে। মানুষ যখন এ্যামিবা ছিল সেই স্মৃতিও আছে। আদি প্রাণ দীর্ঘকাল কাটাল পানিতে, সেই পানির জগতের স্মৃতিও আছে মানুষের মাথায়। এক সময় এ্যামিবার বিকাশ হল সরীসৃপ হিসেবে। হিংস্র সরীসৃপ, মানুষের আদি পিতা। সেই সরীসৃপের স্মৃতিও সঞ্চিত রইল, মস্তিষ্ক কিছুই হরায় না——।'

'চাচা, আপনি ঘুমুবার চেষ্টা করুন।'

'আমি তো বেশি দিন বাঁচব না। যা আমি জেনেছি সব তোমাকে বলে যেতে চাই। বুঝলে দীপা, আমাদের মাথায় আছে লক্ষ লক্ষ বছরের স্মৃতি। আমাদের মস্তিষ্কের একটা অংশ সরীসৃপের মতো চিন্তা করে, একটা অংশ জলজ জীবের মতো চিন্তা করে, একটা অংশ—'

'চাচা, আপনি ঘুমুতে চেষ্টা করেন—প্লীজ চাচা—'

'আচ্ছা মা, আচ্ছা। তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি যা—'

নিশানাথ বাবু থামলেন। তীব্র ভয় তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তিনি যা বলছেন সবই ভুল। সবই

ভুল। উত্তপ মস্তিষ্কের কল্পনা। কিন্তু কল্পনা বলে তো মনে হয় না।

না না না--কল্পনা নয়--সত্যি। যা ঘটছে সবই সত্যি। একটু পরপর মাথায় বিচিত্র সব ছবি আসছে। অদ্ভুত সব ছবি। তিনি বুঝতে পারছেন ছবিগুলি কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়, বিভ্রম নয়--সবই স্মৃতি। অতি প্রাচীন স্মৃতি। হাজার বছর, লক্ষ বছর কিংবা আরো আগের কোনো স্মৃতি। কোনো কিছুই হারায় না-জীবজগৎ তার মস্তিষ্কে সমস্ত স্মৃতি ধরে রাখে।

কখন প্রাণের বিকাশ হয়েছিল? তিনি জানেন না। তাঁর পড়াশোনা সীমিত, জ্ঞান সীমিত, বুদ্ধি সীমিত, কিন্তু এখন তিনি অনেক কিছু বুঝতে পারছেন। কেউ যেন তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। এক সময় এই জগৎ ছিল প্রাণহীন। প্রাণহীন জগতে প্রাণের আবির্ভাব হল। একটি যৌগিক অণু--প্রোটিন। সামান্য ক্ষুদ্র একটি এমিনো এসিড, অথচ কী বিপুল তার সম্ভাবনা। একটি স্মৃতিধর অণু। কী রহস্য, কী অপার রহস্য!

নিশানাথ বাবু ছটফট করতে লাগলেন। সহ্য হচ্ছে না, তাঁর আর সহ্য হচ্ছে না। তিনি ঘুমুতে চান। ঘুম--শান্তির ঘুম। যেন কত কাল তাঁর ঘুম হয় নি। কত অনন্ত কাল ধরে তিনি জেগে আছেন। তিনি ব্যাকুল স্বরে বললেন, 'দীপা মা, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।'

ডাক্তার এসে পড়েছেন।

দীপা ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, 'দেখুন তো ডাক্তার সাহেব, অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছেন।'

ডাক্তার রুগীর কপালে হাত রেখে চমকে উঠলেন--জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। শরীরের এই অস্বাভাবিক উত্তাপ দ্রুত কমান প্রয়োজন। বরফজলে গা ডুবিয়ে রাখতে হবে--এ ছাড়া অন্য কিছু তিনি এই মুহূর্তে ভাবতে পারছেন না।

নিশানাথ চোখ মেললেন, ঘোলাটে চোখ। মনে হচ্ছে চারপাশের জগৎ তিনি চিনতে পারছেন না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কেমন লাগছে?'

নিশানাথ ফিসফিস করে বললেন, 'ভালো লাগছে না, খুব খারাপ লাগছে, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'খুব বেশি যন্ত্রণা?'

'হ্যাঁ, খুব বেশি। মাঝে মাঝে আবার চোখে দেখতে পাই না। সব ঝাপসা লাগে।'

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'চোখে দেখতে পান না?'

'জ্বি-না। সব সময় না। মাঝে মাঝে এরকম হয়।'

'এখন কি দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি। ডাক্তার সাহেব, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। দয়া করে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিন।'

ডাক্তার সাহেব একটা পেথিড্রিন ইনজেকশন দিলেন। প্রচুর বরফের ব্যবস্থা করতে বললেন। রুগীকে বরফ–পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এমন 'হাই ফিভার' তিনি তাঁর ডাক্তারী জীবনে কখনো দেখেন নি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

বরফ চলে এল। ডাক্তার সাহেবকে সেই বরফ ব্যবহার করতে হল না। তার আগেই রুগীর জ্বর কমে গেল। এটাও একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'রুগীকে এখানে রাখা ঠিক হবে না। হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন।'

দীপা বললেন, 'ওঁর কী হয়েছে?'

'আমি ধরতে পরছি না। হাসপাতালে বড়ো বড়ো ডাক্তাররা আছেন। তাঁরা হয়তো বুঝতে পারবেন।'

দীপা কী করবেন বুঝতে পারলেন না। নিশানাথ বাবুকে হাসপাতালে পাঠাতে তাঁর মন সরছে না। হাসপাতালে তাঁকে কে দেখবে? শরীরের এই অবস্থায় যতটুকু সেবা–যত্ন দরকার হাসপাতাল তার কতটা করবে? তাঁর পক্ষে বেশি সময় দেওয়া সম্ভব নয়, তাছাড়া তিনি হাসপাতাল সহ্য করতে পারেন না। হাসপাতালে পা দিলেই বমি–বমি ভাব হয়। বাসায় ফিরেও তা কাটতে চায় না। মহসিনের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করা দরকার। তাকে ইদানীং পাওয়াই যাচ্ছে না। কী নিয়ে যেন খুব ব্যস্ত। মাঝে মাঝে এমনও হয়--বাড়ি ফিরতে পারে না। কোনো একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে। মহসিনের চিন্তিত মুখ দেখেই তা বোঝা যায়। ব্যবসাসংক্রান্ত কোনো জটিলতা হবে। দীপা প্রায়ই ভাবেন জিজ্ঞেস করবেন--জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না। মহসিনের ব্যবসার ব্যাপারে কোনো কৌতূহল দেখাতে তাঁর ভালো লাগে না।

আজ মহসিন সাহেব সন্ধ্যার আগেই ফিরলেন। তাঁর মুখ শুকনো--তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। দীপা চায়ের কাপ নিয়ে যেতেই বললেন, 'আজ আমাকে সকাল সকাল ভাত দিতে পারবে?'

দীপা বললেন, 'কেন পারব না। ক'টার সময় ভাত চাও?'

'এই ধর--সাতটা সাড়ে–সাতটা।'

'কোথাও যাবে?'

'হুঁ।'

দীপা পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ মহসিন তাঁকে ঠিক লক্ষ করছেন বলে মনে হচ্ছে না। কেমন যেন অন্যমনস্ক।

'দীপা।'

'বল।'

'আমি আজ বাসায় নাও ফিরতে পারি। যদি দেখ এগারোটার মধ্যে ফিরছি না, তাহলে দারোয়ানকে গেট বন্ধ করে দিতে বলবে।'

'আচ্ছা।'

মহসিন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হালকা গলায় বললেন, 'তোমার ডাক্তার বোন এ-বাড়িতে অনেক দিন আসে না। ব্যাপার কি বল তো?

'ব্যাপার আবার কি? নিশ্চয়ই কাজ নিয়ে ব্যস্ত।'

'কোনো কিছু নিয়ে রাগটাগ করে নি তো?'

দীপা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'রাগ করবে কেন? তৃণা রাগ করার মতো মেয়ে না। তার মধ্যে এই সব ক্ষুদ্রতা নেই। হঠাৎ তৃণার কথা উঠল কেন?'

'এম্নি। অনেক দিন ওকে দেখি না।'

'আচ্ছা, ওকে আসতে বলব। নিশানাথ চাচার শরীরের অবস্থা নিয়েও ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'ওঁর শরীর কি আবার খরাপ হয়েছে?'

'হুঁ। আজ তো খুব ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার সাহেব বললেন, হাসপাতালে নিয়ে যেতে--'

'ডাক্তার বললে তাই কর। তবে এই সব করে কিছু হবে বলে মনে হয় না। তঁর যা হয়েছে তার নাম মৃত্যু-রোগ। ভালো হবে আবার খারাপ হবে আবার একটু ভালো হবে, চলতেই থাকবে--আনটিল দ্য ফাইনাল সল্যুশন---'

দীপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কেউ এত সহজ ভঙ্গিতে মৃত্যুর কথা বললে তাঁর ভালো লাগে না। মৃত্যু একটি ভয়াবহ ব্যাপার। সেই মৃত্যু নিয়ে এমনভাবে কথা বলা উচিত নয়।

মহসিন চলে যাবার পরপরই দীপা তৃণাকে টেলিফোন করলেন। তৃণার স্বভাব হচ্ছে টেলিফোন ধরেই হড়হড় করে একগাদা কথা বলা। অন্য কে কী বলছে তা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। তুফান মেইলে নিজের সব কথা বলে শেষ করে এক সময় নিঃশ্বাস ফেলে বলবে 'তারপর আপা, কেমন আছ?' সেই প্রশ্নের উত্তরও সে ভালোমতো না শুনেই বলবে, 'আপা এখন রাখি, কেমন? কারো অসুখবিসুখ নেই তো? খোদা হাফেজ।'

আজও তৃণা টেলিফোন তুলেই হড়হড় করে কথা বলে যাচ্ছে, 'আপা আমি জানি তুমি আমার উপর খুব রাগ করেছ। গত পনের দিনে এক বারও তোমাদের খোঁজখবর নিই নি। যা ব্যস্ত ছিলাম বলার না। দু'টা সেমিনার হয়েছে। একটা এপিলেপ্সির উপর, অন্যটা সাইকাডেলিক ড্রাগ। দু'টাই খুব ইন্টারেস্টিং সেমিনার। এত ইন্টারেস্টিং হবে জানলে তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতাম। এক আমেরিকান প্রফেসর এসেছিলেন--প্রায় সত্তুরের মতো বয়স--প্রফেসর বার্ণ। আমাকে কী বললেন জান? খুব গম্ভীর গলায় বললেন--মিস তৃণা, আমি কি তোমার সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে হলেও প্রেম প্রেম গলায় কথা বলতে পারি? এরা কেমন রসিক, দেখলে আপা?'

দীপা কোনো রকমে তাকে থামিয়ে বলল, 'তুই কি আমার এখানে আসতে পারবি?'

'অবশ্যই পারব। কখন আসব--এখন?'

'কাল সকালে এলেও হবে। নিশানাথ চাচার ব্যাপারে তোর সঙ্গে পরামর্শ করব।'

'ওঁর অসুখ কি আরো বেড়েছে?'

'হুঁ। কি সব আজেবাজে কথা বলে--মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে, জীবজন্তুর কথা বুঝতে পারে—'

'ব্রেইন সেলের ডিজেনারেশন হচ্ছে--আর কিছু না। আমি সকাল বেলায় চলে আসব। তবে আমাকে দিয়ে তো কিছু হবে না আপা। আমি হচ্ছি ছোট ডাক্তার।'

'হাতের কাছের ডাক্তার সব সময়ই ছোট। যে-ডাক্তার অনেক দূরে, তাকেই মনে হয় অনেক বড়ো।'

'মাঝে মাঝে তুমি ফিলসফির টীচারের মতো কথা বল আপা।'

'ফিলসফির টীচাররা এমন করে কথা বলে, তা তো জানতাম না।'

'আমি তাহলে রাখি আপা? খোদা হাফেজ।--দুলাভাই ভালো আছেন তো?'

'হ্যাঁ, ও ভালোই আছে--ও তোর কথা আজ বলছিল--'

'কি বলছিলেন?'

'অনেক দিন তোর সঙ্গে দেখা হয় না--তুই রাগ করেছিস কিনা এই সব।'

তৃণা বিস্মিত গলায় বলল, 'গত কালই তো দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। রোববারেও দেখা হয়েছে।'

'তাই নাকি। তা হলে হয়তো ভুলে গেছে।'

'দুলাভাইকে একটু দাও তো, কথা বলি।'

'ও বাসায় নেই।'

'কখন ফিরবেন?'

'রাত এগারোটার দিকে ফিরতে পারে। আবার নাও ফিরতে পারে।'

'নাও ফিরতে পারে মানে? রাতে কোথায় থাকবেন?'

'তা তো জানি না। ব্যবসাট্যাবসা নিয়ে কী সব সমস্যা যাচ্ছে।'

তৃণা গম্ভীর গলায় বলল, 'দুলাভাই যদি এগারোটার মধ্যে ফেরেন তাহলে বলবে আমাকে টেলিফোন করতে।'

'আচ্ছা।'

'কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে আপা। খোদা হাফেজ।'

মহসিন রাত এগারোটার মধ্যে ফিরলেন না। দারোয়ানকে গেটে তালা লাগিয়ে দিতে বলে দীপা শেষ বারের মতো নিশানাথ বাবুর খোঁজ নিতে গেলেন।

নিশানাথ চাদর গায়ে দিব্যি ভালোমানুষের মতো বসে আছেন হাতে স্যুপের বাটি। চামচ দিয়ে স্যুপ তুলে মুখে দিচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আনন্দে আছেন।

'চাচা, শরীরটা কি এখন ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ মা; তবে ঘুম-ঘুম ভাব এখনো আছে। স্যুপ খেয়ে আবার শুয়ে পড়ব।'

'সলিড কিছু খাবেন? ভাত-মাছ? খুব ভালো পাঙ্গাশ মাছ ছিল।'

'না মা। দাঁত নেই তো--তরল খাবার ছাড়া অন্য কিছু খেতে পারি না; গলায় আটকে যায়।'

'স্যুপটা কি খেতে ভালো হয়েছে?'

'খুবই ভালো হয়েছে। অতি উত্তম হয়েছে।'

'কাল তৃণা আসবে। ওর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করব কি করব না। ডাক্তার সাহেব হাসপাতালে নেবার কথা বলছিলেন।'

'বলুক। আমি এখানেই থাকব। বেশি দিন বাঁচব না মা। খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ। এই এক সপ্তাহ নিজের ঘরটায় থাকি। পরিচিত জায়গায় মরার একটা আলাদা আনন্দ আছে মা।'

দীপা কিছু বললেন না। তাকিয়ে রইলেন। কী কুৎসিত দেখাচ্ছে মানুষটাকে, দাঁত নেই, চুল নেই, সমস্ত গা ফুলে কী হয়েছে! অথচ এই মানুষের ভেতরটা যে কত সুন্দর তা তাঁর মতো ভালো কেউ জানে না।

'দীপা।'

'জ্বি চাচা।'

'তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ। ঋণ নিয়ে মরতে ভালো লাগে না। তবে তোমার ঋণের জন্যে আমার খারাপ লাগছে না। দেবী অংশে তোমার জন্ম। দেবীদের কাছে ঋণী থাকা দোষের না।'

কথা ঘোরাবার জন্যে দীপা বললেন, 'খাওয়ার পর কি আমি আপনার জন্যে এক কাপ গরম কফি আনব?'

'আন।'

কফি এনে দীপা দেখলেন চাদর মুড়ি দিয়ে নিশানাথ বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। দীপা তাঁকে জাগালেন না। অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষটির জন্যে তাঁর চোখ ভিজে উঠল।

৯

তৃণাকে ডাক্তারের এ্যপ্রনে সুন্দর দেখাচ্ছে। সাদা রঙের গাম্ভীর্য তার চেহারাতেও পড়েছে। তাকে এখন বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে, তবে ছেলেমানুষী পুরোপুরি কাটাতে

পারছে না। নিশানাথের কথাবার্তা যদিও সে বিচক্ষণ ভঙ্গি করে শুনছে, তবু বারবার হাসি আসছে। অনেক কষ্টে সে হাসি সামলাচ্ছে ঘরে আর কেউ নেই। দীপা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তৃণাকে বলে গেছেন নিশানাথবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যাপারটা বুঝতে। তৃণার ধারণা বোঝাবুঝির কিছুই নেই। লোকটির মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে। এই বয়সে তা অস্বাভাবিকও নয়। মাথা ঠিক থাকলেই বরং অস্বাভাবিক হ'ত

নিশানাথ বললেন, 'মা, তোমার কাছে বোধ হয় খুব অবাক লাগছে। তবে ব্যাপারটা সত্যি। আমি মানুষের মাথার ভেতর চলে যেতে পারি।'

তৃণা মনে মনে বলল, 'মাথার ভেতরে কী ভাবে যান? নাকের ফুটো দিয়ে ঢোকেন? নাকি কানের ফুটো দিয়ে?' তৃণার ইচ্ছা করছে মনে মনে না বলে শব্দ করেই বলতে। সে তা বলছে না, কারণ অসুস্থ মানুষকে রাগিয়ে দিয়ে লাভ নেই।

'তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ?'

'করছি। করব না কেন? আপনি কেন শুধু শুধু আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবেন?'

'আমি ইচ্ছা করলে তোমার মাথার ভেতরও ঢুকে যেতে পারি। তুমি কী ভাবছ এই সব বলে দিতে পারি।'

তৃণা কপট আতঙ্কের ভঙ্গি করে বলল, 'প্লীজ, এটা করবেন না। আমি অনেক আজেবাজে জিনিস ভাবি। আপনি জেনে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে।'

নিশানাথ বললেন, 'এটা খুব খাঁটি কথা বলেছ মা। বিনা অনুমতিতে অন্যের মাথায় ঢোকা উচিত না। খুবই গর্হিত কাজ। এই জন্যেই এখন আর সহজে কারো মাথায় ঢুকতে চাই না।'

তৃণা অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখে গম্ভীর মুখে বলল, 'অন্য সমস্যাও আছে। হয়তো কারো মাথায় ঢুকলেন, তারপর আর বেরুতে পারলেন না। সারা জীবনের জন্যে আটকা পড়ে থাকতে হল। কী অদ্ভুত অবস্থা! আপনার শরীরটা চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, আর আপনি আটকা পড়ে আছেন অন্য এক জনের মাথায়। হতে পারে না এ-রকম?'

নিশানাথ বাবু ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। তাঁর মনে হল এই চমৎকার মেয়েটা তাঁকে নিয়ে মজা করার চেষ্টা করছে। তাঁর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এক বার ইচ্ছা করল মেয়েটার মাথায় ঢুকে গোপন কিছু তথ্য জেনে নিয়ে মেয়েটাকে চমকে দেবেন। পরমুহূর্তেই চিন্তাটা বাতিল করে দিলেন। এটা উচিত না--খুবই গর্হিত কাজ।

তৃণা বলল, 'মানুষের মাথায় ঢোকা ছাড়া আর কিছু কি পারেন?'

'খুব ভালো চিন্তা করতে পারি। যেমন অঙ্ক মানসাঙ্ক চট করে করে ফেলতে পারি। বড়ো বড়ো ভাগ, গুণ, বর্গমূল--খাতা পেনসিল কিছুই লাগে না।'

'বাহ্, খুব মজা তো!'

'তুমি পরীক্ষা করে দেখ। একটা বিরাট ভাগ অঙ্ক দাও--দেখ, কেমন চট করে উত্তর বলে দেব।'

'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করছি।'

'না, তুমি বিশ্বাস করছ না। দাও একটা অঙ্ক---'

তৃণা খানিকটা বিরক্তি নিয়েই বলল, 'আপনার যখন এতই ইচ্ছা, তাহলে বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ দিন। ভাগফলটা আমাকে বলুন।'

নিশানাথ বললেন, 'উত্তর হচ্ছে--তিন দশমিক এক, চার, দুই, আট, পাঁচ, সাত, এক, দুই, চার, চার, নয়, আট, সাত, তিন, দুই, আট, তিন, এক---'

এই পর্যন্ত বলেই নিশানাথ থেমে গেলেন। তৃণা বলল, 'থামলেন কেন?'

নিশানাথ ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এর উত্তর মিলবে না--অনন্ত কাল ধরে চলতেই থাকবে।'

'আপনি কি তা আগেই জানতেন, না এখন টের পেলেন?'

'এখন টের পেলাম। আগে জানতাম না।'

তৃণা এখন খানিকটা আগ্রহ বোধ করছে, যদিও নিশানাথ বাবুর কথা সে ঠিক বিশ্বাস করছে না। 'পাই'য়ের মান যে মানুষের অজানা তা অনেকেই জানে। হয়তো নিশানাথ বাবুও জানেন।

তৃণা বলল, 'আচ্ছা বলুন তো--আমার এই হাতব্যাগে কী আছে?' নিশানাথ বিস্মিত গলায় বললেন, 'এটা কী করে বলব? আমি তোমার মাথার ভেতর ঢুকতে পারি কিন্তু ব্যাগের ভেতর তো ঢুকতে পারি না।'

তৃণা এইবার ফিক করে হেসে ফেলল। অবশ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে হাসির রেখা মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, যে মানুষের মাথায় ঢুকতে পারে, সে সব জায়গাতেই ঢুকতে পারে।'

'এটা ঠিক না। মানুষের মন বেতারতরঙ্গের মতো। বেতারতরঙ্গ ধরতে রেডিও সেট লাগে। মানুষের মাথা হচ্ছে সে-রকম সেট-রিসিভিং স্টেশন। পশু, কীটপতঙ্গ এরাও এক ধরনের রিসিভিং সেট, তবে খুব দুর্বল।'

'আপনার কথা শুনে খুব ভালো লাগল, এখন তাহলে উঠি?'

'উঠবে?'

'হ্যাঁ। আমাকে এগারোটার মধ্যে হাসপাতালে যেতে হবে।'

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে মা--তাহলে যাও।'

'আমার তো মনে হচ্ছে এখন আপনার শরীর বেশ ভালো।'

'হ্যাঁ ভালো। সারা দিনে কিছুটা সময় ভালো থাকে--আবার খারাপ হয়। বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে খুব খারাপ হয়।'

'আপনি আজেবাজে জিনিস--যেমন মানুষের মাথার ভেতর ঢোকা এইসব

নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবেন না। প্রচুর রেস্ট নেবেন। খাওয়াদাওয়া করবেন। আমি এখন থেকে এক দিন পরপর আপনাকে এসে দেখে যাব।'

তৃণা দরজা পর্যন্ত গিয়েছে, নিশানাথ ডাকলেন, 'মা, এক মিনিট দাঁড়াও।'

তৃণা থমকে দাঁড়াল। নিশানাথ বললেন, 'এখন আমি তোমার ব্যাগে কী আছে বলতে পারব। তোমার সঙ্গে কথা বলতে–বলতে অন্যমনস্ক হয়ে তোমার মাথায় ঢুকে পড়েছিলাম। ঢোকামাত্র বুঝতে পারলাম।'

'কী বুঝতে পারলেন?'

'বুঝলাম যে তোমার ব্যাগে অনেক কিছুই আছে, তবে সে–সব তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। লিপস্টিক, চুলের কাঁটা, একটা চিরুনি, একটা রুমাল—।'

'এসব তো সব মেয়ের ব্যাগেই থাকে।'

'হ্যাঁ, তা থাকে। এই জন্যেই তো বলছি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। তবে একটা জিনিস আছে, যা নিয়ে তুমি খুব চিন্তিত। একটা খামে বন্ধ চিঠি। এই চিঠি তুমি এক জনকে দেবে। তার নাম হারুন। চিঠিটা তুমি অনেক দিন আগেই লিখে রেখেছ--দিতে পারছ না। আজ ঠিক করে রেখেছ, যে করেই হোক তুমি তাকে চিঠিটা দেবে।'

তৃণা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। পুরো ব্যাপারটা তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। নিশানাথ সহজ গলায় বললেন, 'চিঠির বিষয়বস্তুও আমি জানি।'

'কী জানেন?'

'এক সময় এই ছেলেটিকে তুমি খুব পছন্দ করতে। তোমরা দু' জন বিয়ে করবে, এ রকম পরিকল্পনা করে রেখেছ। কিন্তু এখন আর ছেলেটিকে তোমার পছন্দ না। মুখ ফুটে বলতে পারছ না বলে চিঠি লিখেছ।'

তৃণা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনি তাহলে সত্যি সত্যি মানুষের মাথায় ঢুকতে পারেন?'

'হ্যাঁ পারি।'

'অবিশ্বাস্য ব্যাপার!'

নিশানাথ দুঃখিত গলায় বললেন, 'মানুষের মাথায় ঢোকার ব্যাপারটা অন্যায়। খুবই অন্যায়। খুবই গর্হিত কাজ। তুমি কিছু মনে কর না তৃণা।'

'না, আমি কিছু মনে করি নি। আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না--যদিও জানি আপনার ক্ষমতাটা সত্যি। এর মধ্যে কোনো ভুল নেই। আমি আরেকটু বসি আপনার সঙ্গে?'

'বস।'

'আপনার খবর প্রকাশিত হলে মেডিকেল সায়েন্সের জগতে কী রকম হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে, সেটা কি আপনি জানেন?'

'না। জানি না।'

তৃণা কাঁপা গলায় বলল, 'এই দেখুন আমার গা কাঁপছে। আচ্ছা, আপনি শুরু থেকে বলুন তো--কখন আপনি প্রথম আপনার এই ক্ষমতার কথা বুঝতে পারলেন?'

নিশানাথ জবাব দিলেন না। তাঁর মাথায় তীব্র যন্ত্রণা আবার শুরু হয়েছে। চারপাশের জগৎ ঘোলাটে হয়ে আসতে শুরু করেছে। তিনি দুর্বল স্বরে বললেন, 'মা, তুমি এখন যাও।'

'আমার পুরো ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছা করছে। না জেনে আমি যেতে পারব না।'

নিশানাথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সব তোমাকে বলব। এখন না। এখন পারব না। তোমাকে আমি খবর দেব। আমি নিজে নিজে চিন্তা করে অনেক কিছু বের করেছি। সে সবও তোমাকে বলব। আজ না। অন্য এক দিন।'

'কবে সেই অন্য এক দিন?'

'খুব শিগ্‌গিরই। আমার হাতেও সময় নেই। আমি বাঁচব না। বাঁচার আগে কাউকে বলতে চাই। কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।'

নিশানাথ চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেললেন। যেন চেনা পৃথিবী থেকে লুকোতে চাচ্ছেন।

তৃণা দীপার খোঁজে রান্নাঘরে ঢুকেছে। দীপা পরিজ তৈরি করছেন--নিশানাথ বাবুর সকালের নাশতা। সকালে চালের আটার রুটি করে দিয়েছিলেন, খেতে পারেন নি। পরিজ খেতে পারেন। তৃণা দীপার পাশে এসে দাঁড়ায়। দীপা বোনের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বললেন, 'তোর কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি তো।'

'তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'জানি না। আপা, আমাকে এক কাপ চা করে দাও।'

'তুই হাসপাতালে যাবি না?'

'বুঝতে পারছি না। হয়তো যাব না।'

'রুগী কেমন দেখলি?'

তৃণা জবাব দিল না। তার কথা বলতে ভালো লাগছে না। দীপা বললেন, 'তোর কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'শরীর খারাপ লাগলে উপরে গিয়ে শুয়ে থাক।'

'দুলাভাই কি বাসায় আছেন আপা?'

'না। ও কাল রাতে ফেরে নি।'

'কখন ফিরবেন?'

'জানি না।'

তৃণা রান্নাঘর থেকে বেরুল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বারান্দায় হাঁটল। তারপর উঠে গেল দোতলায়। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবে। শরীর ভালো লাগছে না। একটু আগে চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছিল, এখন তাও হচ্ছে না।

আলো তার শোবার ঘরের অন্ধকার কোণে একটা বই নিয়ে বসে আছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বইটিতে কেন্দ্রীভূত। তৃণা ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সে এগিয়ে গেল। আলো ছোটখালাকে দেখে জড়সড় হয়ে গেল। ছোট ছোট করে শ্বাস নিচ্ছে, দ্রুত চোখের পাতা ফেলছে। সে কি ভয় পেয়েছে?

তৃণা নরম গলায় বলল, 'কেমন আছ?'

আলো চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল। ছোটখালার কথা সে কিছুই বুঝতে পারে নি; শুধু বুঝেছে ছোটখালা তাকে নরম স্বরে কিছু বলেছেন। যা বলেছেন তাতে আদর ও ভালোবাসা মাখান। কেউ আদর ও ভালোবাসা মাখিয়ে কিছু বললে আলোর চোখে পানি এসে যায়। তারো ইচ্ছা করে আদর ও ভালোবাসা মাখিয়ে কিছু বলতে। কী করে বলতে হয় তা সে জানে না।

তৃণা আরো কাছে এগিয়ে এল। একটা হাত রাখল আলোর মাথায়। আলোর হাতের বইটি মেঝেতে পড়ে গেল। তৃণা লক্ষ করল মেঝেতে একটা সাদা কাগজ এবং পেনসিল। কাগজে কী সব লেখা। তৃণা কাগজটা হাতে নিল। গোটা গোটা হরফে নানান শব্দ লেখা--

সাফল্য
প্রতিজ্ঞা
শ্রবণ
মন্দির
দিবস

তৃণা লেখার দিকে ইঙ্গিত করে বিস্মিত গলায় বলল, 'এগুলি তুমি লিখেছ?' আলো এই প্রশ্ন বুঝতে পারল। সে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তৃণা বলল, 'কেন লিখেছ?' আলো এই প্রশ্ন বুঝতে পারল না। চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল।

তৃণা কী যেন বলতে গেল। তার আগেই আলো কাগজ টেনে নিয়ে পেনসিল দিয়ে গুটি গুটি করে লিখতে শুরু করল। লেখা শেষ হবার পর তৃণার দিকে কাগজটি বাড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। তার বড়ো লজ্জা লাগছে।

কাগজে গোটা গোটা করে লেখা--'খালা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

এর মানে কী? মূক-বধির একটি মেয়ে হঠাৎ করে কেন কাগজে লিখবে 'খালা, আমি তোমাকে ভালোবাসি?'

এর অর্থ কি সে জানে? কেউ হয়তো এই একটি বাক্য লেখা শিখিয়ে দিয়েছে।

অক্ষর-পরিচয়হীন মানুষ যেমন নিজের নাম সই করতে শেখে। হয়তো এও সে-রকম কিছু।

'কে তোমাকে লেখা শিখিয়েছে?'

আলো প্রশ্নের জবাব দিল না। তৃণার দিকে কাগজ এগিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করল লিখে দেবার জন্যে। বিস্মিত তৃণা লিখল, 'তুমি কি লিখতে পার?'

আলো উত্তরে লিখল, 'হ্যাঁ।'

'কে তোমাকে শিখিয়েছে?'

'স্যার।'

'নিশানাথ বাবু?'

'হ্যাঁ।'

'কখন শেখালেন?'

এর উত্তরে আলো কিছু লিখল না।

তৃণা লিখল, 'তুমি বই পড়তে পার?'

'পারি।'

'বই পড়ে বুঝতে পার?'

'পারি।'

'চশমা কী জান?'

'চোখে দেয়।'

'প্রতিজ্ঞা কী জান?'

'না।'

কাগজের খণ্ডটিতে আর লেখার জায়গা নেই। তৃণা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। কী হচ্ছে এ বাড়িতে? এ বাড়ির মানুষজন কি জানে কী হচ্ছে?

তৃণা আলোর খাটে শুয়ে পড়ল। তার মাথা ধরেছে। বমি-বমি লাগছে। দীপা চা নিয়ে এসে দেখলেন তৃণা মড়ার মতো পড়ে আছে। তিনি কোমল গলায় বললেন, 'তোর তো মনে হচ্ছে সত্যি শরীর খারাপ। ডাক্তারদের শরীর খারাপ করলে কি ডাক্তার ডাকার নিয়ম আছে? থাকলে বল--এক জন ডাক্তারকে খবর দিই।'

তৃণা উঠে বসতে-বসতে বলল, 'দুলাভাইয়ের সঙ্গে আমার কিছু কথা বলা দরকার আপা। দুলাভাই কখন আসবেন?'

'ও এসেছে।'

'এসেছেন? কোথায়?'

'নিচে। নিশানাথ চাচাকে দেখতে গিয়েছে। ওর সঙ্গে কি কথা বলবি?'

তৃণা জবাব দিল না। চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল।

নিশানাথকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না--তিনি জেগে আছেন না ঘুমিয়ে আছেন। ইজিচেয়ারে লম্বালম্বি শুয়ে থাকা এক জন মানুষ, যাঁর চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। বাইরের কেউ হঠাৎ দেখলে চমকে উঠবে। মহসিনের সঙ্গে তাঁর রোজই দেখা হচ্ছে, তবু মহসিন চমকে উঠলেন--কী কুৎসিতই না মানুষটাকে লাগছে! শরীরে মনে হচ্ছে পানি এসে গেছে। পা দুটো ফোলা। অথচ পায়ের আঙুলগুলো শুকিয়ে পাখির নখের মতো হয়ে আছে! মহসিন মৃদু স্বরে বললেন, 'স্যার কি জেগে আছেন?'

নিশানাথ খসখসে গলায় বললেন, 'বুঝতে পারছি না বাবা। এখন এমন হয়েছে--কখন জেগে থাকি, কখন ঘুমিয়ে থাকি বুঝতে পারি না।'

'আপনি বিশ্রাম করুন।'

'আর বিশ্রাম, আমি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি বাবা। কোথায় যাব তাই-বা কে জানে?'

মহসিন কিছু বললেন না। মৃতপ্রায় মানুষটির সামনে তাঁর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না, আবার চলে যেতেও বাধো বাধো লাগছে।

নিশানাথ বললেন, 'তুমি একটু বস।'

বারান্দায় বসবার জায়গা নেই। মহসিন দাঁড়িয়ে রইলেন। নিশানাথ বললেন, 'আমার গলার স্বরটা কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে--তুমি কি লক্ষ করেছ?'

'জ্বি করেছি।'

'নিজের গলার স্বর নিজেই চিনতে পারি না। যখন কথা বলি মনে হয় অন্য কেউ কথা বলছে।'

'আমার মনে হয় কথা না বলে এখন চুপচাপ শুয়ে থাকাই ভালো।'

'সব ভালো জিনিস তো বাবা সব সময় করা যায় না। এখন আমার সারাক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছা করে। আমার পরিকল্পনা কি জান? আমার পরিকল্পনা হচ্ছে, মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত আমি কথা বলব। মৃত্যু কী এই সম্পর্কে বলব--রানিং কমেন্ট্রি। যখন কথা বলতে পারব না, তখন কারো মাথার ভেতর ঢুকে যাব। তাকে জানিয়ে যাব ব্যাপারটা কী।'

মহসিন আড়চোখে ঘড়ি দেখলেন। এক জন অসুস্থ মানুষের আবোল-তাবোল কথা শুনতে তাঁর ভালো লাগছে না। অথচ উঠে যাওয়াও যাচ্ছে না।

'মহসিন।'

'জ্বি স্যার।'

'আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই--বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা।'

'কী পরীক্ষা?'

'আমার যে-অংশ অন্যের মাথায় ঢোকে, সেই অংশের কোনো মৃত্যু আছে কি-না তা জানা। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অংশটাও কি মরে যায়, না ঐ অংশ বেঁচে

থাকে। যদি বেঁচে থাকে, সে কোথায় থাকে।'

'আমি মনে হয় আপনার কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না।'

নিশানাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, 'আমি নিজেই নিজের কথা বুঝি না, তুমি কী করে বুঝবে?'

মহসিন আবার ঘড়ি দেখলেন। আর থাকা যায় না, এবার উঠতে হয়।

'মহসিন।'

'জ্বি স্যার।'

'আমার কথা কি তোমার কাছে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে?'

'জ্বি না। তবে আমার মনে হয় এইসব জটিল বিষয় নিয়ে আপনার চিন্তা করা উচিত না। আপনার উচিত চুপচাপ বিশ্রাম করা, যাতে স্নায়ু উত্তেজিত না হয়.'

'মহসিন, আমার মনে হয় তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। আমার কথাগুলি যে পাগলের প্রলাপ নয়, তা কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। খুব সহজেই পারি।'

'আমি তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না, স্যার।'

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, এটা আমি চাই; কারণ মৃত্যু কী, তা বোঝার জন্যে আমি তোমার সাহায্য চাই। তোমার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। তুমি যদি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস কর, তাহলেই সাহায্য করবে।'

'আমি আপনার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করছি।'

'না, করছ না। আমি এখন তোমার মাথার ভেতর ঢুকব। এ ছাড়া তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে না।'

মহসিন সাহেব বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকালেন আর ঠিক তখনই বাঁ দিকের কপালে সূক্ষ্ম যন্ত্রণা বোধ করলেন। এই যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হল না; তিনি বুঝতেও পারলেন না নিশানাথ তাঁর মাথায় ঢুকে গেছেন; মস্তিষ্কের অতলান্তিক কুয়ায় অতি দ্রুত নেমে যাচ্ছেন। কুয়ার গহিন থেকে প্রবল আকর্ষণী শক্তি নিশানাথকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এ কী! তিনি এ কী দেখছেন?

এটা কি মহসিনের মস্তিষ্ক? এই কুয়ার চারপাশের দেয়ালে থরে থরে সাজান স্মৃতিগুলি কি সত্যি তাঁর এককালের প্রিয় ছাত্র মহসিনের? মৃদুভাষী মহসিন। ছেলেমেয়ের অতি আদরের বাবা। দীপার ভালোবাসার মানুষ। শান্ত, বিবেচক, বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান এক জন মানুষ। না–না–না, তিনি যা দেখছেন তা ভুল! কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই অন্য কারোর মস্তিষ্ক।

কারণ এই মস্তিষ্কের মানুষটি খুব ঠাণ্ডা মাথায় একটি খুনের পরিকল্পনা করেছে। খুন করা হবে একটি মেয়েকে, যার নাম দীপা। যে মেয়েটি তারই স্ত্রী। এমন ভাবে হত্যাকাণ্ডটি হবে যে কেউ বুঝতে পারবে না––কেউ সন্দেহ করবে না।

শোকে ও কষ্টে মানুষটি ভেঙে পড়ার অভিনয় করবে। তারপর এক সময় শোকের তীব্রতা কমে যাবে। সব স্বাভাবিক হয়ে আসবে। বাচ্চাগুলির দেখাশোনার জন্যেই তখন সবাই তাকে বিয়ে করবার জন্যে চাপ দেবে। সে বিয়ে করবে। এ বাড়িতে একটি মেয়ে এসে উঠবে, যার মাথার চুল ছোট-ছোট করে কাটা, যার গায়ের রঙ শ্যামলা, যার চোখ বড়ো বড়ো, যার নাম নুশরাত জাহান, যাকে আদর করে এই লোকটি 'নুশা' বলে। দীপাকে হত্যা না করেও এই লোকটি 'নুশা'কে ঘরে আনতে পারে। খুব সহজেই পারে। দীপাকে ত্যাগ করলেই হয়। তা সে করবে না, কারণ তাতে সামাজিকভাবে সে হেয় হবে। তার চেয়েও বড়ো কথা দীপাকে ত্যাগ করা মানে দীপার বিশাল সম্পত্তি ত্যাগ করা। এই সম্পদ দীপা তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। এর চেয়ে হত্যাই ভালো। কেউ কোনো দিন জানবে না। জানার কোনোই উপায় নেই। কারণ পরিকল্পনা করা হয়েছে ভেবেচিন্তে।

দীপাকে অফিস থেকে এক বার টেলিফোন করে বলা হবে--দীপা, আমি একটু বাইরে যাব। আমার নীল স্যুট, লাল একটা টাই আর স্ট্রাইপ-দেওয়া শার্টটা কাউকে দিয়ে অফিসে পাঠিয়ে দাও। দীপা তাই করতে যাবে। স্ট্রাইপ-দেওয়া সাদা শার্ট যেহেতু ইস্ত্রি নেই, সে ইস্ত্রি করতে বসবে। ঘটনাটা ঘটবে তখন। ইস্ত্রির ভেতরের তার শর্ট সার্কিট করা থাকবে বডির সঙ্গে। ইণ্ডাসট্রিয়াল পাওয়ার লাইনের হাই-ভোল্টেজ তার শরীর দিয়ে প্রবাহিত হবে। সে বড়ো ধরনের চিৎকার করারও সময় পাবে না।

ঘটনাটা কবে ঘটবে? খুব শিগ্‌গিরই ঘটবে। দেরি করার কোনো মানে হয় না। ইস্ত্রি ঠিকঠাক করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেললেই হয়। এত বড়ো একটা ব্যাপার দীর্ঘদিন মাথার উপর চেপে রাখার মানে হয় না......। শিগ্‌গিরই হবে। খুব শিগ্‌গির। হয়তো আজ, কিংবা কাল, কিংবা পরশু।

নিশানাথ মহসিনের মাথা থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি আর থাকতে পারছেন না। বার বার মনে হচ্ছিল আর কিছুক্ষণ থাকলে বের হওয়া যাবে না। সারা জীবনের জন্যে আটকা পড়ে যেতে হবে। নিশানাথ হাঁপাচ্ছেন। বড়ো বড়ো করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে বাতাস কোনো কারণে অক্সিজেনশূন্য হয়ে পড়েছে।

মহসিন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে স্যার?'

'না, কিছু না।'

'এ-রকম ঘামছেন কেন?'

'কিছু না, তুমি যাও। ঠিক হয়ে যাবে।'

'ডাক্তারকে খবর দিই?'

'কাউকেই খবর দিতে হবে না। তুমি যাও।'

নিশানাথ চোখ বন্ধ করে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারছেন না। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ তিনি কী দেখলেন? যা

দেখলেন তা--কি সত্যি না মায়া? মহসিন খানিকক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তিত মুখে চলে এলেন। বসার ঘরে ঢুকে টেলিফোনে ডাক্তারকে খবর দিলেন, যদিও ঘরেই ডাক্তার ছিল। তৃণা যে ঘরে আছে, তিনি জানতেন না।

তৃণা এই মানুষটাকে খুব পছন্দ করে। কেমন ঠাণ্ডা এক জন মানুষ। কথা কম বলাও যে এক ধরনের আর্ট, তা এই মানুষটা জানে। বড়ো বড়ো পার্টিতে তৃণা লক্ষ করেছে, তার দুলাভাই একেবারেই কথা বলছেন না। অথচ তিনি যে কথা বলছেন, না চুপচাপ আছেন--তাও ধরা পড়ছে না। এমন নয় যে তিনি কথা বলতে পারেন না। ভালোই পারেন। যখন কথা বলেন মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়।

তৃণা বলল, 'কেমন আছেন দুলাভাই?'

মহসিন হাসলেন, এই হাসি একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলল। তৃণা মনে মনে ভাবল আপার মতো ভাগ্যবতী মেয়ে হয় না।

'দুলাভাই।'

'বল।'

'আমার দিকে একটু ভালো করে তাকান তো দুলাভাই।'

'তাকালাম।'

'আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে?'

মহসিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার উপর দিয়ে একটা বড়ো ধরনের ঝড় বয়ে গেছে।'

'ঠিক ধরেছেন। এখন আন্দাজ করুন ঝড়ের কারণটা কী।'

'আন্দাজ করতে পারছি না। আন্দাজের ব্যাপারে আমি বেশ কাঁচা।'

'তবু আন্দাজ করুন।'

'মনে হচ্ছে তোমার ভালোবাসার কোনো মানুষ তোমাকে হঠাৎ বিনা কারণে ত্যাগ করেছে।'

'হয় নি। কারণটা কি আপনি জানতে চান?'

'তুমি বলতে চাইলে অবশ্যই জানতে চাই; বলতে না চাইলে জানতে চাই না।'

'আমি বলতে চাই। আপনাকে বলার জন্যেই বসে আছি, নয়তো কখন চলে যেতাম।'

'বল।'

'এখানে না। আমার সঙ্গে বাগানে চলুন।'

'সিরিয়াস কিছু নাকি?'

'হ্যাঁ, সিরিয়াস। খুব সিরিয়াস। যা বলব আপনি কিন্তু মন দিয়ে শুনবেন: হাসতে পারবেন না।'

'হাসি আসলেও হাসব না?'

'না। প্রতিজ্ঞা করুন হাসবেন না।'

'প্রতিজ্ঞা করলাম।'

'বলুন--প্রমিস।'

'প্রমিস।'

'তাহলে চলুন বাগানে যাই।'

বাগানে হাঁটিতে-হাঁটিতে মহসিন তৃণার কথা শুনলেন। তিনি হাসলেন না, বিরক্ত হলেন। তৃণা বলল, 'দুলাভাই, আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন?'

'না।'

'না, কেন?'

'মানুষ অন্যের মনের কথা বুঝতে পারে না। থটরিডিং বলে কিছু নেই। ম্যাজিশিয়ানরা মাঝে মাঝে থটরিডিং-এর কিছু খেলা দেখান। তার কৌশল ভিন্ন।'

'ম্যাজিশিয়ানদের থটরিডিং-এর কথা বলছি না দুলাভাই, নিশানাথ বাবুর কথা বলছি। উনি সত্যি সত্যি মানুষের মনের কথা বলতে পারেন। মানুষের মাথার মধ্যে ঢুকে যেতে পারেন।'

'উনি কোনো জীবাণু বা ভাইরাস না যে মানুষের মাথার মধ্যে ঢুকে যাবেন। যা শোন তাই বিশ্বাস কর কেন? তুমি এক জন ডাক্তার, তুমি হবে যুক্তিবাদী।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না--আমি যুক্তিবাদী বলেই নিশানাথ বাবুর ক্ষমতা দেখে এত আপসেট হচ্ছি।'

'আপসেট হবার কোনোই কারণ নেই। তুমি বাসায় যাও। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে ঘুমাও।'

তৃণা মন খারাপ করে ফেলল। মহসিন বললেন, 'এই পৃথিবী এই গ্রহ-নক্ষত্র চলছে লজিকের ওপর। তুমি যা বলছ, তা লজিকের বাইরে। কাজেই আমরা তা অস্বীকার করব।'

'প্রমাণ দেখলেও অস্বীকার করব?'

'হ্যাঁ। কারণ তুমি যা প্রমাণ বলে ভাবছ, তা প্রমাণ নয়। প্রমাণ থাকতে পারে না।'

'যদি থাকে?'

'বললাম তো--নেই।'

মহসিন অফিসে গেলেন না; সারা দিন ঘরেই রইলেন। খানিকক্ষণ বাগানের কাজ করলেন। স্টেরিওতে গান শুনলেন। দীপাকে বললেন, 'চল, আজ রাতে বাইরে কোথাও খেতে যাই। তৃণাও যখন আছে-ভালোই লাগবে। অনেক দিন বাইরে যাওয়া হয় না।'

দীপা বললেন, 'নিশানাথ চাচাকে এই অবস্থায় রেখে বাইরে খেতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'শরীর কি আরো খারাপ করেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। কী সব আবোল-তাবোল বকছেন।'

'আবোল-তাবোল তো সব সময়ই বলতেন, এটা নতুন কি?'

'এখন যা বলছেন, তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। এখন আমাকে ডেকে বললেন--মা, খবরদার তুমি ইস্ত্রিতে হাত দেবে না। কোনোক্রমেই না। ঘরে যে-ক'টা ইস্ত্রি আছে, সব আমার কাছে দিয়ে যাও।'

মহসিন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। দীপা বললেন, 'কী যন্ত্রণা বলতো দেখি! দুটা ইস্ত্রিই ওঁর কাছে দিয়ে আসতে হয়েছে।'

'তুমি দিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ। না দিয়ে কী করব বল? যা হৈচৈ করছেন।'

মহসিন ঠাণ্ডা মাথায় দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই নিলেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর খুব বেগ পেতে হল না। তিনি নিজেকে বোঝালেন, অসুস্থ, বৃদ্ধ এক জন মানুষের অকারণে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। এই বৃদ্ধ তো এমনিতেই মারা যাচ্ছে। দু' দিন আগে মারা গেলে কারোর কোনো ক্ষতি হবে না। এক জন অথর্ব বুড়োকে হত্যা করাও কঠিন কিছু নয়। সহজ, খুবই সহজ। অনেক পদ্ধতি আছে। সেই অনেক পদ্ধতির যে-কোনো একটি গ্রহণ করা যায়। যেমন নাকের উপর একটা বালিশ চেপে ধরা। দীর্ঘ সময় চেপে ধরার কোনোই প্রয়োজন নেই। দুই থেকে তিন মিনিটের মামলা।

এই মামলা সেরে ফেলা উচিত। মোটেই দেরি করা উচিত নয়। আজ রাতে সেরে ফেলাই ভালো। দেরি করা যায় না। কিছুতেই না।

দীপা বললেন, 'তোমাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন?'

'এম্নি। শরীরটা মনে হয় ভালো না।'

'যাও, শুয়ে থাক।'

তিনি শুয়ে রইলেন। ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে ভাবতে হবে। খুব ঠাণ্ডা মাথায়। সময় নেই। হাতে একেবারেই সময় নেই।

দীপা বললেন, 'মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

তিনি বললেন, 'দাও।'

তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। দীপা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু তিনি ঘুমুচ্ছেন না। ঘুমুবার উপায় নেই। তাঁকে জেগে থাকতে হবে। ভাবতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়। খুব ঠাণ্ডা মাথায়।

১০

রাত দুটার মতো বাজে।

মহসিন খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামলেন। দীপা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই সে তৃপ্তির একটা শব্দ করল। খানিকক্ষণের জন্যে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। এক বার মনে হল আবার বিছানায় ফিরে আসবেন। পরমুহূর্তেই সেই পরিকল্পনা বাতিল করে খালি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে গেলেন। খুব সাবধানে দরজা খুলে বারান্দায় এলেন। যদিও এত সাবধানতার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি হাঁটছেন নিজের বাড়িতে। কেউ তাঁকে দেখলেও কিছু যায় আসে না। তিনি যাচ্ছেন নিশানাথের ঘরে। এর মধ্যেও অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। তিনি তো যেতেই পারেন। নিশানাথ এক জন রুগী মানুষ। রাত-বিরেতে তাঁকে দেখতে যাওয়াই তো স্বাভাবিক।

নিশানাথের ঘরে ঢোকাও কোনো সমস্যা নয়। তাঁর ঘরের দরজা খোলা থাকে, যাতে সময়ে-অসময়ে তাঁর ঘরে যাওয়া যায়।

মহসিন ছোট-ছোট পা ফেলে এগোচ্ছেন। আকাশ মেঘলা। তাঁর শীত-শীত করছে। পায়েও ঠাণ্ডা লাগছে। চটি জোড়া পরে নিলে হ'ত। নিশানাথ বাবুর ঘরের কাছাকাছি আসতেই তিনি কপালের বাঁ দিকে ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করলেন। হালকা যন্ত্রণা। তিনি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। যন্ত্রণাটা কেমন করে জানি সারা মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে। এর মানে কী? নিশানাথ কি তাঁর মাথায় ঢুকে পড়েছে? এও কি সম্ভব! এটা কি বিশ্বাস্য?

অসম্ভব নয়। এই অদ্ভুত পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। ইস্ত্রির কথা দীপাকে বলা হয়েছে যখন, তখন সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব। মহসিন দ্রুত এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। তাঁর হাতে সময় নেই।

সময় নেই নিশানাথের হাতেও। নিশানাথ মহসিনের মাথার ভেতর ঢুকে গেছেন। তাঁকেও অতিদ্রুত কাজ করতে হচ্ছে। মহসিনের মাথা থেকে 'নুশরাত জাহান' নামের মেয়েটির সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলতে হবে কঠিন কাজ। একটি স্মৃতি দশটি স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। অন্যগুলি নষ্ট না-করে সেই স্মৃতি নষ্ট করা যায় না। স্মৃতির জাল দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। মাকড়শার জালের মতো তা ছড়ান। এই জাল থেকে একটি সুতো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এমন ভাবে ছিঁড়তে হবে যেন জালের কোনো ক্ষতি না হয়। কঠিন কাজ। অতি কঠিন কাজ হাতে সময় এত অল্প। মহসিনের মনের ভেতর থেকে কুটিল ক্রোধ, ভয়ঙ্কর ঘৃণাও নষ্ট করে দিতে হবে, যেন প্রবল ভালোবাসা জেগে ওঠে দীপা নামের অসাধারণ মেয়েটির দিকে। যে মেয়েটির জন্ম দেবী অংশে। সময় নেই। মোটেই সময় নেই। কঠিন কাজ। ভয়ংকর কঠিন কাজ।

মহসিন নিশানাথের ঘরে ঢুকে পড়েছেন। নিশানাথ কাত হয়ে শুয়ে আছেন। পায়ের কাছে কোলবালিশ। মহসিন কোলবালিশ হাতে তুলে নিলেন। তাঁর হাত একটু কাঁপছে। মাথায় যন্ত্রণা প্রবল হয়ে উঠছে। উঠুক। তিনি তার কাজ শেষ

করবেন। সারা জীবন তিনি তাঁর পরিকল্পনা অক্ষরে অক্ষরে কাজে খাটিয়েছেন। আজও খাটাবেন। এর কোনো নড়-চড় হবে না। কিন্তু মাথা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বড্ড অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। হোক। যা ইচ্ছা হোক। তিনি নিচু হয়ে নিশানাথের মুখের উপর বালিশ চেপে ধরলেন।

সময় শেষ হয়ে এসেছে। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। নিশানাথ মৃত্যুর স্বরূপ বুঝতে পারছেন। বড়োই আফসোস, কাউকে তা জানাতে পারছেন না। কারণ তাঁর কাজ শেষ হয় নি। এখনো কিছু কাজ বাকি আছে। মহসিন এই মুহূর্তে একটি খুন করছে। এই খুনের স্মৃতিও তার মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এই ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে সে স্বাভাবিক মানুষের জীবন যাপন করতে পারবে না। এই স্মৃতিও নষ্ট করতে হবে। সময় নেই। এক অণুপল সময়ও নষ্ট করা যাবে না। আহ্‌, যদি কিছু সময় থাকত, তাহলে মৃত্যুর স্বরূপ অন্য কাউকে বলে যেতে পারতেন! শুধু একটি কথা যদি বলতে পারতেন--যদি জানিয়ে যেতে পারতেন মৃত্যু ভয়াবহ নয়, কুৎসিত নয়। মৃত্যুর সৌন্দর্য জন্মের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। কাকে জানাবেন? মহসিনকে? মন্দ কি? কেউ এক জন জানুক।

মহসিন সাধারণত খুব ভোরবেলায় জাগেন। আজ ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। দীপা ডেকে তুলে বললেন,--'তোমার একটা জরুরী টেলিফোন। মহসিন আধো ঘুমে টেলিফোন রিসিভারে মুখ লাগিয়ে বললেন, 'কে?'

ওপার থেকে মধুর স্বরে বলা হল, 'আমি।'

'আমিটা কে?'

'আমি নুশরাত জাহান--নুশা।'

'নুশা মানে?--নুশা কে?'

ওপাশ থেকে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলা হল, 'আমি তোমার নুশা।'

মহসিন বিস্মিত ও বিরক্ত হলেন।

'তুমি এমন করছ কেন? আমি নুশা।'

মহসিন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। বিছানার পাশে দীপা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ জলে ভেজা। সেই দিকে তাকিয়ে মহসিনের মন মায়ায় ভরে গেল। এত গভীর মায়া, এত গভীর মমতা তাঁর ভেতর আছে, তা তিনি কখনো বোঝেন নি। এই মমতার উৎস কী? তিনি হাত বাড়িয়ে দীপাকে স্পর্শ করলেন। দীপা নিচু গলায় বলল, 'নিশানাথ চাচা কাল রাতে মারা গেছেন।'

দীপার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। মহসিনের চোখও ভিজে উঠল। তিনি গভীর বেদনা বোধ করলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'মৃত্যু নিয়ে মন খারাপ করতে নেই দীপা। মৃত্যুও আনন্দময়। আমরা জানি না বলেই ভয় পাই।'

এইটুকু বলেই তিনি চমকে উঠলেন। কেন এ রকম একটা অদ্ভুত কথা বললেন, ভেবে পেলেন না। তাঁর মনে হল, এই কথাগুলি স্বপ্নে পেয়েছেন। হ্যাঁ, অদ্ভুত একটা স্বপ্ন তিনি কাল রাতে দেখেছেন। যেন খুব একটা শীতের রাত--খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে কোথায় যেন যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন?

দীপা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তাঁর গাল অশ্রুতে ভেজা। মহসিন সেই অশ্রু মুছিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। তিনি গাঢ় স্বরে ডাকলেন, 'দীপা।'

দীপা কিছু বলল না।

তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি দীপা। এ রকম করে কেঁদ না। আমার কষ্ট হচ্ছে। সত্যি কষ্ট হচ্ছে।'

বলতে-বলতে সত্যি-সত্যি তাঁর চোখে জল এসে গেল। এই পৃথিবীতে চোখের জলের মতো পবিত্র তো আর কিছু নেই। এই পবিত্র জলের স্পর্শে সব গ্লানি--সব মালিন্য কেটে যায়।